অনির্বাণ

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশন-সহায়ক
জনকল্যাণ সংসদ
৭এ, রামশেঠ রোড
কলিকাতা-৬

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৭১

অরবিন্দ আশ্রম ট্রাষ্ট, পণ্ডিচেরী-২

মূল্য ঃ ৮'০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক ঃ
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

বিজ্ঞপ্তি

বইখানি শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্য-জীবন'-পাঠের অবতরণিকারূপে রচিত। প্রথম সংস্করণে, এর প্রথম খণ্ডের আলোচনা সংক্ষিপ্ত ছিল—এবার তা পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হল। অধ্যায়-সন্নিবেশ মূল গ্রন্থের অনুরূপ। পাঠকদের সুবিধার জন্য সবার শেষে দার্শনিক পরিভাষার একটি কোশ যুক্ত করা হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্ম ও জগৎ

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম পর্ব

অনন্তচেতনা এবং অবিদ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পর্ব

বিদ্যা এবং চিন্ময় পরিণাম

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্ম ও জগৎ

প্রথম অধ্যায়

নচিকেতার অভীপ্সা

প্রাকৃত মানুষের জীবন কাটছে যেন স্বপ্নের ঘোরে—একটা অন্ধশক্তির তাড়নায়। সে-জীবনেরও একটা আপাত-লক্ষ্য আছে ; কিন্তু তা গভীর নয়, দূরের নয়। অধিকাংশেরই জীবনের এই ধারা। কিন্তু এরই মধ্যে ঘুমের ঘোর কারও-কারও ফিকা হয়ে আসে—জাগে একটা নতুনধরনের জীবন-জিজ্ঞাসা। মনে হয়, যা পেয়েছি, তা-ই চরম নয়। দেহের দাবি, প্রাণের আকৃতি, মনের কল্পনাকে ছাড়িয়েও আরেকটা কিছু আছে, যাকে না পেলে জীবনের ফাঁক যেন কিছুতেই ভরতে চায় না। এই অতৃপ্তির বেদনা মানুষের চিত্তকে করে লোকোত্তরের অভিযাত্রী—অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতা খোঁজে সে অন্তরের গভীর হতে উৎসারিত উষার আলোতে, আত্মার অবন্ধন স্বাতন্ত্র্যে, মৃত্যুহীন প্রাণের উল্লাসে। মানুষ চায় ভূমাকে। এ-চাওয়া লোকাতত না হ'ক, তবুও এ চিরন্তন।

কিন্তু এমনি করে ভূমাকে চাওয়ার রূপটি সবার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। জীবনের গভীরে অচল প্রতিষ্ঠার একটি ধ্রুববিন্দুকে আবিষ্কার করে ভূমার আলোয় আনন্দে এবং বীর্যে বনস্পতির মত উচ্ছ্রিত হওয়া দ্যুলোকের দিকে—অনেকের কাছেই মনে হবে, এটা একটা অবাস্তব আদর্শবাদের অলস জল্পনা শুধু। আমাদের আটপৌরে ব্যাবহারিক জীবনের সঙ্গে এর কোনও সঙ্গতি নাই। এমন দিব্য-জীবনের সম্ভাবনাকে যদি স্বীকারও করি, তবুও তার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে বা হবে ক'জন সাধক ? তাছাড়া, এই সিদ্ধির অনুকূল কোনও ব্যবস্থা কি আমরা বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখতে পাই ? সেখানে কুরুক্ষেত্রই ঘোর বাস্তব—বৃন্দাবনের স্বপ্ন একটা আলেয়া মাত্র। প্রকৃতির চক্র একটা নির্দিষ্ট তলে যন্ত্রের মত ঘুরছে শুধু। দু'একজন তার আবর্ত থেকে বাইরে ছিটকে পড়ছে—এই মাত্র। কিন্তু তার গতিতে কোথায় উত্তরায়ণের ইশারা ?

কথাগুলি অদূরদর্শী মন্দবুদ্ধির—বিশ্বতশ্চক্ষু বিশালবুদ্ধির নয়। একেবারে নিরেট বাস্তব নিয়ে বাঁচা উদ্ভিদ বা পশুর বাঁচা হতে পারে—কিন্তু মানুষের

বাঁচা কখনও নয়। আর ওদের বাঁচার মধ্যেও কি ক্রমিক পরিণামের একটা ছন্দ নাই—যার লক্ষ্য রূপায়ণের উৎকর্ষের দিকে? অঙ্কুরণ থেকে ফল ধরা পর্যন্ত, ভ্রূণদশা হতে যৌবন পর্যন্ত—জীবনের ইতিহাস কি প্রাণশক্তির একটা কুণ্ডলমোচনের ইতিহাস নয়? উদ্ভিদ বা পশুতে তার অর্থ এবং চেতনা খুব স্পষ্ট না হলেও, তা স্পষ্ট হয়েছে মানুষের মধ্যে প্রাণ যখন মনে বিকশিত হয়েছে। একজন বৈদিক ঋষি এর একটা সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন এইভাবে: 'দেখছি, সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে প্রজ্ঞানের একটা উৎকৃষ্টতর আবির্ভাব। তার ভূমিকা রচিত হয়েছে উদ্ভিদে। প্রাণ সেখানে রসকেই ফুটিয়েছে—চিত্তকে নয়। তারপর পশুতে সে ফোটাল চিত্তকেও—কিন্তু প্রজ্ঞানকে নয়। অবশেষে মানুষের মধ্যে এসে হল প্রজ্ঞানের উৎকৃষ্টতম আবির্ভাব। পিছনের দিকে তাকিয়ে সে দেখল অতীতকে—সামনের দিকে ভবিষ্যৎকে। সে জানল ইহলোককে, আবার জানল লোকোত্তরকে। আমি বলি, জড় থেকে শুরু করে প্রাণ ও চেতনার যত রূপ—সব প্রজ্ঞানের বিচিত্র লীলা। আর এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম (ঐতরেয় আরণ্যক এবং উপনিষদ)।'

অব্যক্ত অতীত হতে পূর্ণতর পূর্ণতম ভবিষ্যতের দিকে জীবনের এই-যে অভিযান, মানুষের আদর্শবোধের মূলে আছে তারই প্রেরণা। শুধু মানুষেই নয়—এ-প্রেরণা বিশ্বের সর্বত্র। উদ্ভিদে তা আচ্ছন্ন-চেতন, পশুতে অবচেতন, আর মানুষে সচেতন। অচেতন জড় তার আধার। সচেতনতা আনে ভবিষ্যতের কল্পনা। একমাত্র মানুষই তার ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট রূপ দেখতে পায়। ভাবময় সে-রূপকে বাস্তব করে তোলাই হল তার জীবনের তপস্যা। অপরের বেলায় এ-তপস্যা চলে নেপথ্যে—বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃপুরে। উদ্ভিদ বা পশু জানে না, তারা কি হবে। এক নিগূঢ় শক্তির নিপুণ প্রযুক্তিতে তারা অবশে কেবল 'হয়ে চলে'। কিন্তু মানুষের সন্ধানী দৃষ্টি সেই গহনেও নেমে গিয়ে প্রকৃতির কলা-কৌশল আবিষ্কার করে তার নিয়ন্ত্রণের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান এই নিয়ন্ত্রণের বিস্ময়কর পরিণাম।

দুটি শক্তি বিজ্ঞানের মূলে কাজ করছে—প্রগতির তাগিদ, আর চৈতন্যের আবিষ্ক্রিয়া। প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে, একটিকে বলতে পারি প্রাণের, আরেকটিকে প্রজ্ঞার ব্যাপার। প্রগতি প্রাণের ধর্ম, আর আবিষ্ক্রিয়া প্রজ্ঞানের ধর্ম। জড় প্রাণ মন সবই বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে। কিন্তু তার ফলিত লক্ষ্য যে প্রাণনের উৎকর্ষ এবং প্রজ্ঞানের প্রসার—একথা কোনও বৈজ্ঞানিক

অস্বীকার করতে পারেন না। আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের আদর্শ-বোধের বীজ—যাকে বলতে পারি বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বগত প্রেরণা। 'পর্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—এই চাওয়ার সংবেগই বিশ্বব্যাপারের মর্মচর সত্য। ঋষির ভাষায়, 'য়দিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'—এই জগতে যা-কিছু, সব প্রাণ হতে কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। আর সম্ভূতির এই প্রাণস্পন্দ চলছে ভূমার সন্ধানে।

অতএব আদর্শবাদ একটা অবাস্তব অসার জল্পনা নয়। রূপদক্ষ শিল্পী যেমন পাথরের চাঙ্গড় কুঁদে মূর্তি ফোটায়, আদর্শ তেমনি বস্তুপিণ্ড ঘেঁটে গড়ে ভাবের রূপ। এখানে বস্তু বা ভাব কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। বস্তু উপাদান, ভাব নিমিত্ত। দুয়ের যোগাযোগে সার্থক রূপসৃষ্টি। অত্যন্ত কাছের এবং অত্যন্ত চেনা-জানা বলে বস্তুকে যে আঁকড়ে থাকে, তারও মধ্যে একটা বস্তুনিষ্ঠ ভাবা-দর্শের প্রেরণা আছে—অন্যথায় সে নিষ্প্রাণ অচেতন জড়ের শামিল হয়ে থাকত। সম্যক্ দৃষ্টির অভাবে তার আদর্শ জড়ের গণ্ডিতে সীমিত রয়েছে। নইলে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, আরও কোন্‌খানে'—এ-বাণী তারও।

আর এই আদর্শের প্রেরণা থেকেই জীবনে যত সঙ্কট আর সমস্যার উদ্ভব। একটা-কিছু করতে হবে, একটা-কিছু হতে হবে—এই হল প্রাণের তাগিদ। কিন্তু করা বা হওয়া—কোনটাই তো সহজ নয়। প্রাণ নির্ঋতি (chaos, disorder) হতে উত্তীর্ণ হতে চাইছে ঋতচ্ছন্দে (cosmic rhythm, order)। তার জন্য তার যেমন চাই অধৃষ্য বীর্য, তেমনি প্রজ্ঞার প্রসার। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রকে যদি একনজরে দেখতে পাই, আর অন্তরে যদি থাকে অদম্য উৎসাহ—তাহলেই যা-কিছু অগোছাল হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাকে আমরা একটি নিটোল সুষমায় গুছিয়ে তুলতে পারি। এই সৌষম্যের সাধনাই হল সত্যকার জীবনশিল্প। কোন-কিছুকেই বাদ দেব না, কিন্তু যাথাতথ্যত বিধানের দ্বারা সবাইকে গুছিয়ে এনে ব্যাহৃতির মন্ত্রে চেতনার অবরভূমি হতে তাদের উত্তীর্ণ করব উত্তরভূমিতে—এই হল আমাদের আদর্শ-বোধের দায়। বিশ্বব্যাপারে প্রকৃতিও এই দায় নির্বাহ করে চলেছে। একই রীতিতে জড়ের পরিকীর্ণতায় সে উন্মেষিত করছে প্রাণ, প্রাণের অজস্র উচ্ছলতার মধ্যে সে ফুটিয়ে তুলছে মনের সুমিত ছন্দ, মনের গভীরে ধীরে-ধীরে আবিষ্কৃত করছে প্রজ্ঞানের সাবিত্রী দীপ্তি। জড় প্রাণ মন ও প্রজ্ঞান বিশ্বের এই চারটি মৌলতত্ত্বই আমাদের মধ্যে রূপ ধরেছে দেহে প্রাণে মনে এবং

বিজ্ঞানে বা অধ্যাত্মচেতনায়। এদের মধ্যে প্রথম তিনটির সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান নেপথ্যে থেকে কাজ করছে বুদ্ধির মাধ্যমে—তাইতে তার স্বরূপ তাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অথচ এই বিজ্ঞানই হল মানুষের অধ্যাত্মসাধনার প্রথম সাধন।

বিজ্ঞানের বিশিষ্ট দুটি লক্ষণ হল—চেতনার অন্তর্মুখীনতা, দৃষ্টিকে বাহির থেকে অন্তরের দিকে ফেরানো ; আর চেতনার অতীন্দ্রিয় ব্যাপ্তি, বস্তুর বন্ধন কাটিয়ে তার উত্তীর্ণ হওয়া ভাবের রাজ্যে। বিজ্ঞান মনকে ছাপিয়ে—যেমন দেহকে ছাপিয়ে প্রাণ, আর তাকে ছাপিয়ে মন। মানুষের মধ্যে চিৎপরিণাম মনে এসেই শেষ হয়ে যায়নি—যদিও মনন মানুষের বিশিষ্ট ধর্ম। প্রাকৃত মন নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের উপর—যাদের কারবার বিশেষকে (particulars) নিয়ে। আর বিজ্ঞানের কারবার হল সামান্যকে (universals) নিয়ে। মনের ওপারে থেকে বিজ্ঞান মনের মধ্যে স্ফুরিত হতে চাইছে—তার এই চাওয়াই হল ভূমাকে চাওয়া, যা মানুষের অধ্যাত্মপিপাসার বনিয়াদ। ভূমার বোধ বৃহৎএর বোধ—ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের বোধ। এই বোধই দিব্য-জীবনের ভিত্তি—যা প্রাকৃত-জীবনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ এবং অতিরেক।

ভূমাকে চাওয়াই নচিকেতার অভীপ্সা। নচিকেতা শ্রদ্ধাবিষ্ট মনের প্রতিরূপ—সে ভূমাকে জানেনি, কিন্তু জানতে চায়। তার চাওয়ার একটা অখণ্ড রূপ আছে। তার পরিচয়—এই মর্ত্য আধারকেই অমৃতরসে পূর্ণ করবার, এই পার্থিব জগতেই দিব্য-জীবনের আবির্ভাব ঘটাবার আকৃতিতে। সমষ্টি-চেতনায় এখনও এ-আকৃতি স্পষ্ট নয়। বাধা এসেছে মানুষের একপেশে মতুয়ার বুদ্ধি হতে। পরম সত্য জড় না চৈতন্য—এ-প্রশ্নের মীমাংসা সে সমগ্র-দৃষ্টির ঔদার্য নিয়ে করতে পারেনি। দুরাগ্রহের আতিশয্যে কখনও সে জড়কে করেছে বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব, কখনও-বা চিৎকে ; এক অখণ্ড-তত্ত্বের মধ্যেই যে দুটি ওতপ্রোত হয়ে আছে—এ-অনুভব তার কাছে সহজ হয়নি। তাই, জড় আর চৈতন্যের মধ্যে যে-আপাতবিরোধ, গোড়াতেই তার একটা মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জড়বাদীর নাস্তি

জড় না চিৎ, কোন্‌টি যে বিশ্বের মূল—এ নিয়ে আবহমান কাল মানুষের মনে একটা দ্বন্দ্ব আছে। এর মধ্যে দার্শনিক মত হিসাবে জড়বাদকে সবার উপরে স্থান দেওয়া খুব সহজ। আজকালকার দস্তুরও তা-ই। জড় হাতের কাছে, জড় নিরেট, জড় হতেই জীবনের শুরু—তাকে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নাই। তাই তাকে বিশ্বের বনিয়াদ বলে মেনে নিতে প্রাকৃত বুদ্ধির কোথাও আটকায় না। তার যুক্তি এই। যা আমাদের প্রত্যক্ষ, আমরা তাকেই নিঃসংশয়ে সত্য বলে মানতে পারি। এইদিক দিয়ে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের চাইতে বড় প্রমাণ আর-কিছুই নাই। অবশ্য যুক্তির মধ্যে অনুমানের একটা বড় স্থান আছে—এমন-কি আমাদের জ্ঞানের প্রসার অনেকখানি নির্ভর করে অনুমানের উপর। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ যদি অনুমানের ভিত্তি হয়, তাহলেই সত্যের ইমারত পাকা হতে পারে। অতএব যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, সেই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর লোকান্তর ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বস্তু আমাদের কাছে নিষ্প্রমাণ—ওরা ভাবকের কল্পনাবিলাস শুধু।

নিঃসন্দেহে এ-যুক্তির একটা জোর আছে। বিশেষত বৈজ্ঞানিকের সত্য-নিষ্ঠার জোর : যা সত্য তা প্রত্যক্ষগোচর হওয়া চাই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও বলব, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাহেতু এ-যুক্তির মধ্যে মস্ত ফাঁকও রয়েছে। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, মানুষের ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগুলি খোলা রয়েছে বাইরের দিকে—তাই তার দৃষ্টি পরাক্ (objective)। সে শুধু বাহিরটাই দেখে—ভিতরের দিকে তাকায় না। কদাচিৎ কেউ আবৃত্তচক্ষু হয়ে ভিতরের দিকে তাকায়—আর প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিতে দেখে আত্মাকে।

এখন পরাক্ দৃষ্টিতে বাইরের জগৎটাকে দেখা যেমন একধরনের প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ দৃষ্টিতে তেমনি নিজেকে বা আত্মাকে দেখাও আরেকধরনের প্রত্যক্ষ।

দুটি প্রত্যক্ষই পড়ে সত্যানুভবের এলাকায়। এক্ষেত্রে বাইরের অনুভব বরং বহিরঙ্গ, আর অন্তরের অনুভব একান্তভাবে অন্তরঙ্গ। ইন্দ্রিয়ের দেখা খুবই সত্য হতে পারে—যদিও তার দেখায় যে কখনও ভুল হয় না, তা নয়। কিন্তু সেই দেখাই যদি ভাবের চোখে রসের দেখা হয়, তখন তা হয় সত্যতর। তা শুধু নিজের বাইরে রেখে জড়কে খুঁটিয়ে দেখা নয়, নিজের ভিতরে তাকে টেনে এনে তদাত্মক হয়ে দেখা। আগের দেখা বৈজ্ঞানিকের; আর পরের দেখা হল বিজ্ঞানীর, কবির, রসিকের এবং মরমীয়ার। আগের দেখা প্রয়োজনের তাগিদে—তার অনেক দাম। কিন্তু পরের দেখাটি আরও দামী—কেননা তা জীবনে জাগিয়ে তোলে ইষ্টার্থের (values) বোধ, যা জীবনকে মহনীয় করে স্বাদু করে।

অতএব সত্যের দর্শন অখণ্ড এবং পূর্ণায়ত হবে—যদি আমরা পরাক্ দৃষ্টি এবং প্রত্যক্ দৃষ্টি দুটিকে মিলিয়ে নিতে পারি। পরাক্ দৃষ্টিতে যেমন জগৎকে খুঁটিয়ে জানব, তেমনি প্রত্যক্ দৃষ্টিতে নিজেকে বা আত্মাকেও জানব গভীর করে। একটি হল বস্তুকে জানা, আরেকটি হল তাকে ভাবে পাওয়া। সত্য বলতে, বস্তু বা জড় আর ভাব বা চিৎ পরস্পরবিরোধী দুটি তত্ত্ব নয়। একই অখণ্ড সত্তার তারা কুমেরু এবং সুমেরু। দুয়ের মধ্যে বইছে শক্তির প্রবাহ—যা জড়ের মধ্যে প্রাণ ও চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ক্রমশ তাকে চিন্ময় করে তুলছে। অতএব জড় শক্তি ও চৈতন্য তিনের সমাহারে যে-অখণ্ডতত্ত্বটি পাই, তা-ই হল বিশ্বের মূল।

এই তত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয় আমাদের নিজের মধ্যে। আমার দেহ জড়—কিন্তু সপ্রাণ এবং সচেতন জড়। আমার মধ্যেও দেখি, দেহ আর আত্মচৈতন্য ওতপ্রোত হয়ে আছে। দুয়ের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে প্রাণের প্রবাহ। প্রাচীনেরা বলতেন উজান-ভাটায় এই প্রবাহের দুটি ধারা—একটি ভোগের, আরেকটি অপবর্গের বা যোগের। একই প্রাণ ভোগে চৈতন্যকে দেহে নামিয়ে এনে বন্দী করে—আর তাইতে দেহের প্রতি যোগীর এত বিরাগ; আর যোগে দেহচেতনার উজানধারায় তাকে মিলিয়ে দেয় মহাশূন্যে—তাইতে নির্বিশেষ চৈতন্যকে ভোগীর এত ভয়। আর তার ফলে দেহে এবং আত্মায় জড়ে আর চৈতন্যে অমন দুরপনেয় বিরোধের কল্পনা। কিন্তু বস্তুত ভোগে আর যোগে একই প্রাণগঙ্গার ভোগবতী আর উত্তরবাহিনী দুটি ধারা। ধারা ভূলোক হতে উজিয়ে যায় দ্যুলোকে; আবার সেখান হতে অলকানন্দা

হয়ে নেমে আসে ভূলোকে। মর্ত্য জীবন তাতে অমৃতরসসিক্ত হয়ে দিব্য হয়। অখণ্ড বিশ্বলীলার এই পরম তাৎপর্য।

বিশ্বের মূলে এক অদ্বয়তত্ত্বকে আবিষ্কার করাই সমস্ত দর্শনের লক্ষ্য। যার যেমন দৃষ্টি যেমন সংস্কার, সে তেমনি একটি তত্ত্বকে বেছে নিয়ে তাকেই কল্পনা করে বিশ্বমূল বলে এবং আর সব-কিছুকে তা-ই দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়। সত্তার এক মেরুতে জড়, আরেক মেরুতে চিৎ। জড়বাদী বলবে, জড়ই একমাত্র সত্য, চৈতন্য তার অবাস্তব একটা উপসৃষ্টি (by-product) মাত্র। আবার তেমনি জোরের সঙ্গে চিদ্‌বাদীও বলবে, চৈতন্যই একমাত্র সত্য, জড় তার কল্পিত একটা বিভ্রম (illusion) শুধু। দুটি দর্শনই একদেশদর্শী এবং উচ্চারণ করছে একটা অর্ধসত্য মাত্র। দুটি দর্শনই অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাদের অদ্বৈতের ভিত্তি নেতিবাদের উপর। জড় এবং চিৎ দুয়েরই প্রত্যক্ষ অনুভব আমাদের আছে, অতএব এক অখণ্ডদর্শনের ঔদার্যে দুয়ের সমাহার সম্ভাবিত। কিন্তু তা না করে আমরা যদি একটিকে উড়িয়ে দিয়ে আরেকটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাই, তাহলে তা একের দর্শন বলে অদ্বৈতবাদ হবে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে অপরটির কোনও সঙ্গতি এবং সম্পর্ক না থাকায় তা পূর্ণাদ্বৈত হবে না।

অথচ আমাদের 'অনুভবে' জড় আর চিৎ ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই অখণ্ড অনুভবকে যদি সম্প্রসারিত করে বিশ্বে আরোপ করি, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যের অনুভবের উপর যদি বিশ্বের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলেই জড় আর চিৎএর মধ্যে আপাতদৃষ্ট বিরোধের সমাধান সম্ভব। কিন্তু পরাক্ দৃষ্টি তার জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যক্ দৃষ্টি নিয়ে ডুবতে হবে নিজেরই গভীরে—অথচ সেই গভীরেও পরাক্ দৃষ্টিকে সজাগ রাখতে হবে, যাতে একে-একে জড়ের কঞ্চুক উন্মোচন করে তার চিন্ময় স্বরূপকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

কিন্তু জড়বাদী তাতে রাজী নয়। ইন্দ্রিয়সংবিৎ (sensation) আর তার আশ্রিত অনুমানের বাইরে অনুভবের সীমানাকে সে প্রসারিত করতে চায় না। এক্ষেত্রে তার একধরনের গোঁড়ামি আছে, যাকে কিছুতেই সমীক্ষা এবং পরীক্ষায় কুশল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অনুকূল বলা চলে না। কিন্তু জাগ্রৎ-ভূমি ছাড়া চেতনার আরও দুটি ভূমি আছে—স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। তাদের পরিশুদ্ধ রূপও সত্যদর্শনের প্রমাণ বলে গণ্য হবার দাবি রাখে। উপনিষদে এবং যোগে তারা তত্ত্ব-জ্ঞানের আলম্বনরূপে স্বীকৃত। প্রাতিভ সংবিৎএর আকারে প্রাকৃত জাগ্রতেও তারা মাঝে-মাঝে চমক হানে। তাদের কিছু-কিছু স্থূল বৃত্তির সঙ্গে

সম্প্রতি ওদেশের মনোবিদ্‌দের খানিকটা পরিচয় ঘটেছে। এখন, বিচারমূঢ়তায় এদের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে অনুভবের সীমাকে সঙ্কুচিত রাখার কি তাহলে কোনও যৌক্তিকতা আছে ?

জড়বাদীর ভয়, ইন্দ্রিয়সংবিৎএর বাইরে গেলে রহস্যলোকের আলো-আঁধারিতে পড়ে সে দিশাহারা হয়ে যাবে। কিন্তু রহস্য কোথায় নাই ? সত্যের সন্ধান মানেই সীমিত প্রত্যয়ের সহায়ে অসীমের সন্ধান। জানার কোথাও সীমারেখা টানা যায় না। সব জানার প্রত্যন্তে দেখি, অজানার হাতছানি। মানুষের দুর্মর জিজ্ঞাসা তাকে অজ্ঞেয় বলে হাল ছেড়ে দেয় না, বলে—আজ সে অজ্ঞাত, কিন্তু একদিন তাকে আমি জানবই। জানতে গিয়ে প্রমাতৃচৈতন্য প্রমাণ আর প্রমেয় তিনটিই সূক্ষ্ম হয়ে যায়—কেননা যে-কোনও বিষয়ের তত্ত্বমাত্রেই 'গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে', সে ধরা পড়ে কেবল অগ্র্যা বুদ্ধির সূক্ষ্ম বৃত্তির কাছেই। এমনি করে জড়বাদীর জড়ও আজ অবাস্তব মায়া হয়ে গেছে—তার অধিষ্ঠানরূপে দেখা দিয়েছে শক্তির সত্য। সে-শক্তি আবার অনির্বচনীয়—তার স্পষ্ট কোনও রূপরেখা নাই অজানা রহস্যের কতকগুলি ইশারা (pointers) ছাড়া। জড়বিজ্ঞানের গবেষণায় ইন্দ্রিয়সংবিৎএর স্থান কবেই গৌণ হয়ে গেছে। এখন আছে কেবল কতকগুলি প্রত্যয়সামান্যের অন্যোন্যসম্বন্ধ—যার ফলে প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের বিবৃতি দার্শনিকের বিবৃতির সগোত্র হয়ে উঠছে দিনকে-দিন।

প্রমাণ সম্পর্কে দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাটুকু বাদ দিলে পর, বৈজ্ঞানিক জড়বাদে যে তীব্র সত্যৈষণা এবং সত্যনিষ্ঠার সংবেগ আছে, তা আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের যোগ্য। আমরা সত্যকে জানব এবং মিথ্যার সমস্ত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সে-জানাকে নির্মমভাবে নির্মল রাখব—এ-আদর্শ সব সত্যব্রতীর। কিন্তু সত্য শুধু বাইরের নয়—অন্তরেরও সত্য আছে। পরাক্ দৃষ্টিতে যেমন সত্যের একটি দিগন্ত উন্মোচিত হয়, তেমনি প্রত্যক্ দৃষ্টির কাছে হয় আরেকটি। মানুষ যেন বাইরের সত্য আর অন্তরের সত্যের মাঝে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের অভ্যুদয় এবং অন্তরের নিঃশ্রেয়স দুইই তার কাম্য। যেমন তার দেহ আছে, তেমনি তার আত্মাও আছে। দুয়েরই ঋদ্ধি সিদ্ধি এবং প্রমুক্তিতে তার পুরুষার্থের চরিতার্থতা। অতএব জড়বাদ এবং চিদ্‌বাদ দুয়ের সমন্বয় এবং সমাহারের দ্বারা একটি অখণ্ড জীবনদর্শন গড়ে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

জড়বাদের মধ্যে বাস্তবতার প্রতি ঝোঁক এবং সংশয়কে পুরোধা করে তার

সত্যৈষণাকেও আমরা দোষ দিতে পারি না। অতীন্দ্রিয়ের কারবারী হতে গিয়ে সব দেশের অধ্যাত্মবাদেই প্রচুর পরিমাণে অতিপ্রাকৃতের ভেজাল ঢুকেছে —যার নির্ভর শুধু বিচারমূঢ়ের শ্রদ্ধালুতার উপর। কঠোর পরীক্ষা ও সমীক্ষার দ্বারা এগুলিকে যাচাই করে না নিলে মানুষের অধ্যাত্মচেতনা নির্বীর্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে জড়বাদীর সংশয় পূর্বপক্ষের কাজ করে। বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং যুক্তির দ্বারা তার খণ্ডন এবং সেই উপলক্ষ্যে অখণ্ড অনুভবের ধারাবাহিকতায় লোকোত্তরের সত্যকে ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত করা অধ্যাত্মবাদীর একটা মস্ত দায়। এদেশের প্রাচীন দর্শনগুলিতে দেখা যায়, অলৌকিকের প্রামাণ্য সবসময় লৌকিকের প্রামাণ্যের সমান্তরাল। অর্থাৎ বৈদিক ঋষির ভাষায়, আমাদের বুদ্ধি যদি হয় দ্যুলোকাভিসারী, তবুও তার চরণ থাকবে এই পৃথিবীর 'পরে। আমরা ভুলব না যে, দ্যুলোক যদিও আমাদের পিতা, কিন্তু এই পৃথিবীই আমাদের মাতা। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম শুধু লোকোত্তর নন, তিনি লোকাত্মকও—এমন-কি 'অন্ন' অর্থাৎ প্রাণোপাদান জড়ও ব্রহ্ম। আত্মা এবং তনু তাঁর কাছে অন্যোন্যবিনিময়ে (interchangeable) দুটি সংজ্ঞা। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ শুধু অতীন্দ্রিয় নয়—এই দেহ দিয়ে ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রাণ দিয়ে মন দিয়েও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই চিন্ময় প্রত্যক্ষে তারা উদ্ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং তাইতে যে-জিজীবিষা (will to live) আমাদের স্বভাবগত, তার সার্থক পরিতর্পণ ঘটে। জিজীবিষা ভোগ এবং কর্ম—কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। প্রাকৃত ভূমিতে তাদের মধ্যে যে-ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়—উচ্ছেদ দ্বারা নয়, অমৃত-ভাবনা ত্যাগ এবং নির্লেপ দ্বারা তাদের আপূরিত এবং রূপান্তরিত করাই আমাদের পরম পুরুষার্থ (ঈশোপনিষদ)।

এইধরনের একটা ভাবনা বৈজ্ঞানিক জড়বাদের পিছনেও কাজ করছে—যদিও তার রূপ তার কাছে স্পষ্ট নয়। জড়বাদীও প্রাণ চায় আলো চায় আনন্দ চায়—আর চায় সবার জন্য। জড়কে গোড়ায় মেনে নিয়েছে বলে তর্কের খাতিরে সে যত অত্যুক্তিই করুক না কেন—সে জড়ত্ব থেকে প্রাণে এবং চৈতন্যে উত্তীর্ণ হতেই চায়, জড়ত্বে ফিরে যেতে বা তাকে আঁকড়ে থাকতে চায় না। সেও সূক্ষ্মেরই পূজারী—স্থূলের নয়। তার প্রধান দোষ দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা। যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে সে বাইরের গবেষণায় নিযুক্ত করেছে, তাকে যদি যোগীর মত অন্তরের গবেষণায়ও নিযুক্ত করে নির্মুক্ত মন নিয়ে—তাহলে আশা করতে পারি, তার সাম্প্রতিক সাধনা মানবজাতির একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই পুরোধা

হবে। কেবল উপকরণের সঞ্চয়ে যে-জীবন তৃপ্ত হয়, সে হল পশুর জীবন। কিন্তু 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'। চৈতন্যের উন্মেষ ছাড়া, ভূমার অনুভব ছাড়া মানুষের জীবনের কোনও সমস্যারই সার্থক এবং সর্বাঙ্গীণ সমাধান হতে পারে না। কেবল অভ্যুদয় বা কেবল নিঃশ্রেয়স নয়—দুয়ের সমাহারে মানুষ চায় দিব্য-জীবন।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈরাগীর নেতি

জড়বাদের উলটা পিঠেই চিদ্‌বাদ। তার মতে একমাত্র চিৎই সত্য—জড় মিথ্যা, জগৎ একটা বিভ্রম বা মায়া। জড়বাদের নির্ভর যেমন ইন্দ্রিয়ের 'পরে, এর নির্ভর তেমনি অতীন্দ্রিয় অনুভবের 'পরে। জড়বাদীর জীবনদর্শনে ভোগ এবং ঐশ্বর্যই (mastery over things) মানুষের পরম পুরুষার্থ। চিদ্‌বাদীর আগ্রহ বৈরাগ্য এবং মুক্তির সাধনায়—'নেতি নেতি' বলে জীবনের লৌকিক সমস্ত ঋদ্ধিকে প্রত্যাখান করে এক লোকোত্তর চিন্ময় ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়ায়।

চিদ্‌বাদী ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষকে চরম প্রামাণ্য দিতে নারাজ। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ যে সবসময় সত্য নয়, তার অধিকার যে সীমিত—জড়বাদীও একথা অস্বীকার করতে পারেন না। আবার স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ছাড়াও সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যে আছে এবং তার দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান যে হতে পারে—একথাও এখন আর উড়িয়ে দেবার উপায় নাই। এইসব ইন্দ্রিয়কে স্ফুরিত করবার বৈজ্ঞানিক রীতির বিবৃতি এদেশের প্রাচীন যোগশাস্ত্রে আছে। তার অনুশীলনে চেতনায় যে গভীরতা ব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা আসে, তার ফলে অতীন্দ্রিয় জগতের একটা পরম্পরা আমাদের চোখের সামনে খুলে যেতে পারে। তখন যে চিন্ময় ভোগ এবং ঐশ্বর্যের সন্ধান আমরা পাই, তার উৎকর্ষ লৌকিক ভোগৈশ্বর্যকে বহুগুণ ছাপিয়ে যায়। তার প্রতি অন্ধ থাকাকে কিছুতেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ প্রগতির অনুকূল বলতে পারি না।

আসল কথা, চৈতন্যের বিকাশ ঘটানোই মানুষের পরম পুরুষার্থ। এই চৈতন্যকে বলতে পারি বিশ্বের মূলতত্ত্ব—কেননা আমাদের চৈতন্যেই বিশ্বের প্রকাশ ; আর তার সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু করবার তার প্রেরণা আসে এই চৈতন্য থেকেই। চৈতন্য সাক্ষী, আর বিশ্ব বা জগৎ তার দ্বারা উদ্ভাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত। আবার জগৎও একটা নয়—দু'টা। একটা বাইরের জগৎ—চেতনা তাকে গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে ইন্দ্রিয়ের সহায়ে। কিন্তু বাইরের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুই আবার অন্তরে ভাব হয়ে ফুটে গড়ে তোলে অন্তর্জগৎ। তার সাক্ষী

এবং নিয়ামক হল মন। অন্তর্জগতে চেতনা নিজেকেই নিজের বিষয় করে—এই হল তার বৈশিষ্ট্য। দুটি জগৎই অনন্ত আর দুয়েরই ভোক্তা এবং ঈশ্বর হওয়ার একটা তাগিদ আমাদের মধ্যে আছে। সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে দুটি জগৎ মিলে-মিশে রয়েছে। বিরোধের সৃষ্টি করেন বিশেষজ্ঞেরা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বহির্জগতের কারবারী তাঁরা বৈজ্ঞানিক, তাঁদের দর্শনের ভিত্তি স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিৎ এবং তার আশ্রিত জড়বাদ। তেমনি অন্তর্জগৎকে নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা চিদ্বাদী। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, বাইরের বিক্ষেপ হতে চিত্তকে ভিতরে গুটিয়ে আনলে পরে আমরা অন্তরে শান্তি দীপ্তি আনন্দ আর শক্তির এমন-একটা বিপুল উৎসের সন্ধান পাই, যার কাছে বাইরের ভোগৈশ্বর্যের প্রমত্ততাকে তুচ্ছ মনে হয়। যে-কোনও আকারেই হ'ক, চিৎ-শক্তিই যে শেষপর্যন্ত জড়শক্তির নিয়ামক একথা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিৎএর অনুশীলনকে মানুষ তখন তার একমাত্র পুরুষার্থ বলে মনে করে। তার অনুকূলে একটা প্রবল যুক্তি এই, বাইরের জগতে দুঃখ আছে ঝামেলা আছে—কোনও লৌকিক উপায়েই তার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায় না। দুঃখ দূর হয় একমাত্র অন্তরে ডুবলে পর। বাইরে কেবলই ভয়, অন্তরে অভয়। অতএব ভয় আর দুঃখের হাত হতে যদি বাঁচতে চাও বাইরের আকর্ষণকে সবলে প্রত্যাখ্যান কর। বিষয়বৈরাগ্যকে কর জীবনসাধনার মূল মন্ত্র।

এই দুঃখবাদ আর বৈরাগ্যবাদ চরমে উঠল বৌদ্ধদর্শনে। তার মতে, জগতের সব-কিছু অনিত্য অতএব দুঃখ—কোথাও কোন-কিছুর সত্যকার সার্থকতা নাই। শুধু বাইরের জগৎই নয়, অন্তর্জগৎ সম্পর্কেও ওই একই কথা। বস্তুকে ভাবে রূপান্তরিত করেও তার অনিত্যতা ঘোচানো যায় না। কি বাইরে, কি ভিতরে চলছে একটা ক্ষণভঙ্গের খেলা। অন্তর্মুখ চিত্ত যখন শূন্য আকাশের মত নিস্পন্দ হয়ে যায়, তখনই এই খেলার বিরতি। তখন চেতনার দীপ নিবে গিয়ে এক অক্ষুব্ধ শান্তিতে সব-কিছু ছেয়ে যায়। এই নির্বাণেই দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি, এ-ই মানুষের পরম পুরুষার্থ।

এ শুধু মুখের কথা নয়, একটা গভীরতম অনুভূতির সত্য। আর এর আকর্ষণ এমনই দুর্বার যে হাজার-হাজার বছর ধরে সন্ধ্যাকাশের মত বৈরাগ্যের গৈরিক আভায় ভারতবর্ষের মন অনুরঞ্জিত হয়ে আছে। দিনের আলোর সব সমারোহ পিছনে পড়ে থাক্—সামনে যে রাত্রির নির্বর্ণ প্রশান্তির হাতছানি, তার অনুসরণই তার কাছে অস্তিত্বের চরম নিয়তি।

একদিকে জড়বাদ আর জীবনের উল্লাস, আরেকদিকে চিদ্‌বাদ আর মৃত্যুর স্তব্ধতা—অস্তিত্বের এই দুটি মেরু। মানুষ কোন্ দিকে ঝুঁকবে এই নিয়ে তার আবহমান দ্বন্দ্ব। এর মীমাংসা কোথায় ?

মীমাংসা চৈতন্যের প্রসারে। জড় আর চিৎ, জীবন আর মরণ, প্রপঞ্চের উল্লাস আর উপশম—অস্তিত্বের এই দুটি মেরুকেই বিশ্বচেতনার একটা সংবর্তুল প্রত্যয়ের মধ্যে ধারণ করতে হবে পরস্পরের অবিরোধে এবং অনু-পূরকরূপে। জড় আর চিৎ দুইই সত্য—দুইই অনন্তের দুটি বিভাব। আর দুয়ের মধ্যে চিৎ মুখ্য, জড় গৌণ—কেননা চিৎ জড়ের বোদ্ধা এবং নিয়ন্তা, জড় চিৎশাসিত। আমার বাস্তব জীবনে জড়ের প্রকাশ আমার দেহে, আর চিৎএর প্রকাশ মনে। দুটিতে একেবারে ওতপ্রোত—একটিকে ছেড়ে আরেকটির চলে না। তবুও আমি প্রাণ-মন-বুদ্ধিরূপে চিৎএরই উপাসক—জড়ের নই। দেহ আমার জীবনের আধার—কিন্তু তবুও আমি তার মধ্যে চিৎএরই প্রকাশ চাই, তাকে একটা জড়পিণ্ড করে রাখতে চাই না। একান্ত জড়বাদীরও তা লক্ষ্য নয়। আবার চিৎএর সাধনা—এমন-কি তার তুঙ্গতম অভিব্যক্তি যে-নির্বাণে—তার সাধনাও দেহনিরপেক্ষ নয়। আমি ভাবে যা পেলাম, যদি বস্তুতে তাকে না নামিয়ে আনতে পারি, তবে আমার পাওয়ার সার্থকতা কোথায় ?

বস্তুত জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের নাস্তিক্য আর চিদ্‌বাদী বৈরাগীর নেতিমন্ত্র—এ-দুয়ের কোনটাকেই একান্ত করে তুলে মানুষের সহজবুদ্ধি কখনও পুরাপুরি তৃপ্ত হয় না। আকাশকে বাদ দিয়ে শুধু মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে তার যেমন হাঁফ ধরে, তেমনি মাটির দাবিকে অস্বীকার করে আকাশে মিলিয়ে যাবার উৎকট আগ্রহকেও সে মনে করতে পারে না জীবনধর্মের সুস্থ পরিচয়। অবর্ণ আকাশ তার অনুপম বর্ণৈশ্বর্যের গোপন সঞ্চয়কে ফুলের ফসলে উজাড় করে দিক মাটির বুকে—এই তার অন্তঃপ্রকৃতির গভীর আকুতি।

জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে দৃষ্টির প্রসার এবং গভীরতায়, সমন্বয়বুদ্ধির ঔদার্যে। দ্বন্দ্ববুদ্ধি মানুষের স্বাভাবিক। কিন্তু তাবলে দ্বন্দ্বের কোনও একটি কোটিকে একান্ত করে তোলা সম্যক্-দর্শনের অনুকূল নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের একটা লক্ষ্য এবং দাবি আছে—এ যেমন সত্য, তেমনি অতীন্দ্রিয় চিজ্জগতেরও একটা তাৎপর্য এবং প্রেতি আছে—এও সমানভাবে সত্য। জড় আর চিৎ দুয়ের সঙ্গমতীর্থ বিশ্বচেতনায়। একদিকে

মহাকাশের সব-খোয়ানো নৈঃশব্দ্যের মধ্যে চেতনার পরম মুক্তি, আরেকদিকে ব্যাবহারিক জীবনের অঙ্গনে অপ্রবুদ্ধ প্রাণধর্মের কোলাহল—দুয়ের মাঝে বিশ্ব-চেতনার এক উদার লোক। এই বিজ্ঞানভূমিতে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হতে মুক্তি পায় বলে জড় আর চিৎএর মাঝে কোনও বিরোধ দেখতে পায় না। অন্তর্মুখ বাস্তব অনুভবে চেতনা ভাবময়, জড় রূপময়। ভাব আর রূপ ওতপ্রোত। ভাবের গভীরে রূপের আকৃতি, রূপের বুকে ভাবের ব্যঞ্জনা। জড় চিৎএর ঘনবিগ্রহ, চিৎ জড়ের স্বরূপসত্য।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জগৎ যেন একটা কুরুক্ষেত্র—এখানে কেবলই বিরোধ, কেবলই হানাহানি। কিন্তু এ-দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি—নিচুতলার দৃষ্টি। একটু উপরে উঠলেই দৃষ্টির দিগন্ত প্রসারিত হয়। তখন দেখি, বিরোধের ভিতর দিয়েই জীবন এগিয়ে চলেছে এক মহা সৌষম্যের দিকে। বিরুদ্ধ দুটি পক্ষের উভয়ের মধ্যেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে। সেই খণ্ড সত্য এক পরম সত্যে উত্তীর্ণ হতে চায় বলেই আপাতত এই হানাহানি। কালে বিরোধ মিটে যায়, আসে সমন্বয়। সমন্বয় বস্তুত কোনও আপসরফা নয়, তাহলে তা টিকত না। তার মূল একাত্মবোধে, একটা বৃহত্তর সত্যের অনুপ্রাণনায়। শিল্পীর তুলিতে নানা-বর্ণের সমাবেশে তখন ফোটে একখানি সুন্দর ছবি। বর্ণে-বর্ণে তখন আর বিরোধ নাই—আছে বৈচিত্র্য। বুদ্ধি যদি সজাগ থাকে আর উদার হয়, তাহলে সমন্বয় তাড়াতাড়ি আসে। তাতে জীবন উজ্জ্বল হয়, সমৃদ্ধ হয়।

জীবনদর্শনে এই সমন্বয়বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। যে-অনুভবের মধ্যে সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ প্রত্যয়ের সমন্বয়ে একটা অখণ্ড বোধ জাগে, বৃহতের সেই বোধকে এদেশের প্রাচীন মরমীয়ারা বলেছিলেন 'ব্রহ্ম'। তাঁদের কাছে ব্রহ্ম ছিলেন আকাশের মত, আলোর মত—অবিরোধে বিশ্বের সব-কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে সঞ্জীবিত করে তাদের তিনি ছাপিয়ে আছেন। তাঁদের অনুভবের মহাবাক্য : 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্'—সেই পরমপুরুষই এই সব-কিছু হয়েছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা-কিছু সবই ব্রহ্ম। এই অনুভবেই পরম শান্তি, উত্তম জ্যোতি, অমৃত আনন্দ, অকৈতব প্রেম, অফুরন্ত শক্তি আর ভূতহিতব্রতের সার্থক উদ্‌যাপন।

এক অখণ্ড সর্বগত পরমার্থতত্ত্বরূপে ব্রহ্ম বিশ্বের আদি এবং অন্ত—এই অনুভবই চিদ্‌বাদের উপজীব্য। কিন্তু বিভজ্যবাদী (analytic) মনের মায়ায় এই অখণ্ডদর্শনও খণ্ডিত হয়ে যায়। অখণ্ড ব্রহ্মকে মন সগুণ এবং নির্গুণ, সৎ এবং অসৎ এই দুইভাগে খণ্ডিত করে একটা দার্শনিক বিকল্পের (mental

construction) সৃষ্টি করে। অবশ্য এমন-একটা ভাগাভাগি অধ্যাত্মসাধনার গোড়াতে অপরিহার্য—মন যখন অসৎ হতে সৎএ, অন্ধকার হতে আলোতে, মৃত্যু হতে অমৃতে উত্তীর্ণ হতে চায়। চিৎ না জড়—কার উপাসনা মানুষের পুরুষার্থ হবে, এই নিয়ে তার মনে একটা দ্বন্দ্ব জীবনের গোড়াতেই ছিল, এ আমরা দেখেছি। চিৎকে শ্রেয়ের আসন দিয়ে তাকে বিশ্বমূল তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েও কিন্তু আমাদের মনের দ্বন্দ্ব ঘোচে না—ওই চিৎকে নিয়েই আবার নতুন করে একটা দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। তার তাগিদ আসে ইষ্টার্থের (values) বোধ হতে। শুধু চিৎই যে জড়ের চাইতে আমার ইষ্টতর তা নয়, চিৎএর প্রকর্ষের মধ্যেও একটা তারতম্য আছে। আর তাইতে সাধনাতেও 'নেতি নেতি' বলে ধাপে-ধাপে উঠে যাওয়া আছে। চরম নেতিতে জগৎ তো উবে যায়ই, আত্মা বা ঈশ্বরের সংজ্ঞানও থাকে না। এই হচ্ছে বৌদ্ধের শূন্যবাদ অথবা প্রাচীন উপনিষদের অসদ্-ব্রহ্মবাদ। মন বলবে, অধ্যাত্মচেতনার এই হল তুঙ্গতম শিখর। এ-ই নির্গুণ ব্রহ্ম, এ-ই পরম সত্য—সগুণ ব্রহ্ম একটা অবর সত্য মাত্র।

নির্গুণ ব্রহ্ম পরম সত্য বটে, কিন্তু চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের অখণ্ড সত্য নয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ছাতে উঠতে গিয়ে সিঁড়ি ভাঙবার সময় বলি, এটা ছাত নয়, এটা ছাত নয়। কিন্তু ছাত থেকে নামবার সময় দেখি ছাতও যে ইট-চুন-সুর্কি, সিঁড়িও সেই ইট-চুন-সুর্কি।' ওই ইট-চুন-সুর্কির জ্ঞানে ছাত আর সিঁড়ির ভেদ ঘুচে গেল, এক অখণ্ডজ্ঞানে দুয়ের জ্ঞান পূর্ণ হল। ব্রহ্মের বেলাতেও তা-ই। নির্গুণ আর সগুণ দুয়ের সমন্বয়ে পূর্ণব্রহ্ম। তখন সগুণে-নির্গুণে বিবাদ নাই, দুয়েরই সমান মর্যাদা—অবশ্য মনের কাছে নয়, বোধের কাছে।

বস্তুত সগুণ এবং নির্গুণ এক পূর্ণব্রহ্মেরই ইতি- এবং নেতি-ভাব মাত্র—তাদের একটিকে ছেড়ে আরেকটি দাঁড়াতেই পারে না। নির্গুণ সগুণের অধিষ্ঠান, সগুণ নির্গুণের বিলাস। নির্গুণ শিব, সগুণ শক্তি। দুয়ের সম্বন্ধ অবিনাভাবের। অস্তিত্বের উজানধারায় শক্তি শিবের মধ্যে গুটিয়ে যান, কিন্তু লুপ্ত হন না। তেমনি ভাটার বেলায় শিবও শক্তিতে গুটিয়ে আসেন, কিন্তু লুপ্ত হন না। অখণ্ড সংবিৎএ উজান-ভাটা দুই দশাতেই শিব-শক্তির পরিপূর্ণ বোধ সম্ভব। শুধু মনের কাছেই তাঁরা পর্যায়ক্রমে একজন ব্যক্ত তো আরেকজন অব্যক্ত।

সিদ্ধের জীবনে তাইতে দেখা দেয় শিব-শক্তির সামরস্যের ভিত্তিতে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়। অন্তরের গভীর প্রশান্তি হতে কর্মের স্বত-উৎসারণ তাঁর পক্ষে একান্ত সহজ। বুদ্ধের নির্বাণচেতনা তাইতে তাঁর ধর্মচক্রের প্রবর্তক—যার গতিবেগ কোনদিন স্তিমিত হবার নয়।

ব্রহ্মের কোনও নেতিবাচক বিশেষণ দিতে হলে বলতে হয়, তিনি অনির্বচনীয়—তিনি কি তা মুখ ফুটে বলা যায় না। তিনি কি বা কতখানি, মন তা ধারণায় আনতে পারে না—তাই মনের কাছে তিনি অচিন্ত্য। তিনি মনোবাণীর অতীত, তাই তাঁকে বলি অসৎ। অথচ বোধে তাঁর বোধ হয়। তখন তাঁকে অনুভব করি পরম-সৎ বলে। অসৎ আর সৎ দুইই পরমার্থসৎএর দুটি কোটি। 'অসৎ' বলতে 'তখন কিছুই না' বোঝায় না—বোঝায় 'এমন-কিছু' যাকে আমরা কিছুতেই বেড়ে পাই না। এমন অনির্বচনীয়তা আর অভাবনীয়তা শুধু ব্রহ্মের বেলাতেই নয়; বিশ্বের যে-কোনও বস্তুর মূল খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধি এমনি করে খেই হারিয়ে ফেলে—কেননা তার জানার ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়সংবিৎ, আর সে-সংবিৎ সীমাবদ্ধ। অনুমান এক্ষেত্রে সীমাকে খানিকটা প্রসারিত করতে পারে বটে, কিন্তু তবু তার জানার ধরন বদলায় না বলে শেষ পর্যন্ত একজায়গায় এসে তাকে কবুল করতেই হয়, জ্ঞাতব্য বিষয়টি শুধু দুর্জ্ঞেয় নয়—অজ্ঞেয়। কিন্তু তখনও বুদ্ধি তাকে অসৎ বলতে পারে কি?

সাধারণ জ্ঞানের কাছেও ব্রহ্ম প্রথমটায় অজ্ঞাত, তারপর দুর্জ্ঞেয় এবং শেষটায় হয়তো অজ্ঞেয়। কিন্তু ব্রহ্মকে জানার ধরন গোড়াতেই অন্যরকম—তাঁকে জানতে হয় ভিতরের দিকে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুত আত্মজ্ঞানেরই সম্প্রসারণ। 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।' অথচ কী-এক নিবিড় অন্তরঙ্গবোধে আমাকে আমি তো সবখানিই জানি—যদিও বলতে পারি না, কি জানলাম। ব্রহ্মসংবিৎও ঠিক এইধরনের। বচনে-মননে তাঁর কূল পাই না। অথচ হৃদয় দিয়ে তো তাঁকে পুরাপুরিই পাই—আর সে-পাওয়াতে হৃদয় ভরে উঠে উপচে পড়ে। যতটুকু উপচে পড়ে, বুদ্ধি তাকে বলে 'অসৎ'; আর যতটুকুতে হৃদয় ভরে ওঠে, তাকে বলে 'সৎ'। কিন্তু হৃদয় বলে, সৎ আর অসৎ দুই নিয়ে তুমি আমার পূর্ণ।

তখন দেখি, তিনি বিশ্বাত্মক হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ। যখন বিশ্বোত্তীর্ণ, তখন তিনি 'অসৎ'; যখন বিশ্বাত্মক, তখন 'সৎ'। অসৎ আর সৎএর যুগল মায়ায় তিনি পরম মায়াবী। ওই অসৎএর অপ্রকেততা (superconscience)

২

হতেই তিনি বেরিয়ে আসছেন সৎএর প্রচেতনায় (expanding consciousness)। আবার সে বেরিয়ে আসা পর্যায়ক্রমে নয়, তাহলে কাল দিয়ে তাঁকে খণ্ডিত করতে হয়। তিনি যুগপৎ অসৎ এবং সৎ, অক্ষর এবং ক্ষর ; আর অক্ষরের নিত্যক্ষরণেও অক্ষরই থেকে যাওয়া তাঁর অনির্বচনীয় মায়া। বেদের ভাষায় তাঁর পূর্ণতা হতে পূর্ণতা উপচে পড়ছে, তবুও পূর্ণতাই থাকছে অবশিষ্ট ; তাইতে কবি হয়ে মনীষা দিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজে অবশেষে এই হৃদয়ে সৎএর বৃন্তটি খুঁজে পাই অসৎএর মধ্যে।

অতএব 'নেতি নেতি'—তিনি এ নন, তিনি তা নন, এ-অনুভব যেমন সত্য, তেমনি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—তিনিই সব-কিছু হয়েছেন, এ-অনুভবও তো মিথ্যা নয়। দুটিকে মিলিয়ে পাই : তিনি আমাদের বুদ্ধির রচা 'ইতি' বা 'নেতি'র কল্পনার বাইরে—তিনি অনির্বচনীয়। তাঁর সম্পর্কে নেতিবাদ আনে আত্মার স্বাতন্ত্র্য ; আবার সেই ভূমিকায় ফোটে তাঁর ঐশ্বরযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত যোগস্থ কর্মের বীর্য এবং উল্লাস। অপক্ষপাতী অনুভব বলবে : দুইই সত্য, কেননা দুইই তাঁর স্বরূপের এককেটা দিক ; অথচ এও তাঁর নিঃশেষ পরিচয় নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবের নিয়তি

এক সর্বগত পরমার্থসৎই বিশ্বের মর্মসত্য। জীবরূপে আমরা এই বিশ্বের অন্তর্ভূত। মন ও মনীষা দিয়ে ওই সত্যকে জানা এবং হৃদয় দিয়ে তাকে পাওয়া—এই হল আমাদের পরম পুরুষার্থ এবং দিব্য নিয়তি। এই জানা এবং পাওয়াকে জীবনের প্রাত্যহিকতায় রূপ দেওয়াতে আমাদের অন্তর আর বাইরের পূর্ণতা।

এই পরমার্থসৎকে আমরা বলি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অখণ্ড পরম এক। কিন্তু তাঁর একত্ব শুধু বহুর সমষ্টি বা সমাহার নয়। বহুকে জুড়ে-জুড়ে একটা সমষ্টিতে পৌছন হল মনের ধরন। বহুর সমাহারে একটা সংহত একত্বের (organic unity) ধারণা করা হল মনীষা বা বুদ্ধির ধরন। আর বহুর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে নিজের মধ্যে রসের নিবিড়তায় বহুকে পাওয়া হল হৃদয়ের ধরন। মন মনীষা এবং হৃদয় এই তিনটি সাধন দিয়েই ব্রহ্মকে পেতে হবে 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-রূপে।

ব্রহ্মের একত্ব স্বরূপত অনির্বচনীয়। তাই মনের কাছে তার পরিচয় দিতে হয় নেতি-বাচন দিয়ে। বহুকে নিয়েই এই এক—তাকে বাদ দিয়ে নয়। বহুর সমষ্টি বা সমাহার যত বৃহৎই হ'ক না কেন, ব্রহ্মের একত্ব তাকেও ছাপিয়ে যায়। তাই বলতে হয়, ব্রহ্ম 'নেতি-নেতি'; তিনি যে কি তা মুখে বা মনে আনা যায় না—কেবল 'বোধে তাঁর বোধ' হয়।

এই বোধকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য মনকে সবরকম একদেশদর্শিতা হতে মুক্ত করে অনন্তের রসে জারিত রাখতে হয়। ব্রহ্মের অনন্ত বিভাব। তার যে-কোনও একটি বিভাব যত বড়ই হ'ক, তাকেই একান্ত করে মন যদি আর-সব বিভাবকে ছেঁটে ফেলে, তাহলে সে অখণ্ডের খণ্ড বোধেই পৌছবে—একবিজ্ঞানের পরম সত্যে নয়। তাই উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মকে শুধু সৎ চিৎ আর আনন্দই বলেননি, তাকেও ছাপিয়ে তাঁকে বলেছেন 'অসৎ'। একটিতে তাঁর সম্পর্কে ইতি-ভাবনা যেমন চরমে পৌছেছে, আরেকটিতে তেমনি চরমে

পৌঁছেছে নেতি-ভাবনা। তিনি নাই বলে 'অসৎ' নন, সমস্ত ভাবনার অতীত বলেই অসৎ। আবার সে-অসৎ এর বোধ হয়—সর্বাতিশায়ী একটা অনির্বচনীয় প্রত্যয়রূপে, একটা শান্তিসমৃদ্ধ অমৃতের প্রস্রবণরূপে। সেই অসৎ হতেই সৎএর বিসৃষ্টি। অতএব আমরা সৎ বা অসৎ বলতে যা বুঝি, সেভাবে তিনি সৎও নন, অসৎও নন। এই ভাবনাগুলি যেমন বেদে আছে, তেমনি বৌদ্ধ-দর্শনেও আছে। কেবল তফাত এই, বৈদিক ভাবনায় জোর পড়েছে 'ইতি'র উপর, আর বৌদ্ধ ভাবনায় 'নেতি'র উপর। একটিতে 'নেতি নেতি' করে উজিয়ে যাওয়া—আর ফিরে আসা নয়; আরেকটিতে ইতি আর নেতি দুটিকেই এক বৃহত্তর অস্তি-ভাবনায় বিধৃত রাখা। এই শেষেরটিতে যে অনির্বচনীয় সম্পর্কে একটা অখণ্ড ভাবনার পরিচয় মেলে, তা বলাই বাহুল্য।

'হেথা নয়, অন্য কোথা, আরও কোন্‌খানে'—এমন-একটা তাগিদ মানুষের সমস্ত প্রগতির মূলে। তাই আমাদের অধ্যাত্মসাধনাও বাস্তবিক শুরু হয় নেতিবাদকে আশ্রয় করে। যা নিয়েই আমরা সাধনা করি না কেন, কিছুদিন পরে তাই যেন আমাদের পেয়ে বসে—আমরা তখন তার বাইরে আর-কিছুই দেখতে পাই না। এমনি করে নেতিবাদের দুরাগ্রহেও আমরা যা-কিছু ছেড়ে এসেছি, তাকে আর কোনমতেই আগল দিতে চাই না। ব্রহ্ম তখন আমাদের কাছে কেবল বিশ্বোত্তীর্ণ—বিশ্ব আর জীব দুইই তাঁর বাইরে। এই বিশ্বোত্তীর্ণ নির্গুণ ব্রহ্মে তলিয়ে যাওয়াই তখন আমার পরম পুরুষার্থ, আমার চরম নিয়তি। বিশ্ব আর জীবের জীবন একটা বিভ্রম, একটা অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যাই দুঃখের হেতু। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় অবিদ্যার উচ্ছেদ হলে। তখন জগৎ বা জীব কিছুই থাকে না। থাকে কারও মতে এক মহাবিনাশ, কারও মতে এক সংবিৎহীন অস্তিত্ব, কারও মতে এক নির্বর্ণ এবং কেবল চৈতন্য। এ-ই ব্রহ্মনির্বাণ বা মুক্তি। এ ব্রহ্মানন্দ নয়—দুঃখাভাব মাত্র। এ-ই সত্য, আর সব-কিছু মিথ্যা।

এই সর্বনাশের নেশা বলতে গেলে আমাদের পেয়ে বসেছে। আর অনুভবের একটা গভীরতা হতে এ-প্রত্যয়ের উদ্ভব বলে এর প্রামাণ্যও অনস্বীকার্য। কিন্তু এর একটা মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে ব্যাপ্তির অভাব। এ আমার একার দর্শন, বিশ্বের দর্শন নয়। এ আমাকে এমন-একটা সত্যে পৌঁছিয়ে দেয়, যেখানে আর সব-কিছু মিথ্যা হয়ে যায়—এমন সত্যের সন্ধান দেয় না যার দীপ্তিতে সব-কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ-দর্শনে আমার একার

মুক্তির গরজটাকেই আমি বড় করে দেখছি, আর তাইতে বিশ্ব পরিণত হচ্ছে শুধু একটা বন্ধনযন্ত্রে। আর বিশ্বের অধীশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন (এজাতীয় দর্শনে প্রায়ই তিনি অনুপস্থিত), এই বন্ধন-মুক্তির তিনি উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। এই যান্ত্রিক বিশ্বে কেন যে জীবচেতনার একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল, তার কোনও অর্থই আমরা খুঁজে পেলাম না। আর জীবের বন্ধন-মোচনের প্রয়াসও তো একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। বিনাশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে মুক্তির যে-আস্বাদন, তার অনুভবিতা কে? এই মুক্তিও যে সাময়িক নয়, তা-ই বা কে বলতে পারে?

কিন্তু চেতনার গভীরে শুধু তলিয়ে যাওয়া নয়, তাকে পরিব্যাপ্ত এবং উদ্বুদ্ধ করাও যদি আমাদের সাধনা হয়, তাহলে অনুভবের একটা নতুন দিগন্ত আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। চেতনার ব্যাপ্তিতে আমরা তখন পাই বিশ্বকে এবং তার উত্তুঙ্গতায় পাই 'পরমব্যোমের সেই অধ্যক্ষপুরুষকে' যাঁর মধ্যে বিশ্বের এবং আমার অস্তিত্বের সার্থকতা। বিশ্বের বিসৃষ্টি তখন শুধু জীবকে দুঃখ দিতে নয়—দুঃখকে ছাপিয়েও প্রবুদ্ধ চেতনায় অকুণ্ঠ বীর্য এবং অকামহত আনন্দের অভ্যুদয় ঘটাতে। বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্ব এবং জীব তখন ব্রহ্মের একটি ত্রিপুটী। বিশ্বোত্তীর্ণতায় সব ছাপিয়ে তিনি 'অতিষ্ঠা', স্বধাবান্ (self-poised) এবং আত্মারাম। তাঁর এই 'স্বধা' বা আত্মস্থিতির বীর্যই আমাদের মধ্যে জাগায় সর্বনাশের সেই নেশা, যার কথা আগে বলেছি। কিন্তু এই তাঁর একমাত্র বিভাব নয়। আপনাতে আপনি থেকেও আনন্দের বীর্যে তিনি উপচে পড়েন বিশ্বের বিচিত্র বিভূতিতে। আবার এই বিশ্বের মধ্যেই তিনি তাঁর 'স্বয়ম্ভূ' স্বধা আর 'পরিভূ' ব্যাপ্তিকে গুটিয়ে আনেন জীবের মধ্যে এক আনন্দ-চিন্ময় ভাবনার অঙ্কুররূপে। যেমন তিনি বিশ্বাতীতে 'মহতো মহীয়ান্', তেমনি জীবে 'অণোরণীয়ান্'—যে-অণিমা নেমে এসেছে একেবারে অন্তঃসংজ্ঞ অতিপরমাণুর জড়িমায়। তাঁর মহিমা আর অণিমার মধ্যে এই পরিব্যাপ্ত বিশ্বের বৈভব—তার অণুভাবের কুণ্ডলমোচনের ক্ষেত্ররূপে। আমাদের মধ্যে মুক্তির যে-আকূতি, তা তাঁর আত্মবিস্ফারণের প্রবেগে উদ্দীপ্ত—এক মহাবিনাশের অতলে তলিয়ে যাবার ব্যক্তিগত উন্মাদনাই তার স্বরূপসত্য নয়। জীবচেতনা যেখানে বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত এবং বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনার দ্বারা বিধৃত, সেখানে ব্যক্তির মুক্তিও আর তার একার মুক্তিতে নিবদ্ধ নয়। এই ব্যাপ্তিচৈতন্য ছিল বলেই বুদ্ধ একার মুক্তিতে তৃপ্ত হতে পারলেন

না, ব্রহ্মনির্বাণকে তুচ্ছ করেও আবার নেমে এলেন জগতে আত্মমুক্তিকে বিশ্বমুক্তির প্রয়োজক করতে।

যে সর্বগত পরমার্থসৎ বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্ব এবং জীবরূপে যুগপৎ বিলসিত, সেই অখণ্ড ব্রহ্মকে পেতে হবে, এই হল জীবের নিয়তি। তাঁকে পাওয়া আর নিজেকে পাওয়া একই কথা—কেননা আমার মধ্যে তাঁরই প্রকাশ। সে-প্রকাশে বৈচিত্র্য আছে, ধাপে-ধাপে উঠে যাওয়া আছে। তাঁকে পেতে হলে সব ধাপই উজিয়ে যেতে হবে। তা-ই হল আমার মুক্তি। আবার তাঁকে কেন্দ্র করেই চলছে বিশ্বশক্তির ঢেউএ-ঢেউএ ছড়িয়ে পড়া। তিনি যা, আমাদেরও ঠিক তা-ই হতে হবে। হতে হবে পুরাপুরি—কোনও দিককে এড়িয়ে নয় বা ছেঁটে ফেলে নয়। তাঁর অন্তরে স্বাতন্ত্র্যের স্তব্ধতা, অথচ বাইরে অফুরন্ত বিভূতির উল্লাস। আমাদেরও জীবনের দিব্য নিয়তি ঠিক তা-ই। অবিদ্যার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই আমাদের পথ। তাকে ধরেই পৌছতে হবে বিদ্যার কূলে, অনেক মৃত্যু পার হয়ে যেতে হবে অমৃতত্বের সাগরসঙ্গমে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্ব ও মানব

আমি একা নই—এক বিরাট বিশ্ব আমায় ঘিরে আছে। এই বিশ্বের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? যেমন হ'ক, আমার জীবনের একটা লক্ষ্য আছে তাৎপর্য আছে। বিশ্বেরও কি কোনও লক্ষ্য আছে? সে কি আমার লক্ষ্যের অনুকূল, না সে শুধু লক্ষ্যহীন যন্ত্রাচারের মূঢ় একটা আবর্তন?

যদি দৃষ্টিকে গভীর প্রসারিত এবং উত্তুঙ্গ না করি, তাহলে এসব প্রশ্নের কোনও জবাব পাওয়া যায় না। যদি দৃষ্টিকে গভীরে তলিয়ে দিই, তাহলে বাইরের সহস্র বিক্ষেপ আর জটিলতার অন্তরালে নিজের মধ্যেই একটা প্রতিষ্ঠার ভূমি একটা সৌষম্যের ছন্দ খুঁজে পাই। তাকে মনে হয় আমার আত্মচৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু—যেখান হতে আমি প্রতিনিয়ত বিস্ফারিত হয়ে চলেছি। আত্ম-বিস্ফারণ শুধু আমার নয়—জীবমাত্রের ধর্ম। মানুষের মধ্যে তা অতিমাত্রায় সচেতন। বৃহৎ হবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ মানুষের মধ্যে আছে—সে যেন তার কোনও সীমা দেখতে পায় না। বাইরে তার সামর্থ্যের যদিও-বা সীমা আছে, অন্তরে অনুভবের ব্যাপ্তি তার সত্যি অপরিসীম। প্রদীপের শিখার মত নিজেকে ছাড়িয়ে বিশ্বকে ছাপিয়ে অবশেষে বিশ্বোত্তীর্ণের মহাশূন্যে সে মিলিয়ে যায়।

বিশ্বোত্তীর্ণের ওই তুঙ্গতা হতে যদি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন জীব আর বিশ্বের জীবনায়নের তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বোত্তীর্ণের মধ্যে যা একটা দিক্‌চিহ্নহীন অসীম বিস্তার, তারই বীর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে জীবে, আর তার কেন্দ্রানুগ বীর্যই আবার কেন্দ্রাতিগ হয়ে ফিরে যেতে চাইছে স্বধামে। এই প্রত্যাবর্তন বা কুণ্ডলমোচনের বেগেই ক্রমোর্ধ্ব পরম্পরায় দেখা দিচ্ছে বিশ্বের লোকসংস্থান (world-order)। একে বলতে পারি, জীবকে আশ্রয় করে বিশ্বের ভিতর দিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণের আত্মোন্মীলন। এই উন্মীলনের ব্যাপারে বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্ব আর জীব একসূত্রে গাঁথা। আমাদের দিক থেকে জীবত্ব আমাদের স্বরূপধাতু (essential substance), বিশ্ব

পরিবেশ, আর বিশ্বোত্তীর্ণ লক্ষ্য। এ যেন উষার বুকে যে-আলো সংবৃত্ত (involved) হয়ে রয়েছে, ক্রমে-ক্রমে তার মাধ্যন্দিন ভাস্বরতার ফুটে ওঠা।

বিশ্বোত্তীর্ণকে বলি ব্রহ্ম। কিন্তু জীব ও জগৎকে ছাপিয়ে গেলেও তিনিই জগৎ হয়েছেন জীব হয়েছেন—এই অখণ্ড দৃষ্টিটুকু ভুললে চলবে না।

বিশ্বে দেখি জড়ের একদেশে প্রাণ-চৈতন্যের উন্মেষ, জীব এই বিশ্বেরই অন্তর্গত, কিন্তু তার জড়ভাগের সবটাই প্রাণ-চিন্ময়। এই চৈতন্যের ক্রমিক উন্মেষ তার অনুভবের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। চরমে ব্রহ্মের অনুভব, তার মধ্যে জড় আর চৈতন্যের ভেদ লুপ্ত হয়ে সবই চিন্ময় হয়ে ওঠে। জীব তখন বিশ্ব আর ব্রহ্মের মধ্যে সেতুর মত। ব্রহ্মের অনুভব সর্বগত, অতএব বিশ্বের যে-জড়ভাগ, ব্রহ্ম তারও মধ্যে অনুস্যূত। অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য বিশ্বের অবরভাগ জড়ে নিগূহিত, আর বিশ্বোত্তীর্ণে পূর্ণাভিব্যক্ত। চৈতন্যের এই কুমেরু আর সুমেরুর মধ্যে জীবচৈতন্যের ক্রমিক অভিব্যক্তি তাহলে জীবলীলার, অতএব বিশ্বলীলারও পরম তাৎপর্য।

চৈতন্যের উন্মেষের মধ্য পর্ব বলে জীব যেন দাঁড়িয়ে আছে দুটি অব্যক্তের অমানিশার মাঝখানটায়। তার পায়ের তলায় জড়ত্বের অমানিশা, সেখানে তার বোধ পৌঁছয় না; আবার তার মাথার উপরেও এক অতিচেতনার অমানিশা, সেখানেও তার বোধ হারিয়ে যায়। তার চৈতন্যের বর্ণচ্ছত্রের অবলোহিত (infra-red) আর অতিবেগনী (ultra-violet) দুটি প্রান্তই তার অনুভবের বাইরে।

কিন্তু চৈতন্য বস্তুত স্থাণুস্বভাব নয়—সে শক্তিযুক্ত। সে-শক্তিতে জোয়ার-ভাটা আছে। জোয়ারে শক্তি যেমন এক অবর্ণের দিকে উজিয়ে যায়, ভাটায় তেমনি তলিয়ে যায় আরেক অবর্ণের মধ্যে। জোয়ারে চৈতন্যের প্রসার ঘটে, তার শক্তি বাড়ে। তাইতে ভাটার রহস্যও তার বোধগম্য হয়। বুদ্ধির উৎকর্ষ দিয়ে তার অপকর্ষ বোঝা যায়, কিন্তু অপকর্ষ দিয়ে উৎকর্ষকে বোঝা যায় না। এইজন্য চৈতন্যের আলোতে জড়ের ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু জড়ের অন্ধকার দিয়ে চৈতন্যের হদিশ পাওয়া যায় না। চিৎপ্রকর্ষই জীবের নিয়তি বলে চিদ্‌বাদ দিয়ে যেমন জড়বাদ বোঝা যায়, জড়বাদ দিয়ে চিদ্‌বাদ তেমন বোঝা যায় না।

জীবের মধ্যে চিৎপ্রকর্ষ ঘটছে ধাপে-ধাপে। একটা ধাপ এসে শেষ হয়েছে উদ্ভিদে। চেতনা সেখানে অস্ফুট। আরেকটা ধাপ শেষ হয়েছে পশুতে। চেতনা সেখানে অর্ধস্ফুট। এই দুটি ধাপের নিয়ন্তা হল প্রাণ—যা চৈতন্যেরই শক্তিরূপ।

মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ফুটল মন, বেদের ঋষিরা যাকে বলতেন 'মনু'। মনুর আবেশে মানবের সৃষ্টি। বিশ্বের প্রকৃতি-পরিণাম তার মধ্যে একটা অভূত-পূর্ব সার্থকতা পেল।

মানুষের মন বস্তুত সংবিৎ হতে ভাবকে আচ্ছিন্ন করে নিতে পারল। ফলে তার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটল অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের কল্পনা—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহির্জগৎ ছাড়াও ফুটল মনোগ্রাহ্য একটা অন্তর্জগৎ। এই জগতে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেল—পেয়ে আত্মসচেতন হল। প্রেয়কে ছাপিয়ে তার মধ্যে জাগল শ্রেয়ের বোধ। এই হতে তার অধ্যাত্ম এষণার শুরু। তার পরিণাম মানবের চিৎপ্রকর্ষের একটা নতুন অভিব্যঞ্জনা।

জড়ে ব্রহ্মের আত্মনিগূহন, আবার জড় থেকে তাঁর আত্মোন্মীলন—সৃষ্টির এই দুটি দোলা। তাঁর আত্মোন্মীলনই জীবের মধ্যে চিৎপ্রকর্ষের রূপ ধরে। তার প্রবেগ মনে এসেই থেমে যায় না—উজিয়ে চলে মানসোত্তর ভূমিসমূহের দিকে। মন তখন অন্তর্মুখ হয়। অন্তর্মুখ মন বিন্দুতে গুটিয়ে আসে। তাতে আত্মার অনুভব হয়। আত্মার যেমন প্রশান্ত স্বরূপস্থিতি আছে, তেমনি তাঁর শক্তির বিভূতিও আছে। শক্তি যে কেবল বিক্ষেপের কারণ তা নয়, সে আবার রাস টানতেও জানে। রাস টেনে রেখে যে শক্তির প্রকাশ, তা কল্যাণবীর্যের পরিচায়ক। তা সিদ্ধির বাধক না হয়ে সাধক হতে পারে।

অন্তর্মুখীনতায় জীবনকে রিক্ত করাই মানুষের একমাত্র সাধ্য নয়। রিক্ততায় প্রতিষ্ঠিত থেকে শক্তির বিচ্ছুরণও তার সাধ্য। বিশ্বের মূলেও শক্তির এই দ্বৈত-লীলা। ব্রহ্মেরও প্রপঞ্চের উপশমে যেমন আনন্দ, উল্লাসেও তেমনি আনন্দ। উপশমে থেকে তিনি উল্লাসের মহেশ্বর। দিগম্বর মহেশ্বরের কোলে বহুশোভ-মানা উমাকে স্থাপন করে এদেশের মরমীয়াও এই কথা বলতে চেয়েছেন। এই হল 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্'-এ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মী স্থিতির স্বরূপ। সেই স্বরূপ-স্থিতিকে আমাদের জীবনেও নামিয়ে আনতে হবে।

আত্মনিগূহনে ব্রহ্ম জড় হয়েছেন, কিন্তু সেখানে তিনি থেমে নাই। আবার তিনি আত্মোন্মীলনে চৈতন্য হচ্ছেন। তাইতে তাঁর বিশ্বও শুধু জড় নয়, সে চিন্ময়ও। আমাদের কাছে তার জড়ত্বের দিকটা প্রথম প্রবল হয়ে দেখা দেয় বলে তাকে আমরা একটা যন্ত্রের শামিল কল্পনা করে আমাদের অধ্যাত্মসাধনার বাধা মনে করি। কিন্তু তার মর্মনিহিত প্রাণ ও চৈতন্যের শক্তি যে আবার আমাদের অনুকূলও। তাইতে তার সঙ্গে আমাদের কেবল

অহি-নকুলের সম্পর্ক নয়। দুয়ের সত্যকার সম্পর্ক হল ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের। বিশ্বের অন্তর্নিহিত চিৎশক্তি স্ফুরিত হয় জীবকে আশ্রয় করে, তাই জীব বিশ্বের ক্ষেত্রজ্ঞ। আর সেই শক্তির স্ফুরণকে সে সার্থক করে শূন্যে-শূন্যে নয়—ওই বিশ্বকেই আশ্রয় করে। তাই বিশ্ব জীবের সাধনার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের কুমেরুতে আর সুমেরুতে যে অমানিশার অন্ধকার, ক্ষেত্রজ্ঞের সন্ধানী দৃষ্টির বিদ্যুতে তার রহস্যকে উন্মোচিত করবে—এ-ই জীবের দায়।

জীব আর জগৎ—এ-দুটিই ব্রহ্মের স্বরূপের সত্যবিভূতি। দুয়ের অতীত থেকেও এ-দুয়ের মধ্যে তিনি নেমে এসেছেন। তাঁর মধ্যে আছে বলেই জীব আর বিশ্ব পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। বিশ্বরূপে যে-শক্তিকে তিনি বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেই শক্তিকেই আবার গুটিয়ে এনেছেন জীবের মধ্যে। জীব তাঁর বিশ্বশক্তির কেন্দ্র; অন্ধ জগৎ যেন চোখ মেলেছে তারই মধ্যে। তাই জীবকে ধরেই আবার জগৎ এগিয়ে যায় আত্মসচেতন প্রগতির পথে। জীব আর জগৎ অন্যোন্যনির্ভর; আর দুয়ের আশ্রয় ব্রহ্ম।

সপ্তম অধ্যায়

অহং এবং দ্বন্দ্ববোধ

আমি, আমাকে ঘিরে একটা জগৎ, আর উভয়ের আশ্রয়রূপে ব্রহ্ম—এককথায় জীব জগৎ আর ব্রহ্ম—এই নিয়ে অস্তিত্বের একটা ত্রিপুটী। তিনটিতে ওতপ্রোত এবং এদের প্রত্যেকটিই সত্য। অবশ্য ব্রহ্মই পরম সত্য—কিন্তু তাবলে জীব বা জগৎ কোনটাই মিথ্যা নয়। জগতে থেকে ব্রহ্মকে আশ্রয় করে জীব ব্রহ্ম হয়ে উঠছে—এই হল তার জীবনের সত্য, জগতের গতির সত্য।

জীব চলছে ব্রহ্মের দিকে। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ এবং শক্তি। এই ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। কিন্তু জগতে আমরা জীবকে স্বরূপে দেখতে পাচ্ছি না—দেখছি, মৃত্যু দুঃখ অনর্থ এবং অশক্তির দ্বারা সে লাঞ্ছিত। সে স্বরূপে নাই—আছে বিরূপ হয়ে। কেউ-কেউ বলেন, এই বৈরূপ্য হল তার স্বরূপ হতে বিচ্যুতি। কিন্তু কেন? ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ; জীব-জগৎ তাঁর শক্তির বিভূতি। তাহলে জীব-জগৎ সচ্চিদানন্দ হল না কেন?

সোজাসুজি এ-প্রশ্নের কোনও জবাব হয় না। জবাব পেতে হলে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বুঝতে হবে।

সচ্চিদানন্দ একটা অনুভবের সত্য। তার বিপরীত অসত্য অজ্ঞান এবং দুঃখ—এও একটা অনুভবের সত্য। বরং এই অনুভবটাই এখন আমাদের মধ্যে কায়েম হয়ে আছে। দুটি অনুভবকে বলতে পারি অস্তিত্বের সুমেরু এবং কুমেরু। আমরা আছি কুমেরুতে, উজিয়ে যেতে চাইছি সুমেরুতে। এই উজিয়ে যাওয়ার যে-চেষ্টা অর্থাৎ দুটি অনুভবের মধ্যে শক্তির যে-খেলা, তাও একটা সত্য। বরং আমাদের কাছে এই সত্যের গুরুত্বই সবচাইতে বেশী।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, জগতে দুঃখ কেন? তাহলে বলতে পারি, 'দুঃখ কেন' বলে নালিশের সুরে কথা কয়ো না। দুঃখ আছে, একথা স্বীকার করে নাও। সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার কর, দুঃখ দূর করবার শক্তিও তোমার মধ্যে আছে। সেই শক্তিকে আবিষ্কার করবার জন্যই এই দুঃখের বিধান। দুঃখকে জয় করে শুধু যে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হই, তা নয়—সঙ্গে-সঙ্গে

অনুভব করি শক্তির একটা উল্লাস। এই শক্তির মুক্তির জন্যই দুঃখ সপ্রয়োজন। শক্তির যোগে দুঃখ তখন হয়ে ওঠে তপস্যা। সচ্চিদানন্দ দিব্য-জীবন শুধু আত্মরত আরামের জীবন নয়; অতন্দ্র তপস্যার দীপ্তিতে উজ্জ্বল জীবন—সূর্যের মত।

দুঃখ আছে, কিন্তু সে একান্ত হয়ে নাই—তার নিরোধ সম্ভব। এই কথা মেনে নিয়ে এবার প্রশ্ন করতে পারি, দুঃখ কেন। প্রশ্নটা তখন আর নালিশ নয়—একটা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা। দুঃখকে দূর করবার জন্যই প্রশ্ন করতে পারি, দুঃখ কেন। কে দুঃখ দিচ্ছে একথাটা তখন বড় নয়, কথা হল দুঃখ আমি পাচ্ছি কেন। দুঃখের নিদান বাইরে না খুঁজে নিজের মধ্যে খুঁজলে তবেই তার সত্যকার প্রতিকারের পথ পাওয়া যায়।

দুঃখ অনুভবের ব্যাপার। অতএব তার একটা ব্যক্তিগত ভিত্তি আছে। একই দুঃখ সবার কাছে সমান নয় বা একজনের কাছেও সবসময় সমান নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চিত্ত যখন শান্ত উদার এবং প্রসন্ন, তখন দুঃখের ধাক্কাটা কম লাগে। এইথেকে সিদ্ধান্ত করতে পারি, দুঃখ চেতনার সঙ্কোচের ফল। আমি যত ছোট হই, তত দুঃখ পাই কিংবা পরকে দুঃখ দিয়ে জগৎকে দুঃখময় করে তুলি। যখন বৃহৎ হই, তখন আমার দুঃখ থাকে না। ব্রহ্ম সবচাইতে বৃহৎ, তাই ব্রহ্মে দুঃখ নাই। আশার কথা, আমি ব্রহ্ম হতে পারি—ব্রহ্ম হওয়াই আমার জীবনের দিব্যনিয়তি।

এই সঙ্কুচিত চেতনাকে—হ'ক তা জ্ঞানের প্রেমের বা শক্তির সঙ্কোচ—বলি অবিদ্যা। অবিদ্যাই দুঃখের হেতু। অবিদ্যার আশ্রয় হল অহং—আমার ক্ষুদ্র স্বার্থপর কাঙাল আমি, আমার 'কাঁচা আমি'। অহং সব-কিছুকে ছোট নজরে দেখে, আর দেখে নিজের গরজে। তাইতে সব-কিছু তার কাছে উপাদেয় আর হেয়—এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। তখন এটা ভাল ওটা মন্দ, এটা সুখ ওটা দুঃখ ইত্যাকার দ্বন্দ্ববোধের সৃষ্টি হয়। তাতে জগৎটাকে মনে হয় সহস্র বিরোধে জর্জর। বিরোধের একটা অস্বস্তি আছে, মানুষ তাকে দূর করতেই চায়। কিন্তু দৃষ্টি আর বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার দরুন তার কোনও সত্যকার উপায় সে খুঁজে পায় না। বিরোধের রফা অনেকরকমেরই হয়, কিন্তু কোনও রফাই শেষ পর্যন্ত টেকে না। ফলে বিরোধের কারণ নির্মূল হয় না—দুঃখ লেগেই থাকে।

সব-কিছুর একটা কার্যকরী সমাধান সম্ভব হতে পারে চেতনার প্রসারে।

প্রসারিত চেতনা শান্ত, উত্তুঙ্গ এবং গভীর—যেন একাধারে আকাশ আর সমুদ্র। এই উত্তুঙ্গতা আর গভীরতা শুধু যে সমস্ত বিরোধের গ্রন্থিমোচন করে তা নয়—একটা লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ করে চেতনার রূপান্তর ঘটায়।

রূপান্তরিত চেতনা একটা কথার কথা নয়—অধ্যাত্ম অনুভবের 'পরে তার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃত চেতনার মূলে কাজ করছে ইন্দ্রিয়াশ্রিত মন। আর এই যোগচেতনার মূলে আছে বিজ্ঞান। মন ইন্দ্রিয়নির্ভর অতএব বহির্মুখ; আর বিজ্ঞান অন্তর্মুখ এবং অতীন্দ্রিয়। মনের কারবার বাইরের বস্তু নিয়ে, আর বিজ্ঞানের কারবার অন্তরের ভাব নিয়ে। মনেরও প্রসার ঘটে—যেমন প্রকৃতিতে পশুর মন প্রসারিত হয়েছে মানুষের মনে আর সে-মন ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই, মনের অকল্পনীয় ঐশ্বর্য সত্ত্বেও মানুষ অন্তরে কত দীন। তার মনশ্চেতনার প্রসার ঘটেছে, কিন্তু তা গভীর হয়নি কিংবা চিরাভ্যস্ত ভূমির একটুও ঊর্ধ্বে ওঠেনি। অর্থাৎ তার চেতনার রূপান্তর ঘটেনি। তার ফলে জীবনের কোনও সমস্যারই একটা স্থায়ী সমাধান সে করে উঠতে পারেনি। অথচ এর জন্য তার চেষ্টার বিরাম নাই। তবুও সে পেরে ওঠে না কেন?

জগৎটা এলোমেলো। আর তাইতে কত সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যার সমাধান সৌষম্যে—এলোমেলো বস্তু আর ভাবকে গুছিয়ে আনাতে। মনের কাছে সব-কিছু প্রথমটায় এলোমেলো হয়েই হাজির হয়, বুদ্ধি তারপর তাকে গুছিয়ে আনে। মন দেখে বহুকে, আর বুদ্ধি একেকে দেখে। তাইতে মন চঞ্চল, বুদ্ধি স্থির। ব্যাবহারিক জগতে বুদ্ধির তাইতে কদর এত বেশী।

বুদ্ধিরও উজানে হচ্ছে বিজ্ঞান—যার প্রতিষ্ঠা চেতনার গভীরে। বুদ্ধি বিজ্ঞানেরই বহির্মুখ বৃত্তি। মন যেমন ইন্দ্রিয়নির্ভর, বুদ্ধিও তেমনি মনোনির্ভর। এইজন্য মনের সঙ্কীর্ণতা অগভীরতা এবং চাঞ্চল্য খানিকটা বুদ্ধির মধ্যেও এসে যায়। তাইতে ব্যাবহারিক বুদ্ধিতেও জীবনসমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান হয় না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মানুষে-মানুষে হানাহানি জীবনের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। পরিবেশের খানিকটা অদলবদল করে বুদ্ধি তার মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য আনে। কিন্তু অন্তরের গভীর একটা প্রত্যয় দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যকে সে অনুভব করে না। তাই একটা আপসরফা দিয়ে সে বিরোধের সমাধান করতে চায়—প্রেম দিয়ে নয়, একাত্মবোধ দিয়ে নয়।

এইটি করতে পারে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে চেতনা গভীর হয়। অন্তরের গভীরে ডুবে বিজ্ঞান প্রথমত আত্মচৈতন্যের মধ্যে মন ও বুদ্ধির সমস্ত বিক্ষেপকে একটি সুসমন্বয়ের সূত্রে অন্বিত করে। তারপরে সেই সমন্বয়ের ভাবনাকে সে প্রয়োগ করে ব্যবহারের জগতে। তখনই বিরোধের সত্যকার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

এইজন্য একজন বুদ্ধের সাম্যবাদ আর একজন রাজনীতিবিদের সাম্যবাদের মূলসূত্র এক নয়। বুদ্ধ মানুষে-মানুষে দেখছেন আত্মার সাম্য, আর রাজনীতিবিদ খুঁজছেন ব্যাবহারিক সুযোগ-সুবিধার সাম্য। একজনের সাধন হল বিজ্ঞান, আরেকজনের সাধন বুদ্ধি আর মন। ব্যাবহারিক জগৎ উপেক্ষণীয় নয়, সেখানে মন-বুদ্ধির দানও অসামান্য। কিন্তু এই মন-বুদ্ধি যদি বিজ্ঞানদ্বারা শাসিত হয়, জীবনের সাধনা যদি অধ্যাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই মানুষের যথার্থ এবং সামগ্রিক কল্যাণ হওয়া সম্ভবপর।

জগতে বহুর মেলা নিত্যপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এই বহু ক্রমশ উঠে যাচ্ছে সংহতির দিকে, একের দিকে। মানুষের চেতনায় এই ঐক্যের প্রাথমিক কেন্দ্র হল তার অহং। অহংএর চারদিকে সে তার নিজস্ব একটা জগৎকে সাজিয়ে তুলতে চায়। তার অহং মন-বুদ্ধির অহং, তাই তার দৃষ্টি সবদিক দিয়েই সীমিত। অথচ এই সীমার মধ্যেই সে অসীমকে পুরতে চায়। এ যেন পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্রে স্থাপন করে তার গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা করবার অপচেষ্টার মত। আসলে সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ঘুরছে। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে জীবের জীবন। এই দৃষ্টিই সুস্থ এবং সঙ্গত।

এই ঈশ্বর একটা নিরর্থক কল্পনা নয়। ঈশ্বরের প্রমাণ রয়েছে আমার চেতনার বৃহৎ হওয়ার প্রয়াসে। আমরা সবাই নানাদিক দিয়ে বৃহৎ হতে চাইছি। চেতনার যে পরম এবং সর্বাঙ্গীণ বৃহত্ত্ব, তা-ই ব্রহ্ম তা-ই ঈশ্বর। বস্তুত আমরা সবাই ব্রহ্ম হতে চাইছি—আত্মচৈতন্যের এই প্রেষণাই (urge) আমাদের সমস্ত আদর্শবোধের মূলে।

সুতরাং বস্তুতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের প্ররোচনায় ঈশ্বরকে ব্রহ্মকে লোকোত্তরকে প্রত্যাখ্যান করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। সব আদর্শই একটা বৃহত্ত্বের কল্পনা। কিন্তু সে-কল্পনা প্রাণবন্ত, জীবনের বাস্তবতায় সে একটা বেগ সঞ্চার করে, সীমার সঙ্কোচকে কাটিয়ে উঠতে আমাদের উদ্বুদ্ধ

করে। ব্রহ্মের বোধ, বৃহতের বোধ বস্তুত একটা আদর্শ-চৈতন্যের বোধ। এই বোধের আবেশে যদি জীবনকে পরিচালিত করতে পারি, তবেই মনঃকল্পিত দ্বন্দ্ববোধ এবং অহমিকার ক্লিষ্টতা হতে মুক্ত হয়ে তা দিব্য এবং সর্বতোভদ্র হয়ে উঠবে।

উপনিষদের ঋষি বললেন, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ আনন্দো ব্রহ্ম'। এই সত্য জ্ঞান আনন্দ আর আনন্ত্য একটা আন্তর অনুভব। আমার আত্মানুভবেরও এই স্বরূপ। তাই ঋষি আবার ঘোষণা করলেন, 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'—আমার এই আত্মা ব্রহ্ম। আমার আত্মবোধের তুঙ্গতা ওই ব্রহ্মবোধে। ওই তুঙ্গতা হতে আবার আমি নেমে আসি এই জগতে। তখন দেখি, যেমন আমার আত্মা ব্রহ্ম, তেমনি এই জগতও ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। উত্তুঙ্গ ব্রহ্মবোধকে আত্মচৈতন্যে গভীর করা এবং জগতে প্রসারিত করাতেই বেদান্তের সার্থকতা।

শেষ কথা এই, জীবনে দুঃখ আছে এ যেমন সত্য, তেমনি দুঃখাভাব এবং সেখানে পৌঁছবার সাধনাও আছে—এও সত্য। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব আপেক্ষিক —জীবনের তা গোড়ার সত্য হলেও শেষের সত্য নয়। এই দ্বন্দ্ব সঙ্কীর্ণ অহংএর কাছে—কিন্তু ভূমার কাছে, ব্রহ্মের কাছে নয়। জীব চলেছে ভূমার দিকে; দ্বন্দ্ববোধ তার অহন্তার চলতি পথের সৃষ্টি। চেতনার বিলোপে তাদের বিলোপ ঘটানো যায় বটে—কিন্তু সে হল সর্বনাশের সাধনা। চেতনার প্রসারে এবং রূপান্তরেও তাদের রূপান্তর ঘটানো যায়। তা-ই আমাদের কাম্য।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মবিদ্যার সাধন

দেখলাম, আমাদের প্রাকৃত জীবন দ্বন্দ্ববোধের দ্বারা পীড়িত। দ্বন্দ্ব প্রধানত বাস্তবের ক্ষেত্রে সুখ আর দুঃখের, আবার আদর্শের ক্ষেত্রে ভাল আর মন্দের। তাইতে জীবন জুড়ে সবসময় চলছে একটা দোটানার অস্বস্তি। তার মূলে আছে আমাদের সঙ্কীর্ণ অহং। অহংএর সঙ্কোচ আসে অবিদ্যা হতে—আমরা যেমন নিজেকে ভাল করে জানি না, তেমনি জগৎকেও পুরাপুরি দেখতে পাই না। এই দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা হতে জীবন নানা সমস্যায় জটিল হয়ে ওঠে—তাদের একটা সুষ্ঠু এবং সর্বাঙ্গীণ সমাধান আমরা কোথাও খুঁজে পাই না।

অথচ আমাদের মধ্যে নিজেকে আর জগৎকে বৃহৎ করে জানবার এবং পাবার একটা প্রবল আগ্রহ সবসময় কাজ করে চলেছে—আমরা সবাই প্রজ্ঞানে আনন্দে প্রেমে এবং শক্তিতে 'বৃহৎ' হতে চাইছি। এই বৃহৎএর বোধ যেখানে নিরতিশয়, বেদান্তে তাকে বলা হয় 'ব্রহ্ম'। বেদান্তীর অনুভব : 'আমার এই আত্মা ব্রহ্ম'; 'আমার পরিদৃশ্যমান এই জগৎও ব্রহ্মের প্রভাস'; আর 'এক পরিব্যাপ্ত আত্মবোধে আমি আর জগৎ এক'। উপনিষদের তিনটি মহাবাক্যে যথাক্রমে এই অনুভবের প্রকাশ : 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'; 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্'। সঙ্কীর্ণ অহংকে এমনি করে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে বিস্ফারিত করার দার্শনিক সংজ্ঞা হল 'ব্রহ্মবিদ্যা' কি না বৃহৎকে জানা এবং পাওয়া। প্রাকৃত জীবনের সঙ্কীর্ণ অহন্তা হতে যে-দ্বন্দ্ববোধের সৃষ্টি হয়, তার নিরসন হতে পারে এই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা।

এখন দেখতে হবে, কি করে আমরা এই ব্রহ্মকে জানতে এবং পেতে পারি।

প্রাকৃত জীবনে আমাদের জ্ঞানের সাধন হল ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানি, তা বস্তুরূপে আমাদের বাইরে পড়ে থাকে। কিন্তু তাকেই আবার মন দিয়ে ভাবরূপে ভিতরে টেনে আনতে পারি। বন্ধুকে চোখের সামনে দেখছি—ইন্দ্রিয় দিয়ে। চোখের সামনে না থাকলেও স্মৃতির পটে

তার ছবি দেখছি—মন দিয়ে। এটা ভাবের দেখা—যদিও তার ভিত্তি ইন্দ্রিয়-সংবিৎএর (sensation) উপর। ভাবের দেখা গাঢ়তর হয়ে একটা রসবোধ জাগাল—বন্ধুর স্মৃতিকে আশ্রয় করে শাশ্বত বন্ধুত্বের একটা আস্বাদন পেলাম। এই জানা হল বুদ্ধি দিয়ে জানা। এও তাকে ভাবে পাওয়া। কিন্তু মনের পাওয়া ছিল বিশেষকে (particular) পাওয়া, আর এ হল সামান্যকে (universal) পাওয়া। বুদ্ধিগ্রাহ্য বন্ধু যেন বিশ্ববন্ধুরই প্রতীক।

দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানার চাইতে মন দিয়ে জানা হল কোনও-কিছুকে অন্তরঙ্গ করে জানা, আর বুদ্ধি দিয়ে জানা আরও অন্তরঙ্গ করে জানা। আমরা নিজেকেও এইভাবে জানি। তাইতে মন বা বুদ্ধি দিয়ে জানবার সময় বিষয়কে খানিকটা নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তদাত্মক হয়ে তাকে জানি। সাধারণত ইন্দ্রিয়বোধ আমাদের কাছে খুব তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট, আর অন্তরঙ্গ তাদাত্ম্যবোধ কিছুটা ফিকা। কিন্তু অভ্যাসের ফলে এই বোধকেও তীক্ষ্ণ করা যায়—আমরা তাকে বলি তন্ময়তা। তন্ময়তায় বিষয় আর বিষয়ী যেন একাকার হয়ে যায়। তখন বিষয়কে আর বাইরে রেখে আমাথেকে আলাদা করে জানি না—বিষয় 'হয়ে' বিষয়কে জানি। চেতনার যে-বৃত্তি দিয়ে আমরা এমনি করে 'হয়ে জানি', তাকে বলে বোধি। বোধি একটা অতীন্দ্রিয় অনুভব, অথচ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ানুভবের চাইতেও তা স্পষ্ট। ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য সাধন হল এই বোধি।

ইন্দ্রিয়—মন—বুদ্ধি এবং অবশেষে বোধি : এই হল জ্ঞানের সাধন। দেখতে পাচ্ছি, এক্ষেত্রে জ্ঞানের মোড় ফেরানো বাইরের দিকে নয়—অন্তরের দিকে। অন্তরাবৃত্তি বোধির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কিছুটা অন্তরাবৃত্তি মন আর বুদ্ধিতেও আছে, কিন্তু বোধির অন্তরাবৃত্তির মত তা অবিমিশ্র নয়—তাতে ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর খাদ মেশানো। শকুন্তলা তন্ময় হয়ে দুষ্মন্তের কথা ভাবছে। তার এই তন্ময়তা বোধিরই প্রসাদ—কিন্তু তার আলম্বন হল দুষ্মন্তের বিশিষ্ট বা সামান্য রূপ যা বস্তুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতএব তার তন্ময়তা মনের বা বুদ্ধির—কিন্তু বোধির নয়। তন্ময়তা আরও গভীর হলে চেতনার এমন-একটা অবস্থা আসতে পারে, যেখানে শকুন্তলা বা দুষ্মন্ত কেউ নাই—আছে শুধু একটা আনন্দময় অস্মিতার বোধ। এইখান থেকে বোধিজ তন্ময়তার শুরু। এখানে শকুন্তলা আর দুষ্মন্ত আলাদা-আলাদা হয়ে নাই—কিন্তু যে-এক ভেঙে ওই দুয়ের সৃষ্টি, আছে সেই মৌল একরস প্রত্যয়। এই প্রত্যয় যখন বুদ্ধি আর মনে নেমে আসে,

তখন তাদের বলি শুদ্ধ বুদ্ধি এবং শুদ্ধ মন। তারা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ এবং বোধির আলোকে দীপ্ত।

অন্তরাবৃত্তি এবং তন্ময়তা দুরকমের। এক হল বাইরের কোনও বিষয়কে আশ্রয় করে অন্তরে ডুবে যাওয়া—যেমন দুষ্মন্তের ভাবনায় শকুন্তলার তন্ময় হওয়া। কিন্তু শকুন্তলা 'আমি কি' জানবার জন্য শুধু নিজের অস্তিত্বের অনুভবেও ডুবে যেতে পারত। তখন তার তন্ময়তা হত যোগিনীর একাগ্রভূমিক চিত্তের তন্ময়তা। এই অন্তরাবৃত্তি এবং তন্ময়তা সাক্ষাৎভাবে তাকে পৌঁছে দিত ব্রহ্মের বিজ্ঞানে—কূটস্থ আত্মবোধ বিস্ফারিত হত ব্রহ্মবোধে, তার উপলব্ধি হত 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'। আর এই ব্রহ্মবোধে দুষ্মন্তকে সে অনুভব করত তার আত্মস্বরূপেরই একটা বিভাব বলে, আত্মার আত্মীয় বলে। তখন তার দুষ্মন্ত হয়ে দুষ্মন্তকে পাওয়া ; আর সেই পাওয়ায় বিরহ-মিলনের দ্বন্দ্বের অবসানে এই বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়ের পাওয়াও এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়ে উঠত।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অনুভবের পিছনে ব্রহ্মের অনুভব সব-কিছুর আধাররূপে স্তব্ধ হয়ে আছে। তাকে আবিষ্কার করতে হবে বোধির দ্বারা। রামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর কথায় এই বোধির পরিচয় দিয়েছেন। বলছেন, 'ঈশ্বরকে কি মন দিয়ে জানা যায় ? শুধু বোধে তাঁর বোধ হয়।' অর্থাৎ আমার গভীরে যে এক নির্বিশেষ অস্তিত্বের বোধ, এক 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'এর বোধ, তা-ই যুগপৎ আমার আত্মবোধ এবং ব্রহ্মবোধ দুইই। আর তা-ই আমার জীবনের 'সন্মূল সদায়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠা'—এক বিপুল অস্তিত্বের মধ্যে আমার সত্তার সুষম বিধৃতি।

উপনিষদ এই বোধকে উপমিত করেছেন আকাশের সঙ্গে। আকাশ যেমন বিপুল প্রশান্ত নির্দ্বন্দ্ব এবং প্রসন্ন, অথচ সর্বানুস্যূত হয়েও সর্বাতিশায়ী, ব্রহ্মবোধও তা-ই। বলছেন, 'বাইরের আকাশকে ভিতরে টেনে এনে অন্তরাকাশের অনুভব জাগাও। তারপর সেই অনুভবকে সংহত কর হৃদয়ে। তখন দেখবে, তোমার হৃদয়ে যে-আকাশ, সে বাইরের এই দ্যুলোক-ভূলোককেও ছাপিয়ে গেছে।'

ব্রহ্মোপলব্ধির সাধন যেমন বোধি, তেমনি বোধিরও সাধন হল অন্তরাবৃত্তি একাগ্রতা আত্মসচেতনতা আর ব্যাপ্তিচৈতন্য। ইন্দ্রিয়পথে কেবল বাইরে ছিটকে পড়া নয়—বারবার ডুবতে হবে নিজের গভীরে। সেখানে 'অচল অটল সুমেরুবৎ' যে পাকা-আমি, তাকে বোধে আনতে হবে। আর সেই

বোধির আলো-কে নিঃসীম ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে দিতে হবে অন্তরের আকাশে। এই পথ।

বাহিরটাকে চাপলে পরেই ভিতরটা জেগে ওঠে—এটা চেতনার একটা সাধারণ নিয়ম। যেমন দেখি, সম্মোহনে। অন্তরাবৃত্তিতে আন্তর সূক্ষ্মশক্তির বোধ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মাধ্যমেও হতে পারে। এই সূক্ষ্ম সংবিৎগুলি বোধিরই বৃত্তি—তার অন্তর্জ্যোতিরই প্রাণময় অভিব্যক্তি। জ্যোতি আর শক্তি অবিনাভূত—একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি প্রাণ। বোধির জ্যোতি স্বয়ম্প্রজ্ঞ, তার শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। বস্তুত বোধির আবেশেই ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সক্রিয় হয়, কিন্তু তাদের গতি বহিরাবৃত্ত বলে আবেশের শুদ্ধ রূপটি তাদের ক্রিয়ায় সবসময় ফুটতে পায় না। দীর্ঘকাল অন্তরাবৃত্তি অভ্যাসের ফলে বোধির প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি দুইই অবাধ হয় এবং তার আবেশে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সংবিৎএরও দিব্য রূপান্তর ঘটে। অন্তরের প্রত্যক্ষ আর বাইরের প্রত্যক্ষে তখন মর্মগত কোনও ভেদ থাকে না—সব প্রত্যক্ষই হয়ে ওঠে চিন্ময় প্রত্যক্ষ।

উপনিষদে ব্রহ্মোপলব্ধির যে-বিবৃতি আমরা পাই, তা বোধিজাত। আমার মধ্যে যাঁকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করছি, তাঁকেই দেখছি 'ওষধিষু বনস্পতিষু'—এ-দেখা কবির, ঋষির, মরমীয়ার। এ-দেখা যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না, বিষয়কে খণ্ডে-খণ্ডে ভাগ করে দেখে না—বাইরের বস্তুকে ছাপিয়েও তার অন্তরে-বাইরে দেখে এক লোকোত্তরের জ্যোতিরুদ্ভাস। এ-দেখায় বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিরোধ নাই—আছে সর্বসমন্বয়ী সৌষম্যের মধ্যে এক অখণ্ড-চিন্ময় উপলব্ধির রসায়ন।

কিন্তু বোধিজ প্রত্যয়ের এ-আলো যেন কৈশোরের আলো—যার উপর ক্রমে ঘনিয়ে এল তারুণ্যের ছায়া, বোধির সহজ দর্শনকে আচ্ছন্ন করল বুদ্ধিজাত বহুদর্শিতার ঐশ্বর্য। অখণ্ড প্রত্যয়ের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল খণ্ডপ্রত্যয়ের চিড়। বেদান্তের ভাষায় শ্রুতিপ্রস্থান বিবর্তিত হল স্মৃতিপ্রস্থানে। অভেদের মধ্যে ভেদ দেখা দিল, কিন্তু একান্ত উগ্র হয়ে নয়। পদ্মের কর্ণিকার চারদিকে দলের মত একটি মৌল সত্যের মধ্যে সত্যের বিচিত্র বিভূতিরা বিধৃত হয়ে রইল।

অবশেষে বুদ্ধিকে এসে বেদখল করল মন তার একদেশদর্শিতার দাপট নিয়ে, দার্শনিক খণ্ডন-মণ্ডনের কচকচি নিয়ে দেখা দিল তর্কপ্রস্থান—যার লক্ষ্য হল সত্যের একটি দিককেই একান্ত করে আর সবদিককে নস্যাৎ করে দেওয়া।

আমরা এখন বাস করছি মন-বুদ্ধির এলাকায়। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা অসম্ভব—আমরা সে-চেষ্টাও করব না। উপনিষদের ঋষির মতই ব্রহ্মকে আমরা মন এবং মনীষা বা বুদ্ধি দিয়েও উপলব্ধি করব, কিন্তু সবার উপরে স্থান দেব হৃদয়কে। হৃদয়ের আলো বোধির আলো। সেই আলোতে মন আর মনীষাকেও প্রদীপ্ত করে তুলতে হবে, তাদের ঐশ্বর্যকে হৃদয়ের রসসংবেদনের অনুগত করতে হবে। তবেই আমাদের উপলব্ধির পরিপূর্ণতা।

তাঁকে জানতে হবে—এ-তাগিদ আমাদের প্রাণের গোড়ায়। কি করে জানব? বাইরের জগৎকে জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। সেই জানার মাল-মসলা দিয়ে গড়ে তুলি বিজ্ঞান আর দর্শন। দিন-দিন তাদের পরিসর বেড়ে চলেছে। কিন্তু অন্তরের গভীরে মানুষকে তা তৃপ্তি দিতে পারছে না। এ-জানা বিষয়কে বাইরে রেখে জানা, হয়ে জানা তো নয়। তাই এতে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, মন খুশী হয়—কিন্তু হৃদয় ভরে না। সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন যিনি, তাঁকে পেতে হলে এই বাইরে-বাইরে জানার চাতুরীতে তো কুল'বে না। তার জন্য অন্য পথ ধরতে হবে। জানতে হবে মন দিয়ে—বোধি (intuition) দিয়ে। বোধির জানা বাইরে-বাইরে জানা নয়—ভিতরে-ভিতরে এক হয়ে জানা। এ যেন আত্মরসে জারিত করে বিষয়কে জানা—যেমন করে আমাকে আমি জানছি অথবা জানছি আমার প্রিয়জনকে। এর জন্য বাইরে জানার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে ভিতরের দিকে। মন-বুদ্ধির পিছনেই বোধির এলাকা—ডুবতে হবে সেইখানে। মনকে করতে হবে 'অন্তর্লক্ষ্য বর্হিদৃষ্টি' যোগীর মন। অনন্তের রহস্য তখন সত্য হয়ে গভীর হয়ে ভেসে উঠবে এই মনেই।

নবম পরিচ্ছেদ

সদ্‌ব্রহ্ম

বেদান্তে ব্রহ্ম সৎ চিৎ এবং আনন্দ—এই তাঁর স্বরূপলক্ষণ। আবার তাঁহতেই জগৎ ও জীবের বিসৃষ্টি—এই তাঁর তটস্থলক্ষণ বা শক্তিরূপ। দুটি মিলিয়ে ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ—তিনি সৎ চিৎ আনন্দ এবং শক্তিস্বরূপ। এবার একে-একে তাঁর স্বরূপের চারটি বিভাবেরই পরিচয় নেওয়া যাক।

জীব আর জগৎকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—অতএব ব্রহ্মের শক্তিরূপ আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধিরও গোচরীভূত। জগতের দিকে চেয়ে আমরা প্রথম দৃষ্টিতেই দেখি এক অফুরন্ত শক্তির খেলা—সীমাহীন দেশ আর অন্তহীন কাল জুড়ে। জগৎ চলছেই—সে-চলার যেন আর বিরাম নাই। কিন্তু এমন করে জগৎকে দেখা বাইরের দেখা শুধু; আর তাও পুরাপুরি দেখা নয়। যদি প্রশ্ন করি, কোথাহতে চলার শুরু আর কোথায় তার শেষ, তাহলে আর থই পাই না। যে দেশ আর কালকে এই চলার সঙ্গে আমরা গেঁথে নিয়েছি, তখন দেখি, তারা আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। ধাবমান স্রোতের মাঝখানটা শুধু দেখছি—তার আদি বা অন্ত দুইই আমাদের কল্পনার বাইরে। সেখানে দেশ নাই, কাল নাই, চলাও নাই—কোনও বিশেষ্য নাই, বিশেষণও নাই। এই নির্বিশেষ নিশ্চল হতেই চলার শুরু, আবার তাতেই তার শেষ। বস্তুজগৎ-টাকে ভাবরূপে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনলে দেখি, অন্তর্মুখ মনের পরদায় জগতের ছায়াছবিগুলি নেচে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু পরদাটা রয়েছে স্থির। ছবি ফুরিয়ে যাবে, তবুও ওই অবর্ণ আলোর পরদাটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। এমনি করে বুদ্ধি আর বোধির রায় মিলিয়ে মনে হবে, চলাটাই যে একমাত্র সত্য তা নয়—তাকে ঘিরে একটা নিশ্চলের ভূমিকাও আছে। তা-ই দার্শনিকের সন্মাত্র (Pure Existence) বা অধিষ্ঠান-সত্তা, জ্ঞানীর সদ্-ব্রহ্ম, যোগীর কূটস্থ আত্মা—যা কামারের নেহাইএর মত শত আঘাতেও নির্বিকার। চলন্ত জগৎ যেমন সত্য, তেমনি এই অবিচল সদ্‌ব্রহ্মও সত্য। পুরাণের ভাষায়, জগৎটা যেন শবরূপী শিবের বুকে রণরঙ্গিণী কালীর নৃত্য। অখণ্ড বোধির দৃষ্টিতে শিব আর কালী দুইই সমান সত্য। সদ্‌ব্রহ্ম ব্রহ্মের স্বরূপসত্যের প্রথম পরিচয়।

বোধির এই অখণ্ড অনুভব কিন্তু মনের মধ্যে এসে খণ্ডিত হয়ে পড়ে। বোধির কাছে শিব আর শক্তি অবিনাভূত—একটিকে ছেড়ে আরেকটির সত্তা অকল্পনীয়। কিন্তু মন বলবে, শিব স্থাণু সত্তামাত্র, আর শক্তি চঞ্চলা। স্থাণুত্বে চঞ্চলতা নাই যেমন; তেমনি চঞ্চলতাতেও স্থাণুত্ব নাই। শক্তির খেলা জগৎময়। এতদিন জানতাম, স্থাণু জড়কে নিয়ে সে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে অসীম দেশ আর অনন্ত কাল জুড়ে। এখন জানি, জড়ের স্থাণুত্ব আমাদের কল্পনা মাত্র, আসলে সেও শক্তিস্বরূপ। সমস্তটা জগৎ একটা শক্তির স্পন্দন।…এই স্পন্দনের কোনও আধার আছে কি ? বৈজ্ঞানিক বলবেন, এ-প্রশ্ন নিরর্থক। শক্তির হিসাব কষে তাকে কাজে লাগাতে পারলেই হল ; তার পিছনে একটা আধারের বাজে কল্পনা কেন ? নিস্পন্দ সত্তার কোনও বাস্তবতা নাই, ও শুধু মনের একটা বিভ্রম।

এদেশের বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদও কতকটা এইধরনের। বৌদ্ধ বলেন, যা সৎ, তা-ই ক্ষণিক—সে এই আছে এই নাই। কি অন্তরে কি বাইরে—সর্বত্র চলছে একটা ভাঙা-গড়ার খেলা। দীপের শিখাকে মনে করছি নিবাত-নিষ্কম্প, কিন্তু আসলে ক্ষণে-ক্ষণে নতুন করে একেকটা শিখার সৃষ্টি আর লয় হয়ে চলেছে, আর আমরা ভাবছি, বুঝি একটা শিখাই আছে। আমার অন্তরেও তেমনি চলছে বীথিচিত্তের একটা পরম্পরা, আমি ভুল করে তাকে ভাবছি শাশ্বত আত্মা।

তবে বৈজ্ঞানিকের ক্ষণভঙ্গবাদ আর বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদে একটা মৌলিক তফাত আছে। বৌদ্ধ প্রকৃতির ক্ষণভঙ্গের পিছনে এক শাশ্বত বস্তুর সন্ধানে বেরিয়ে জগতের কোথাও তাকে খুঁজে পেলেন না, বিভজ্যবাদের প্ররোচনায় সব-কিছু ভাঙতে-ভাঙতে শেষটায় পৌঁছলেন এক মহাশূন্যে। এবং পৌঁছে শান্তি পেলেন। সুতরাং অন্তরের দিক দিয়ে তাঁর শূন্যতার উপলব্ধি কিন্তু প্রপঞ্চোপশম শান্তিরূপে একটা সদ্‌বস্তুরই সন্ধান দিল। বৌদ্ধের শূন্যবাদ যে অসদ্‌ব্রহ্মবাদরূপে নিরতিশয়-নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধিরই একটা সাধন—একথা আগেও বলেছি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি অন্তরাবৃত্ত নয়—একান্তই বহিরাবৃত্ত। তিনি অন্তরের কোনও শাশ্বত সত্যের সন্ধানে বের'ননি, কাজেই শক্তির কারবারে শিবকে টেনে আনবার কোনও প্রয়োজনই তিনি অনুভব করলেন না।

শক্তির সঙ্গে আর-দুটি তত্ত্ব জড়িয়ে আছে—যা নিয়ে বিভজ্যবাদীর মনে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তত্ত্ব দুটি হচ্ছে দেশ আর কাল। শক্তির স্ফুরণ আমরা দেখতে পাই দেশে আর কালে। শক্তির উন্মেষ হয় বহুর বিভাবনায়

(manifold manifestation)—একের বহু হয়ে ছড়িয়ে পড়ায়। এই বহুত্বের অবস্থান ও বিন্যাসের জন্য একটা অবকাশের প্রয়োজন হয়—প্রাচীনেরা যাকে বলতেন পরমব্যোম বা আকাশ, আমরা এখন বলি দেশ (Space)। সৃষ্টিতে অসীম দেশ জুড়ে বহুর মেলা। কিন্তু এই বহু চিত্রপটে স্থাণু হয়ে বসে নাই, তাদের মধ্যে অবিশ্রাম একটা পরিবর্তনের খেলা চলছে—যেমন অবস্থান-গত, তেমনি আবার গুণগতও। এই পরিবর্তনকে দর্শনে বলা হয় স্পন্দ। চেতনায় স্পন্দের যে-বোধ, তাকে মেপে চলেছে কাল (Time)। শক্তির স্ফুরণ বিশেষ করে ধরা পড়ে কালগত পরিণামে। কালকে তখন বলতে পারি শক্তিস্পন্দ—যার বিশিষ্ট অনুভব হয় আবার আমাদের অন্তশ্চেতনায়, সেখানে চিত্তবৃত্তির ওঠা-পড়ার যেন আর বিরাম নাই। আপাতদৃষ্টিতে দেশকে সর্বাধাররূপে স্থাণু মনে হলেও আন্তর অনুভবে তারও মধ্যে একটা স্পন্দবৃত্তি লক্ষিত হয় সঙ্কোচে আর প্রসারে। প্রাচীনেরা বলতেন, আকাশ সঙ্কুচিত হতে-হতে হয়ে যায় 'অণোরণীয়ান্', আবার প্রসারিত হতে-হতে হয় 'মহতো মহীয়ান্'। বনস্পতি বীজে গুটিয়ে আসে, আবার বীজ বনস্পতিতে বিস্ফারিত হয়। মরমীয়ার অনুভবে ব্রহ্ম জীবাত্মায় গুটিয়ে আসেন, আবার জীবাত্মা বিস্ফারিত হয় ব্রহ্মানুভবের বৈপুল্যে। এও শক্তির স্পন্দ—তার দৈশিক স্পন্দ। দেশে আর কালে শক্তিস্পন্দই হল সৃষ্টি।

শক্তিস্পন্দ ছাড়া সৃষ্টির উজানে কিছু আছে কি? যাঁরা অন্তর্মুখ, অবিরাম স্পন্দনে যাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন, তাঁরা বলেন, 'আছে—আছে আমার অনুভবে, আমার প্রপঞ্চোপশম শিবত্বের অদ্বৈতচেতনায়, আমার অন্তরারাম মুক্তির আনন্দে। এমন-কি আমার নিত্যস্পন্দিত ব্যাবহারিক জীবনেও আছে আমার বিশ্রান্তিতে, আমার সুষুপ্তির প্রগাঢ়তায়।' যাঁরা বহির্মুখ, অবিরাম শক্তির দোলায় দুলতে যাঁদের ভাল লাগে, দুলতে-দুলতেও যে মাঝে-মাঝে থেমে যান—এটা যাঁরা খেয়াল করেন না, তাঁরা বলেন, 'শক্তিস্পন্দের বাইরে কিছুই নাই। যারা মনে করে—আছে, তারা মনের একটা খেয়ালের পিছনে শুধু বোকার মত ছুটে বেড়ায়।' তাঁরা শান্তি চান না, খোঁজেন না—তাই পানও না। তাঁদের জীবনদর্শনে শান্তির পাট নাই, তার জন্য দুঃখও নাই।

প্রশ্ন হবে, স্পন্দ আর অস্পন্দ—দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা সত্য? সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধি বলবে, 'দুটাই সত্য। হামেশাই দেখতে পাচ্ছি, স্পন্দ একসময় নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছে—কর্মের পর আসছে বিশ্রাম, জাগ্রতের পর সুপ্তি,

জীবনের শেষে মরণ। স্পন্দ আর অস্পন্দ পর্যায়ক্রমে জগৎ জুড়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে।' যেমন স্বভাবের নিয়মে স্পন্দের প্রতি কারও অনুরাগ, তেমনি কারও-বা আবার বিরাগ। কেউ চান স্পন্দের সমস্ত সংস্কার নির্মূল করে এক শাশ্বত অস্পন্দে নিত্যস্থিতি। শূন্যবাদী বৌদ্ধ এই দলের, একথা আগে বলেছি।

যাঁরা অস্পন্দকে আমল দেন না, আর যাঁরা স্পন্দকে আমল দিতে চান না—দুইই বুদ্ধিজীবী একদেশদর্শী দার্শনিক। তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় কাজ করছে বিভজ্যবাদী মন—সে অখণ্ড সত্যকে খণ্ডিত না করে সমগ্রভাবে ধারণা করতে পারে না। তার কাছে, স্পন্দ যদি সত্য হয়, তাহলে অস্পন্দ মিথ্যা ; আর অস্পন্দ যদি সত্য হয়, তাহলে স্পন্দ মিথ্যা। স্পন্দ আর অস্পন্দ দুইই যুগপৎ কি করে সত্য হতে পারে, এ তার ধারণার অগোচর। সহজ-বুদ্ধির রায় মেনে দুটিকে সত্য বলে যদি-বা সে স্বীকার করে, তাহলে হয় তাদের মধ্যে সে একটা পর্যায় কল্পনা করবে, কিংবা দুটির একটিকে বলবে পরমার্থ (Reality), আরেকটিকে প্রতিভাস (Appearance)। এ-দর্শন আর যা-ই হক, অখণ্ড অদ্বৈতের দর্শন নয়।

অখণ্ডাদ্বৈতের দর্শন হল বোধির। অস্পন্দে আর স্পন্দে, সত্তায় আর শক্তিতে সে কোনও ভেদ দেখে না। তার দৃষ্টিতে, শিব যখন নিঃসঙ্গ এবং নিস্পন্দ, শক্তি তখন তাঁতে নিশেষিত বা অন্তর্লীন। আর শক্তির উন্মেষদশায় শিব তাতে আবিষ্ট। শিব আর শক্তিকে কখনও কোনও অবস্থাতেই পৃথক করা যায় না। শক্তি চৈতন্যে গুটিয়ে এলেও তবুও সে শক্তিই—তার স্পন্দ তখন দার্শনিকের ভাষায় নিরোধাভিমুখী 'সদৃশস্পন্দ'। স্থাণু শিবে শক্তির অভাব সূচিত হয় না—সূচিত হয় তার নিরোধ। কথা বলবার শক্তি থাকতেও আমি যখন ইচ্ছা করে চুপ করে থাকি, তখন আমি বাক্‌শক্তিরহিত তো নই। আবার কথা বলবার সময়ও অন্তরের গভীরে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি—আমার বাক্ তখন অক্ষীয়মাণ একটা উৎসের ধারা। যে-আমি নিশ্চুপ আর যে-আমি মুখর, দুইই এক সত্তা-শক্তির এপিঠ-ওপিঠ।

এই হল সদ্‌ব্রহ্মের পরিচয়। তিনি স্পন্দ আর অস্পন্দের অতীত হয়ে দুয়েরই বিধর্তা। একদেশ-দর্শনে তাঁর পরিচয় হয় না, মনের দ্বৈতবিভঙ্গ দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। তাঁর অখণ্ড অনুভব সম্ভব মন-বুদ্ধির ওপারে বোধির সংবর্তুলতায় (globality)—যার কাছে সবই সত্য, যার মধ্যে অন্তরে-বাইরে পরমার্থে-প্রতিভাসে অস্পন্দে-স্পন্দে কোনও বিরোধ নাই।

দশম অধ্যায়

চিৎ-শক্তি

ব্রহ্মস্বরূপের প্রথম বিভাবের পরিচিতিতে জানলাম, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ। কিন্তু তাঁর সত্তা নিঃশক্তিক নয়। শক্তির নিমেষে আর উন্মেষে অস্পন্দ আর স্পন্দ তাঁর মধ্যে যুগপৎ ওতপ্রোত হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই শক্তি জড়, না চিন্ময় ?

এককথায় এ-প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। বিশ্বে জড়শক্তি আর চিৎশক্তি দুয়েরই খেলা আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষ। সুতরাং সহজবুদ্ধিতে মনে হবে, শক্তি জড় এবং চিন্ময় দুইই। কিন্তু এর পরে যদি প্রশ্ন করি, কোন্ শক্তির বিকাশ আগে হয়েছে—জড়শক্তির, না চিৎশক্তির ? জবাবে দার্শনিকরা জড়-বাদী আর চিদ্‌বাদী এই দু'দলে ভাগ হয়ে পড়বেন। জড়বাদী বলবেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, জগতে আগে দেখা দিয়েছে জড়শক্তির খেলা, তারপর তার মধ্যে ক্রমে ফুটেছে প্রাণ আর চৈতন্য। সুতরাং বিশ্বমূল শক্তি জড়। চিদ্‌বাদী বলবেন, ওই শক্তি-পরিণামের মূলে রয়েছে চৈতন্যেরই প্রেষণা (urge)। সুতরাং বিশ্বমূল শক্তি আসলে চিন্ময়।

বস্তুত ঝগড়াটা দৃষ্টির ভেদ থেকে। জড়বাদী বিশ্বকে দেখছেন পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে—নীচের দিক থেকে ; আর চিদ্‌বাদী দেখছেন প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিতে—উপরের দিক থেকে। আমাদের নিজেদের মধ্যে কিন্তু দুটি দৃষ্টির একটা সমন্বয় খুঁজে পাই। আমরা জীবন শুরু করি পরাক্ দৃষ্টি নিয়ে—তখন আমরা তাকাই বাইরের দিকে, অন্তরের দিকে নয়। কিন্তু জীবনবোধ যত গাঢ় হয়, ততই দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফেরে। তখন বুঝতে পারি, বাহিরটা যত বড় যত অপরিহার্যই হ'ক না কেন, আসলে সে চলছে অন্তরের প্রশাসনে। গোড়ায় আমি জড়নির্ভর, কিন্তু অবশেষে চৈতন্য দিয়ে জড়কে নিয়ন্ত্রিত করাতেই আমার মনুষ্যত্বের গৌরব। তাহলে ইষ্টার্থের (values) দিক দিয়ে চৈতন্যেরই গুরুত্ব বেশী নয় কি—যদিও জড় তারই কুক্ষিগত একটি অপরিহার্য তত্ত্বও বটে ?

বলা বাহুল্য, এ-দর্শন অখণ্ডের সম্যক্ দর্শন। আর এদেশে এক লোকায়ত-দর্শন ছাড়া আর-সব দর্শনই সেই প্রাচীনকাল হতে জড়কে যথোচিত মর্যাদা দিয়েও চৈতন্যকে করেছে তার দিশারী—যেমন ব্যাবহারিক জীবনে আমরা হামেশাই করে চলেছি। ধরা যাক সাংখ্যদর্শন। জগৎকে সে দেখতে শুরু করল প্রকৃতি-পরিণামের দিক থেকে। গোড়ায় পঞ্চভূত, তারপর তারই অনুরূপ ভূতসূক্ষ্ম, তারপর কর্মেন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য আর তার সঙ্গে জড়িয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বোধ, তারও পরে মানুষের মন—এমনি করে ধাপে-ধাপে সে চৈতন্যের দিকে উজিয়ে চলেছে। মনে এসে তার দৃষ্টি গভীর হয়েছে—মনের পিছনে সে দেখেছে তারই প্রশাসকরূপে ব্যক্তির অহংকে, তার পটভূমিকায় মহৎতত্ত্ব বা বিশ্বগত এক বুদ্ধিকে। অথচ এসমস্তকেই সে স্থাপিত করেছে এক নিত্যপরিণামী প্রকৃতি-শক্তির কুক্ষিতে—যার ক্রিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে যান্ত্রিক (mechanical) বলে যাকে জড় বলতেও সে দ্বিধা করেনি। অথচ তারও উজানে সে দেখেছে পুরুষকে বা চৈতন্যকে। সে-চৈতন্য এমনই বর্ণরাগহীন যে তাকে পাশ্চাত্য জড়বাদীর প্রবৃত্তিবাদের (Behaviourism) কল্পিত অলীক চৈতন্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তুলনা করা যেতে পারে। অথচ সাংখ্যের মতে এই অপরিণামী চৈতন্যই সমস্ত প্রকৃতি-পরিণামের অপ্রবর্তী প্রবর্তক—সুদর্শনা প্রকৃতির আঁধার ঘরের সে 'রাজা'। মরমীয়া জানেন, এ-দর্শন কত গভীর, আর ভারতীয় সাধনজীবনের উপর তার প্রভাব কী প্রচণ্ড। জড়বাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেও যে চৈতন্যের মহিমাকে জীবনে সার্থক মর্যাদা দেওয়া যায়, সাংখ্যদর্শন তার একটা প্রজ্বল নিদর্শন।

ব্রহ্মানুভবকে আমরা আত্মানুভবের সাক্ষ্যেই মেনে নিয়েছি—সুতরাং আমরাও জড়বাদের অবিরোধেই চিদ্‌বাদী। কেবল 'জড়বাদীর নাস্তি' আর 'বৈরাগীর নেতি'তে আমাদের আপত্তি—একথা গোড়াতেই বলেছি। সদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বের অধিষ্ঠান—তা একটা চিন্ময় তত্ত্ব। শক্তি এই সত্তারই অবিনাভূত স্বরূপ-শক্তি, সুতরাং তাও চিন্ময়। চৈতন্যই বিশ্বমূল, চৈতন্যের নিগূহনে জড় তারই একটা প্রতিক্ষেপ (projection)—আমরা বিশ্বকে দেখছি এই দৃষ্টিতে। জড়বাদের নানা আক্ষেপের জবাব দিয়ে এখন আমাদের এই দৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এদেশের চিদ্‌বাদেও একধরনের জড়বাদ আছে, যাতে সত্তাকে স্থাণু ভাবনা করে শক্তিকে তাহতে বিযুক্ত কল্পনা করা হয়। তার বীজ রয়েছে অর্বাচীন

একদেশী সাংখ্যমতে—যার ভিত্তি হল প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যবিবেক। এই মতের প্রভাব পড়েছে বৌদ্ধ শূন্যবাদে এবং বৈদান্তিক মায়াবাদে—কোনও-কোনও তান্ত্রিক মতবাদেও। প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরুষ কেবলই দুঃখ পায়—এই ধারণা হল এইসব মতবাদের মূলে। কিন্তু বস্তুত পুরুষ যতক্ষণ উপনিষদের ভাষায় 'অনীশঃ শোচমানঃ', ততক্ষণই তার দুঃখ। কিন্তু প্রকৃতি যদি পুরুষের আত্মপ্রকৃতি হয়, আর পুরুষ তার ভর্তা মহেশ্বর হয়, তাহলে দুঃখ পাওয়া তো তার পক্ষে অপরিহার্য নয়। দুঃখকে তখন আনন্দে রূপান্তরিত করবার বীর্যও পুরুষের মধ্যে জাগতে পারে, আর সে-বীর্য প্রকৃতিরই শক্তি। কিন্তু প্রকৃতি তখন আর অপরা নয়—পরা বা পরমা।

অপরা প্রকৃতিকে যান্ত্রিক (mechanical) বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি, কিন্তু তা করি পরা বা পরমা প্রকৃতিরই প্রেষণায়। সে-প্রকৃতি কিন্তু লক্ষ্যাভি-সারী (teleological)। যেখানে লক্ষ্য আছে, সেখানে কোনও-না-কোনও আকারে চেতনাও আছে, ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যও আছে—এর পরিচয় আমরা পাই আন্তর অনুভবে। সুতরাং প্রকৃতিকে সেখানে আর জড় বলতে পারি না, বলি চিন্ময়। প্রকৃতি আর পুরুষ তখন বিযুক্ত নয়—যুগনদ্ধ। পুরুষ আর প্রকৃতি, চৈতন্য আর শক্তি তখন সমব্যাপ্ত (co-extensive)—দুয়ে মিলে এক অখণ্ড সত্তা। শিব আর শক্তি অবিনাভূত, একথা আগেও বলেছি। এ-মতবাদ ঔপনিষদ এবং তান্ত্রিক বেদান্তের—সেখানে যা-কিছু সৎ, তা-ই চিন্ময় এবং শক্তিতে স্ফুরন্ত। শক্তি তখন চিৎ-শক্তি। জড়শক্তি তারই একদেশ, তারই ইষ্টসিদ্ধির প্রয়োজনে চৈতন্যের স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগূহনে কল্পিত। বলা বাহুল্য, এ-মতবাদ আমাদেরও অভীষ্ট—তার মধ্যে শূন্য মায়া বা শিবের শক্তিবশ্যতার কোনও বাস্তবতা নাই।

অন্তরাবৃত্ত অনুভবে সদ্‌ব্রহ্মকে পাই বিশ্বের মূলে। এই অনুভবের প্রামাণ্যেই বুঝতে পারি, এই সত্তা চিন্ময়। যেমন সত্তা বিশ্বমূল, তেমনি চৈতন্যও বিশ্বমূল। আমি যখন চৈতন্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে আমার মধ্যে তলিয়ে যাই, তখন আমার সমস্ত উপাধি খসে পড়ে—থাকে শুধু 'আমি আছি' এই বোধ। সত্তা আর বোধ এখানে অবিনাভূত। দুইই আমার মৌল স্বরূপ। তেমনি বিশ্বের মূলেও আছে সদ্‌ব্রহ্ম আর চিদ্‌ব্রহ্মের নিত্যসমাহার—আত্মানুভবের মাধ্যমেই আমরা এ-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই। বেদান্তের ভাষায়, ব্রহ্ম শাশ্বত সৎস্বরূপ এবং শাশ্বত চিৎস্বরূপ। এই সচ্চিদ্-ব্রহ্ম নিঃশক্তিক নন। সদ্‌ব্রহ্ম যদি চিন্ময় হন,

তাহলে তাঁর শক্তিও হবে চিৎ-শক্তি, কেননা শক্তি সত্তারই স্পন্দ বা বিভূতি। সেই শক্তির লীলায়ন যখন এই জগৎ, তখন এও চিন্ময়।

কিন্তু নিরেট জড়বাদীর এখানে আপত্তি হবে, জগতে আমরা যে-শক্তির খেলা দেখতে পাচ্ছি, সে যে সর্বত্রই চিৎশক্তি, তা কি করে বলি? বরং এই কথাই কি সত্য নয় যে চৈতন্য জড়েরই পরিণাম, জড় চৈতন্যের বিসৃষ্টি নয়? এ যে জড়বাদীর একটা দৃষ্টির বিভ্রম, একথা আগেই বলেছি। স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে মেনে আমরা বলি, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টা। এক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। চেতনার নিচুতলায় তাকে মনে হয় ইন্দ্রিয়নির্ভর। কিন্তু সেখানেও অলক্ষ্য চিৎশক্তির প্রেষণায় যে অস্থানে ইন্দ্রিয়শক্তির আবির্ভাব হতে পারে, একথা জীববিজ্ঞানীরও আর অজানা নয়। আর চেতনার উপরতলায় সে-ই যে 'সর্বেশ্বর এবং সর্বযোনি', এ তো নিত্যপ্রত্যক্ষ। সেখানেও লক্ষ্যের চেতনাই তার সাধন ও সিদ্ধির নিয়ামক—যন্ত্রী যেমন যন্ত্রের নিয়ামক।

আসলে চৈতন্য সম্পর্কে কতকগুলি ভুল ধারণা হতে তার অধিকার নিয়ে আমাদের এত সংশয়। মানুষের মনের জাগ্রৎ-অবস্থাকেই আমরা সাধারণত চেতনার নিরিখ বলে ধরে নিই। আমাদের কাছে চেতনা আর চিত্তবৃত্তি সমার্থক। কিন্তু বস্তুত চেতনার এলাকা এত ছোট নয়। আজকাল বৈজ্ঞানিক মহলেও শুনতে পাই অবচেতন (subconscious) আর নির্জ্ঞান (unconscious) মনের কথা—যার প্রভাব জাগ্রৎ মনকেও অলক্ষ্যে প্রভাবিত করে। আবার আধুনিক মনোবিদ্ এক বিশ্বগত নির্জ্ঞানের (universal unconscious) কথাও বলেন, যা আমাদের জাগ্রৎ মনের সমস্ত প্রবৃত্তির নিয়ামক। কিন্তু এ তো গেল চেতনার প্রবৃত্তিমুখী ব্যাপার। এছাড়া তার একটা নিবৃত্তিমুখী ব্যাপারও আছে, যার অনুশীলন চলে যোগে এবং তার ফলে অধিচেতনা (subliminal consciousness) আর অতিচেতনার (super-consciousness) স্তরগুলিও আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। চেতনার এই বিপুল পরিধি নিয়ে তার আলোচনা করলে তবেই তার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়।

আবার যেমন আছে মানুষের মনশ্চেতনা, তেমনি পশুর প্রাণচেতনা, উদ্ভিদের অন্তঃসংজ্ঞ চেতনা। উপর হতে দেখলে মনে হয়, চেতনা প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে ক্রমে যেন গুটিয়ে আসছে।

অবশেষে জড়ের মধ্যে এসে আমাদের দৃষ্টিতে সে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু এটাকে চেতনার অভাব না বলে আত্মনিগূহন বা নিবর্তন (involution) বলতেই-বা বাধা কোথায়? প্রাণিমাত্রেরই সব অবস্থাতে চেতনার ক্রিয়া চলছে—শুধু তার প্রকাশের ধারা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানে এসেই-বা থামব কেন? যাকে বলি জড়, তারও মধ্যে যে প্রাণ ও চেতনা উন্মেষের অভিমুখে অতি সূক্ষ্ম ও অস্ফুটভাবে ক্রিয়া করছে না, তাই-বা বলি কি করে? জড়ের স্বরূপ শক্তি-স্পন্দ; কিন্তু সে-স্পন্দ অস্ফুট প্রাণস্পন্দ বা চিৎস্পন্দ হতে বাধা কি?

চেতনার বিশেষ লক্ষণ—একটা লক্ষ্য ধরে কাজ করা। সমস্ত প্রকৃতি-শক্তির মূলেই যে তার তাগিদ প্রচ্ছন্ন হয়ে নাই, এও তো জোর করে বলতে পারি না। জড়ের মধ্যেও যে নিয়মের বিচিত্র খেলা, আমরা আমাদের ছটাকে বুদ্ধি দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে থ' হয়ে যাই। কিন্তু অখণ্ড উদার দৃষ্টি নিয়ে তাকে একটা মহতী বুদ্ধির লীলা বলে ভাবতে পারি না কেন?

পারতাম, যদি অন্তর্মুখ হয়ে আত্মচৈতন্যকে বিশ্বে বিচ্ছুরিত বলে অনুভব করতাম। তখন দেখতাম, বিশ্বশক্তি বস্তুতই চিৎ-শক্তি, বিশ্বাধিষ্ঠান চিদ্‌ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি।

একাদশ অধ্যায়

আনন্দরূপম্

(সমস্যা)

ব্রহ্মস্বরূপের দুটি বিভাবের পরিচয় পেলাম—ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ। সত্তা এবং চৈতন্যকে সাধারণত আমরা স্থাণু ভাবতে অভ্যস্ত। সত্তা যেন জগতের নিস্পন্দ অধিষ্ঠান, চৈতন্য যেন তার নির্বিকার প্রকাশক। যত স্পন্দ আর বিকার, সব জগতে—তা সত্তাতেও নাই, চৈতন্যেও নাই। অন্তরাবৃত্ত অনুভবের গভীরে এমন-একটা নিবাত-নিষ্কম্প চিজ্জ্যোতির দেখা পাই বলেই আমাদের ধারণা জন্মায়, ওই অধূমক নিস্পন্দ জ্যোতিই সত্য, আর জগতে যে-স্পন্দলীলা তা মিথ্যা। কিন্তু এ হল এক অখণ্ড সত্যকে মনের মায়ায় খণ্ডিত করে দেখা। বোধিজাত গভীরতর অনুভবের প্রামাণ্যেই আবার বুঝি, সত্তা আর চৈতন্য দুইই শক্তিযুক্ত, দুয়েরই বিসৃষ্টির সামর্থ্য আছে। নিস্পন্দ সত্তা আর নির্বিকার চৈতন্য দুইই এক অন্তহীন সৃষ্টিসামর্থ্যের আধার। শিব অটল থেকেই টলছেন, আবার টলেও অটল থাকছেন। বেদে উপমা দেওয়া হয়েছে এক অক্ষীয়মাণ শতধার উৎসের—শতধারায় ক্ষরিত হয়েও যা স্বরূপত অক্ষর, যা 'ক্ষরত্যক্ষরম্।'

এইবার প্রশ্ন করতে পারি, অটল টলেন কেন, অক্ষরের ক্ষরণ হয় কেন? দার্শনিকের ভাষায়, সত্তা আর চৈতন্য শক্তিতে স্পন্দিত হয় কেন? বুদ্ধির কাছে এ-প্রশ্নের পুরাপুরি জবাব আমরা পাই না—পাই বোধির কাছে, আত্ম-সত্তার গভীর অনুভব থেকে। আগেই বলেছি, সত্তা চিৎসত্তা, তার স্পন্দ চিৎস্পন্দ। আত্মসত্তার গহনে এই চিৎস্পন্দকে অনুভব করা যায় একটা অকারণ অবারণ উল্লাসরূপে। সত্তা নিস্পন্দ থেকেই শক্তির বেগে স্পন্দিত হচ্ছে, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার পরিণামিত করবার উল্লাসে সৃষ্টি করছে দেশ আর কাল, আর সেই ভূমিকায় ফুটিয়ে তুলছে নিজেরই আত্মসংবিন্ময় বিচিত্র বিভূতি। যেমন কবির কাব্য : তার নিজের মধ্যে নিজেকে পাবার গভীর আনন্দ উছলে পড়ছে বাণীর ঝঙ্কারে, ছন্দের বৈচিত্র্যে। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে শুদ্ধ-সন্মাত্রের নিজের ভূমিকায় নিজেকে বিচিত্র লীলায়নে ছড়িয়ে দিয়ে

আস্বাদন করবার আনন্দই তাঁর বিশ্বরূপ। এই আনন্দ সত্তার গভীরে—ব্রহ্ম তখন আত্মারাম। আবার এই আনন্দ তাঁর শক্তির বিকিরণে, এই আনন্দ বিশ্বলীলায় তাঁর আত্মরূপায়ণে—তখন তিনি বিশ্বরমণ।

এইখানে ব্রহ্মস্বরূপের তৃতীয় বিভাবের সন্ধান পেলাম। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ। তাঁর অবিনাভূত স্বরূপশক্তিও উন্মেষে-নিমেষে তা-ই, আর সেই শক্তির পরিণাম এই জগৎও তা-ই। তার প্রমাণ জীবের আত্মসত্তার প্রত্যক্ষ অনুভবে—যে-জীব বিশ্বশক্তির কেন্দ্র, আবার বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু।

সৃষ্টি যদি ব্রহ্মের আত্মরূপায়ণের উল্লাসই হয়, প্রশ্ন হবে—জগতে তাহলে এত দুঃখ কেন? দুঃখ যে আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। দুঃখবাদী দার্শনিক তো বলেই বসলেন, এ-সংসার অশাশ্বত এবং দুঃখালয়, দেহ ধারণ করলেই জীবকে দুঃখ পেতে হবে, দুঃখ জীবনের আর্যসত্য; যাকে লোকে সুখ মনে করে, আসলে তা দুঃখই—এসেছে সুখের মুখোশ প'রে।

কিন্তু দুঃখবাদের এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি নয় কি? সত্যি বলতে বিশ্বের জীবনলীলায় দুঃখের চাইতে সুখের ভাগই বেশী। সুখ স্বাভাবিক বলেই তার দিকে আমরা ততটা নজর দিই না, আর নিত্য-অনুভূত অনেকখানি সহজ সুখের চাইতে এতটুকু দুঃখকেই বড় করে তুলি। দুঃখের মত সুখকেও তীব্র করে তোলবার আগ্রহে আমরা তার সহজ রূপটিকে ভুলে গিয়ে দুঃখের বোঝাটাকে আরও ভারী করি। দুঃখ যেমন চেতনাকে উত্তেজিত ক'রে অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলে, একটা পরিব্যাপ্ত সহজ সরল সুখের বোধ চেতনাকে তেমনি গভীর ক'রে স্বরূপানন্দে আমাদের বিশ্রান্ত করতে পারে—এটা আমরা খেয়াল করি না।

কিন্তু দুঃখবাদীর নালিশটা তবু থেকেই যায়। তার প্রশ্ন, সবই যদি সচ্চিদানন্দ, তাহলে দুঃখ-তাপের অস্তিত্ব মোটেই সম্ভব হয় কি করে? প্রাকৃত বুদ্ধির দুটি সংস্কার প্রশ্নটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। একটি সংস্কার: দুঃখের বিধাতা যে-ঈশ্বর, তিনি আছেন জগতের বাইরে দাঁড়িয়ে। সেখানে তিনি নিজে সুখে থেকে তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য দুঃখ বিধান করছেন—হয় তিনি সাধারণ মানুষের মতই নিষ্ঠুর বা পক্ষপাতী বলে, অথবা জীবকে কোনও অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেবেন বলে। শেষের কথাটার ভিত্তি হল আরেকটা সংস্কার: দুঃখ অধর্মের শাস্তি, পাপের ফল।

আসল প্রশ্নটার জবাব দর্শন আর মনোবিজ্ঞান দুয়ের তরফ থেকেই দেওয়া

চলে। দার্শনিকের জবাব: জগতের বাইরে একজন ঈশ্বরকে দাঁড় করিয়ে এ-সমস্যার মীমাংসা হয় না। কেননা ঈশ্বর জগদ্‌বহির্ভূত হলে তাঁর সৃষ্ট জগতে দুঃখ আর অনর্থের সৃষ্টির দায় শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘাড়ে না চাপিয়ে উপায় থাকে না। তাঁকে নিষ্ঠুরতা আর খোশখেয়ালের অপবাদ থেকে বাঁচাবার জন্য যদি দুঃখ আর অনর্থের কর্তা বলে সৃষ্টির মধ্যে একটা শয়তানকে এনে হাজির করা হয়, তাহলে অখণ্ড ঈশ্বরসত্তা অন্যোন্যবিরোধী দুটি সত্তায় ভাগ হয়ে পড়ে। বেদান্তের মায়াবাদেও এইধরনের একটা দ্বৈধভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে ব্রহ্ম আর মায়ার সম্পর্কে একটা গোঁজামিল দেখা দিয়েছে। কিন্তু যদি মানি, ঈশ্বরই জগৎ হয়েছেন, তাহলে বলতে পারি—জীবের মধ্যে থেকে তিনিই দুঃখ ভোগ করছেন, অনর্থের বিপাকে পড়ে দিশাহারা হচ্ছেন, আবার এ-দুর্ভোগ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টাও করছেন তিনিই। আর সবটাই হচ্ছে অবশ হয়ে নয় বা অজ্ঞানে নয়—হচ্ছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মরূপায়ণের চিন্ময় উল্লাসে। তাতে দুঃখ এবং অনর্থেরও জগদ্‌ব্যাপারে একটা সপ্রয়োজন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—যার কথা পরে তুলব।

দুঃখকে যদি অধর্মের সাজা বলি, তাহলে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার জন্য কর্মবাদ আর জন্মান্তরবাদকে এ-আলোচনায় টেনে আনতে হয়। তাতেও সমস্যার সর্বাঙ্গীণ সমাধান হয় না। স্পষ্টই দেখতে পাই, পাপের ফল সবসময় দুঃখ নয়—বরং এ-সংসারে দুর্ভোগটা যুধিষ্ঠিরদেরই বেশী। অথচ দুঃখে পড়েও তাঁরা প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল এবং প্রসন্ন। কাজেই দুঃখের সঙ্গে পাপের আর সুখের সঙ্গে পুণ্যের সম্পর্কটা কার্য-কারণের স্থূল এবং সরাসরি বিচারে সত্য নয়। গোড়ায় আমরা যাতে সুখ পাই তাকে ভাল, আর যাতে দুঃখ পাই তাকে মন্দ বলি। সুখ-দুঃখের সঙ্গে ধর্মাধর্ম এমনি করে প্রথমটায় জড়িয়ে যায় বটে। কিন্তু এ-বিচার নিতান্তই বহিরঙ্গ। কেননা চিৎপ্রকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মাধর্মের মূল্যায়ন হয় বাইরের সুখ-দুঃখ দিয়ে নয়—অন্তরের প্রসাদে আর বিষাদে। তখন পুণ্যের পুরস্কার অন্তরের প্রশান্তিতে, আর পাপের দণ্ড অনুশোচনায়।

জগদ্‌বহির্ভূত ঈশ্বরের ধারণা থেকে আমরা শেষপর্যন্ত সাংখ্যের বিবিক্ত পুরুষের ভিতর দিয়ে পৌছই শূন্যবাদে। মহাশূন্য নির্দ্বন্দ্ব—সেখানে সুখ-দুঃখ বা ধর্মাধর্মের কোনও দ্বন্দ্বই নাই। অতএব এখানকার দ্বন্দ্বচেতনার ভূমি হতে উজিয়ে গিয়ে 'ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন পুণ্যং ন পাপম্'এর ভূমিতে পৌছনোকেই

আমরা পুরুষার্থ করি না কেন? এও একটা পথ বটে, কিন্তু এতে আসল সমস্যার পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় শুধু—তার কোনও মীমাংসা হয় না। শূন্যবাদ সব-কিছুকে নস্যাৎ করে দিতেই পারে, কোনও-কিছুকে ব্যাখ্যা করবার দায় তার নাই। বিশ্বাতীত আর বিশ্ব, সত্তার একান্তবিবিক্ত দুটি ভূমি—একে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব, আর অপরে দ্বন্দ্বের একান্ত অভাব। এখান হতে ওখানে চেতনার উত্তরণে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি এবং তার ফলে আমার ব্যক্তিগত মোক্ষপিপাসার চরিতার্থতা। এছাড়া দুঃখ কেন, তার কোনও স্পষ্ট জবাব এই দর্শনে আমরা খুঁজে পাই না।

দুঃখ কেন, তার জবাবে মনোবিজ্ঞানী বলবেন: দুঃখের অনুভব আপেক্ষিক। দুঃখ যে সবসময় দুঃখই, তা তো নয়। চেতনার সঙ্কোচে প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ যখন সঙ্কীর্ণ বা ব্যাহত হয়, তখনই দুঃখের উৎপত্তি। আবার চেতনার প্রসারে বা তুঙ্গতায় দুঃখের তীব্রতা মন্দীভূত বা নিরুদ্ধও হতে পারে। দুঃখের আঘাতকে গ্রহণ না করা, এমন-কি তার পরিস্পন্দকে স্বীকার করেও আনন্দে তাকে রূপান্তরিত করা—চিৎশক্তির পক্ষে এ তো অসাধ্য কিছু নয়। সত্তার গভীরে অবগাহন করলে বরং এই বোধই হয়, আনন্দই বিশ্বের মূল তত্ত্ব —দুঃখ তার একটা তির্যক বিক্ষেপ মাত্র। চেতনার মৌলধর্ম হচ্ছে রসগ্রাহিতা। সে সুখে যেমন রস পায়, তেমনি দুঃখেও রস পেতে পারে—রসিকের রসনা যেমন মিষ্টান্নে তেমনি শুক্তাতেও রস পায়।

ধর্মাধর্মের বেলাতেও সেই একই কথা। ওটি জগদ্ব্যাপারের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য নয়। অপরা প্রকৃতির নীচের স্তরে যেমন এর বালাই নাই, তেমনি নাই পরা বা পরমা প্রকৃতির এলাকাতেও। এ শুধু প্রকৃতি-পরিণামের মাঝখানকার একটা ব্যাপার। প্রকৃতির সর্বত্র রয়েছে সচ্চিদানন্দের আত্মরূপায়ণের একটা প্রেতি (urge)। এ-প্রেতি প্রথমত ধর্মহীন—যেমন জড়ে; সেখানে কোনও আদর্শ অনুশীলনের তাগিদ নাই। তারপর এ-প্রেতি ধর্মাভাসযুক্ত—যেমন ইতর-প্রাণীতে। অবশেষে মানুষের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি চেতনার উত্তরায়ণের পথে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে চেতনার এমন ভূমিও আছে, যেখানে ধর্মের অনুশাসন নিষ্প্রয়োজন।

আসল কথা, সুখ-দুঃখ বা ধর্মাধর্মের দ্বন্দ্ব মানুষের প্রাকৃত চেতনারই একটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্বচেতনাতে সবই আনন্দ, সবই জ্যোতি হতে উত্তরজ্যোতিতে উত্তরণের একটা প্রবেগ। সন্মাত্রের এ-আনন্দ জড়ে অবচেতন, উন্মনীতে

অতিচেতন ; শুধু প্রাণে ও মনে এ নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে চায় সম্ভূতির লীলায়নে, স্পন্দবৃত্তির উপচীয়মান আত্মসচেতনতায়। বোধের এই মধ্যপর্বটিকে যাচাই করতে হবে একপেশে দৃষ্টি দিয়ে নয়—সমগ্রদৃষ্টির ব্যাপ্তি দিয়ে। দুঃখ আর অধর্মকে তখন আমরা নিত্যসত্যের মর্যাদা দেব না, কিংবা হেয় জ্ঞানে উড়িয়ে দিতেও চাইব না—কিন্তু বৃহতের মধ্যে রেখে বুঝতে চাইব কতটুকু তাদের সীমা, কিই-বা তাদের তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

আনন্দব্রহ্মগম্

(সমাধান)

এক পরিকীর্ণ হচ্ছেন বহুতে, যিনি অবিভক্ত তিনি প্রতীয়মান হচ্ছেন 'বিভক্তবৎ' (গীতা)—এই হল বিশ্বলীলার মর্মকথা। ব্রহ্মের সত্তা চৈতন্য আর আনন্দ প্রত্যক্ অনুভবে যেমন অন্যোন্যসঙ্গত একটি একরস প্রত্যয়, পরাক্ অনুভবে তেমনি বহুধাবিশ্লিষ্ট খণ্ডিত প্রত্যয়ও বটে—তেশিরা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা আলোর মত। অখণ্ড সত্তা তাইতে খণ্ডিত হচ্ছে বিচিত্র সংঘাতে বা আয়তনে (organisation), অখণ্ড চৈতন্য বিচিত্র চিত্তবৃত্তিতে, অখণ্ড আনন্দ সুখ-দুঃখের বিচিত্র দোলনে। খণ্ডভাবের মধ্যে যেমন অনুভবের নিবিড়তা আছে, তেমনি একটা বেদনাও আছে—সে আবার ফিরে যেতে চায় ভূমাতে। আধারের সঙ্কীর্ণতা, চিত্তের অবিদ্যা, হৃদয়ের বেদনা, শক্তির দীনতা হতে মানুষ মুক্তি চায়। তার মুক্তি চৈতন্যের প্রসারে, আনন্ত্যের উপলব্ধিতে—আত্মায় 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ আনন্দং ব্রহ্ম'র বোধিতে। দুঃখ-সমস্যার সমাধানও সত্তার মর্মচর এক সর্বগত আনন্দভাবনার সহজতায়—তর্কবুদ্ধির দ্বারা কেবল কথার ধুলা ঝেঁটিয়ে তোলায় নয়।

বাস্তবিক অখণ্ড দৃষ্টির উদার আলোকে জগতের দিকে তাকিয়ে দেখি, আনন্দ কোথায় নাই? বিশ্বের সর্বত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখবার যে অদম্য আকূতি, প্রাণের মর্মমূলে যে অমরত্বের বেদন, অকুণ্ঠ ঐশ্বর্যে নিজেকে উপচে তোলবার যে-মনোবেগ—সবাতেই আনন্দ; এমন-কি আত্মহত্যার সাময়িক প্রবৃত্তিও আনন্দ-পিপাসার একটা তির্যক প্রকাশ মাত্র। বস্তুত আনন্দই আত্মভাবের বিধৃতি, আনন্দই সৃষ্টির রহস্য, আনন্দই ভবের প্রবর্তক, আবার তার নিবর্তকও।

ব্রহ্ম সৎ চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ; জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি। ব্রহ্মের স্বরূপের সঙ্গে জগতের তাহলে কি সম্পর্ক? বস্তুত সৎ চিৎ আনন্দ অন্যোন্যসঙ্গত একটি মহাভাবেরই ত্রিপুটী—বিভজ্যবৃত্ত (analytic) মনের কারসাজিতে আমরা

তার একেকটি বিভাবের উপর একেকবার জোর দিই। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে প্রাচীনেরা তাই তিনটি বিভাবকে অবলম্বন করে তিনটি বাদের সৃষ্টি করেছেন : ব্রহ্মের সত্তার দিক থেকে মায়াবাদ, চৈতন্যের দিক থেকে প্রকৃতিবাদ, আর আনন্দের দিক থেকে লীলাবাদ। তলিয়ে দেখতে গেলে তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ব্রহ্মোপলব্ধি যত গভীর হয়, ততই একটি সিদ্ধান্তের অনুষঙ্গে আরেকটি সিদ্ধান্ত দেখা দেয়।

প্রথম সিদ্ধান্ত : ব্রহ্ম যদি সৎ বা সত্যস্বরূপ, জগৎ তাহলে মায়া। মায়া বলতে এখন আমরা বুঝি 'মিথ্যা'—মায়াবাদের আরেক নাম তাই 'জগন্মিথ্যাত্ব-বাদ'। এই মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ এবং জীব দুইই মিথ্যা বা অলীক। এই মায়াবাদ এসেছে বৌদ্ধ শূন্যবাদ হতে—পরে তা নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। বেদে মায়ার কথা অনেক আছে। কিন্তু মায়া সেখানে মিথ্যা নয়। মায়া দেবতার সেই শক্তি—আমাদের সীমিত বুদ্ধির কাছে যা একটা অনির্বচনীয় রহস্য। মায়া ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন সত্য, তেমনি তাঁর শক্তিও সত্য—সেই শক্তির সৃষ্ট জগৎ ও জীবও সত্য। তবে কিনা বুদ্ধির কাছে তাদের স্বরূপ অনির্বচনীয়—মননে-বচনে তাদের রহস্যকে প্রকাশ করা যায় না, যদিও বোধিতে তাদের বোধ হয়।

জগৎ মায়া অর্থাৎ স্বপ্নের মতই মিথ্যা—এমন-একটা কথা চালু আছে। তবুও জানতে হবে, জগৎ স্বপ্ন হলেও ব্রহ্মেরই স্বপ্ন, প্রাকৃত জীবের স্বপ্ন নয়। ব্রহ্মের স্বপ্নদশাকে বেদে-পুরাণে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভকে জানা যায় যোগের বিজ্ঞানভূমিতে। ব্রহ্মের জগৎস্বপ্ন তাহলে জগতের নির্বাহক বিজ্ঞানশক্তি, অতএব তা কখনও অলীক হতে পারে না।

আবার বলা হয়, জগৎ অনিত্য, অতএব মায়া বা মিথ্যা। কিন্তু অনিত্য কোনও নিত্যসত্যেরই সাময়িক প্রকাশ। তা অব্যক্তে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু কখনও তার স্বরূপনাশ হয় না। অতএব অনিত্যেরও একটা প্রবাহ-নিত্যতা সুতরাং সত্যতা আছে। যা অনিত্য, তা অলীক নয়।

তবে একথা সত্য, মায়া সত্য হলেও ব্রহ্মের সত্তার কাছে তার জগৎসৃষ্টিকারী সত্তা খাটো। ব্রহ্ম স্ব-তন্ত্র, মায়া ব্রহ্মের শক্তি বলে তাঁর আশ্রিত, অতএব পরতন্ত্র। মায়া ব্রহ্মের আত্মমায়া হয়ে তাঁর মধ্যে গুটিয়ে আছে—তখন তার নিমেষদশা; আবার জগৎরূপে তাঁরই আয়তনে নিজেকে প্রসারিত করছে—তখন তার উন্মেষদশা। ব্রহ্ম যুগপৎ নিমেষ-উন্মেষের ধারক এবং নির্বাহক

বলে তার অতীত। তিনি মায়াতীত এবং মায়াধীশ। মায়া তাঁর স্বরূপসত্য নয়—কিন্তু স্বরূপশক্তি। এইটুকু তার ন্যূনতা। ব্রহ্ম জগৎ হয়েও জগৎকে ছাপিয়ে গেছেন।

মায়াবাদের সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসত্তা আর জগৎসত্তার আপেক্ষিকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এতে সত্য-মিথ্যার বিচারটাই বড় হয়ে দেখা দেয়—কিন্তু জগৎ যে বস্তুত কি তার কোনও বিবৃতি পাওয়া যায় না। এই বিবৃতি আমরা পাই জগৎ সম্পর্কে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে—প্রকৃতিবাদে। জগৎ ব্রহ্মশক্তির বিচ্ছুরণ। বাইরে শক্তির অনুভব হয় কাজ দেখে। কিন্তু তার অপরোক্ষ অনুভব পাই নিজের মধ্যে। তখন তাকে তত্ত্বত জানি চিৎশক্তি বলে। সাংখ্যের পরিভাষা অনুসারে চৈতন্যকে তখন বলি 'পুরুষ', আর তার কার্যকারিণী শক্তিকে বলি 'প্রকৃতি'। ব্রহ্মের চিৎস্বরূপের দিক থেকে তখন বলতে পারি, ব্রহ্ম চিন্ময় পুরুষ—জগৎ তাঁর প্রকৃতি, তাঁর চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ। মায়াতে ব্রহ্মশক্তির বিজ্ঞানরূপ (ideative energy), আর প্রকৃতিতে তার কৃতিরূপ (executive energy)। উভয়ত্র শক্তি 'দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়া' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)। আমাদের মধ্যে আত্মানুভবে আমরা পাই সাক্ষিচৈতন্যের পরিচয়, আর আত্ম-প্রকৃতিতে দেখি দেহ-প্রাণ-মনে তার উল্লাস।

দৃষ্টি আরও গভীর হলে জগৎসত্তাকে দেখি শাশ্বত-সন্মাত্রের স্বরূপানন্দের ভূমিকায় রেখে। তখন জগৎসম্পর্কে তৃতীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছই—এ-জগৎ ব্রহ্মের লীলা। আত্মরূপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজেরই মধ্যে নিজেকে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন অক্লান্ত ছন্দোলীলায়। দেখি, দিকে-দিকে 'আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্ বিভাতি'—বিচিত্র বিভায় ফুটে উঠছে ব্রহ্মের আনন্দরূপ। এ-আনন্দমেলায় তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ। তিনি কবি, জগৎ তাঁর কাব্য।

এমনি করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ভূমিকায় দেখি বিশ্বব্যাপারের তিনটি সামান্যরূপ—এদেশে যারা মায়াবাদ প্রকৃতিবাদ এবং লীলাবাদের অন্যোন্যবিরোধী দর্শনে পরিণত হয়েছে। বস্তুত অখণ্ড দৃষ্টিতে তার পরস্পরের আপূরক। সত্তার অবিনাভূত যে-শক্তিস্পন্দ, তা তত্ত্বত চিন্ময়; আর এই চিৎ-শক্তির আত্মপরিণামের প্রয়োজক হল সত্তার আনন্ত্যে নিরূঢ় এক স্বরূপানন্দের দোলা। তাইতে জগৎসম্পর্কে মায়াবাদ প্রকৃতিবাদ এবং লীলাবাদ তিনটিই সমকালে এবং সমভাবে সত্য।

যেমন ব্রহ্ম সত্য এবং ব্রহ্মের বিভূতিরূপে জগৎ সত্য, তেমনি তার কেন্দ্রে চিদ্‌ঘনবিগ্রহরূপে জীবও সত্য। জীব সত্য, জীব চিন্ময়, জীব আনন্দময়—এই তার স্বরূপ। এই স্বরূপ বিরূপ হয়েছে খণ্ডবোধের দরুন। আমরা ভূমা হয়ে নাই, বৃহৎ হয়ে নাই—আছি 'অল্প' হয়ে, 'জুগুপ্সিত' বা সঙ্কুচিত হয়ে। তাই আমরা চঞ্চল, আমরা মূঢ়, আমরা নিরানন্দ। এক অক্ষোভ্য আনন্দসত্তা আমাদের স্বরূপ; কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে এই আনন্দই আমাদের চেতনায় জাগে সুখ দুঃখ আর উপেক্ষার এলোমেলে সাড়া হয়ে। জীবনের অনুকূল আর প্রতিকূল বেদনায় সুখ আর দুঃখের দ্বন্দ্ব, আর অসাড়তায় উপেক্ষা—এই হল প্রাকৃত অনুভবের রীতি।

কিন্তু এমনি করে সাড়া দেওয়াই তো আমাদের জীবনের চরম নিয়তি নয়। আমাদেরই সত্তার গভীরে গুহাহিত হয়ে আছেন এক 'মধ্বদ' পুরুষ—যিনি জীবনের সমস্ত অনুভবেই আস্বাদন করেন এক মধুময় চেতনার রস। অন্তরাবৃত্ত হয়ে সত্তার গভীরে তলিয়ে গিয়ে এই মধ্বদ পুরুষকে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, ব্যাবহারিক জীবনে তাঁকে করতে হবে আমাদের সমস্ত ভাবনা (thought), বেদনা (emotion) এবং সঙ্কল্পের (will) পুরোধা। তখন আমাদের এই প্রাকৃত চেতনারও ঘটবে দিব্য রূপান্তর, এই মর্ত্য আধারেই আমরা পাব অমৃতের আস্বাদন। এই আমাদের সত্য এবং শাশ্বত নিয়তি।

সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে যে-ঝঙ্কার উঠছে প্রতিনিয়ত, তা বস্তুত একটা বাইরের ব্যাপার মাত্র। এভাবে সাড়া আমাদের দিতেই হবে, এমন-কোনও বাধ্যবাধকতা বস্তুতই নাই। ইচ্ছামত, ব্যবস্থিত সাড়ার বিপরীত সাড়া দেবার যোগ্যতাও আমাদের আছে। সুখ-দুঃখের সাড়া যে নিতান্ত আপেক্ষিক এবং চিরাচরিত একটা অভ্যাসের ফল—মানসিক ব্যাপারে এটা সহজেই ধরা পড়ে। বহির্মুখ প্রাকৃত মন অভ্যাসের দাস; কিন্তু অন্তর্মুখ মনোময় পুরুষ এ-দাসত্ব হতে মুক্ত। অপমানে ক্ষতিতে পরাজয়ে শোকাচ্ছন্ন হতে তিনি বাধ্য নন। এদের তিনি পুরাপুরি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন কিংবা প্রসন্নচিত্তে এদের বরণ করে নিতে পারেন, মাত্রাস্পর্শের (limited contact) দাস না হয়ে সংবেদনের (response) স্বাতন্ত্র্যে স্বরাট হতে পারেন।

অবশ্য শারীরিক সুখ-দুঃখের বেলায় স্বারাজ্যের এই সহজ মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানেও যে অভ্যস্ত সাড়ার বিপরীত সাড়া দেওয়া অসম্ভব নয়, তার পরিচয় পাই সম্মোহনের বেলায়। তিতিক্ষা এবং

আত্মস্বরূপের অনুধ্যান দ্বারা একধরনের আত্মসম্মোহনের সামর্থ্য আমরা অর্জন করতে পারি, যা সমত্ববোধের ভিতর দিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে ব্রাহ্মী চেতনার বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ ভূমিতে। সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারি ব্রাহ্মী স্থিতির প্রশান্তিতে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি অভিঘাতে জ্বলে উঠতে পারি ব্রহ্মসংবিতের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে, গলে পড়তে পারি ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দময় উচ্ছলনে।

যদি প্রশ্ন হয়, ব্রহ্ম তো 'একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ'স্বরূপ; তবে এই বিশ্ব-পরিণামে তাঁর আনন্দ কেন? বহুর ঝামেলায় তিতিবিরক্ত হয়ে অদ্বয়স্থিতির প্রশান্তির প্রতি একটা আগ্রহ পোষণ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রহ্মের তো কোন-কিছুর প্রতি বিরাগ বা পক্ষপাত থাকার কথা নয়—কেননা বিচিত্র আত্মাস্বাদনের আনন্দে তিনিই যে সব হয়েছেন এবং হয়েও ফুরিয়ে যাননি। আনন্ত্যই যাঁর স্বরূপ, তাঁর মধ্যে তো সমস্তই সম্ভাবিত। সম্ভূতির বিপরিণামেই (manifold modification) হ'ক, আর অসম্ভূতির অপরি-ণামেই হ'ক, তাঁর সদ্ভাবের যে-আনন্দ (delight of existence), সে তো সার্থক হবে নিখিল সম্ভাবনার চরিতার্থতাতেই।

বস্তুত বিশ্বলীলার মর্মমূলে নিহিত রয়েছে যে-পরমসত্য, শুদ্ধসত্তার অখণ্ড সমরস আনন্দই তার স্বরূপ। সে-আনন্দের সামরস্য ফুটছে যেমন প্রকৃতির অবচেতন সুষুপ্তিতে, তেমনি জীবকে কেন্দ্র করে অর্ধচেতন স্বপ্নের ধাঁধায়—আবার শাশ্বত অতিচেতনার স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমাতেও।

সর্বত্র 'আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্ বিভাতি'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেব-মায়া

ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় পেলাম—ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ। তাঁর সত্তা যেমন কূটস্থ নিত্যতায় সব-কিছুর অধিষ্ঠান, তেমনি তারই অন্তর্নিহিত সন্ধিনী (all-linking) শক্তির সংযোগে সব-কিছুর বিধৃতি। তাঁর সত্তা চিৎসত্তা, যার সংবৃত্ত (involved) রূপ হল জড়। আর তাঁর সংবৃত্তি ও বিবৃত্তির (evolution) লীলার মূলে রয়েছে তাঁর স্বরূপানন্দের প্রেষণা। এই আনন্দে তিনি কবি—বিশ্ব তাঁর কাব্যরূপে আত্মরূপায়ণ। তিনি কোনও অবস্থাতেই নিঃশক্তিক নন—তাঁর সত্তা আর শক্তি অবিনাভূত। সে-শক্তি বিশ্বের সম্ভূতিতে অন্তঃসত্ত্ব হয়ে কাজ করে চলেছে বিচিত্র ভূতের মেলায় নিজের সরূপকে (replica) ফুটিয়ে তোলবার জন্য। ব্রহ্মের স্বরূপের পর এইবার তাঁর শক্তির পরিচয়।

ব্রহ্ম জগৎ আর জীব—এই তিনটি হল বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যেমন জগতের, তেমনি জীবেরও স্বরূপ। কিন্তু জগৎ এবং জীব স্বরূপত যা, আর আপাতত যা হয়ে আছে—দুয়ের মধ্যে রয়েছে খানিকটা ফাঁক। এই ফাঁকটা জুড়ে আছে ব্রহ্মের শক্তি। বেদে এই শক্তিকে বলা হয়েছে অদিতি, আর বলা হয়েছে 'অদিতিই পিতা, অদিতিই মাতা, আবার অদিতিই পুত্র'। দর্শনের ভাষায় ব্রহ্ম পিতা, ব্রহ্মশক্তি মাতা, আর উভয়ের বিসৃষ্টি জগৎ আর জীব পুত্র। ব্রহ্ম আত্মমায়ায় ফুটছেন জীব হয়ে। স্বরূপ (Reality) ফুটছে প্রতিভাস (Appearance) হয়ে, এক ফুটছে বহু হয়ে। আবার সে-ফোটাও শুধু আসলের নকল নয় বা প্রতিচ্ছবি নয়, তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, পরম্পরা আছে—আছে সদ্‌বস্তুর সত্য 'পরিণাম' বা ধাপে-ধাপে নামা-ওঠা। ব্রহ্মের আনন্দের ভূমিকায় এবং তাঁর স্বরূপশক্তির প্রেষণায় নিজেকে বৃহৎ করে ফুটিয়ে তোলাতেই জীবের সার্থকতা। এটা ব্রহ্মশক্তির ঊর্ধ্বপরিণাম।

এই ঊর্ধ্বপরিণাম ঘটে পর্বে-পর্বে। তার গোড়ায় পাই চিৎ-শক্তির জড়ে সংবৃত্তি, তারপর সেই নিগূহিত চৈতন্যের দেহে-প্রাণে-মনে উন্মিষিত হওয়া এবং অবশেষে চিৎস্বরূপের উপলব্ধি। শক্তিপরিণাম গোড়ায় নির্ঋত (chaotic)

বা এলোমেলো। কিন্তু তার মধ্যেই প্রাণ একটা ছন্দ আনে। প্রাণ স্বরূপত চিন্ময় হলেও প্রথমটায় আত্মসচেতন নয়—যেমন উদ্‌ভিদে নয়, পশুতেও নয়। সে আত্মসচেতন হয়, যখন মানুষের মধ্যে সে মন হয়ে ফোটে। মনে এবং তার ঊর্ধ্বে শক্তি ঋতময় (orderly)। এই ঋতের প্রেরণা আসে চৈতন্য হতে। প্রাণ যে নির্ঋতির মধ্যে ঋতচ্ছন্দ আনে, তাও এই চৈতন্যের নিগূঢ় আবেশে। অগোছালোকে গুছিয়ে আনাকে বেদে বলা হয়েছে 'দেবতার ব্রত' কিনা শক্তির সম্ভাবিত অনেক পরিণামের মধ্যে একটি পরিণামকে 'বেছে নিয়ে' সুসংবদ্ধরূপে তাকে ফুটিয়ে তোলা। এটি চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, শক্তির লীলায়নে দেবতার ব্রত বা ঋতচ্ছন্দ তার ওঠা-নামার দুটি পরিণামেই অব্যাহতভাবে কাজ করছে। নামবার সময় ঋত সৃষ্টি করছে নৈসর্গিক নিয়ম—যা শক্তির বহিরঙ্গ পরিণাম; আর ওঠবার সময় সৃষ্টি করছে ধর্মবোধ—যা তার অন্তরঙ্গ পরিণাম। দুটি পরিণাম কিন্তু ওতপ্রোত হয়ে আছে। প্রাচীনেরা একে বলতেন জগদ্‌ব্যাপার। আর যে-শক্তিতে এ-ব্যাপার ঘটছে, তাকে বলতেন মায়া। মায়া ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি—যে-শক্তিতে তিনি জগৎ ও জীবরূপে ছড়িয়ে পড়ছেন, আবার আত্মস্বরূপে গুটিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু সংজ্ঞাটি নিয়ে দার্শনিকেরা কিছু গোল পাকিয়েছেন। একই মায়াকে ব্রহ্মের শক্তির দিক থেকে বলতে পারি 'দেব-মায়া', আবার জীবের অসমগ্র দৃষ্টির দিক থেকে 'অদেবী-মায়া'। দেব-মায়া ব্রহ্মের সৃষ্টির শক্তি—পুরাণকার যাকে বলেছেন 'যোগমায়া' বা 'মহামায়া'। আর অদেবী মায়া জীবের দৃষ্টির ভুল—বৌদ্ধ এবং শাঙ্কর বেদান্তে যার প্রপঞ্চন পাই। এই দৃষ্টির ভুলটাকেই অনেকে মনে করেছেন সৃষ্টির শক্তি। আসলে দৃষ্টির ভুল হল মনের মায়া—সমস্ত সৃষ্টির উপর সে একটা অর্থের আরোপ শুধু। কিন্তু তাতে সৃষ্টির মূলে যে-শক্তির কাজ, তার কোনও হদিশ মেলে না, সৃষ্টির রহস্যও বোঝা যায় না। একই মায়া অখণ্ডদর্শনে দেব-মায়া, আর মনের খণ্ডিতদর্শনে অদেবী মায়া। একটি মায়ার পররূপ, আরেকটি তার অবররূপ।

অবরমায়া বা মনের মায়াকে সৃষ্টির মূলে স্থাপন করেছেন দুই শ্রেণীর দার্শনিক—দুঃখবাদী আর মায়াবাদী। দুঃখবাদী দার্শনিকদের প্রধান হলেন সাংখ্যবাদী, আর মায়াবাদ এসেছে বৌদ্ধ শূন্যবাদ হতে। এঁদের কথা আগেও কিছু-কিছু বলেছি। এঁদের মতে জগৎ 'দুঃখালয়', জগতে এলে পরেই জীবকে দুঃখ পেতে হবে। দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি তাইতে তার একমাত্র পুরুষার্থ।

চেতনার এমন-একটা ভূমি আছে, যেখানে দুঃখ নাই। সেখানে জগৎও নাই। সাংখ্যে প্রকৃতিই জগৎ, পুরুষ বা বিশুদ্ধ চৈতন্য জগতের ঊর্ধ্বে—সেখানে পুরুষ অসঙ্গ এবং প্রকৃতি হতে বিবিক্ত। প্রকৃতি পুরুষকে বাঁধে কেবল দুঃখ দেবার জন্য। অবশ্য সে সুখও দেয়, কিন্তু তা দুঃখেরই নামান্তর। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিয়ে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি কেবল প্রকৃতি হতে পুরুষের একান্ত বিবিক্ততাতেই সম্ভব। প্রকৃতি হতে আমরা বিবিক্ত হতে পারি 'নেতি-নেতি' বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। দেহ প্রাণ মন অহঙ্কার·বুদ্ধি—সব যদি ছাপিয়ে উঠি, তাহলে পৌঁছই এক মহাশূন্যে বা অব্যক্তে। পুরুষ তারও ওপারে। এই পুরুষে জগৎ নাই, দুঃখও নাই। ওইখানে পুরুষের স্বরূপস্থিতি। তাহতে বিচ্যুত হলেই তাঁর দুঃখ। অতএব দুঃখই জগৎসৃষ্টির মূলে। আর স্বরূপস্থিতিই যদি আমার একমাত্র পুরুষার্থ হয়, তাহলে পরমার্থত তা-ই একমাত্র সত্য। জগৎ তাহলে মিথ্যা। তবুও জগৎ যখন আছে, আর তার অনুভবও হয়, তখন জগতের কথঞ্চিৎ-সত্যতা একটা মায়ার খেলা।

এই দর্শনে এক অখণ্ড তত্ত্বকে সত্য এবং মিথ্যা পরমার্থ এবং প্রতিভাস দু'ভাগে ভাগ করে একভাগকে গ্রহণ ক'রে আরেক ভাগকে বর্জন করা হয়েছে—নিজের গরজে। এটা হল জগৎকে নীচ থেকে দেখা—উপর থেকে নয়। তাতে এই দুঃখময় জগতের কেন সৃষ্টি হল, তার কোন জবাব পাই না। দুঃখের উচ্ছেদই আমাদের কাম্য। তার প্রয়োজন কি, তার রূপান্তর সম্ভব কিনা—এসব আমরা চিন্তাও করি না।

বলা বাহুল্য, এ-দর্শন অখণ্ড সত্যের দর্শন নয়—বিভজ্যবাদী অতএব এক-দেশদর্শী মনের দর্শন। মন দুঃখের পরকলার ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকে দেখে তার উপর যে-অর্থের আরোপ করছে, তা সৃষ্টির চরম অর্থ নাও হতে পারে। দুঃখের হেতু আবিষ্কার করতে গিয়ে সে বলছে, অবিদ্যাই দুঃখহেতু। অবিদ্যা মানে বিপর্যয়বুদ্ধি বা ভুল বোঝাবুঝি। আমরা সুখকে প্রতিনিয়ত দুঃখ বলে ভুল করছি। তাই আমাদের জগৎজ্ঞান আগাগোড়া একটা ভুলের ফসল। অবিদ্যাই জগন্মূল। এ-মত দুঃখবাদের একটা অনুসিদ্ধান্ত।

কিন্তু অবিদ্যা যে দুঃখের জগৎ সৃষ্টি করছে, সে তো আমাদের মনঃকল্পিত একটা জগৎ। সে-ই কি জগতের সবখানি বা আসল জগৎ? ভুল যখন ভাঙে, তখন নিশ্চয় দুঃখ থাকে না। তাহলে কি থাকে? দুঃখবাদীরা তার দু'রকম জবাব দেন। মনের বিভজ্যবৃত্তির সংস্কার যাঁদের মধ্যে প্রবল, তাঁরা

বলেন, তখন দুঃখ বা সুখ কোনটাই থাকে না, দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় এইমাত্র। এঁদের মধ্যে যাঁরা ন্যায়প্রস্থানের দার্শনিক, তাঁরা বলেন, দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিতে সুখ তো থাকেই না, চৈতন্যও থাকে না। যাঁরা সাংখ্য-প্রস্থানের তাঁরা বলেন, সুখ থাকে না বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্য তখন থাকে। নৈয়ায়িক চৈতন্য বলতে মনের চেতনাই বুঝেছেন, আর সাংখ্যবাদী এবং নৈয়ায়িক উভয়েই সুখ-দুঃখ বলতে মনের সুখ-দুঃখই বুঝেছেন। তাই চৈতন্য বা সুখকে স্বীকার করলে সঙ্গে-সঙ্গে মনের স্বভাবগুণে দুর্বহ দুঃখও এসে ঘাড়ে চাপবে—এই তাঁদের ভয়। আরেক শ্রেণীর দুঃখবাদী কিন্তু মনের উপর বোধিকে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের জগৎও মনোময় জগৎ। পরমার্থসত্যের সন্ধানে বেরিয়ে তাকে তাঁরা উড়িয়ে তো দিয়েছেনই—আত্মাকে এবং ঈশ্বরকে পর্যন্ত নস্যাৎ করে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন চেতনার এক মহানির্বাণের শূন্যতায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির পরেও তাঁরা আবিষ্কার করেছেন 'হসিতোৎপাদক্রিয়াচিত্তে'র এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতা, যার অপরূপ আভা ফুটে উঠেছে এদেশের বুদ্ধমূর্তির মুখে। ফলে দুঃখবাদ মহানির্বাণের ভিতর দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মহাসুখবাদে। তাঁদের কাছে জগৎ দুঃখময়, জগৎ মায়া। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ফুটে ওঠে ওই মহাসুখের অরোরা। কোথাহতে ফোটে? তার কোনও জবাব তাঁরা দেননি।

বিভজ্যবাদী মনের সংস্কার অনুভবের ওই পরম তুঙ্গতায় গিয়েও না মরে যদি, তাহলে অখণ্ডসত্যের নাগাল পাওয়া যায় না, জগৎ আর জীবনের রহস্যও পুরাপুরি জানা যায় না। মন দিয়ে সৃষ্টির ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়ার এই বিপদ। আসলে মন তো সর্বজ্ঞ নয়। সে সৃষ্টিরহস্যের কিছুটা জানে, আর বাকীটা জানতে চায়। তার জানা কখনও হওয়া নয়। তার আয়নায় সিদ্ধবস্তুর একটা ছায়া পড়ে মাত্র। ওই বস্তুটিকে সে কিছুটা জানে, কিন্তু কি করে ওটি হল তা সে মোটেই বলতে পারে না। এইজন্য মনকে বা মনের অবিদ্যাকে মনঃকল্পিত জগতের উদ্ভাবক বলা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই তাকে বিশ্বের স্রষ্টার আসনে বসানো যেতে পারে না। মন স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থ, সে কি করে স্রষ্টা হবে? অবিদ্যা হতে অবিদ্যার সৃষ্টি হতে পারে, বিদ্যার সৃষ্টি হবে কি করে? দুঃখ দুঃখের নিদান হতে পারে, সুখের সে নিদান হবে কি করে? যদি বল, ব্যক্তি-মনের সঙ্কীর্ণ উপাধি হতে মুক্ত এক অনন্ত মন বিশ্বের স্রষ্টা, তাহলে সে-মন আর মন রইল না।

উপাধিনির্মুক্ত মন তো অতিমানসের সত্য—যার আভাস পাওয়া যায় বোধিমানসে।

আসলে যে সৎ-চিৎ-আনন্দের দিকে এই মন উজিয়ে চলেছে, তার স্বরূপ-শক্তিই হল বিশ্বের স্রষ্টা। সত্যরূপে সে 'সত্যানৃতের মিথুনে'র স্রষ্টা, চিৎরূপে বিদ্যা-অবিদ্যার স্রষ্টা, আনন্দরূপে সুখ-দুঃখের স্রষ্টা। জগতের মিথ্যা অবিদ্যা আর আনন্দ তার সপ্রয়োজন বিভূতি। অতএব অবরমায়াকে কুক্ষিগত করে সে পরমায়া বা দেব-মায়া। জগদ্‌ব্যাপারটা ঘটছে তার অখণ্ড সর্বাবগাহী দৃষ্টির তলে—তারই বিচিত্র সিসৃক্ষার উল্লাসরূপে। তার দৃষ্টি-সৃষ্টিতে সবই সত্য, সবই চিন্ময়, সবই আনন্দময়। মিথ্যা তার মধ্যে সত্যেরই ছায়া, অবিদ্যা বিদ্যারই বিভূতি, দুঃখ আনন্দেরই তির্যক বিলাস।

মনের অতীত অথচ মনের প্রসূতি বলে সে অতিমানস।

চতুর্দশ অধ্যায়

অতিমানস—স্রষ্টারূপে

বেদের এই দেব-মায়াকেই আমরা বলছি অতিমানস (Supermind)। আর অতিমানসই ব্রহ্মের স্বরূপশক্তিরূপে জগতের স্রষ্টা। একদিকে ব্রহ্ম, আরেকদিকে জগৎ—দুয়ের মধ্যে সেতুরূপে রয়েছে অতিমানস। অতিমানস মনের ওপারে, অথচ মনের মধ্যেও তার বীজ রয়েছে; মন তার অন্ত্যবিভূতি। তবু মনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। আগেই বলেছি, মনের মধ্যে আছে এক অদেবী মায়া—যার মধ্যে সত্য আর অনৃত মিথুনীভূত হয়ে আছে; আর অতিমানস দেব-মায়া—যা ঋতময়, যার মধ্যে অনৃত বিসৃষ্টির প্রয়োজনে ঋতেরই একটা তির্যক বিভূতি। মন শুধু খণ্ডকেই বোঝে—অখণ্ডের ধারণা তার কাছে ঝাপসা; কিন্তু অতিমানস অখণ্ডের একটা গভীর জলন্ত এবং জীবন্ত চেতনা। মন একটা বস্তুকে বুঝতে চায় তার সম্বন্ধে ভেবে-ভেবে, তাকে নিজের বাইরে রেখে—অন্তরঙ্গ অনুভবে তার সঙ্গে এক হয়ে নয়; কিন্তু অতিমানসে সত্তা আর ভাব একাকার—তার জানা হল 'হয়ে জানা'। মন একটা-কিছু ভাবতে পারে, কিন্তু ভাবকে (Idea) সঙ্গে-সঙ্গে রূপ দেবার মত সঙ্কল্পের (Will) জোর তার নাই। কিন্তু অতিমানসের মধ্যে ভাব আর সঙ্কল্পের এ-বিরোধ নাই। সেখানে দৃষ্টির অর্থ বাইরের প্রাকৃসিদ্ধ একটা বস্তুকে শুধু অবশ হয়ে দেখে যাওয়া নয়—আমরা যেমন জগৎকে দেখি; সে হল অন্তরের নিত্যসিদ্ধ একটা ভাববস্তুর দর্শনকে সঙ্গে-সঙ্গে সৃষ্টিতে মূর্ত করে তোলা। ভাব আর বস্তু, সত্তা আর চেতনা, বিজ্ঞান আর সঙ্কল্প, কবির দৃষ্টি আর স্রষ্টার বীর্য এক হয়ে আছে অতিমানসের মধ্যে। এই অতিমানসই ব্রহ্মের স্বরূপসত্যকে এক অখণ্ডের ভূমিকায় বিধৃত রেখে ছড়িয়ে দিচ্ছে খণ্ডের বিচিত্র লীলায়; আবার খণ্ডের গভীরে চিদ্‌বীজরূপে নিহিত থেকে স্পন্দিত হচ্ছে অখণ্ডের প্রতি ঊর্ধ্বমুখী অভিযানের অতন্দ্র আকূতি নিয়ে।[৮]

ব্রহ্মের সিসৃক্ষার মূলভূত প্রজ্ঞা-বীর্যরূপী অতিমানসের এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন বিষয়টার একটু বিস্তার করা যাক।

অতিমানসকে আমরা মনের ওপারে বলেছি বলে মনে হতে পারে, সে বুঝি অজ্ঞেয় একটা তত্ত্ব। কিন্তু বস্তুত অতিমানস মানস অনুভবের একেবারে বাইরে নয়। আগেই বলেছি, মন যতক্ষণ একান্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর থাকে, ততক্ষণ সে বস্তুকে ছাপিয়ে ভাবকে বিশেষকে (particular) ছাপিয়ে সামান্যকে (universal) দেখতে পায় না। কিন্তু বুদ্ধির ভূমিতে উত্তীর্ণ হলেই মনের এই ন্যূনতা কেটে যায়—মন তখন বস্তুর পিছনে ভাবকেও দেখতে শেখে। দর্শনে-বিজ্ঞানে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—ব্যবহারের ভূমিতেও বস্তুর পিছনে ভাবের একটা অস্পষ্ট আভাস উদ্যত হয়ে থাকে। বুদ্ধির পর বোধির ভূমিতে এই অস্পষ্ট ভাব ইন্দ্রিয়-সংবিৎএর (sensation) মতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এই বোধির মাধ্যমেই অতিমানসের সঙ্গে মনের যোগাযোগ হওয়া সম্ভব। তবে কি না তা যোগজ-সন্নিকর্ষের (contact by yogic power) অপেক্ষা রাখে। মন অতিমানসের বিসৃষ্ট একটা অবর শক্তি। স্বভাবতই তার মধ্যে আপন উৎসে ফিরে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে তা ধরে জিজ্ঞাসার রূপ, আর বোধির ক্ষেত্রে অভীপ্সার (will to achieve)। নচিকেতা-মনের অধ্যাত্ম অভীপ্সা মনীষার ভিতর দিয়ে অতিমানসের স্পর্শ পায়—যা অবশেষে নিবিড় হয় হৃদয়ের বোধিজাত প্রত্যয়ে।

সাধারণত ব্রহ্মকে আমরা জগতের অধিষ্ঠানরূপে দেখি, তার স্রষ্টারূপে নয়। অধিষ্ঠানে পাই ব্রহ্মের প্রজ্ঞাস্থিতির পরিচয়—তিনি যেন জগতের তটস্থ দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু তিনিই যদি জগৎ হয়ে থাকেন, তাহলে জগতের মূলে আছে তাঁর প্রজ্ঞাস্থিতিই নয় শুধু—প্রজ্ঞাবীর্যও। অতিমানসে প্রজ্ঞার স্থিতি এবং গতি ওতপ্রোত, তাদের একটিকে আরেকটি হতে পৃথক করা যায় না—যদিও বিভজ্যবৃত্ত (analytically operative) বলে মন সহজেই তা করে বসে।

অতিমানসের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় বেদের দেববাদে। বেদে 'পরমব্যোম' বা চিদাকাশের লোকাতীত বৃহৎ প্রসারের কথা আছে, সেখানে সত্যের জ্যোতির সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে জড়িয়ে আছে ঋতের বিভূতি। এই পরমব্যোমই অতিমানসের স্বধাম। দেবতারা স্বরূপত অতিমানসের বীর্যরূপে এই 'পরমব্যোমে নিষণ্ণ'। প্রজ্ঞায় তাঁরা 'ঋতচিন্ময়', কর্মে 'কবিক্রতু'। কৃতি এবং বিসৃষ্টিতে উৎসারিত তাঁদের চিৎ-শক্তি বিধৃত আছে পূর্ণপ্রজ্ঞার অপরোক্ষ প্রশাসনে। এছাড়া ঋতচিন্ময় প্রত্যয়ের দুটি মুখ্যবৃত্তির বর্ণনা আছে বেদে—

একটি 'চক্ষুঃ' বা দিব্যদর্শন, আরেকটি 'শ্রবঃ' বা দিব্যশ্রুতি, যাদের পরে আমরা দেখব বোধিমানসের বৃত্তিরূপে। আবার শুদ্ধবুদ্ধির দুটি সংবিৎএর কথাও তাঁরা বলেছেন—একটি সম্ভূতি-সংবিৎ, আরেকটি বিভূতি-সংবিৎ। একটি সর্বগ্রাহী প্রত্যক্‌-বৃত্ত (subjective) চেতনা, আরেকটিতে বিসৃষ্টির অভিমুখে পরাক্‌ (objective)-দৃষ্টির সূচনা। এসবই অপরোক্ষভাবে অতিমানসের আশ্রিত চিদ্‌বৃত্তি।

ঋষিদের বিবৃতি হতে বোঝা যাচ্ছে, অতিমানস চেতনা অখণ্ড সত্তার পর (higher) এবং অবর (lower) দুটি ভূমির মাঝে উত্তরণ ও অবতরণের সেতুস্বরূপ একটা মধ্যভূমি। অতিমানসকে ধরে পরতত্ত্ব হতে অবরবিভূতির সৃষ্টি হয়েছে; অতএব তাকে ধরেই আবার সম্ভব হবে পরের মধ্যে অবরের উত্তরায়ণ। ঊর্ধ্বে রয়েছে এক শাশ্বত অব্যয় অদ্বয়তত্ত্ব; নিম্নে আছে শাশ্বত বিপরিণামের (modifications) মেলায় বহুর বিসৃষ্টি। দুয়ের মধ্যে এক সর্বধারক এবং সর্বকারক চিৎশক্তির যে ঋতচিন্ময় বিলাস—যা একেকে পেয়ে বহুকে বর্জন করে না, কিংবা বহুতে নেমে এসেও একেকে হারায় না, তা-ই হল অতিমানস।

অদ্বয়তত্ত্বকে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ। আসলে সচ্চিদানন্দ একটি অখণ্ড একরস প্রত্যয়। কিন্তু ভাষার কারসাজিতে মনের কাছে তা ভেঙে গিয়ে হয় সৎ, চিৎ আর আনন্দ। তারপর মন আবার তাদের জোড়া দিয়ে বলে সৎ-চিৎ-আনন্দ—ওই একেরই ত্রিপুটী। বলে বটে, কিন্তু তিনটিতে যে বেমালুম জোড় মেলে না, তার পরিচয় মনের রচা বেদান্তদর্শনেই আছে। এমনি করে অদ্বয়তত্ত্বকে ভেঙে-ভেঙে বোঝা হল মনের ধরন। কিন্তু অতিমানসে সচ্চিদানন্দের যে পরম অনুভব, তাতে ভেদের সমস্ত সম্ভাবনা বিগলিত হয়ে সত্তাই হয় চৈতন্য, চৈতন্যই হয় আনন্দ। সেখানে সৎ-চিৎ-আনন্দ একে তিন এবং তিনে এক একটি একরস প্রত্যয়—যেন একটা ফুলের পাপড়িগুলি আলোর পাপড়ি হয়ে গেছে। আবার বর্ণালীর সব রং মিশে হয় সাদা—যা কোনও রং নয়, অথচ সব রংএর প্রসূতি। অতিমানসের অভেদপ্রত্যয়ও তেমনি। এ-অনুভবের স্বরূপ কি, তা জানা যায় বোধি দিয়ে—মন-বুদ্ধি দিয়ে নয়, কেননা তাদের অভেদজ্ঞান হতে ভেদের সংস্কার কিছুতেই নিঃশেষে মুছে যায় না।

বিষয়ের খণ্ড-পরিণামকে সত্য বলে ধরে নিতে মনকে কোনও বেগ পেতে হয় না—কেননা সব-কিছুকে ভেঙে-ভেঙে দেখা, আবার ভাঙা টুকরাগুলি

জুড়ে-জুড়ে একটা কল্পিত অখণ্ডে পৌছনো তার স্বভাব। তাইতে চরম একত্ব বা পরম আনন্ত্য তার কাছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা বিকল্পবৃত্তি (unreal construction) মাত্র। অথচ এমন-একটা সত্যকার অনুভব যে আছে, তাও সে অস্বীকার করতে পারে না—কেননা খণ্ড-খণ্ডকে জুড়ে একধরনের একত্বে যে পৌছনো যায় তা তার জানা আছে। আর, যেমন করেই হ'ক, বহুর মধ্যে এককে আবিষ্কার করবার একটা তাগিদ বুদ্ধির মধ্যে আছেই—মন তাতে সায় দিতে বাধ্য। চেতনার অবরপর্বে মন—তত্ত্বদর্শনের সাধন না হলেও বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণের (synthesis) সাধন তো বটেই। তাইতে একত্বে পৌছনোর একটা ঝোঁক তার মধ্যেও আছে।

অধ্যাত্মসাধনায় মনের বিশ্লেষণী বৃত্তি চরমে পৌছেছে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদে। তার ফলেও একধরনের অখণ্ড আনন্ত্যের ধারণা হয়—যার রূপ হল চিত্তের পরিনির্বাণে এক অনুপাখ্য (indescribable) শূন্যতা। অনেকে একেই বিশ্বের পরমতত্ত্ব বলে মনে করেন, এ আমরা দেখেছি। কিন্তু উপনিষদের তুরীয়বাদ (theory of Transcendence) এই প্রপঞ্চোপশম শূন্যতার মধ্যেই এক পরম বিজ্ঞানকে আবিষ্কার করে—যা সর্বেশ্বর এবং সর্বযোনি, আমাদের সকল ভাব ও জ্ঞানের পরম অয়ন। এ যেন অবর্ণ আকাশে সূর্যোদয়ের মত। আকাশ তখনও আকাশই থাকে, অথচ স্বচ্ছন্দ আত্মবিচ্ছুরণে হয় এক বৈবস্বত জ্যোতির নির্বাহক। আলো আছে এবং আলো নাই—দুয়ে সেখানে অপরূপ মিতালি। এই বিজ্ঞান অতিমানসের বিজ্ঞান। উপনিষদের ভাষায়, মনের কাছেই দিন আর রাতের দ্বন্দ্ব। যতক্ষণ দ্বন্দ্ব আছে, ততক্ষণ তমঃও আছে। এই তমঃ যখন থাকে না, তখন দিনও নাই রাতও নাই—আছেন 'কেবল শিব'। কথাটা মনের কাছে হেঁয়ালি। কিন্তু বোধির কাছে এই হল সত্যের পরম অনুভব—অতিমানসে যা এক অবিকল্প সহজ প্রত্যয়।

বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর ব্রহ্মসত্তার অনিবাধ আত্মপ্রসারণই অতিমানস। তার ত্রয়ীর প্রতিষ্ঠা তিন হতে একের সমাহারে নয়—যেমন দেখি মনের বেলায়। এক হতেই তিনকে সে ফুটিয়ে তোলে, কেননা বীজ হতে অর্থকে পর্বে-পর্বে ফুটিয়ে তোলাই তার স্বভাব।

এই হল অতিমানসের সৃষ্টিলীলার দিক। কিন্তু তার মধ্যে যেমন আছে প্রচয় পরিণাম ও স্ফুরণের সামর্থ্য, তেমনি আছে সঙ্কোচ সংবরণ এবং প্রচ্ছাদনের সামর্থ্য। বীজ হতে সে যেমন বনস্পতিতে বিস্ফারিত হয়, তেমনি আবার

বনস্পতির মধ্যে বীজে গুটিয়ে আসে। এটি হল তার প্রলয়মুখী গতি। জগদ্ব্যাপার অতিমানসের সৃষ্টি-প্রলয়ের যুগ্মলীলা। আমরা তাকে দেখি ঘুম আর জাগরণের মত পর্যায়ক্রমে, কিন্তু সর্বসাক্ষী অতিমানস চেতনায় তা যুগপৎ।

অতিমানস এক অখণ্ড অনন্ত সমরস চেতনা। তার মধ্যে সমস্ত সত্তাই চিৎস্বরূপ, আবার সমস্ত চেতনা সত্তারই চেতনা—যেন সত্তার গর্ভে ভ্রূণরূপে আত্মস্পন্দের শিহরন। সত্তা সংবিৎ এবং সঙ্কল্প মনোজগতে যেমন পৃথক-পৃথক, অতিমানসে কিন্তু তেমন নয়। সেখানে তারা ত্রয়ীস্বরূপ—একই মহাস্পন্দের ত্রিস্রোতা পরিণাম। অতিমানস বিজ্ঞানে জ্ঞান আর সঙ্কল্প একেবারে অবিনাভূত। সেখানে দৃষ্টিই সৃষ্টি। বিশ্বের মূলে এই মহাভাবের অনুভূতি হতেই প্রচলিত সকল ধর্মে সর্বাধিষ্ঠান সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা। অতিমানস ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি—তাঁর সন্ধিনী সংবিৎ এবং হলাদিনী শক্তির একায়ন (matrix) এবং বিশ্ববিসৃষ্টির প্রবর্তক প্রজ্ঞা-বীর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঋত-চিৎ

অতিমানস পরমপুরুষের স্বভাব। তাঁর নির্বিশেষ 'স্বয়ম্ভূ' (self-existent) স্বভাব নয়, তাঁর বিশ্বভাবন বিশ্বেশ্বর 'পরিভূ' (all-becoming and all-embracing) স্বভাব। তাঁর এই স্বরূপকেই আমরা বলি ঈশ্বর। ঈশ্বরের যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিশ্বের মূলাধার এবং প্রশাস্তা, তাকে বলি 'ঋত-চিৎ' (Truth-Consciousness)। শব্দটি বেদে আছে। তার অর্থ, 'বৃহৎ' বা আত্মসংবিতের অনিবাধ (unhampered) বৈপুল্যের মধ্যে স্বরূপসত্তার 'সত্য' এবং ক্রিয়া-সত্তার 'ঋতে'র অকুণ্ঠ অনুভব। 'ঋতে'র আক্ষরিক অর্থ হল একটা ধ্রুবচ্ছন্দে সত্যের চলন। সৃষ্টির প্রবর্তক অতিমানসের মধ্যে এই চলনের অবাধিত চেতনা আছে বলে আমরা তাকেও বলতে পারি 'ঋত-চিৎ'। এখন এই দৃষ্টিকোণ হতে আমরা অতিমানসের বিচার করব।

নিখিল বিশ্বে ঋত-চিৎ সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে, যা দিয়ে অখণ্ড-সৎ আপন বহুত্বের ব্যঞ্জনাকে বিচিত্র ছন্দে ফুটিয়ে চলেছেন। তার মধ্যে নিহিত আছে প্রত্যেকটি অভিব্যঞ্জনার মর্মচর সত্য ও ঋতের অপরোক্ষ অনুভব। তার প্রচোদনায় বিশ্বের যে পুষ্টি এবং প্রগতি, পরাক্ দৃষ্টিতে দেখি, তার মূলে আছে কালের কলনা (functioning), দেশের ব্যবস্থা এবং নিমিত্তের (causality) পরম্পরা। আমাদের মন দেশ আর কালকে দেখে পরিমাণের (measurableness) ভিতর দিয়ে। তার কাছে কালের পরিমিতি হয় ঘটনার প্রবাহে, আর দেশের পরিমিতি জড়বস্তুর সংস্থানে। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে দেশ আর কাল মনের কল্পনা নয়—বিশ্বব্যাপী চিৎ-শক্তিরই দুটি বিভাব: বিসৃষ্টিতে চিৎস্বরূপের আত্মপ্রসারণে যে-বহিঃস্পন্দ তা-ই দেশ, আর অন্তঃ-স্পন্দই কাল। অতিমানসে দেশ বা আকাশ চিদাকাশ, আর কাল মহাকাল। কাল-কলনা আর দেশ-ব্যবস্থা—বিসৃষ্টির পক্ষে দুইই প্রয়োজন। কালের পরম্পরা না থাকলে বিশ্বের প্রগতি সম্ভব হত না, আর দেশের প্রসার না থাকলে রূপে-রূপে বিচিত্র সম্বন্ধ আর শক্তিতে-শক্তিতে অন্যোন্যসংঘাতের লীলা দেখা দিত না।

দেশে ব্যবস্থিত বস্তুসমূহের সুনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে কালের পৌর্বা-পর্য যুক্ত হয়ে দেখা দেয় 'নিমিত্ত', যা বিশ্বপরিণামের ধারাকে বহন করে চলে। আমাদের মনে এই পরিণাম নানা সংঘাতে এবং সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ। কিন্তু বস্তুত তার মধ্যে আছে বিশ্ববিভাবন ঋত-চিৎএর সাবলীল স্ফুরত্তা (spontaneous dynamis), তার স্বত-উৎসারণের সহজতা। বাইরের সংঘাত এবং সংঘর্ষ তার একটা গৌণবিভাব মাত্র। সব-কিছুর অন্তরে রয়েছে অখণ্ড স্ব-ভাবের ঋতায়ন। তা সৌষম্যের সুরে বাঁধা। সেই ঋতেরই প্রশাসনে বাইরের আংশিক বিপরিণামে দেখা দেয় সংঘর্ষের প্রতিভাস। মন তাকেই দেখে, তাকেই সত্য বলে জানে। কিন্তু ঋত-চিৎএর দৃষ্টি সবার মধ্যে সৌষম্যের বৃহৎ ও গভীর সত্যকেই দেখতে পায়।

কথাটা বুঝতে হলে মনের দেখা আর ঋত-চিৎএর দেখার মাঝে আবার একটা তুলনামূলক আলোচনা দরকার।

সৎ চিৎ আর আনন্দ একাধারে ব্রহ্মের স্বরূপের সত্য; আর ঋত-চিৎকে বলতে পারি, তাঁর স্বরূপে নিগূঢ় থেকেই স্বরূপ হতে ঠিকরে-পড়া শক্তির সত্য। দুটি সত্য ওতপ্রোত; তাদের মাঝে ভেদ কল্পনা করি মনের মায়ায়। দৃষ্টি আর সৃষ্টি একাকার হয়ে আছে ঋত-চিতের মধ্যে। কিন্তু মনের কাছে দুটি আলাদা-আলাদা। ব্যাপারটার খানিক আভাস পাই, যদি মনের স্বভাবের সঙ্গে ঋত-চিতের ধরনকে মিলিয়ে দেখি।

ঋত-চিৎ অন্তরে যা দেখে, বাইরে তা-ই ফুটিয়ে তোলে। মন দেখে, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না। কল্পনায় তার যে-সৃষ্টি, তা দেখা-জিনিসেরই নানাধরনের বিন্যাস মাত্র। একটা-কিছুকে নিজের থেকে আলাদা করে বাইরে না রেখে মন তাকে দেখতে পারে না। তাইতে তার মধ্যে জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের একটা কৃত্রিম ভেদ আপনাহতেই দেখা দেয়। ভেদ থাকে বলেই মনের জানা বাইরে-বাইরে জানা, হয়ে জানা নয়। এমন জানার চারদিকে একটা সীমার বেড়া থাকবেই। মন দিয়ে যাকে আমরা জানি, নিজেদের গরজে তাকে সীমিত করেই জানি। অসীম দেশ জুড়ে বিশ্বের প্রসার, অনন্ত কাল ধরে তার প্রবাহ। এই অসীম অনন্তের কোনও প্রত্যক্ষ অনুভবই মনের নাই, অথচ তাকে জানবার একটা অস্ফুট ব্যাকুলতা তার মধ্যে আছে।

আনন্ত্যের অনুভব খানিকটা নিবিড় হয়, মন যখন কোনও-কিছুকে বাইরে না রেখে ভিতরে টেনে এনে বুঝতে চায়—চলতি-ভাষায় বিষয়কে 'হৃদয়ঙ্গম'

করতে চায়। হৃদয় দিয়ে জানবার বেলায় আমরা বিষয়বস্তুর গভীরে ডুবতে পারি। সেই গভীরে যেন তার বীজসত্তার সাক্ষাৎ পাই; আবার সে-বীজ প্রাণের স্পন্দনে কি করে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হচ্ছে, তারও কতকটা আভাস পাই। এমনিতর জানার ভিতর দিয়ে বিষয়ের সঙ্গে আমাদের খানিকটা একাত্মতা ঘটে। একেই বলে 'হয়ে জানা'; জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের মাঝে যে কৃত্রিম ভেদ, তা এ-জানায় কিছুটা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এও হল বাছাই-করা একটা জিনিসকে তলিয়ে জানা—সমগ্র বিশ্বকে অসীম দেশের প্রসার এবং অনন্ত কালের প্রবাহে যুগপৎ একটা ঘনীভূত উল্লাসে জানা নয়। ব্রহ্মের ঋত-চিৎ দিয়ে এ-জানা নয়; এ হল জীবের মন দিয়ে জানা—যদিও গভীরে ডোবার দরুন অতিমানস-জ্ঞানের রীতি-নীতির খানিকটা আভাস পাওয়া যায় এর মধ্যে।

অতিমানস-জ্ঞানের এই লক্ষণ। ঋত-চিতের জানা অসীম অনন্তকে অখণ্ড-ভাবে জানা; আবার তাকে বাইরে রেখে জানা নয়, আত্মসাৎ করে হয়ে জানা। এই হওয়ার একটা ছন্দ আছে; আত্মপ্রাণের স্পন্দনে সেই ছন্দের অনুভবও এই জানার একটা বৈশিষ্ট্য। আগেরটুকুকে যদি বলি দৃষ্টি, তাহলে এই শেষেরটুকুকে বলি সৃষ্টি। দৃষ্টি আর সৃষ্টি এখানে একাকার। উপমা দেওয়া চলে: বীজসত্তার মধ্যেই একটা গাছের সমস্ত জীবনকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করে তারই উল্লাসে কালের পর্বে-পর্বে তরঙ্গায়িত করে তাকে দেখা যায় যদি, তাহলে যা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ-উপমাও খোঁড়া।

মন ধাঁধায় পড়ে এক আর বহুকে নিয়ে। বহুত্বের জ্ঞান তার স্বতঃসিদ্ধ, একত্বের জ্ঞান আবছা। তাছাড়া মনের এলাকায় এক আর বহুর মাঝে একটা বিরোধ জেগেই থাকে। বহুকে দেখার ঝোঁকে এককে সে ভুলে যায়; আবার এককে জানতে গিয়ে বহুর বর্ণবৈচিত্র্য তার কাছে মিলিয়ে যায়—সাদার মধ্যে আর-সব রঙের হারিয়ে যাওয়ার মত। অথচ যুক্তিবুদ্ধি বলে, এমন-একটা অখণ্ড-জ্ঞান অসম্ভব নয়, যার মধ্যে এক আর বহু দুইই সমান তীক্ষ্ণ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অজ্ঞানীর মন এককে দেখছে না, দেখছে বহুকে; জ্ঞানীর মন বহুকে দেখছে না, দেখছে এককে। কিন্তু অতিমানসের বিজ্ঞানদৃষ্টি যুগপৎ দেখছে এক হতে বহুর বেরিয়ে আসা, আবার একের মধ্যে বহুর গুটিয়ে যাওয়া—কোনও পক্ষেরই কোনও বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে, এক আর বহুতে মনগড়া ভেদের আভাসকে এতটুকু আমল না দিয়ে। এ কী করে সম্ভব, মনের

কাছে তা একটা হেঁয়ালি। মনের পরের ধাপ বিজ্ঞান, যার একটুখানি আভাস ফোটে বলেই মন বহুর মধ্যে একের ইশারা পায়। মন থেকে নিজেকে তফাত করে এই বিজ্ঞানের মধ্যে ডুবে তারই রসে মনকে জারিত করলে পর এ-রহস্যের খানিকটা মনেরও বোধের এলাকায় আসতে পারে।

আসলে মন অতিমানসেরই একটি বিভূতি। মনের মধ্যে এমন-কিছু নাই, যার একটা নিটোল ও স্বচ্ছন্দ রূপ অতিমানসের মধ্যেও নাই। বিশেষ-দর্শনের বেলায় যেমন মনের গুটিয়ে আসা আর সামান্য-দর্শনে তার ছড়িয়ে পড়া, তেমনি যেন ঋত-চিৎএর 'প্রজ্ঞান' (apprehension) আর সংজ্ঞান (comprehension)। সংজ্ঞান একটি পরিপূর্ণ অভেদজ্ঞান। সেখানে এক আর বহুর কোনরকম ভেদভাবনা বাস্তব তো নয়ই, সম্ভাবিতও নয়—যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাবনাহীন দেহবোধের একটা নিটোলতা, যা আমরা সহজেই অনুভবে আনতে পারি। অথচ বহু হতে গিয়ে একের মধ্যে শক্তির যে-সংবেগ উছলে ওঠে, তার চেতনাও সেখানে বিলুপ্ত নয়। আবার এ যেন প্রত্যেক বিন্দুতে সিন্ধুর সমগ্র স্বভাব ও শক্তিকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়া—শুধু সম্ভাবনার আকারে নয়, একটা নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় রূপায়ণের আনন্দে। ব্রহ্ম তখন গীতার ভাষায় সর্বত্রই 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'। সর্বত্র তখন ব্রহ্মের একটা সমব্যাপ্ত সমাধান (uniform concentration)—'সর্বভূত ব্রহ্মে', 'ব্রহ্ম সর্বভূতে' এবং 'সর্বভূতই ব্রহ্ম' এই হল যেক্ষেত্রে অতিমানসের ত্রিবিদ্যা গায়ত্রী।

এরই মধ্যে একটুখানি ভেদের আভাস যদি দেখা দেয়, অখণ্ডসংবিৎ নিজেকে বিচিত্ররূপে জানবার জন্যই যদি নিজের মধ্যে একটুখানি গুটিয়ে আসে, অথচ এই ভেদাভাস অভেদভাবকে এতটুকু আচ্ছন্ন না করে—তাহলেই আমরা পাই প্রজ্ঞানের খেলা। এই গুটিয়ে আসা বলতে বুঝব একটা বিষমব্যাপ্ত সমাধান (multiform concentration), যার মধ্যে আত্মবিভাজনের প্রথম উন্মেষ—যেন দেহবোধের অখণ্ডতার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিভাস জাগা। বিষয় আর বিষয়ীকে জ্ঞেয় আর জ্ঞাতাকে আশ্রয় করে মনের মধ্যে যে-ভেদভাব দেখা দেয়, এইখানে তার উৎস। মনশ্চেতনায় এ-ভেদভাব একেবারে পাকা। কিন্তু ঋত-চিতের মধ্যে এ শুধু দেব-মায়ার পূর্ণপ্রজ্ঞ একটা লীলায়ন, যাকে বলা চলে সৃষ্টির বীজ।

ষোড়শ অধ্যায়

অতিমানসের ত্রিপুটী

তাহলে দেখলাম, মন নয়—এমন-কি অধিমানসও (Overmind) নয়—ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি অতিমানসই বিশ্বকে সৃষ্টি করছে ঋত-চিৎএর সংবেগে। এই সংবেগ যেন ভৃগু-প্রপাতের (cascade) মত ধাপে-ধাপে নেমে আসছে। এইবার সেই ধাপগুলির কথা। তার আগে সমস্ত ছবিটাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য গোড়ার কথাগুলি আবার সংক্ষেপে আউড়িয়ে নেওয়া যাক।

আমাদের প্রথম সূত্র ছিল : যা-কিছু আছে, তা এক অখণ্ড সন্মাত্র—যার স্বরূপ হল অখণ্ড চৈতন্য; আর চৈতন্যের স্বধর্ম হল শক্তি। সে-সন্মাত্র আনন্দরূপ, সে-চৈতন্য আনন্দরূপ, সে-শক্তিও আনন্দরূপ। সত্তা চৈতন্য শক্তি ও আনন্দ চারটির অখণ্ড একরস অনুভবই ব্রহ্মের অনুভব। এই ব্রহ্ম যখন আত্মসমাহিত, তখন তাঁর স্বরূপানন্দ; আবার সিসৃক্ষায় স্পন্দিত শক্তিতে তাঁর লীলানন্দ। বিশ্ব তাঁর আত্মসম্ভূতির (self-becoming) লীলা; তাঁর স্বরূপানন্দ আর লীলানন্দই বিশ্বের হেতু প্রেতি এবং লক্ষ্য।

সৃষ্টির লীলানন্দে ব্রহ্ম নেমে আসছেন মনে এবং তারও নীচে প্রাণে এবং জড়ে। জীবের মধ্যে প্রাণ এবং জড়ের আশ্রিত সখণ্ড মনের লীলা, আর তার উজানে সত্তার সুমেরুতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। আপাতদৃষ্টিতে দুয়ের মাঝে এক অনতিবর্তনীয় বিরোধ। অথচ দুয়ের মাঝে একটা নাড়ীর যোগ আছে বলে বিরোধকে ছাপিয়ে মিলনেরও একটা সেতু নিশ্চয় আছে। এই সেতুকে আমরা বলেছি অতিমানস বা ঋত-চিৎ। অতিমানস ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। এই শক্তি দেশ কাল আর নিমিত্তকে আশ্রয় করে বিশ্বের সৃষ্টি করছে। দেশ আর কাল তার আত্মব্যাপ্তি (self-expansion), আর নিমিত্ত হল তাদের মধ্যে তার 'দৈব্য ব্রত' বা চিন্ময় ঋতের ছন্দে কার্য-কারণের তরঙ্গায়ণ। মন এই চিন্ময় ঋতের স্বরূপ জানে না, তাই স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থ হয়ে এবং সৃষ্টির মধ্যে থেকে সৃষ্টির রহস্য বুঝতে পারে না। কিন্তু বোঝবার একটা দুর্নিবার আগ্রহ তার আছে, যার প্রেতিতে সে নিজের উজানে যেতে-যেতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

এইখানে সংস্কারভেদে তার সর্বনাশ, আবার সর্বলাভও। যদি নেতি-মন্ত্রের উপাসক হয়, তাহলে এইখানে এসে সে শূন্যে মিলিয়ে যায়; আর গোড়া থেকেই 'ইতি'র (affirmation) সংস্কার প্রবল হলে সে পায় অতিমানসকে। অতিমানস মনের ওপারে, অথচ মনের উৎস। তাই তার মধ্যে নির্বিশেষ আর সবিশেষ দুটি প্রত্যয়ই একসঙ্গে জেগে থাকে। অতএব সদ্‌ব্রহ্ম যখন বৈশিষ্ট্যাবগাহী (determinative) আত্মসংবিতে পরিস্পন্দিত, তখনই তিনি অতিমানস। এই অতিমানসের শক্তিতে দেশ-কালের অতীত থেকেই তিনি দেশ ও কালের ভূমিকায় বিশিষ্ট কতগুলি বিভাবের অনুভবকে মূর্ত করে তোলেন। অমূর্তের এই মূর্ত হওয়াই সৃষ্টি এবং অতিমানস তার সাধন। এই সৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বগত সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর এবং সর্বানন্দ। তাঁর মধ্যে যে বিজ্ঞান- এবং আনন্দ-শক্তির লীলায়ন, তা-ই সৃষ্টি এবং তা তিনিই স্বয়ং। এই হল ব্রহ্ম এবং তাঁর অতিমানস শক্তির পরিচয়। এখন দেখা যাক, সৃষ্টিতে অতিমানসের দৈব্য ব্রত কি ধারায় ফুটে ওঠে।

অতিমানস 'সৃষ্টি' করে—নিজের থেকে আলাদা-কিছুকে নয়, নিজেকেই সে সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করার মৌলিক অর্থ নিজেকে বইয়ে দেওয়া—আলাদা উপকরণ নিয়ে কোনও-কিছু নির্মাণ করা নয়। সুতরাং অতিমানসের সৃষ্টির মূলে আছে অদ্বৈতভাবনার একটা প্রবেগ—কবির কাব্যসৃষ্টির মত। কবি আর তার কাব্য আলাদা নয়; কবির আত্মভাবনারই (self-experience) প্রকাশ তার কাব্যে। বলতে পারি, কবি আর কাব্য এক। কবি যখন মূক, তখনও সে কাব্যময়; এ-অবস্থায় কবি আর কাব্যের পৃথক নিশানা পাওয়া যায় না। তারপর কবির মধ্যে জাগল আপনাকে প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা, কবির চিত্তসমুদ্র যেন দুলে উঠল একটুখানি। এ-দোলা ভাবের দোলা—কাব্য তখন চিন্ময়। তারপর মননের রেখায়-রেখায় চিত্ত ঠিকরে পড়তে লাগল—কাব্য হল মনোময়। সবার শেষে, মন থেকে কথার ফুলঝুরিতে বাইরে ছিটকে কাব্য হল বাঙ্‌ময়। ভাবায় আর ভাবে, কাব্যে আর কবিতে আমরা তখন কৃত্রিম একটা ভেদের সৃষ্টি করলাম—বললাম, ওই কবির এই কাব্য। কাব্যে কবির সবটুকু ফোটে না; অপ্রকাশের বেদনা আর তাকে জড়িয়ে প্রকাশের আকূতি—সব কবিরই নিয়তি। কিন্তু কাব্যে যতটুকু ফুটেছে, সবটুকু কবি নিজেই। আত্মচেতনা হতে কাব্যকে সে কখনও আলাদা করতে পারেনি। কবি, তার কবিত্বশক্তি, আর তার কাব্য—তিনই এক।

তেমনি, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টিশক্তি, আর তাঁর সৃষ্ট জগৎ—তিনই এক। ব্রহ্ম, অতিমানস আর জগৎ—তিনে এক অখণ্ড ধারা। এই অখণ্ডকে মন বোঝে তিন খণ্ডে ভাগ করে। বুঝুক, তাতে ক্ষতি নাই—শুধু অখণ্ডের অনুভবটি সেই বোঝাকেও যদি ছাপিয়ে থাকে, জ্ঞানকে ছাপিয়ে থাকে বিজ্ঞান, বহুর দর্শনকে ছাপিয়ে থাকে অদ্বৈতের ভাবনা।

এই অদ্বৈতভাবনা নিয়েই জগৎকে বুঝতে হবে—তার অন্তরঙ্গ হয়ে, তাকে অন্তরঙ্গ করে; এই হল অতিমানসের দৃষ্টিভঙ্গি। অভেদভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেই যদি ছল্‌কে তোলা যায় ভেদের 'আ-ভাস' (emanation) বা বিচ্ছুরণ, সংজ্ঞানের বুক থেকে যদি ঠিকরে পড়ে প্রজ্ঞানের আলো, তাহলে একে আর বহুতে এতটুকু বিরোধের সৃষ্টি না করেও জগৎকে জানবার বোঝবার আস্বাদন করবার একটা পথ পাওয়া যায়।

সব নিঝুম, ব্রহ্ম আপনাতে আপনি সমাহিত, কাব্য ঘুমিয়ে আছে কবিরই বুকে—সম্যক্-দর্শনের (integral vision) এই একটা দিক। এই নিস্তব্ধ ব্রহ্মচৈতন্যেই অতিমানসের ছটা; সে যেন বহুসম্ভবী বিশ্বের চিন্ময় ভাবনাকে কৌস্তুভদ্যুতির মত ঘনীভূত করে রেখেছে নিজেরই মধ্যে—এই হল দর্শনের আর একটা দিক।

সেই বিজ্ঞানঘন ভাবনার মধ্যেই যেন আলোর ফুট্ ফুটছে, একের উল্লাস ভেঙে পড়ছে বহুর বৈচিত্র্যে, বহুর আকৃতি গলে পড়ছে একের বুকে—সম্যক্-দর্শনের এই আরেকটা দিক। উল্লাস আরও বাড়ল; একের ভাবনাকে অটুট রেখেই বহুতে-বহুতে দেখা দিল কত-যে সম্বন্ধের বৈচিত্র্য, এক যেন একান্ত-ভাবেই আপনাকে বহুরূপে ছড়িয়ে দেবার আনন্দে বহুকে দিলেন স্বারাজ্যের অধিকার—এই হল দর্শনের আর একটা দিক।

কথা হচ্ছে এক আর বহুকে নিয়ে; কিন্তু মনে রাখতে হবে, বহু এখানে কিছুতেই একেকে আড়াল করছে না। এ আলোর রাজ্য—ছায়ার রেখায় ভেদের কুণ্ডলীরচনা এখানে অসম্ভব। অথচ ভেদ আছে; নইলে সৃষ্টি হত না, শক্তি শিবের বুকে ঘুমিয়ে থাকত। কিন্তু সে-ভেদ অভেদেরই উল্লাস।

সম্যক্-দর্শনের মোটের উপর চারটি দিক বা বিভাবের কথা বলা হল। তার প্রথমটি ব্রহ্মের স্বরূপসত্তা; আর তিনটি অতিমানসের ত্রিপুটী। চারটি আলাদা-আলাদা তত্ত্ব নয়—এক অদ্বৈতেরই চারটি ভঙ্গি। অদ্বৈতভাবনা সবার আশ্রয়। শেষের তিনটিতে শক্তির উল্লাস, একের বহু হওয়ার

ক্রমিক ধারা। কবির নিজেকে কাব্যে ফুটিয়ে তোলবার যে-রীতি, এও যেন তা-ই।

তিনটি বিভাবে পাই জগৎ-দর্শনের তিনটি ছক। এদেশের অদ্বৈত-, বিশিষ্টাদ্বৈত- আর দ্বৈত-বাদের মধ্যে তার ছাপ আছে। অদ্বৈতবাদে অদ্বৈত-চেতনাই একমাত্র সত্য। একের বহুধা-বিলাসকে মেনেও সে তাকে বলে মনের মায়া। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আবার একের লীলাকেই দেখে বৃহৎ করে, বলে: জগৎ আর জীবরূপে অদ্বৈতের বিশিষ্ট হওয়াটাই সত্য, নিরুপাধিক চৈতন্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতানুভব মিথ্যা। আবার দ্বৈতবাদে ভেদের লীলাই বড় হয়ে দেখা দেয়। তার কাছে জীবাত্মা আর পরমাত্মার শাশ্বত ভেদই সত্য। অভেদজ্ঞানে ভেদ যে মুছেও যেতে পারে এ-অনুভবের প্রামাণ্যকে সে মানে না।

আসলে সব দর্শনেই সত্য আছে। কিন্তু সে-সত্য একদেশী। তাকে ফাঁপিয়ে তোলার ঝোঁকেই দর্শনের আসরে দেখা দেয় খণ্ডন-মণ্ডনের মিথ্যা কোলাহল। কিন্তু সম্যক্ দর্শনে আমরা পাই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নিটোল সত্যকে, যার মধ্যে সমস্ত দর্শনেরই অবিরোধে স্থান হতে পারে—এক আর বহু, অভেদ আর ভেদ, অদ্বৈত আর দ্বৈত নিয়ে তর্কের ধুলা ঝেঁটিয়ে তোলবার কোন প্রয়োজনই হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্য পুরুষ

অতিমানসের একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা পেলাম। দেখলাম, অতিমানস মনের উজানে, কিন্তু তার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। অতিমানসের ঋত-চিৎকে (Truth-Consciousness) আশ্রয় করেই ব্রহ্ম তাঁর লোকোত্তর স্বরূপস্থিতি হতে নেমে আসছেন বিশ্বে—একেবারে জড় পর্যন্ত। জড়ে তাঁর চরম আত্মনিগূহন (self-concealment)। জড়ে ব্রহ্ম-চৈতন্যই নিগূঢ় হয়ে আছে—বীজের মধ্যে বনস্পতির উদ্যত সম্ভাবনার মত। সেই জড় হতে তাকে সার্থক করে উন্মেষিত হল প্রাণ, আর তাহতে মানুষের মন। তাতে জাগল উত্তরণের অভীপ্সা। নিগূহিত ব্রহ্ম-চৈতন্য নিজেকে প্রকট করে উত্তীর্ণ হতে চাইল তার স্বধামে। মন হল এই উত্তরণের সাধন। তার মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ ইন্দ্রিয়সংবিতের সঙ্কীর্ণতা হতে তাকে মুক্তি দিল ভাবলোকে। ভাবগ্রাহী সামান্যচেতনা (universal consciousness) গাঢ় হল বোধিতে, ভাব যেন বস্তুর মতই প্রত্যক্ষাবগম (palpable) হল। এইখানে ব্রহ্মচৈতন্যের এক সন্ধিভূমিতে অতিমানসের অবতরণ আর মনের উত্তরণ যেন পরস্পরের মুখামুখি হয়ে দাঁড়াল। এই সন্ধিভূমিকে বলতে পারি মহাভাবের উত্তরলোক—যেখানে চিৎ এখনও নেমে আসেনি জড়ের মধ্যে, জীবাত্মা আচ্ছন্ন হয়নি জড়প্রকৃতির দ্বারা, অতএব অবিদ্যারও করাল ছায়া দেখা দেয়নি।

এইখানে সম্যক্-দর্শনের আলোতে আমরা এক নিত্যসিদ্ধ পুরুষের সন্ধান পাই—যাঁকে বলতে পারি 'দিব্য পুরুষ'। প্রকৃতি-পরিণামের ধারা ধরে মানুষ উজিয়ে চলছে দেবতার দিকে; এই দিব্য পুরুষ তার সেই উত্তরায়ণের ধ্রুব লক্ষ্য। দিব্য পুরুষ ব্রহ্মভূত; ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যস্বরূপ আর তাঁর উচ্ছল লীলাবিভূতি যেন আলো আর আলোর ছটার মত অবিভাজ্য হয়ে আছে দিব্য পুরুষের চিন্ময় বিগ্রহে। তিনি সৎ- চিৎ- ও আনন্দ-স্বরূপ। তাঁর সত্তা 'স্বয়ম্ভূ' রূপে আপনাতে আপনি অটল যেমন, তেমনি আবার 'পরিভূ'রূপে বহু- হয়ে-ছড়িয়ে-পড়া সকল সত্ত্বের (beings) শাশ্বত অধিষ্ঠান। তাঁর চেতনা সব-

কিছুকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এনে আপন আলোতে আপনাকে দেখছে যেমন, তেমনি আবার রূপে-রূপে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে সেই আলোতেই দেখছে নিজের বিভূতিকেও। তাঁর আনন্দ আত্মারামের স্বরূপ-আস্বাদনের নিস্তরঙ্গ আনন্দ, আবার নিজেরই বহুরূপে ছল্‌কে-ওঠা শক্তিলীলার বিচিত্র আস্বাদনেরও আনন্দ। তাঁর অভেদবোধ অখণ্ড পূর্ণাদ্বৈতের বোধ বলে একে আর বহুতে, নিত্যে আর লীলায় কিংবা সগুণে আর নির্গুণে কৃত্রিম কোনও ভেদের কল্পনা করে না।

দিব্য পুরুষ জগৎকে দেখতে গিয়ে নিজেকেই দেখেন—আত্মার অনুভব আর বিশ্বের অনুভব তাঁর কাছে আলাদা দুটি অনুভব নয়। এক গভীর বিশাল এবং উত্তুঙ্গ অনুভব তাঁর মধ্যে শিববিন্দু হতে ছড়িয়ে পড়ে শক্তির বর্তুলে—আত্মার কেন্দ্রই বিস্ফারিত হয় বিশ্বের পরিধিরূপে। তাঁর সম্যক্-দর্শনে তাই অতিমানস দৃষ্টির তিনটি ভঙ্গিই যুগপৎ ফুটে ওঠে একরস হয়ে। তাঁর অনুভবে : এখানে যা-কিছু সবই আত্মা—আত্মসত্তার বাইরে কোনও-কিছুরই সত্তা নাই, স্বরূপে আর বিভূতিতে কোনও ভেদ নাই, আর-কিছুই নাই এক অখণ্ড-চেতনার সমুদ্র ছাড়া ; অথচ এরই মধ্যে আছে বহু হওয়ার উল্লাস—একেরই বৈচিত্র্যের লীলায়নে, এক আমির সমুদ্রে বহু আমির তরঙ্গদোলায় ; আবার সমুদ্র যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার তরঙ্গভঙ্গ—প্রত্যেকটি বিন্দুতেই সিন্ধুর আবেশ। তিনটি অনুভব ওতপ্রোত ; কেননা এ তো সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা নয়, এ যেন সমুদ্র হয়ে সমুদ্রকে বুকে পাওয়া।

এমনিতর নিত্যজাগ্রত অদ্বৈতসমাধির ভূমিকায় ফোটে ব্রহ্মভূত দিব্য পুরুষের অন্তরে ভাবের জগৎ আর বাইরে ব্যবহারের জগৎ। 'আমি আছি, বিশ্বাতীত হয়েও আছি বিশ্বরূপ হয়ে'— নিশ্বাসের ছন্দের মত আত্মসত্তার এই সহজ অনুভবের 'পরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর এ-দুটি জগৎ ; তাই এ-দুটিতে তত্ত্বত কোনও ভেদ নাই। এর একটি জগৎ সিদ্ধ. আরেকটি আপাতদৃষ্টিতে সাধ্য। সিদ্ধজগতে কালাতীত নিত্যের সত্য ; আর সাধ্যের জগতে লীলার সত্য, কালের সত্য। সিদ্ধজগতের শক্তিই স্পন্দিত হচ্ছে সাধ্যের জগতে। দিব্য পুরুষের সঙ্কল্প তাই সর্বদর্শীর সত্য-সঙ্কল্প। তাঁর দিব্য ব্যবহারেও ফোটে এই সত্য-সঙ্কল্পেরই অটুট ছন্দ। দিব্য পুরুষের এই সিদ্ধচেতনাতে পৌঁছনই আমাদের সাধ্যের অবধি, আর অহংএর প্রলয় ঘটানো তার মুখ্য সাধন।

দিব্য পুরুষ ব্যবহারের জগতে নেমে আসতে পারেন কোনও ব্রহ্মভূত জীব-চেতনায় আবিষ্ট হয়ে। উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'উত্তমপুরুষ'—যিনি

বৈদিক পুরুষোত্তমের সগোত্র লৌকিক পুরুষোত্তম (গীতা)। জীব-ব্রহ্মরূপী এই পুরুষের কাছে বিশ্ব আর বিশ্বাতীতের দুটি দুয়ারই খোলা বলে এই দুই ভূমি হতেই তিনি জীবত্বের লীলাকে আস্বাদন করেন। চেতনার মর্মমূলে তিনি যেমন অনুভব করেন সর্বযোনি অদ্বৈতের অখণ্ডতা, তেমনি তাঁর চেতনার পরিমণ্ডলে থাকে বিশ্বাত্মক অথচ সবিশেষ অদ্বৈতভাবনা। নির্বিশেষ (transcendental), বিশ্বাত্মক (universal) ও সবিশেষ (individual)—দিব্যভাবের এই তিনটি বিভাবই ওতপ্রোত হয়ে আছে তাঁর চেতনায়। যেমন বেদে দেখি দেবস্বরূপের ভাবনায়। সেখানে যেমন দেখি অগ্নি বৈশ্বানররূপে বিশ্বোত্তর 'একং সৎ', তেমনি ঋষি গৃৎসমদের কাছে তিনি বিশ্বদেবতা, আবার তিনি 'দেবানাম্ অবমঃ' অর্থাৎ দেবতাদের সবার নীচে—মানুষের 'পুরোহিত' এবং তাঁদের দূত।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে উত্তমপুরুষের সম্বন্ধ হবে পরমতাদাত্ম্যের—কেননা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক চৈতন্যকে আত্মচৈতন্যরূপেই সর্বদা তিনি অনুভব করেন। তাঁর নিজের মধ্যে ব্রহ্মতাদাত্ম্যের যে-অনুভব, ব্যবহারদশায় তা-ই ফোটে ঘটে-ঘটে ব্রহ্মানুভবের আকারে। ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, তাই তাঁর বিজ্ঞানে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বের লীলা। ব্রহ্ম শক্তি সঙ্কল্প এবং বীর্যস্বরূপ, তাই তাঁর সঙ্কল্পে ব্রহ্মের সর্বৈশ্বর্যের উচ্ছলন। ব্রহ্ম প্রেম ও আনন্দস্বরূপ, তাই উত্তমপুরুষের প্রেমে ও আনন্দে ব্রহ্মানন্দেরই চিন্ময় রসোল্লাস। পুরুষোত্তমের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে তাঁর হৃদয়ে জাগবে অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের নিরন্ত রসোদ্গার।

দিব্য পুরুষের মর্ত্যবিগ্রহরূপী এই উত্তমপুরুষের দিব্য জীবনায়নই আমাদের কাছে মন হতে অতিমানসে উত্তরণের দিশারী।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মন ও অতিমানস

প্রশ্ন হবে, দিব্য পুরুষের এই অতিমানস চেতনা আর প্রাকৃত জীবের মনোময় চেতনা, দুয়ের মাঝে কি সম্পর্ক ? মনের সঙ্গে আমরা এমনভাবে জড়িয়ে আছি যে, তার বাইরে একটা-কিছু ধারণা করতে গেলেই মন তার খেই হারিয়ে ফেলে। তাই মনের ওপারে আর মনের এপারে সেতুবন্ধন কোনকালেই সম্ভব হতে চায় না। তখন সংশয় জাগে, অতিমানস তত্ত্ব অপ্রাকৃত—প্রাকৃত জগতে তার অবতরণ কি সম্ভব ?

এ-প্রশ্নের একটা দার্শনিক জবাব এই হতে পারে : যদি অতিমানসকেই বলি সৃষ্টির বীজ, যদি স্বীকার করি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তাঁর অতিমানস বিজ্ঞানশক্তিতে জগৎ হয়েছেন, তাহলে এই জগতের মধ্যেই ব্রহ্মস্বভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব হবে কেন ? যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, তিনিই আবার সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ। তাই রূপের বিলোপে নয়, কিন্তু তার সার্থক রূপান্তরেই পরমা প্রকৃতির সিদ্ধি ; অথচ সেই রূপকে ঘিরে অরূপের ব্যঞ্জনা অব্যাহত হয়েই আছে। রূপ আর অরূপের মাঝে আছে দিব্য-রূপায়ণের লীলা—দুয়ের মাঝে সে-ই সেতু ; রূপকে আশ্রয় করে অরূপের উল্লাস সে, রূপের আকূতি চরিতার্থ হয় তারই মধ্যে। তাকে অস্বীকার করা যায় কি করে ?

'মন তার নাগাল না পেয়ে ফিরে আসে সেখানথেকে।'—কথাটা সত্য। কিন্তু মন যেমনটি গিয়েছিল, তেমনটি আর ফিরে আসে না ; একটুখানি হলেও রঙ্‌ছুটের রঙ্ তার গায়ে লাগেই। রূপান্তরের বীজ এইখানে। অধ্যাত্ম-দর্শনও তাই স্বীকার করেছে, গুণাতীত যেমন সত্য, শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি সত্য ; যিনি নির্গুণ, তিনিই আবার অশেষকল্যাণগুণ। পুরুষ আর অপরা প্রকৃতির মাঝে আছে তাঁরই পরমা প্রকৃতি ; মন আর অমনীভাবের মাঝে আছে অতি-মানস, আছে দিব্যমননের সত্যবিভূতি।

যে-মন নিয়ে অহরহ কারবার আমাদের, যে শুধু জানার সাধন, হওয়ার সাধন নয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে এলোমেলো করে উপরভাসাভাবে জানি ; তাকেই

একটু গুছিয়ে আর তলিয়ে জানি মন দিয়ে। মন তাই অন্তরিন্দ্রিয় ; স্বভাবতই চেতনার সে সবখানি নয়। চেতনার মধ্যে শুধু জানার ব্যাপারই চলছে না ; জানার পিছনে অলক্ষ্যে চলছে একটা হওয়ার লীলা। এই হওয়াটা মনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ; তার ন্যূনতাকে পূরণ করে হৃদয়। হৃদয় হয়ে জানে ; তাই সে জানে অখণ্ডভাবে, মনের মতো টুকরা-টুকরা করে নয়। ব্রহ্মকে প্রথম জানতে যাই মন দিয়ে ; ব্রহ্মে জীবে আর জগতে বিরোধের সৃষ্টি হয় তখনই। কিন্তু মনের জানা হৃদয়ের ছোঁয়ায় হওয়ার রসে জারিত হয় যখন, তখন আর এ-ভেদ থাকে না। বেদের ঋষি তাই বলেছিলেন, তাঁকে পেতে হবে শুধু মন দিয়ে নয়, মনীষা দিয়েও নয়—পেতে হবে হৃদয় দিয়ে।

অতিমানসের ভাব পেতে হলে মনের ওপারে যেতে হবে। আবার মনকে ভাল করে না জানলে তার মায়া কাটিয়ে ওঠাও যায় না। তাই তার একটুখানি পরিচয় নেওয়া দরকার।

ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে জগৎকে দেখছি। সে-দেখা বিচিত্র ; একেকটা ইন্দ্রিয় চেতনায় ফোটায় বিষয়ের একেকটা দিক। বাইরের জগৎ হতে হানা আসছে অনবরত, আর চেতনা নানাভাবে তাতে সাড়া দিচ্ছে। জগৎ জুড়ে শক্তির বিচিত্র স্পন্দন, তাই তার বার্তারও রকমারির অন্ত নাই। সব নিয়ে চেতনার পরদায় চলছে এলোমেলো একটা ছায়াবাজির খেলা। ব্যাপারটা এলোমেলো, কিন্তু খুব স্পষ্ট ; বিষয়ের সম্পর্কে ইন্দ্রিয়ের রায়কে উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়। এলোমেলো ভাবটাকে গুছিয়ে আনছে মন—অবশ্য পুরাপুরি নয়, খানিকটা। এইখানে তার মধ্যে পাই 'সামান্যদর্শনে'র বীজ। ইন্দ্রিয় দিয়ে টুকরা-টুকরা দেখা বস্তুর রূপকে একটা সাধারণ ভাবের আকার দেওয়া—তাকে বলা যায় সামান্যদর্শন। সামান্যদর্শন ব্যাপক, কিন্তু অস্পষ্ট ; তার তুলনায় ইন্দ্রিয়ের 'বিশেষদর্শন' সঙ্কীর্ণ হলেও স্পষ্ট। এই বিশেষদর্শন হতে মনের মধ্যে জন্মায় বিশ্লেষণের একটা ঝোঁক : যাকে জানতে হবে, তাকে চিরে-চিরে দেখতে হবে। ঝোঁকটা খুবই প্রবল ; তাই মন চঞ্চল—বিষয়কে কেবলই ঠুকরে-ঠুকরে দেখা, এক বিষয় হতে আরেক বিষয়ে ছিটকে-ছিটকে পড়া তার স্বভাব। অথচ বিশেষদর্শনের বৈচিত্র্যকে একটা সামান্যভাবনার আওতায় না আনতে পারলে এলোমেলো ইন্দ্রিয়ব্যাপারের কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মন এই সামান্যভাবনার কাজটি করে—কিন্তু আনাড়ির মত। যা সামান্য, তা তার কাছে অস্পষ্ট ; কিন্তু যা বিশেষ, তা স্পষ্ট।

অথচ বিশেষদর্শন সঙ্কীর্ণ দর্শন ; তা শুধু বিষয়ের একটা দিকে আপাতত ঝোঁক দেওয়া—আর সব দিক আড়াল ক'রে। তাতে বিষয়কে পুরাপুরি জানা যায় না ; এই পুরাপুরি না-জানাকে বলে 'অবিদ্যা' (Ignorance)। দার্শনিক বলবেন, অবিদ্যা মনের স্বভাব।

মন কোনও-কিছুকেই পুরাপুরি জানতে পারে না—একথা সত্য ; কিন্তু সে জানতে চায়—একথা আরও গভীরভাবে সত্য। দার্শনিকের ভাষায় মন অবিদ্যাগ্রস্ত হলেও বিদ্যার অভীপ্সা বা জিজ্ঞাসা তার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এথেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত, মনের চেতনা পায়রাখুপী নয়—তার মধ্যে ব্যাপ্তির দিকে, গভীরতার দিকে একটা প্রবণতা আছে ; অর্থাৎ মনঃশক্তি আসলে কলায়-কলায় ফুটে-ওঠা চিৎশক্তিরই বিভূতি। দ্বিতীয়ত, অবিদ্যা আর বিদ্যায় ঐকান্তিক কোনও বিরোধ নাই ; বিদ্যারই সঙ্কোচে যেমন অবিদ্যার উৎপত্তি, তেমনি অবিদ্যার প্রসারেই বিদ্যার আবির্ভাব। দার্শনিকেরা বলেন বটে, বিদ্যা আর অবিদ্যা যেন আলো আর আঁধারের মত বিপরীতধর্মী। চরমপ্রান্ত হতে দেখতে গেলে দুটিকে তা-ই মনে হয় ; তবু বলব, ওটা মনের মায়া। সবটাকে একনজরে দেখলে, আলো আবছা হয়ে আঁধারের দিকে যাচ্ছে, আঁধার ফিকা হয়ে আলো হচ্ছে—এইটাই খাঁটি কথা।

অতএব অবিদ্যাগ্রস্ত মন অতিমানস বিদ্যাশক্তিরই একটা অন্ত্যবিভূতি। মন যেন অতিমানস থেকে ছিটকে পড়ে তার দিকে পিছন ফিরে আছে। কিন্তু তাবলে অতিমানস তার দিকে পিছন ফিরে নাই—তার আলো মনের 'পরে ঝরে পড়ছেই অবিরত। দুয়ের মাঝে একটা সন্ধিভূমি আছে, যেখানথেকে অনুভব হয়, মনের টুকরা-টুকরা-করে-দেখাটা অতিমানসেরই বিশেষদর্শনের একটা ভঙ্গি। অতিমানসের এই বিশেষদর্শনকেই আমরা এর আগে বলেছি প্রজ্ঞান। বিশেষকে সেখানে দেখছি—সামান্যকে ভুলে নয়, বা তাকে আবছা করেও নয়। সামান্যের পরিপূর্ণ আলোতেই বিশেষ সেখানে চিদ্‌ঘনবিন্দু হয়ে জ্বলছে যেন। অভেদের মধ্যে এইখানে ভেদের সূচনা ; কিন্তু ভেদ সেখানে অভেদকে আড়াল করে নাই—বরং অভেদেরই সে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি। মনের বিকল্প (manifold construction) নির্বিকল্পে হারিয়ে যায় ; তাকে বলতে পারি অমনীভাব বা মনের মরণ। কিন্তু তখনও অনুভব থাকে—মনোনির্ভর হয়ে নয়, স্বতোনির্ভর হয়ে। চিৎশক্তির সংবেগে সে-অনুভব ক্রমে জমাট বাঁধে। তখন

অমার বুকে আলো ফোটে—ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের আলো নয়, ফোটে ষোড়শীর নিত্য-কলা ; অমনীভাবের আঁধারে ফোটে দিব্যমনের অরোরা। মনের ভেদদর্শনের স্বরূপ আর প্রয়োজন কি, তখনই তা বোঝা যায়।

এবার আরেকভাবে মনের পরিচয় নেওয়া যাক। বিষয়দর্শনের দিক থেকে নয়, অন্তর্দর্শনের দিক থেকে দেখি, মনের স্বরূপ কি। মন জড়িয়ে আছে দেহের সঙ্গে, জড়িয়ে আছে প্রাণের সঙ্গে। এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তাদের ছাড়াছাড়ি করা শক্ত। যার সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠতা, তার ছাপ তার মধ্যে পড়বেই। মন যখন দেহের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন তাতে দেহের সংস্কারই প্রতিফলিত হয়। দেহপিণ্ড বিশ্বের বহু বস্তুপিণ্ডের মধ্যে একটা পিণ্ড। সবার-থেকে সে আলাদা ; তাকে ঘিরে বহুর মেলা। সেই বহুর সঙ্গে তার স্পষ্ট কারবার চলে জেগে-জেগে। স্বপ্নের মধ্যে দেহবোধ আবছা, সুষুপ্তিতে তা নাই-ই ; মনশ্চেতনারও তখন সেই দশা। দেহের এই সংস্কার থেকে মনেরও সংস্কার জন্মে : আমার মত আরও অনেকে আছে, কিন্তু আমরা সবাই আলাদা-আলাদা ; এই বর্তমান দেহটাই আমার চেতনার আশ্রয়, আর এই জাগ্রতে-দেখা জগতের বাইরে সব-কিছুই ভুয়া। দেহনির্ভর জীবের এই হল আত্ম-পরিচয়।

কিন্তু এই উপরভাসা পরিচয়েই সব-কিছু ফুরিয়ে যায় না। যেমন বাইরে আছে বস্তুর জগৎ, তেমনি ভিতরে আছে ভাবের জগৎ ; মন সেখানেও ডুবতে পারে। ভিতরপানে দৃষ্টি ফিরিয়ে মন তখন দেখে, দেহের গভীরে আছে প্রাণ, পিণ্ডের মর্মমূলে আছে এক রূপকৃৎ শক্তির উল্লাস। প্রাণের আকূতিতেই দেহের সৃষ্টি, তারই প্রেরণায় তার রূপের বদল। রূপচেতনার গভীরে আছে এক রসচেতনা ; তার উদ্‌বোধনে বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এলিয়ে পড়ে, অথচ আরও নিবিড় করে বিষয়কে জানবার এবং আস্বাদন করবার পথ খুলে যায়। পর আর তখন পর থাকে না, অন্তরের যোগে আপন হয়ে ওঠে। অন্নময় পুরুষের অন্তরালে এমনি করে মেলে প্রাণময় পুরুষের সাক্ষাৎকার ; যথার্থ আত্ম-পরিচয়ের প্রথম সোপানে তখন পা পড়ে, মনের উপর থেকে জড়ময় দেহবোধের আবরণ খসে যায়।

এইমাত্র শুরু, শেষ এখনও অনেক দূরে। প্রাণময় পুরুষের অনুভবে আছে শক্তিস্পন্দের সাক্ষাৎ বোধ। যেন চিদাকাশে হাজার রশ্মিরেখার সঙ্গে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটেছে একটি রশ্মিরেখা ; সবার আত্মীয় হয়েও তার পথটি কিন্তু

স্বতন্ত্র।…আরও তলিয়ে যেতে হবে, শক্তিরও গভীরে ডুবতে হবে ভাবের অতলান্তে। সেইখানে পাব বিশুদ্ধ মনোময় পুরুষকে—দেহ আর প্রাণ যার চিন্ময় ভাবনার আধার এবং বিচ্ছুরণ মাত্র। দর্শন তখন ভাবের দর্শন ; অপরের চিত্তের স্পন্দন সাক্ষাৎভাবে তখন স্ফুরিত হয় আত্মভাবের আন্দোলনে।…এত আত্মীয়তা তবু আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্যটুকু এখানেও লোপ পায় না—বিন্দু-চেতনার আর সিন্ধু-চেতনার সূক্ষ্ম একটা তফাত থেকেই যায়। অবিদ্যার ওই হল শেষ আবরণ।

তার ওপারে বিজ্ঞানের স্বারাজ্য বা অতিমানসের সাম্রাজ্য।

এবার দর্শনের দিক থেকে সমস্ত বিষয়টার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যাক।

মনের ওপারে অতিমানস। মনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও স্বরূপত সে অরূপাবচর, আর মন হল রূপের কারবারী। তাহলে আমাদের নিত্যপরিচিত রূপের জগতে তাকে নামিয়ে আনা সম্ভব কি ? অরূপ আর রূপ, দিব্য আর অদিব্য একেবারে বিপরীত কোটির পদার্থ নয় কি ?

কিন্তু এতক্ষণের আলোচনায় আমরা এই বুঝেছি, অরূপের মধ্যেই রূপের বিসৃষ্টি, তার বাইরে নয়। রূপের মধ্যে অরূপ ভাবরূপে অনুস্যূত হয়ে আছে—'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ'। তেমনি রূপও চায় ভাবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। ভাবের ফিকা অনুভব জমাট বাঁধে রূপে, আবার রূপের অর্থ মুক্তি পায় ভাবের প্রচ্ছটায়। আবার ভাবই বিশ্বমূল, সে না হলে রূপকে জানত কে ? রূপ আত্মসচেতন হয় ভাবেরই আবেশে। তার আর রূপের মধ্যে, দিব্য আর অদিব্যের মধ্যে এমনিতর একটা অন্যোন্যসম্ভাবনার (mutual interaction and fulfilment) সম্পর্ক আছে। অদিব্য দিব্যের স্বরূপের বিকৃতি নয়, তার অর্থবহ পরিণাম। তাই তার দিব্য রূপান্তর অসম্ভব নয়।

আমাদের মধ্যে মন অদিব্যপরিণামের শীর্ষে—তার নীচে রয়েছে প্রাণ আর জড়ের দুটি ধাপ। মন স্বরূপত চিৎ-শক্তি। তার কাজ অখণ্ডকে খণ্ডিত করা। সে বিভাগ ও বিক্ষেপের প্রবর্তক। তার এই বৃত্তিতেই এক বহু হয়েছেন। বহুতে তাঁর আত্মবিসৃষ্টির উল্লাস, অতএব বহুভাবনা চিৎ-শক্তিরই একটা সপ্রয়োজন লীলায়ন। এই বহুভাবনার সঙ্গে মন সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকলেও

একের ভাবনার প্রতি সে বিমুখ নয়। অখণ্ডকে খণ্ড-খণ্ড করেও আবার তাকে অখণ্ডরূপে ফিরে পাওয়ার একটা আকূতি তার মধ্যে আছে। মনোময় বুদ্ধি তার নিদর্শন। কিন্তু মুখ্যত বিভাগের প্রবর্তক বলেই মন বিশ্বমূল তত্ত্ব হতে পারে না—সে অখণ্ডের বিশিষ্ট প্রবৃত্তির একটা সপ্রয়োজন সাধন মাত্র।

অখণ্ডের মধ্যে সংজ্ঞানের (comprehension) সঙ্গে-সঙ্গেই আছে প্রজ্ঞানের (apprehension) বৃত্তি, যাতে নিজেকেই সে নিজের বিষয়রূপে প্রতিক্ষিপ্ত করে। এইখানে পুরুষ আর তার আত্মপ্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম একটা ভেদের আভাসন (manifestation) হয়। প্রজ্ঞানের মধ্যে এই ভেদাভাসই মনের বিভাজনী বৃত্তির প্রয়োজক।

তাইতে সৃষ্টিতে দেখা দেয় বহুভাবনার লীলা। তার এই রীতি। আদিতে রয়েছে এক অখণ্ড-চিন্ময় সদ্‌ভাব—যার অনন্ত ব্যঞ্জনা অসীম দেশ ও কালের ভাবনায় প্রসারিত। সেই চিন্ময় স্বতঃপ্রসারে অখণ্ড রোমাঞ্চিত হল অগণিত চিদ্‌বিন্দুতে—সাংখ্যে যাদের বলা হয়েছে 'বহু পুরুষ'। তারপর পুরুষের সেই বহুত্ব অদ্বয়ভাবনার অখণ্ডব্যাপ্তিকে বহুধাখণ্ডিত করল ভোগায়তনের (embodiment) কল্পনায়। এইখান থেকে দিব্য-পুরুষের প্রজ্ঞান-মন বিশ্বের খণ্ডলীলার সূচনা করল। আত্মভাবেরই খেলা সেখানে, তবুও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভেদের একটা আভাস 'যেন'।

দিব্য-পুরুষের মন আত্মসঙ্কোচজনিত এই ভেদের কর্তা, অতএব স্ব-তন্ত্র। কিন্তু প্রাকৃত মন তার কর্ম, অতএব পরতন্ত্র, তাই সৃষ্টির কর্তা সে নয়। দিব্য মন গুণাধীশ, গুণলীলাতেও তার স্বরূপদৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। কিন্তু প্রাকৃত মন গুণাধীন, নিজের গুণের জালেই সে জড়িয়ে যায়। এই জড়িয়ে যাওয়া হল নিজের চারদিকে একটা সীমা রচনা করে তার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা। তার নাম আত্মসঙ্কোচ বা অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপত বৃহৎ হয়েও নিজেকে ক্ষুদ্র করে জানা। মন যেমন নিজেকে ছোট করে জানে, বিষয়কেও তেমনি সে ছোট করে দেখে। এইথেকে তার মধ্যে দেখা দেয় বিভাজনের বৃত্তি—একটা কিছুকে টুকরা-টুকরা করে ভাঙা, আর তারই সঙ্গে 'অভিনিবেশ' বা সেই টুকরার মধ্যেই তলিয়ে যাওয়া। চেতনা তখন যেন একটা বিন্দুতে গুটিয়ে আসে আত্মপ্রসারের ভাবনা ছেড়ে, আর বিশিষ্ট দেশ এবং কালের দ্বারা সীমিত নিজের একটা বিভাবকেই মনে করে তার সমগ্র আত্মভাব। জীব তখন ভুলে যায়, অপর জীবও তার আত্মস্বরূপ, অপরের কর্মও তারই কর্ম।

এই আত্মসঙ্কোচের শেষ সীমায় দেহাত্মবোধ, যার মধ্যে অবিদ্যার ঘোর সবচাইতে ঘনিয়ে ওঠে। এইটি জড়ের গ্রন্থি, যার কথা পরে বলব। কিন্তু অতিমানস হতে স্খলিত হয়ে মন যে এমনি করে শুধু তলিয়েই যায়, তা নয়। তার আত্মসঙ্কোচ বস্তুত অতিমানসেরই আত্মসংহরণের লীলা। সে-লীলা বিদ্যার লীলা এবং স্বাতন্ত্র্যের লীলা বলে প্রমুক্তির চেতনা তার মধ্যে কখনও আচ্ছন্ন হয় না। এ যেন সৎস্বরূপের বাঁধন খোলবার খেলাতেই স্বেচ্ছায় বাঁধন পরা। এই প্রমুক্তির বেগ মনের মধ্যেও সংবৃত্ত হয়ে আছে—স্প্রিংএর মত। তাইতে আত্মসঙ্কোচের মধ্যেই সে অনুভব করে একটা আত্মপ্রসারণের বেগ—যা তাকে দেহের প্রাণের এবং নিজের অবরবৃত্তির কুণ্ডল মোচন ক'রে অতিমানসের ব্যাপ্তি জ্যোতি ও স্বাতন্ত্র্যে উত্তীর্ণ হতে প্রচোদিত করে।

অতিমানস আর মনের মধ্যে এই অবতরণ আর উত্তরণের দ্বৈতলীলাই আমাদের অধ্যাত্মজীবনের এক পরম রহস্য। অতিমানসের আবেশে অবিদ্যাগ্রস্ত মন তার স্বরূপসত্যে ফিরে গিয়ে আবার ফুটে ওঠে ঋত-চিন্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলীলায়। সে-মন তখন উত্তমপুরুষের দিব্য মন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রাণ

সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়ে আমরা যেসব তত্ত্বের সন্ধান পেলাম, এইবার তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে, আরও গহনতার মধ্যে প্রবেশ করা যাক।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বহুর মেলা—যাকে বলি জগৎ। বহু দেখা দেয় ইন্দ্রিয়ের কাছে ; কিন্তু মন-বুদ্ধি বলে, বহুর মূলে রয়েছে একটিই তত্ত্ব। বহু সেই একের বিসৃষ্টি। বহুকে জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে, আর একককে জানি বুদ্ধি দিয়ে। দুটি জ্ঞানই সপ্রয়োজন। বহু এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ; তাকে একের মধ্যে যদি গুছিয়ে আনতে পারি, তবেই ব্যবহারের জগতে তার উপর আমাদের যেমন কর্তৃত্ব জন্মায়, তেমনি একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞানের ফলে আমাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাও তৃপ্ত হয়। বহুর উপর কর্তৃত্ব করা বিজ্ঞানের কাজ, আর তার তত্ত্ব জেনে নিজের আন্তর অনুভবের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পেয়ে নিজেকে বৃহৎ করে পাওয়া দর্শন আর অধ্যাত্মবিদ্যার কাজ। আমাদের গবেষণা বিজ্ঞানের অবিরোধে দার্শনিক গবেষণা। এই গবেষণা একের তত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বের আশ্রিত।

দর্শনের প্রশ্ন, বিশ্বমূল অদ্বৈততত্ত্বটি কি ? দুটি তত্ত্ব আমাদের সামনে মুখামুখি দাঁড়িয়ে—একটি জড়, আরেকটি চৈতন্য। যে-দর্শন বিজ্ঞানঘেঁষা এবং শুধু বাইরটা দেখে, সে বলে বিশ্বের মূলে আছে জড়, চৈতন্য তারই একটা বিসৃষ্টি। আর যে-দর্শন ভিতরের দিকেও তাকায়, বিশ্বের এবং জীবনের মূলে একটা অর্থ আবিষ্কার করতে চায়, বিশ্বের মূলে সে দেখে চৈতন্য। জড় হতে চৈতন্য ফুটছে—এটা ব্যাবহারিক সত্য। কিন্তু সেই চৈতন্যই আবার জড়ের প্রশাসন করছে, তার মধ্যে অর্থের বিধান করছে, অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতে যোগসাধন করছে—এটা পারমার্থিক সত্য। এ-সত্যের অধিকার ব্যাপক, জড়ের সত্যও তার অন্তর্ভুক্ত। জড় দিয়ে চৈতন্যের ব্যবহারের ধারা বোঝা যেতে পারে, কিন্তু তার তত্ত্ব বোঝা যায় না। কিন্তু চৈতন্য দিয়ে জড়ের তত্ত্ব বোঝা যায়। চৈতন্যের আবির্ভাবেই জড়ের সার্থকতা, অতএব জড়ের ঈশান-রূপে চৈতন্য তার মূলে—এই দৃষ্টিই পূর্ণ সত্য দৃষ্টি।

বিশ্বমূল এই অদ্বৈত চিন্ময় তত্ত্বকে আমরা বলেছি 'ব্রহ্ম'। প্রাচীন বেদান্তের অনুসরণে ব্রহ্মের লক্ষণ বলেছি সৎ চিৎ শক্তি এবং আনন্দ। বিশ্বের মূলে এক সত্তা; সে-সত্তা একটা অন্ধতামিশ্র নয়, পরন্তু চিন্ময়। সে-চৈতন্য লোকোত্তরে আত্মরত অতএব আমাদের দৃষ্টিতে অব্যাকৃত, কিন্তু লোকবিসৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ত। সে নিষ্ক্রিয় নয়, যুগপৎ আত্মসংহরণে এবং আত্মবিচ্ছুরণে সক্রিয় অতএব শক্তিযুক্ত। শক্তিস্পন্দের এই স্বচ্ছন্দ অনুভবই তার মধ্যে ফুটে ওঠে আনন্দরূপে। সত্তায় স্থিতি, চৈতন্যে দীপ্তি, শক্তিতে স্ফুরত্তা এবং আনন্দ—এই হল ব্রহ্মের স্বরূপ। এই স্বরূপের সন্ধান আমরা পাই আমাদেরই আত্মানুভব হতে। তাইতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রামাণ্য অপরোক্ষ—কেবল তর্কসিদ্ধই নয়। ব্রহ্মের যা স্বরূপ, আমাদেরও তা-ই স্বরূপ। আর ব্রহ্ম হতে বিসৃষ্ট জগতেরও স্বরূপ তা-ই—জগৎ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের একটা বিচ্ছুরণ।

এক ব্রহ্ম জগতে বহু হয়েছেন। বহুত্ব প্রকাশ পেয়েছে যেমন সংখ্যার বাহুল্যে, তেমনি গুণগত বৈচিত্র্যে এবং ক্রিয়ার পরিণামে। এইহতে দেখা দিয়েছে দেশ কাল আর নিমিত্ত, যা ব্রহ্মের বহুভাবনার (manifold becoming) একটা প্রকার (mode) এবং জগতের আধার। বহুত্ব হতে এসেছে অভেদের মধ্যেই ভেদের ভাবনা। যেখানে চেতনার সঙ্কোচ, ভেদ সেখানে বিরোধের সৃষ্টি করে; আবার চেতনার প্রসারে তা-ই রূপান্তরিত হয় বৈচিত্র্যে। সঙ্কোচ আর প্রসার ব্রহ্মশক্তির একটা স্বভাবিক লীলায়ন।

ব্রহ্মের শক্তিকে আমরা বলেছি অতিমানস। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, তাই অতিমানস ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। তার দুটি প্রবৃত্তি (function)—সম্ভূতি এবং বিভূতি। সম্ভূতিতে যা এক, তা-ই বিভূতিতে বহু। অতিমানসে দুয়ে কোনও বিরোধ নাই—বহু সেখানে একে বিধৃত। অতিমানসে একের যে-সংবিৎ, তা হল সংজ্ঞান (comprehension), আর বহুর সংবিৎ প্রজ্ঞান (capprehension)। দুইই বিজ্ঞানের (Knowledge) বৃত্তি।

অতিমানস বিজ্ঞানের যেদিকটা প্রজ্ঞান, সেখানেই ভেদাভাসের সূচনা। তা সত্যকার ভেদ নয়—ভেদের আভাস মাত্র, কেননা বিজ্ঞান সেখানে সজাগ বলে ভেদজ্ঞান অভেদজ্ঞানকে তিরোহিত করেনি। ভেদ সেখানে অভেদের বিলাস, অবিদ্যা বিদ্যার লীলায়ন। অতিমানসের প্রজ্ঞান এবং বিভূতিসংবিৎই এই বিচিত্র সৃষ্টির প্রবর্তক—যা বস্তুত ব্রহ্মের বহুধা আত্মরূপায়ণ। এই প্রজ্ঞানই আবার আমাদের মনের বীজ। অতিমানস বিভূতির স্রষ্টা, আর মন তার দ্রষ্টা

মাত্র—যদিও অনেকসময় ভুল করে আমরা মনকে স্রষ্টার আসনে বসাই। অতিমানস বহুকে নিজের ভিতর হতে উৎসারিত করে, আর মন সেই সিদ্ধ বহুত্বকে নানাভাবে সাজিয়ে কতকগুলি কল্পরূপের সৃষ্টি করে মাত্র—সৃষ্টির ব্যাপারে এইটুকু তার কাজ।

অতিমানস প্রজ্ঞানে যে-ভেদজ্ঞান আভাস মাত্র, তা-ই মনের মধ্যে এসে পাকা হয়। মন তাই সব-কিছুকে খণ্ড-খণ্ড করে দেখে—খণ্ডের পিছনে যে-অখণ্ড রয়েছে, তার কাছে তা-ই আভাস। অখণ্ডের এই আভাসজ্ঞান নিয়ে প্রাকৃত মনে বিজ্ঞানাভিমুখী যে-বৃত্তি দেখা দেয়, তা-ই হল বুদ্ধি। তারও উজানে আভাস যেখানে প্রভাস হয়েছে, সেখানে দেখা দেয় বোধি—যা সাক্ষাৎভাবে অতিমানসের বৃত্তি। অখণ্ডের সত্যের দর্শন এই বোধির পরিণাম—যা বিষয়কে বাইরে থেকে জানে না, 'হয়ে' জানে। বোধিজ বিজ্ঞানই আমাদের দর্শনের মুখ্য সাধন।

সৎ-চিৎ-আনন্দ হতে অতিমানসের ভিতর দিয়ে আমরা এমনি করে এসে পৌঁছলাম মনে—আমাদের প্রাকৃত জীবন যার আশ্রিত। সোজাসুজি দেখতে গেলে মন প্রাণ আর দেহ নিয়ে আমরা 'মানুষ'। তার মধ্যে আবার মন দিয়েই মানুষের নিরিখ—মানুষ মনোময় জীব। এই মন ফুটেছে প্রাণের মধ্যে। মনের পরিচয় আমরা পেয়েছি ; এইবার দেখা যাক, প্রাণ কি। আরও উজিয়ে বোঝা যাক, সচ্চিদানন্দেরই-বা সে কোন্ বিভূতি।

প্রাণের খুব সহজ পরিচয়, প্রাণ শক্তির ক্রিয়া—যে-শক্তি বিশ্বের রূপ গড়ে চলেছে। আমরা সাধারণত প্রাণের খেলাকে জড়শক্তি হতে তফাত করি : দেখি, প্রাণের শক্তি স্ববশ, কিন্তু জড়শক্তি অবশ। জড়শক্তিকে মাপাজোখা চলে, খুশিমত তাকে চালিয়ে নেওয়া যায় খানিকটা ; কিন্তু প্রাণ চলে আপন অন্তরের প্রেরণায়, সহজে তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যকে আইনে বাঁধা যায় না। আবার, প্রাণের কতগুলি বিশেষ ক্রিয়া আছে, যা জড়ে নাই। মাটি আলো বাতাস—এগুলি জড় ; কিন্তু মাটির রস আর আলো-বাতাসকে আত্মসাৎ করে যে-উদ্ভিদ্ জন্মায়, সে প্রাণী। তার পরিবর্তনের ইতিহাস স্বতন্ত্র। সে খায়, আপনাথেকে বাড়ে, বীজ ছড়িয়ে বংশবিস্তার করে, আবার ম'রে মাটির বুকে মিশে যায়। পশুর মধ্যে প্রাণের ক্রিয়ার আরও বৈশিষ্ট্য আছে—সে আপন খুশিতে অঙ্গসঞ্চালন করতে পারে। এই শক্তিই মনের দৌলতে মানুষের মধ্যে ফুটিয়েছে কলা আর শিল্প-সৃষ্টির তাগিদ, গড়েছে মানুষের সভ্যতা।

এইদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, প্রাণ আছে বিশ্বের খানিকটা জুড়ে মাত্র। জড়বাদী বলবেন: সমস্ত বিশ্বটা একটা বিরাট্ জড়পিণ্ড, তার 'পরে পড়েছে প্রাণের একটা আলতো পোঁছ। বাতাসের পরিমাণ আর তাপের মাত্রা ঠিক থাকলেই প্রাণের প্রকাশ সম্ভব। তাই জড়বিশ্বে প্রাণের আবির্ভাব একটা অবান্তর ঘটনা। জড়ের ক্রিয়া আর প্রাণের ক্রিয়া তো এক নয়। সুতরাং বিশ্বমূল শক্তিকে প্রাণশক্তি বলি কি করে? জড়ে প্রাণের লক্ষণ কোথায়?

গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, ইন্দ্রিয়নির্ভর বহির্দৃষ্টি দিয়ে এ-প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। প্রাণের স্থূল ক্রিয়া দেখে তার অস্তিত্বের অনুমান করি যদি, তাতে তার ঠিক স্বরূপটি ধরা পড়ে না। একদিন পশুতে আর উদ্ভিদে প্রাণক্রিয়ার তফাতটা দুর্লঙ্ঘ্য বলেই আমরা ভেবেছিলাম। আজ দেখছি, সেটা ভুল। আবার, আঘাত পেলে সাড়া দেওয়াই প্রাণের লক্ষণ—একান্তভাবে এমন কথাও বলা চলে না। বীজের মধ্যে প্রাণ ঘুমিয়ে থাকে; কোনও-কোনও যোগ-সমাধিতে প্রাণের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হলেও প্রাণ লুপ্ত হয় না; মৃতদেহে প্রাণ ফিরে এসেছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। মোটকথা, চাক্ষুষ জন্ম আর মৃত্যুর বেষ্টনীর মধ্যেই প্রাণের সীমা—এ-সিদ্ধান্ত পুরাপুরি সত্য নয়। এমনও বলতে পারি, মৃত্যু প্রাণেরই একটা ভঙ্গি—অকেজো একটা রূপকে ভেঙে আরেকধরনে আত্মপ্রকাশের ওটা একটা কৌশল তার। এক-একটি আধারে প্রাণের এক-এক প্রকাশ; খণ্ডদৃষ্টিতে তার ইতিহাস স্বতন্ত্র। কিন্তু এ যেন প্রাণসমুদ্রের তরঙ্গগুলিকে আলাদা-আলাদা করে দেখার মত। অখণ্ডদৃষ্টিতে লক্ষ-লক্ষ তরঙ্গ থাকলেও আছে একই সমুদ্র; যেখানে তরঙ্গ নাই, সেখানেও সমুদ্র আছে। এ-দৃষ্টি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি—যার কারবার ভাবকে নিয়ে। খণ্ডদৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের; শক্তিকে তলিয়ে বোঝবার জন্য ততটা নয়, যতটা তাকে কাজে খাটাবার জন্য তার উদ্ভব। সুতরাং বিজ্ঞানীর আর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এক ভূমির নয়। একটির মোড় ফেরানো ভিতরের দিকে, আরেকটির বাইরের দিকে। অবশ্য দুইয়েরই প্রয়োজন আছে।

ব্যক্ত প্রাণ আর অব্যক্ত প্রাণ—এইভাবে দেখি যদি, তাহলে প্রাণের এলাকা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। কথাটা অযৌক্তিক কিছুই নয়। ইন্দ্রিয়নির্ভর মন কোনও জিনিসেরই সবটুকু দেখতে পায় না; তার কাছে যা ব্যক্ত, তা অনন্ত অব্যক্তের বুকে একটি দীপের কলিকা। তার আলো কতটুকু আর ছড়াতে পারে? মন ব্যক্তের বাইরে যেতে চায় না। কিন্তু বোধি অব্যক্তকে

বোঝে ; সে জানে, অব্যক্তই ব্যক্তের উৎস। এ-জানায় চেতনার যে-প্রসার ঘটে, তার একটা আলাদা মূল্য আছে।

বিজ্ঞানীর বোধিদৃষ্টি নিয়ে বলতে পারি, যে-প্রাণের খেলা মানুষে-পশুতে-উদ্ভিদে, সে-প্রাণ আছে জড়েও। জড়শক্তি বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তিরই একটা রূপ। সে-শক্তি আচ্ছন্ন, অবচেতন ; কিন্তু তারও মূলে আছে নিগূঢ় একটা ইচ্ছার বেগ। জড়াণুর রূপ আর জীবাণুর রূপ দুইই ফুটেছে এক অব্যক্তেরই রূপ গড়বার ইচ্ছা থেকে। দুটি রূপ আপাতদৃষ্টিতে আলাদা, তাদের ছন্দেও ভেদ আছে ; কিন্তু দুটি দল পাখা মেলেছে একই ইচ্ছার বৃন্ত হতে।

এই ইচ্ছা চিৎশক্তি : খণ্ডচেতনার শক্তি নয়, বিশ্বব্যাপী মহাচেতনার শক্তি। আত্মচেতনার প্রসারে এ-শক্তির সাক্ষাৎ মেলে—ফোটে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি দেখে : বিশ্বময় এক অখণ্ড প্রাণ, এক অখণ্ড চেতনা ; প্রাণ আর চেতনা ওতপ্রোত। চেতনার তপস্যায় প্রাণের স্ফুরণ ; প্রাণ চিৎতপসের অন্ত্যবিভূতি। এ কিসের তপস্যা ? অরূপের আত্মরূপায়ণের তপস্যা। অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের যে-চিৎ, তা-ই প্রাণরূপে বিশ্বের মূলে। চেতনা নিষ্প্রাণ নয়, প্রাণ অচেতন নয় ; জড়ে তাদের মিথুনলীলা আচ্ছন্ন, জীবে উন্মিষন্ত।

এই হল প্রাণের স্বরূপ। এখন আমাদের মধ্যে তার প্রকাশের রীতিকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

বিংশ অধ্যায়

মৃত্যু কামনা ও অশক্তি

জীবের দেহ আর মন, দুয়ের মাঝামাঝি রয়েছে প্রাণ—চিৎ-শক্তির অন্ত্য-বিভূতিরূপে। এই চিৎশক্তির একটা সুদূর লক্ষ্য আছে—রূপের মধ্যে অনিঃশেষে আপনাকে ফুটিয়ে তোলা। প্রাণ সেই লক্ষ্যসিদ্ধির সাধন। কিন্তু প্রাকৃত জগতে আমরা তার যে-প্রকাশ দেখি, তাতে মনে হয় এই লক্ষ্যের চেতনা প্রাণের মধ্যে আচ্ছন্ন। এখানে প্রাণ পঙ্গু হয়ে আছে মনের মায়ায়। আমাদের মনশ্চেতনা সঙ্কুচিত; সে-সঙ্কোচ সংক্রামিত হয়েছে প্রাণের মধ্যেও। চেতনা নির্মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হত যদি, তাহলে প্রাণও হত অজর অমর ও মহাবীর্যের আধার। কিন্তু বস্তুত প্রাণকে আমরা দেখতে পাই কামনায় আবিল, শক্তি-হীনতায় পঙ্গু, মৃত্যুর দ্বারা কবলিত। মৃত্যু কামনা আর অশক্তি—প্রাকৃত জগতে এই তিনের অভিশাপ প্রাণের 'পরে। তবুও বলব, এও নিরর্থক নয়, এও প্রকৃতি-পরিণামের একটা অঙ্গ।

মূঢ় জড়ের বুকে প্রাণ ফুটিয়ে চলেছে চেতনার রূপ। জড়ের সঙ্গে তাই দেখি প্রাণের একটা অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব। জড়কে আত্মসাৎ করে চেতনার নতুন-নতুন বাহন গড়তে চায় প্রাণ; আবার আড়ষ্টতার মূঢ় ভারে জড় চায় প্রাণকে পিষে মারতে। শিশু-প্রাণ চারদিক হতে জড়শক্তির অজস্র হানাতেও কী করে যে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখে কলায়-কলায় উন্মিষিত করে, সে একটা বিস্ময়কর রহস্য। তখনই এই প্রাণের মূলে অদম্য এক ইচ্ছাশক্তির প্রেরণাকে না মানলে চলে না। এ-ইচ্ছা চিৎশক্তির রূপ গড়বার ইচ্ছা। রূপসৃষ্টির মূলে কিসের তাগিদ?—আর-কিছুরই নয়, শুধু আত্মচেতনার প্রশান্ত গভীরতা হতে আপনাকে উৎসারিত করবার একটা উল্লাস ছাড়া।

চিৎশক্তির এই উল্লাস প্রাণের গভীরে জাগিয়েছে এক অতর্পণ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা। প্রাণ বুভুক্ষু। তার বুভুক্ষাই 'কামনা'। আধারের স্বচ্ছতার তার-তম্যে কামনার স্থূল-সূক্ষ্ম নানান রূপ, তার তর্পণেরও অসার্থক-সার্থক নানান ভঙ্গি। দেহের কামনা স্থূল, তার তৃপ্তি মূঢ় অনিশ্চিত ও অসার্থক। যতদূর

জড়ত্বের এলাকা, ততদূর কামনাতর্পণের এই একই চেহারা। কিন্তু মনের মধ্যে এসে কামনার ফোটে সূক্ষ্মতর একটা রূপ, প্রাণের পরিতর্পণের একটা নতুন ভঙ্গি। কামনার বস্তুকে তখন যেমন বাইরে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় অন্তরেও। বস্তুর জগৎ দেখা দেয় ভাবের জগৎ হয়ে। আত্ম-আস্বাদনের ভিতর দিয়ে প্রাণ তখন খুঁজে পায় তৃপ্তির একটা নতুন পথ।

তবু আধার বা আশ্রয়ের বাধাকে অতিক্রম করা প্রাণের পক্ষে সহজ হয় না। চিৎশক্তির উল্লাস প্রাণের মূলে—সে-উল্লাস অনন্ত ; কিন্তু জড়ের আধার সান্ত। প্রাণের অনন্ত বুভুক্ষা সান্ত আধারে তাই তৃপ্ত হয় না। প্রাণ চায় অনেক-কিছু, অথচ পায় না ; তার সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নাই। একটা প্রচণ্ড শক্তির অভিমান অন্তরে বহন করেও নিজেকে সে পদে-পদে অনুভব করে অশক্ত আর বিড়ম্বিত। তারপর একদিন জড়শক্তির বাধা দুর্বার হয়ে ওঠে—অশক্ত প্রাণের অতৃপ্ত কামনার 'পরে মৃত্যু এসে টেনে দেয় অন্ধকারের যবনিকা।

খণ্ডিত মর্ত্য-প্রাণের এই নিয়তি। কিন্তু অখণ্ড দিব্য-প্রাণ 'বিজরো বিমৃত্যুঃ'—সে অতৃপ্ত নয়, অশক্ত নয়, মৃত্যুলাঞ্ছিত নয়। আমাদের প্রাকৃত চেতনায় এই দিব্য-প্রাণের স্বরূপ আড়াল হয়েছে অবিদ্যার আবরণে।

ভোগ আর ঐশ্বর্য—এ-দুয়ের একটা সহজ আকূতি রয়েছে প্রাণের মূলে। রসের পিপাসা তৃপ্ত হয় ভোগে, আর ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ঐশ্বর্যে বা ঈশনায় (mastery)। প্রাণ চায়, তার কামনা কোথাও যেন অতৃপ্ত না থাকে, তার ইচ্ছা কোথাও যেন হার না মানে। তার এ-চাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, কেননা বিশ্বপ্রাণের মূলেও এই আকূতি। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তাঁর ভোগ অফুরন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ ; তিনি আপ্তকাম, তিনি সর্বশক্তিমান। জীব তাঁরই স্ফুলিঙ্গ ; তাই কামনার তর্পণ আর শক্তির উল্লাস অকুণ্ঠ হ'ক—এ তো সে চাইবেই। কিন্তু যা সে চায়, তা পায় না—নিজের স্বরূপ আর সিদ্ধির পথটি তার জানা নাই বলে। এই হল অবিদ্যার আবরণ। জীবের মন এই অবিদ্যার বাহন।

মন মানুষের চেতনাকে খাটো করে রেখেছে, বিশ্বের সঙ্গে তাকে এক হতে দিচ্ছে না। আমরা দেহের কারায় বন্দী, আমাদের সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব-কিছু আবর্তিত হচ্ছে এই দেহটাকে ঘিরে। দেহে আটকা পড়েছি বলে জগৎটা আমাদের বাইরে। অথচ দেহের মধ্যে থেকেই জগৎটাকে আমরা

আনতে চাই হাতের মুঠায়। তা সম্ভব হয় না বলেই আমাদের কামনা অতৃপ্ত, আমাদের ইচ্ছা অশক্ত।

আধারের সঙ্কোচ হতে চেতনা মুক্তি পেত যদি, তাহলে প্রাণের রহস্য আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে যেত। তখন দেখতাম, কামনার তর্পণ আর ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য যতটা নির্ভর করে অনুভবের 'পরে, বাইরের বস্তুর 'পরে ততটা নয়। অনুভবের গভীরে যে-শিবস্বরূপ শুদ্ধ হয়ে আছেন, তিনি আপ্তকাম, তিনি স্ব-তন্ত্র। তিনি সব পেয়েছেন, সব করছেন। অথচ একটি তাঁর অনিরুদ্ধ আকূতি—এই নিরঙ্কুশ ভোগ আর কর্তৃত্বকে জড়ের আধারে মূর্ত করে তোলা। এইখানে তাঁর শুরু হয় সৃষ্টির তপস্যা। 'ভোক্তা মহেশ্বরের' চিদ্‌বীজ আধারে নিহিত আছে—তাকে ফুটিয়ে তোলাই হল প্রাণের দায়। আধারে এক ঝলকে অনায়াস হয়ে তা ফোটে না—ফোটে ধীরে-ধীরে, অনেক কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়ে। তাই প্রাণকে আধার বদলাতে হয় বারে-বারে। এই আধার-বদলানোর কাজটি মৃত্যুর; প্রাণের সে প্রতিষেধ নয়, তার দোসর। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই অমৃতত্বের পথ, দিব্যসম্ভোগ আর নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যের সাধনা—বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রাণের তপস্যার এই পরিচয়।

একবিংশ অধ্যায়

প্রাণের উদয়ন

অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের যে 'চিৎ-তপস্' বা সূর্যের মত চিন্ময় আত্মবিকিরণ, তা-ই হল প্রাণের স্বরূপ। উপনিষদের ঋষি এই চিৎ-তপস্‌কে বলেছেন প্রজ্ঞা আর প্রাণের একাত্মতা। প্রজ্ঞা প্রকাশধর্মী—সে যেমন স্বপ্রকাশ, তেমনি অপরের প্রকাশক। এইটি হল চৈতন্যের স্থাণুরূপ। কিন্তু তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জঙ্গমরূপ বা শক্তিরূপ। বিশেষ করে চৈতন্যের এই শক্তিরূপই হল প্রাণ। আগেও বলেছি, চৈতন্য শুধু যে প্রকাশ করে তা নয়—সে সৃষ্টিও করে। যেমন সূর্যের আলো—সে যেমন জগৎকে প্রকাশ করে, তেমনি আবার জীবের জীবনীশক্তিও সে। উদ্‌ভিদে সে-ই ফুল ফোটায়, পত্রহরিৎ সৃষ্টি করে তাকে বাঁচিয়ে রাখে, প্রাণিদেহে বিচিত্র রূপান্তরের কাজ করে চলে। আবার আরেকদিক দিয়ে দেখতে গেলে, যেখানে আলো আছে, সেখানে তাপও আছে। আলো প্রজ্ঞা, তাপ প্রাণ। আলো আর তাপ যেমন অবিনাভূত, প্রজ্ঞা আর প্রাণও তা-ই। দুইই এক অখণ্ড চৈতন্যের স্বভাবধর্ম।

আমাদের মধ্যে এই প্রজ্ঞা প্রাকৃত ভূমিতে ফুটেছে মন হয়ে। মনে যে রূপের ভাবনা, তাকে মূর্ত করে প্রাণ। তাইতে প্রাণ রূপকৃৎ। রূপ গড়তে হলে তিনটি জিনিস চাই—রূপের ভাবনা, রূপায়ণী শক্তি, আর রূপের উপাদান। আমাদের মধ্যে তারা যথাক্রমে দেখা দেয় মন প্রাণ আর জড়ের শক্তি হয়ে। জড় আর মনের মধ্যে প্রাণ যেন সেতুর মত। সাংখ্যকার তিনটিকে একই প্রকৃতির ত্রিগুণ পরিণাম বলেছেন—মন প্রকাশধর্মী বলে সত্ত্বের পরিণাম, প্রাণ প্রবৃত্তিধর্মী বলে রজের পরিণাম, আর জড় শেষপর্যন্ত স্থিতিধর্মী বলে তমের পরিণাম। এ-বিচার শক্তির দিক থেকে—তিনটি একই শক্তির পরিণাম। কিন্তু এই শক্তির মূলে রয়েছে চৈতন্যের প্রচোদনা (urge)। কাজেই মন প্রাণ জড়কে চিৎপরিণামও বলতে পারি। বিশ্বমূল তত্ত্বকে আমরা চিন্ময় বলেছি, অতএব আমরা এই দৃষ্টিই আশ্রয় করব। আর তাইতে বলব, প্রাণ ব্রহ্মের চিৎ-তপস্। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আরও বলব, আমাদের মনে প্রাণে এবং

দেহে চৈতন্যের একটা ক্রমিক সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে। মনের মধ্যে চৈতন্য উজ্জ্বল, প্রাণে চঞ্চল এবং আবিল, আর দেহে আচ্ছন্ন এবং সম্মূঢ়।

ক্রিয়াশক্তিরূপে এই সঙ্কোচ ঘটায় প্রাণ—মনশ্চেতনাকে সে-ই দেহের জড়ত্বে বন্দী করে। কিন্তু এই সঙ্কোচের ক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে একটা প্রসারণেরও ক্রিয়া—অখণ্ডদৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দ যেমন আত্মসঙ্কোচনের দ্বারা সংবৃত্ত (involved) হচ্ছেন জড়াণুতে, তেমনি আবার ওই অন্ধতমিস্রা হতে আত্মপ্রসারণের পর্বে-পর্বে উজিয়ে চলে বিবৃত্ত (evolved) হচ্ছেন নিজের স্বরূপজ্যোতিতে। যেমন অবতরণের, তেমনি এই উত্তরণের ক্রিয়াও প্রাণের। রূপকৃৎ প্রাণ ভাটার স্রোতে যেমন সত্তার কুমেরুতে সৃষ্টি করছে জড়ের রূপাণু, তেমনি আবার উজান ধারায় সুমেরুতে অপাবৃত করছে চিদাকাশ। আমাদের সমস্ত প্রগতির মূলে প্রাণের এই উজান বওয়ার তপস্যা। এখন সমগ্র দৃষ্টিতে প্রাণের এই উদয়নের একটা বিবৃতি দেব।

বিশ্ব জুড়ে রূপের মেলা ; ধীরে-ধীরে তার মধ্যে চেতনার ঐশ্বর্যকে ফুটিয়ে তোলাই হল প্রাণের সাধনা। এ-সাধনা চলছে পর্বে-পর্বে—জড়ের ভূমিতে, প্রাণনের ভূমিতে (এরই একটা অংশকে আমরা সাধারণত চিহ্নিত করি প্রাণ-লীলা বলে), আর মনের ভূমিতে। সর্বত্র একই প্রাণের খেলা, কিন্তু পর্বভেদে তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রাণ রূপকৃৎ। জড়জগতে সে গড়ছে পরমাণুর রূপ। পরমাণুতে আমরা পাই জড়ের চরম খণ্ডতার পরিচয়। পরমাণু বলতে গেলে আপন স্বাতন্ত্র্যে অনড়। জড়বিশ্বের সে ভিত্তি। তবু তার মধ্যে আছে দানা বাঁধবার তাগিদ ; নইলে বিশ্বে রূপের বৈচিত্র্য দেখা দিত না। এই তাগিদের মূলে একটা ইচ্ছা নিশ্চয় আছে—যদিও তা অস্ফুট। যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে চেতনাও আছে। কিন্তু জড়জগতের এ-চেতনা আমাদের জাগ্রত-চেতনার মত ব্যষ্টির তীক্ষ্ণ চেতনা নয়, তা সমষ্টির অব্যক্ত চেতনা। প্রাণ আর চেতনা দুইই সেখানে ফুটেছে শক্তির তমোঘন অন্ধতায়। প্রাণের উদয়নের এই প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বে দেখা দিল, আমরা যাকে বিশেষ করে প্রাণ নাম দিয়েছি, সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন শক্তির জগৎ। অব্যক্ত ইচ্ছার প্রেরণায় পরমাণুরা এখানেও জীব-দেহে দানা বাঁধছে ; কিন্তু সেই দানাবাঁধা বস্তুপিণ্ডের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রাণের একটা নতুন ধর্ম—বুভুক্ষার আকারে। জীবদেহ নিজেকে আলাদা করে রাখে অপরথেকে—এইখানে সে জড়-পরমাণুর সগোত্র ; কিন্তু সেইসঙ্গে

অপরকে আত্মসাৎ করে সে আপন করে নেয়—এই তার বৈশিষ্ট্য। এই বুভুক্ষা হতেই প্রাণের জগতে সংঘর্ষের সৃষ্টি, কামনা অশক্তি ও মৃত্যুর উদ্ভব—সেকথা আগেই বলেছি।

প্রাণের উর্ধ্বায়নের এই দ্বিতীয় পর্বটা বড়ই জটিল। জড়াণু একলা থাকে, অপরকে সে আপন করে নেয় না; কিন্তু জীবাণু একলা থেকেও অপরকে আপন করে নেয়—গ্রাস করে। এইথেকে শুরু হয় হানাহানি। এটা হল মন্দের দিক। আবার ভালর দিক হল—এরই মধ্যে বংশবিস্তারের এবং দল বাঁধার প্রেরণায় ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধের ঝাঁঝটা কমে আসে, পরকে গ্রাস না করে আপন করবার একটা সম্ভাবনা উঁকি দেয় উত্তাল বিক্ষোভের মধ্যে।

অন্ধ প্রাণের মধ্যে মনের চোখ ফোটে যখন, তখনই এটা সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে দেখা দেয় প্রাণের উদয়নের তৃতীয় পর্ব। বর্তমানের মানুষ আছে দুটি পর্বের মাঝামাঝি। তার জান্তব দিকটা এখনও বহির্মুখ এবং বুভুক্ষু—সেখানে হানাহানিই জীবনের আইন। কিন্তু তার মানব দিকটা অন্তর্মুখ এবং ভাবুক—সেখানে প্রেমের জগতে ফোটে স্বপ্নের ফুল। পরকে আপন করা যায় গ্রাস করে নয়—ভালবেসে, নিজেকে পরের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে; কামনার তৃপ্তি বাইরে নয়—অন্তরের উন্মীলিত চেতনার গভীরে; শক্তির পরিচয় জিগীষায় নয়—আত্মবিসর্জনে: মানুষের প্রবুদ্ধ মন স্পষ্টভাবে এই কথাগুলি ভাবতে শিখেছে। তাইতে প্রাণেরও রূপবিবর্তনের ধারা মোড় নিয়েছে ভিতরের দিকে।

কথাটা এই। চেতনার বাহনরূপে জড়কে রূপায়িত করবার যে-দায় ছিল প্রাণের 'পরে, তা বলতে গেলে চুকেছে মানুষের মধ্যে এসে। আদিম প্রাণীর তুলনায় মানুষের দেহ ক্ষুদ্র দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু সেই দেহেই চিৎ-শক্তির প্রেরণায় যে-মনের সৃষ্টি হয়েছে, সে আবিষ্কার করেছে বহিঃপ্রকৃতিকে বশে আনবার কৌশল—আর তার চাইতেও বড় কথা, অন্তঃপ্রকৃতিতে স্বরাট্ হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। বাইরের জগৎ হতে একমাত্র মানুষই গুটিয়ে এসেছে ভিতরে, আর সেইখানে গড়ে তুলছে চিন্ময় ইষ্টার্থের (values) একটা বাস্তব কল্প-লোক। মানুষের দেহ হয়তো আর বেশী বদলাবে না; কিন্তু সেই দেহের মধ্যেই ঘটছে এবং ঘটবে চেতনার বিস্ময়কর দ্রুত বিবর্তন। প্রাণ অন্তর্মুখ হয়েছে তারই মধ্যে।

এইহতে শুরু হল তার উদয়নের তৃতীয় পর্ব। এ-পর্বের মৌল বিধান হানাহানির নয়—প্রেমের, একথা আগেই বলেছি। আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই সবাইকে পাওয়া যায়, এবং সেইসঙ্গে নিজেকেও পাওয়া যায় আরও গভীর করে—এই তত্ত্বের 'পরেই মানুষের পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের ভিত্তি। মন এটুকু বুঝেছে, কিন্তু জীবনে ফলিয়ে তুলতে পারেনি পুরাপুরি। সেই পুরানো হানাহানির ভাবটা এখনও তার মধ্যে প্রবল। আধারের নিরেট জড়ত্ব, প্রাণের লোলুপ অস্বচ্ছতা আর মনের অহমিকা-ক্লিষ্ট অন্ধতাই এর জন্য দায়ী। মনঃকল্পিত কোনও আদর্শবাদই এ-অবস্থায় মানুষের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না অতিমানসের শক্তি এসে আধারের গভীরে ওই অন্ধশক্তির দুর্গগুলিকে ভেঙে দিচ্ছে। এ যখন সম্ভব হবে, তখনই আমরা জীবনসমস্যার সত্য সমাধান খুঁজে পাব তৃতীয় পর্ব হতে চতুর্থ পর্বে প্রাণের উদয়নে।

অবশ্য সমস্যার সমাধান সহজ নয়। পদে-পদে তার অনেক বাধা। সেই-গুলিই এবার আমাদের খুঁটিয়ে বুঝতে হবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

প্রাণের সঙ্কট

এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দই জগতের আকারে বহু হয়েছেন। এই বহুকে দেখছে মন। টুকরা-টুকরা করে দেখা তার স্বভাব, তাই বহুকে সে দেখে তার পিছনকার এককে বাদ দিয়ে। তার ফলে, যেখানে অখণ্ডের ভূমিকায় বহুর সমাবেশ দেখা দিত একেরই বিভূতির বৈচিত্র্যরূপে, সেখানে দেখা দেয় বিরোধ—পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি আর হানাহানি। মনের এই খণ্ডদর্শনের ফলে মানুষের জীবন নানা সমস্যায় জটিল হয় ওঠে। সে তার সমাধান চায়। একটা উপরভাসা সমাধান আসে ভাবনার জগতে, কিন্তু মনের সমাধান সার্থক হওয়া চাই প্রাণের সমাধানে—কর্মে ও জীবনে ভাবনার রূপায়ণে।

বিশ্বে পরপর প্রাণের তিনটি রূপ ফুটেছে—জড়ে এক মগ্নচৈতন্যের লীলায় প্রাণের অন্নময় (physical) রূপ, তার পর অর্ধস্ফুট চেতনায় তার প্রাণময় (vital) রূপ এবং অবশেষে উন্মিষিত চেতনায় তার মনোময় (mental) রূপ। প্রাণ যখন এই মনের ভূমিতে উঠে আসে, জীবনের সমস্যাগুলি তখনই জটিল আকার ধারণ করে, কেননা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে একমাত্র মনই—অর্ধচেতন প্রাণ বা সম্মূঢ়চেতন জড় নয়। মন মুখ্যত সমস্যার সমাধান করতে চায় বিদ্যার দ্বারা, কেননা একটু তলিয়ে দেখলেই সে বুঝতে পারে, তার অবিদ্যা বা খণ্ডভাবনাই যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে ; জড়কে প্রাণকে এবং নিজেকে সে পুরাপুরি জানতে পারে না বলেই তাদের বশেও আনতে পারে না। তার জ্ঞানের সঙ্কোচই আনে শক্তির এই দীনতা। অথচ অতিমানসেরই অন্ত্যবিভূতি বলে এই অবিদ্যা আর অশক্তি কাটিয়ে ওঠবার একটা গভীর আকূতি তার মধ্যে গোপন রয়েছে। তারই প্রেষণায় নিজেকে জেনে সে চায় স্বারাজ্যের মহিমা, জগৎকে জেনে চায় বৈরাজ্যের অধিকার। সে বোঝে, বিশ্ব জুড়ে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের যে অবাধিত চৈতন্য, অফুরন্ত আনন্দ আর অকুণ্ঠ শক্তির উল্লাস, তাকে অধিগত করাই তার দিব্যনিয়তি। আর মনোময় প্রাণের অনুপহত বীর্যই তার সাধন। এই সিদ্ধিতেই জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

প্রাণকে আমরা বলেছি 'চিৎ-তপঃ' অথবা চৈতন্যের তপঃশক্তি। এও বলেছি, বস্তুত চৈতন্য আর শক্তি ওতপ্রোত; প্রাণের লীলায় পাই এই মাখা-মাখির নিত্য পরিচয়। আমরা মানুষ, আমাদের জীবনের মুখ্য সাধন হল মন; মনের স্পন্দনেই আমরা জেগে আছি। কিন্তু আসলে মন স্পন্দিত হচ্ছে প্রাণের শক্তিতে। মনের চেতনায় চলেছে প্রাণেরই একটা অতন্দ্র তপস্যা। বাইরেথেকে দেখতে গেলে সে-তপস্যা জানবার এবং পাবার। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে আবার 'হওয়ার' তপস্যা। মানুষের মন আরশির মত অবশভাবে বাইরের চলচ্চিত্রটাকে বুক পেতে নিচ্ছে শুধু, তা নয়। অজানাকে সে জানতে চাইছে, বিশ্বের সব-কিছুকে পেতে চাইছে হাতের মুঠায়। এই জানাতে আর পাওয়াতে তার যে-আনন্দ, তাইতে অন্তরে সিদ্ধ হচ্ছে তার হওয়ার সাধনা। এমনি করে বৃহৎ হওয়ার আত্মসচেতন আনন্দে চলছে চিৎ-তপসের উত্তরায়ণ, ফুটছে প্রাণের উদয়নের লীলা। চৈতন্যে আর শক্তিতে সেখানে মাথামাখি; কেননা সমস্ত ব্যাপারটাই হল অন্ধতা হতে চৈতন্যের ক্রমিক স্ফুরণ। চৈতন্য যে ফুটছে, একে-একে মেলছে তার হাজার দল—এতেই তার শক্তির পরিচয়। তা-ই প্রাণের তপস্যা।

চৈতন্য আর শক্তির ওতপ্রোতভাবের চারটি চেহারা। প্রথম ব্রহ্মে—অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের নিঃসীম পরিপূর্ণতায়। চৈতন্য আর শক্তিতে সেখানে নিত্যযোগ। ব্রহ্ম সর্ববিৎ. আপ্তকাম—তিনি সব জেনে আছেন, সব পেয়ে আছেন; তাই তিনি পূর্ণ শান্ত এবং অদ্বৈত। কিন্তু তাবলে তিনি শক্তিহীন নন। পরব্রহ্ম চিৎস্বরূপ অথচ শক্তিহীন—এ হল আমাদের আতুর মনের কল্পনা। প্রাকৃত চেতনা উজান বইতে গিয়ে ব্রহ্মের মধ্যে সব-কিছুকে হারিয়ে ফেলে; এখানকার সকল জানার আর সকল পাওয়ার তার অবসান হয় মনশ্চেতনা এবং প্রাণবাসনার নির্বাণে। কিন্তু নদীর সর্বনাশেই যে সাগরের পূর্ণতায়, নদীরও পূর্ণতা। মনের একপেশে নজর এ-সত্যটা এড়িয়ে যায়। আসলে শক্তিকে বুকে নিয়েই শিব পূর্ণ; শিব-শক্তি সেখানে অভেদ।

জড়ে দেখি ঠিক তার উল্টা। সেখানে চেতনার সন্ধান পাই না, দেখি শুধু শক্তির আলোড়ন। কিন্তু এ-দেখার মূলে আছে আমাদের খণ্ডিত মনের মায়া। একনজরে সবটা চোখে পড়লে দেখতে পেতাম, ব্রহ্মে যেমন চৈতন্য শক্তিহীন নয়, জড়েও তেমনি শক্তি চৈতন্যহীন নয়। জড়শক্তির মধ্যেও

চৈতন্য আছে, কিন্তু আছে প্রাকৃত-মনের কাছে অস্ফুট হয়ে। চৈতন্য আর শক্তির এই আরেকধরনের মাখামাখি।

অস্ফুট চেতনা স্ফুটতর হয়ে চলেছে—এই হল তার শক্তির পরিচয়। চৈতন্য আর শক্তির একটা লুকাচুরি খেলা—এরই নাম জগৎ। এইখানে চৈতন্য আর শক্তির আরেকধরনের মাখামাখি—বিরোধ আর কৃচ্ছ্রতায় কণ্টকিত মন্থর পরিণামের পথে। চৈতন্য আর শক্তি একবার কাছাকাছি আসছে, আবার ছিটকে পড়ছে—এই দ্বন্দ্ব আমাদের অন্তর জুড়ে। ভাবে যাকে পাই, রূপে তাকে পাই না—এই অশক্তির বেদনা আমাদের নিত্যসঙ্গী। ভাবের রাজ্যে দেখি, চৈতন্যের পূর্ণশক্তি; রূপসিদ্ধি তখন কত সহজ। কিন্তু বস্তুর রাজ্যে—কি নিজের মধ্যে, কি জগতে—ভাবকে রূপ দেওয়া কত কঠিন। অথচ এই কঠিনের তপস্যাই প্রাণ করে চলেছে চিৎশক্তির বাহন হয়ে।

কঠিন সহজ হবে, প্রাণের দুশ্চর তপস্যায় মন যখন উত্তীর্ণ হবে অতিমানসে। শক্তি আর চৈতন্যে মাখামাখির তখন দেখা দেবে আরেক রূপ। শিবের বুকে শক্তি ঘুমিয়ে নয় তখন, কিংবা অন্ধ জড়শক্তির তাণ্ডবের তলায় চৈতন্য শব হয়েও পড়ে নাই; পরস্পরকে পূর্ণরূপে পাওয়ার কৃচ্ছ্র-মন্থর তপস্যা তখন সার্থক হয়েছে দুয়ের এক অনির্বচনীয় সামরস্যের উল্লাসে। সর্ববিৎ আপ্তকাম ব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে তখন ঝলমল করছে তারই গভীর হতে উচ্ছ্বসিত শক্তির ষোড়শী পূর্ণিমা। মনের সব জানবার আর প্রাণের সব পাবার উৎশিখ আকুতির তর্পণ সেখানে নিত্যসিদ্ধ ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণে। এইখানে অতিমানসের সাম্রাজ্য।

নানা সঙ্কট পার হয়ে এই অতিমানসকে মর্ত্যভূমিতে সিদ্ধ করাই হল প্রাণের তপস্যা। তাকে ব্যাহত করছে, এমন তিনটি সঙ্কটের কথা বলতে পারি; তিনেরই মূলে আছে চৈতন্য আর শক্তির একটা অসামঞ্জস্য। চেতনায় যা ভাসে শক্তিতে তা ফোটে না, ভাব ভাব হয়েই থাকে, জীবনে রূপ ধরতে চায় না—মানুষের এই হল বিপত্তি।

প্রাণের প্রথম সঙ্কট—মানুষের সঙ্কীর্ণ আত্মজ্ঞান। দেহ-প্রাণ-মনের বাইরে মানুষ নিজের সম্পর্কে কিছুই জানে না; অথচ তার প্রাকৃত জীবনের এই জ্ঞানটুকুও নিতান্তই ভাসাভাসা। অসহায় মানুষ পদে-পদে অনুভব করে, সে যেন একটা অন্ধশক্তির খেলার পুতুল। এ-শক্তিকে বুঝতে না পেরে সে

বলে মায়া; কিন্তু এ যে তারই মনের মায়া, তা তার খেয়ালে আসে না। অন্তরের গভীরে চেতনার বিস্ফারণের একটা স্বচ্ছ বোধ এবং সে-বোধ হতে আধারে শক্তির একটা নির্বারিত তরঙ্গায়ণ—এই সহজ অনুভব হতে যদি তার জীবনের যাত্রা শুরু হত, তাহলে মুক্তির সঙ্গে সিদ্ধির মিতালিতে তার অভিযান হত প্রভাস্বর।

মানুষ যে শুধু নিজেকে জানে না তা নয়, বিশ্বকেও সে জানে না—এই হল তার জীবনের দ্বিতীয় সঙ্কট। বাইরে জগতের জ্ঞান যতই আমাদের বাড়ে, অন্তরে আমরা ততই দেউলিয়া হয়ে যাই—এ আমাদের এক দুর্মোচন অভিশাপ। নিজের হৃদয়ের গভীরে ডুবতে পারি না, সেই গভীরের স্বচ্ছতা দিয়ে অপরকে অনুভব করতে পারি না আত্মার আত্মীয়রূপে—অথচ আমরা সমাজ গড়ি রাষ্ট্র গড়ি মনঃকল্পিত আদর্শের ঠ্যোকাঠুকি আর গোঁজামিল দিয়ে। আমাদের ব্যক্তির জীবন তাই যেমন মূঢ়, বিশ্বের জীবনও তেমনি একটা কুরুক্ষেত্র।

জীবনের তৃতীয় সঙ্কট, আমাদের নিজেদের মধ্যেই চৈতন্য আর শক্তির বিরোধে। দেহ প্রাণ আর মন—আমাদের এ-তিনটিতে বনিবনাও হয় না কোনদিন, কেউ কারও দাবিকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া, সত্তার গভীরে রয়েছে চিৎশক্তির নিজেকে ফোটাবার একটা অদম্য আকুতি; প্রতিমুহূর্তেই সে চায় বর্তমানের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যেতে। যা হয়ে আছে, মানুষ তাতে তৃপ্ত নয়—সে চায় আরও বড় হতে। কিন্তু তার বর্তমানের হওয়াটারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। নিজেকে একটা স্থির রূপ দিতে এবং স্বভাবকে পুষ্ট করতে একজায়গায় খুঁটি গেড়ে বসাও তো তার দরকার। তাই স্থিতিতে আর গতিতে নিত্যসংঘর্ষ মানুষের জীবনে অনিবার্য। সংঘর্ষের সমাধান হতে পারত, বোধির আলো যদি স্বচ্ছ থাকত। কিন্তু দেহের জড়তায়, প্রাণবাসনার বিক্ষোভে আর মনের কুয়াসায় সে-আলো নিষ্প্রভ। তাই জীবনভোর আধারের বাইরে-ভিতরের দ্বন্দ্ব কিছুতেই যেন আর মিটতে চায় না।

এই তিনটি সঙ্কটের সমাধান মনের চাতুরীতে হবার নয়। নিজেকে জানা, পরকে পাওয়া আর নিজের ঘর সামলানো তিনটিই কঠিন সাধনা। সিদ্ধির জন্য ডুবতে হবে নিজের অতলে, নিস্পন্দ মনের আরও গভীরে—যেখানে আমার সত্তায় আর অপরের সত্তায় ভেদ নাই, যেখানে অতিমানস চেতনার জ্যোতিঃকন্দ হতে উচ্ছ্রিত হয়েছে সিদ্ধতপা প্রাণের চিত্রসুষমাময় মঞ্জরী।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চৈত্য-পুরুষ

ব্রহ্মই জগৎ হয়েছেন—জগতের স্থূল উপাদানরূপে নেমে এসেছেন একেবারে জড় পর্যন্ত। সেই জড়ের মধ্যে অন্তর্গূঢ় তাঁর যে চিৎ-শক্তি, তা-ই অণু-প্রমাণ জীবের ভিতর দিয়ে প্রাণের সংবেগে উজিয়ে চলেছে আবার সেই ব্রহ্মের দিকে। ব্রহ্মই জীব হয়েছেন, আর জীব ব্রহ্ম হয়ে উঠছে—সৃষ্টি জুড়ে শক্তির এই অবতরণ আর উত্তরণের দোলা। এর মধ্যে ব্রহ্ম আর জীবের মাঝে বিভাবনার (manifold becoming) একটা সমান্তরলতা আছে। ব্রহ্মের চারটি বিভাবের (aspect) পরিচয় আমরা পেয়েছি : ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ এবং অতিমানস। দেখেছি, জীবে তাঁর অতিমানস হয়েছে মন, তাঁর চিৎ-শক্তি বা 'চিৎ-তপস' হয়েছে প্রাণ। পরে দেখব, তাঁর সদ্-ভাব (Being) হয়েছে বিশ্ব-জড়, যা জীবদেহের মুখ্য উপাদান। দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে আমরা মানুষ—ব্রহ্মের তিনটি বিভাব আমাদের মধ্যে অভিব্যক্ত। তাঁর চতুর্থ বিভাব যে-আনন্দ, সেটি কোথায় গেল? আমাদের মধ্যে সে কোন্ রূপে ফুটে উঠেছে—এবার তার সন্ধানে বের'তে হবে। আভাসে বুঝতে পারছি, প্রাণের সঙ্গে এই আনন্দতত্ত্বের একটা নিবিড় যোগ আছে। প্রাণ বুভুক্ষু, তার মধ্যে সম্ভোগের বাসনা প্রবল। আর সম্ভোগেই আনন্দের স্ফুরণ। অতএব এই আনন্দ তত্ত্বটিকে আমরা আমাদের প্রাণের অন্দরমহলেই খুঁজে পাব।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও আন্দাজ করতে পারছি, প্রাণের তর্পণ আর আনন্দ আমাদের মধ্যে ঠিক একজাতের নয়। আগেরটি যেন কিছুটা স্থূল—যদিও চেতনার বিস্ফারণ হেতু বিশ্বপ্রাণের উল্লাসে এই স্থূলতা নাই ; কিন্তু আনন্দ একটা সূক্ষ্ম সুকুমার তত্ত্ব—যার সঙ্গে মনের যোগ গভীর। আর মন নিয়েই মানুষ ; তাই অনুমান করা যেতে পারে, এই আনন্দতত্ত্বটিও বিশেষ করে মানুষের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। প্রাণের উদয়নের তৃতীয় পর্বে বুভুক্ষু প্রাণকে দেখি আত্মত্যাগের দীক্ষা নিতে—সে ভালবাসতে শিখেছে। আর সেই ভালবাসার করণ (organ) হল 'হৃদয়'। মনে হয়, এইখানেই আমরা ব্রহ্মের আনন্দবিভাবের দেখা পাব।

চৈত্য-পুরুষ

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। তাঁর আনন্দের উচ্ছলনে এই জগতের সৃষ্টি। এর প্রতি পর্বে প্রাণের যে-তপস্যা চলছে, তার লক্ষ্য চেতনার কাছে ওই আনন্দরূপটি ফুটিয়ে তোলা। জড়ভূমিতে প্রাণ সুপ্ত, আনন্দ স্তিমিত; তবুও প্রাণের আনন্দ যে সেখানেও আছে, তা বোঝা যায় নিরোধ-সমাধির বিপুল ও গভীর স্তব্ধতা দিয়ে। প্রাণভূমিতে প্রাণ বুভুক্ষু, আনন্দ সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত; অথচ বুভুক্ষু প্রাণ স্বার্থের তর্পণে আনন্দকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে। বিশুদ্ধ মনের ভূমিতে প্রাণ উদার—তার আনন্দ আত্মবিসর্জনে, আনন্দ প্রেমে। তারও ওপারে অতিমানস-ভূমিতে প্রাণ চিন্ময়, আপ্তকাম, অনিরুদ্ধ শক্তিতে নির্ঝরিত হয়ে ফুটিয়ে চলেছে সৃষ্টির ফুল। তার আনন্দ সবার মধ্যে এককে এবং একের মধ্যে সবাইকে পাওয়ার নিবিড় সাযুজ্যবোধে (communion)।

এই আনন্দ আমাদের মধ্যেও আছে। আমাদের দেহ আছে, প্রাণ আছে, মন আছে; তারও গভীরে আছে চেতনার নিরঙ্কুশ আনন্দসম্ভোগের শক্তি। এই শক্তি যাঁর স্বভাব, উপনিষদ্ তাঁকে বলছেন 'পুরুষ'; দেহ-প্রাণ-মনের তিনমহলা পুরীতে সঙ্গোপনে শয়ান তিনি—তিনি আছেন বলেই তাঁকে কেন্দ্র করে ওদের কাজ চলছে।

আমাদের মধ্যে এই পুরুষের দুটি রূপ—একটি কাম-পুরুষ, আরেকটি চৈত্য-পুরুষ। কাম-পুরুষকে আমরা সবাই চিনি, জীবনের বহিরঙ্গন তার কলরবে নিত্যমুখর। প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে তার কারবার—তাদের নানা ঝামেলায় সে উদ্‌ভ্রান্ত, সেও রসের সন্ধানী; কিন্তু তার মূঢ়তায় আর ক্ষিপ্ততায় জীবনের সব রসই তার কাছে বিরস হয়ে ওঠে।

প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের গভীরে আছে শুদ্ধ দেহ-প্রাণ-মনের এলাকা, যেখানে তাদের স্বভাবের বিপর্যয় ঘটেনি। দেহ-প্রাণ-মন সেখানে চেতনারই শুদ্ধ বিভূতি—তাদের স্বরূপ বোধময়। এই অপ্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে যাঁর কারবার, তিনিই চৈত্য-পুরুষ। প্রাকৃত জীবচেতনার অন্তঃপুরে তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্যজীব।

কাম-পুরুষ অহঙ্কারী। তার অহঙ্কার সঙ্কীর্ণ, নিজের ছোট্ট একটি গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উগ্র এবং অসহিষ্ণু। সে কেবল পরের অহঙ্কারকে গুঁতিয়ে বেড়ায়, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে অপরের অহংকে জীর্ণ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বহির্মুখ প্রাকৃত-চেতনার এই অভিশাপ। সে-চেতনা জগৎকে জানে ইন্দ্রিয় দিয়ে—টুকরা-টুকরা করে; তাই মৌচাকের আলাদা-আলাদা খোপ-

গুলিই তার নজরে পড়ে, তাদের গভীরে অখণ্ড একরসের স্বাদটুকু সে পায় না। গভীরে ডুবতে গিয়ে সে তলিয়ে যায় অবচেতনার নিদ্মহলে ; সেখানে সব ছায়ার মায়া, এক মূঢ় অন্ধশক্তির উৎক্ষেপ। জাগ্রতের বহিশ্চেতনা, আর স্বপ্নের অবচেতনা—এই নিয়ে কাম-পুরুষের এলাকা।

চৈত্য-পুরুষ আছেন 'অধিচেতন' (subliminal) ভূমিতে। প্রাকৃত-চেতনা এই অধিচেতনার খবর রাখে না, যদিও তার অনেক আলোরই ইশারা আসে ওইখান থেকে। অধিচেতনা অবচেতনার মতই গভীর, কিন্তু তমসাচ্ছন্ন নয় ; সেখানে জ্বলছে বোধির মণিদীপ্তি। প্রাকৃত চেতনার পরিসর স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ ; তাই সেখানে বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতার বোধ আচ্ছন্ন এবং বিকৃত। কিন্তু অধিচেতনাতে এই বোধ সুস্পষ্ট ; সেখানে ব্যক্তির অহং নিজের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও অপরের অহংকে আপন করে নিতে পারে। এই অধিচেতনায় চৈত্য-পুরুষের নিবাস বলে তাঁর অহন্তা কাম-পুরুষের মত খণ্ডিত নয়—তা বিশ্বযোগে উল্লসিত নিটোল পূর্ণাহন্তা।

বিশ্বের মধ্যে কাম-পুরুষ আছে খাপছাড়া হয়ে, তাই তার চেতনায় দ্বন্দ্বের আর অন্ত নাই। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব বলতে গেলে তার নিত্যসহচর। সুখ-দুঃখকে ছাপিয়ে এক শাশ্বত আনন্দের অনুভব যে থাকতে পারে, এ তার কল্পনার অগোচর। উদার বৈপুল্যের দৃষ্টিতে জগৎকে সে দেখে না, কোনও গভীরতর অর্থের সন্ধান তার মধ্যে করে না ; তাই তার চেতনা বাইরের অভিঘাতে সুখ-দুঃখের অভ্যস্ত দোলাতেই কেবল দুলতে থাকে, আরেকটু তলিয়ে গিয়ে দুঃখ-সুখের রসরূপটিকে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

চৈত্য-পুরুষ স্বরূপত আনন্দময়, তাই বিশ্বে এই রসরূপটি তাঁর কাছে নিত্য অনাবৃত। সুখ-দুঃখের বেদনা আছে জীবনে ; কিন্তু তার চাইতেও গভীর কথা, জীবনে রস আছে। যে শিল্পী, যে রসিক, একটুখানি দূরে থেকে স্তব্ধ থেকে অস্তিত্বের মর্মে দৃষ্টিকে বিঁধিয়ে যে দেখে, রসের বৃন্তে সে দেখতে পায় সুখ-দুঃখের জোড়া ফুল। চৈত্য-পুরুষের কাছে এ-অনুভব সহজ। উপনিষদের ভাষায় তিনি 'মধ্বদ'—জীবনের সমস্ত অনুভবেই মধুর রসের রসিক।

তিনি শুধু রসিক নন, তিনি শিল্পীও। তটস্থ থেকে তিনি শুধু আস্বাদন করেন না, গভীরে নেমে সৃষ্টিও করেন। কূটস্থ-পুরুষ উদাসীন, সুখ-দুঃখে নির্বিকার ; সেই ঔদাসীন্যকে আত্মসাৎ করেই চৈত্য-পুরুষ দুঃখের বেদনাকে রূপান্তরিত করতে পারেন স্বরূপানন্দের আস্বাদনে। এটি সহজ নয়—কিন্তু

তাবলে অসম্ভবও নয়; বরং নির্মুক্ত চেতনায় একেই বলি সিদ্ধির চরম। রসায়নের এই কৌশল জানেন বলেই গভীরে থেকে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে যুগ-যুগ ধরে চৈত্য-পুরুষ গড়ে চলেছেন তাঁর লোকোত্তর কল্পরূপ।

আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার অন্তরালে চৈত্য-পুরুষ গুহাহিত হয়ে আছেন অন্তরাত্মারূপে (Inner Being)। গীতার ভাষায়, পুরুষোত্তমের তিনি 'জীবভূতা পরা প্রকৃতিঃ', তাঁর 'অংশঃ সনাতনঃ'। উপনিষদের ভাষায়, তিনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ'—অধূমক জ্যোতির শিখায় হৃদয়ের গভীরে জ্বলছেন জীবনের ভূত-ভব্যের ঈশান হয়ে। এই আধারে নির্বিকার কূটস্থ পুরুষের তিনি প্রতিভূ—চিন্ময় শুদ্ধ বিকৃতিতে ইন্দুলেখার মত উপচে চলেছেন কলায়-কলায়। কাম-পুরুষে দেখি অপরা প্রকৃতির অশুদ্ধ বিকৃতি—আঁধারের দ্বন্দ্বে আলোর স্তিমিতি বা পরাভব; কূটস্থ-পুরুষ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে বিকৃতিহীন নিত্য জ্যোতি। আর চৈত্য-পুরুষে পরা প্রকৃতির শুদ্ধ বিকৃতি—কালের ছন্দে আলোকের উত্তরায়ণ। আমাদের জীবনে তিনি অভীপ্সার (aspiration) ঊর্ধ্বশিখা, হৃদয়ে রসচেতনার নিগূঢ় উল্লাস। তিনিই নিত্যজীব এবং সত্যজীব—সাধনাযজ্ঞের তিনিই ঋত্বিক এবং পুরোহিত।

প্রাকৃত জীবনের বহিরঙ্গনে কাম-পুরুষের ছন্নছাড়া মাতামাতি; তার অন্তঃপুরে চৈত্য-পুরুষের স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, নীরব দেশনা, সুগভীর রসবোধ। তাঁর নিত্যজাগ্রত প্রভাবের একটুখানি পরিচয় ফোটে এই প্রাকৃত চেতনাতেও বোধির ঝলকে, প্রতিভার সৃষ্টিনৈপুণ্যে, ওপারের আচমকা হাতছানিতে। গভীরে-গোপন এই চৈত্য-পুরুষকে চেতনার সামনে আনা জীবনের দিশারী-রূপে—অধ্যাত্মসাধনার এই হল প্রথম সোপান। তার জন্য অন্তর্মুখ হতে শিখতে হবে সবার আগে। বাইরের ডাকে মন কেবলই ছুটে বেরয়; একটুখানি তার রাস টেনে ধরতে হবে, যাতে ক্ষণেকের জন্যে সে থমকে দাঁড়ায়, গভীরের শূন্যতার দিকে একটিবার কান পাতে কোনও-কিছু শোনবার আশায়। এইটি অভ্যাস করতে হবে প্রত্যেক ভাবনায়, প্রত্যেক বেদনায়, প্রত্যেক কর্মে। অন্তরের অশ্রুত গুঞ্জন এমনি করেই স্পষ্ট হবে। ভাবনা ও কর্মের প্রেরণা আসবে তখন গভীর হতে। চৈত্য-পুরুষ হবেন জীবনের দিশারী, তার ছন্দ তখন হবে লঘু এবং অনায়াস।

চৈত্য-পুরুষের পরিপূর্ণ আবেশে জীবনে আসে তৈজস বা চৈত্য রূপান্তর (psychic transformation)। প্রাকৃত জীব পরিণত হয় অপ্রাকৃত সত্য-

জীবে, পরম-পুরুষের পরা প্রকৃতিতে। এ হল গভীরের সাধনায় জীবভাবের সিদ্ধি; কিন্তু একেই বলতে পারি না অধ্যাত্মসাধনার শেষ। শুদ্ধ জীবসত্তাকে ঘিরে একটা আলোর কুণ্ডলী তখনও থেকে যায়; পূর্ণচেতন হয়ে তাকে ভাঙ্‌বার জন্য দরকার হয় ব্যাপ্তির এবং ঊর্ধ্বায়নের সাধনা। বিশ্বভাব এবং ব্রহ্মভাবের সিদ্ধিতে আধারে তখন ঘটে চিন্ময় রূপান্তর (spiritual transformation)। কিন্তু এতে আধারের আমূল সম্যক-রূপান্তর নাও ঘটতে পারে। শুদ্ধ-জীবভাবকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে বা ব্রহ্মে মিলিয়ে দিয়ে চেতনার মুক্তিতেও শক্তির সিদ্ধি সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় না। তাই চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তরের পরেও অতিমানস রূপান্তরের (supramental transformation) একটা অপেক্ষা থেকেই যায়। তার কথা পরে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জড়

মন প্রাণ আর জীবচেতনার কথা বলা হল। তিনটিই চিৎশক্তির খেলা—তা-ই নিয়ে মানুষের শক্তিরূপ। সে-শক্তি আশ্রিত রয়েছে আরেকটি তত্ত্বে—আমরা যার নাম দিয়েছি জড়। জড়ের জগৎ আমাদের অতিবাস্তব প্রত্যক্ষের সত্য, তার অন্ধশক্তির উল্লাসকে আমরা খুব চিনি। এই জড়ের খানিকটা প্রাণময় মনোময় ও চিন্ময় হয়ে গড়েছে আমাদের দেহ। জড় দিয়ে গড়া একটা দেহ, তাকে আশ্রয় করেই ফুটেছে প্রাণ, ফুটেছে মন, ফুটেছে নিগূঢ় চৈত্যসত্তা। দেখে মনে হতে পারে, জড়ই বিশ্বের গোড়ার তত্ত্ব; জড়ের আধার না হলে প্রাণ মন আর চৈত্যসত্তা ফুটত কোথায়?

তখন প্রশ্ন হয়, জড়ের স্বরূপ কি? একদিন বৈজ্ঞানিকেরা ভাবতেন, জড় স্বয়ংসিদ্ধ নিরেট একটা-কিছু। আজ তাঁদের ভুল ভেঙেছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়কে ভেঙে তাঁরা পৌঁছলেন অতীন্দ্রিয় অতিপরমাণুতে। এইখানে এসে আর জড়ের পাত্তা পাওয়া গেল না; হঠাৎ দেখা গেল, জড় রূপান্তরিত হয়েছে শক্তিতে। নিরেট জড়ের জগৎ আসলে বৈদ্যুতিক শক্তির একটা উচ্ছ্বাস মাত্র। জড়ের কল্পনা মায়া, শক্তিই সত্য।

জড় নাই, আছে শুধু শক্তি—এতেও কিন্তু সব বলা হল না। বৈজ্ঞানিকেরা আঁক কষে শক্তির পরিচয় দিলেন, তাকে বশে আনবার কৌশল শেখালেন। এতে জড়ের মায়ার একটা দিক কিছু-কিছু বুঝলাম। কিন্তু চেতনার সঙ্গে জড়ের বা শক্তির সম্পর্কটা রহস্যই থেকে গেল। অতিপরমাণুরা নির্বিশেষ; অথচ সংখ্যা ও সংস্থানের বৈশিষ্ট্যে তারা সৃষ্টি করছে দৃশ্যজগতের বৈচিত্র্য। সে-বৈচিত্র্য আবার ধরা পড়ছে চেতনার কাছে। চেতনায়-পাওয়া এই বৈচিত্র্যকে কতগুলি অঙ্কের ফর্মুলায় তর্জমা করলেই কিন্তু সকল কথা পরিষ্কার হয় না। নির্দিষ্ট আয়তনের ও সংখ্যার বিদ্যুৎতরঙ্গ জীবদেহে ধাক্কা দিলে চেতনায় কেন লাল রঙ ফোটে, তার কোনও জবাব মেলে না। এই সামান্য ব্যাপারটার দুটি প্রান্তে মুখামুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে দুটি তত্ত্ব—শক্তি আর চৈতন্য।

শক্তি এল বিদ্যুৎতরঙ্গ হয়ে; চৈতন্য তার ছোঁয়ায় শিউরে উঠে বলল, তুমি লাল রঙ। শক্তি যেমন মৌল, এই অনুভবটাও তেমনই মৌল। বরং একদিক দিয়ে এই অনুভবেরই দাম বেশী। অনুভব হল জড় বা শক্তির অর্থ (Meaning)। চৈতন্য শক্তির অর্থ আবিষ্কার করে চলেছে—এই তার মহিমা।

ব্যাপারটাকে এইদিক থেকে দেখে দার্শনিক বললেন: জড় হতে চিৎ নয়, চিৎ হতেই জড়—এই হল আসল তত্ত্ব। প্রাকৃতমনের কাছে কথাটা হেঁয়ালি; কারণ, জড় তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটা নিরেট বস্তু, চৈতন্য কুয়াসার মত আবছা। অথচ বৈজ্ঞানিক বলছেন, জড়ের স্বরূপ হল শক্তি। শক্তি অতীন্দ্রিয়, কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য। এই ধারাতে আরেকটু উজিয়ে গেলে বলা চলে: শক্তিও আসলে চিৎশক্তি, আর এই চিৎশক্তি বোধিগ্রাহ্য; সুতরাং জড়ও চিৎশক্তির পরিণাম।

কথাটা বুঝতে হলে আমাদের মানস দৃষ্টির ধরনকে পালটে দিতে হবে। দেখছি, তথাকথিত জড় হতে চেতনায় সাড়া জাগে। তাইতে মন ভাবে, এখানে জড় নিয়ন্তা, চেতনা নিয়ন্ত্রিত—জড় আধার, চেতনা আধেয়। কিন্তু জড় সাড়ার নিমিত্ত ও আধার হলেও সাড়াটা আসলে চেতনার নিজস্ব সৃষ্টি এবং তা জড়ের অর্থও। তার চাইতেও বড় কথা, সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটাকে চেতনা নিরুদ্ধ করতেও পারে। এই নিরোধে পাই চেতনার স্বাতন্ত্র্যশক্তির পরিচয়। নিরোধের ফলে, চেতনা জড়ের মুখে কপাট দিয়ে নিজের মধ্যেই শক্তির উজান ঠেলে চলতে থাকে। চলার সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে ফোটে স্বাতন্ত্র্য আর ব্যাপ্তির বোধ। অবশেষে চেতনা পৌঁছয় শক্তির সেই গঙ্গোত্রীতে, যেখান থেকে বিশ্বের সমগ্র ধারা ও তার নিয়ন্ত্রণকে সে অনুভব করে আত্ম-সত্তার গভীরে এক অনির্বচনীয় আত্মবিসৃষ্টির প্রেতিরূপে। এই অতিমানস দৃষ্টিতেই জড় দেখা দেয় চিৎশক্তির পরিণামরূপে।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখি জড়ের ভূতরূপ; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে জড় শক্তিরূপ, আরও গভীরে দেখলে জড় বোধরূপ। শেষের দেখাটা দার্শনিকের বা বিজ্ঞানীর; জড়তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব হয় এই দৃষ্টিতে। জড়কে পরোক্ষভাবে পাই বাইরের জগতে, অপরোক্ষভাবে পাই নিজের দেহে। জড়ের সত্য স্বরূপের পরিচয় মিলবে এইখানে, যেখানে সে প্রাণ আর মনের বাহন। দেহবোধই জড়ের চিন্ময় রূপ। চেতনা সেখানে জড় হয়ে জড়কে জানছে নিজেরই একটা

ভঙ্গিরূপে, বাইরের নিরেট বস্তুপিণ্ডরূপে নয় শুধু। এই সূত্র ধরে চেতনার ব্যাপ্তি ঘটাই যদি, বিশ্বচেতনায় পাই বিশ্বদেহের অনুভব। রূপকে তখন অনুভব করি অরূপের ছটা বলে। চিতের জড়ে পরিণামের এই সত্য।

অতিমানসের অখণ্ডতায় আত্ম-আস্বাদনের আনন্দে চিৎ-শক্তির স্পন্দন: সমুদ্রের অন্তর্জ্যোতি জ্যোৎস্নাতরল বীচিভঙ্গে ঝিকিয়ে উঠল যেন। অখণ্ডের ভূমিকায় ফুটল বিশ্বমনের খণ্ডভাবনার চিন্ময় কল্পনা। তাকে রূপ দেবার ভার নিল প্রাণ—ওই চিৎশক্তিরই স্পন্দনরূপে। রূপের আধার হল জড়; সে ওই প্রাণস্পন্দনের ঘনিমা।

অতিমানস হতে বিশ্বমন, বিশ্বমন হতে বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ হতে বিশ্বজড় —পরিণামের এই ধারা। প্রাকৃতমন যাকে সৃষ্টি বলে, এ-ধারা কিন্তু তার উজানে; এ-ধারা অব্যক্তের ধারা, চিন্ময় সঙ্কল্পের ধারা। ব্যক্তের ধারা শুরু হল জড় হতে; তার মধ্যে ফুটল প্রাণ, ফুটল মন, ফুটবে অতিমানস। আমরা পরদার এপিঠ থেকে সৃষ্টির ছবি দেখছি—যেটা কালের পিঠ। ওপিঠে ক্ষণ-শাশ্বতের আলো—কালাতীত একটি ক্ষণ সেখানে বিদ্যুৎ-গর্ভ হয়ে আছে শাশ্বতকালের সংহরণে। সে হল নিত্যের দেশ, আর এ লীলার দেশ।

'একং সৎ'—এই হল নিত্যের স্বরূপ। তাঁর সঙ্কল্প হল, আমি বহু হব। 'হল' আর 'হব'—এও আমাদের মনের গোল। তাঁর সঙ্কল্প নিত্যসঙ্কল্প, অতএব কালের গণ্ডির বাইরে। সঙ্কল্প সেখানে সিদ্ধসত্তার বিচ্ছুরণ মাত্র। এক যিনি, তিনি বহু হচ্ছেন—নিত্যকাল ধরে। কেন, তার জবাব নাই। জবাব পেতে হলে যেতে হবে বহুর ওপারে। তখন আর এ-প্রশ্ন থাকবে না; থাকবে শুধু অখণ্ডের আত্মবিচ্ছুরণের অনুভব—যার মধ্যে এক আর বহুর মনগড়া ভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। সব রহস্যের কিনারা হয় এমনি করে। যাকে বুঝতে চাই. তাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। জানা তখন রূপান্তরিত হয় হওয়ায়। হয়ে ঠিক জানতে পারি, কেন হল।

একের বহু হওয়ার তাগিদ হল জড়ত্বের মূল। অরূপ রূপ ধরল—তা-ই হল সৃষ্টি। তার একদিকে ভাব, আরেকদিকে বস্তু। অরূপ আর রূপ, ভাব আর বস্তু, চিৎ আর জড়, আমাদের মধ্যে চেতনা আর দেহ—সব জোড়ায়-জোড়ায় বাঁধা। একই সত্তা দুভাগ হয়ে গেছে; বহু হতে গেলে এই বিভাজনটা অপরিহার্য। 'আমি বহু'—এই ছোট্ট কথাটিতে দেখি, বিশ্বমনের মধ্যে পড়েছে একটা দ্বিদল অনুভবের চিড়। একবার ভাঙন ধরল

যখন, তখন ভাঙনের আর শেষ রইল না। সত্তা—শিব আর শক্তি—শিব শক্তি আর ভূত, এমনি করে একবচন দ্বিবচন আর বহুবচনে চলল রূপের সাধনা। বহুবচনের চরম রূপ জড়ে, জড়-পরমাণুতে।

একের বহু হওয়া যেমন জড়ত্বের একটা নিশানা, চিতের অচিৎ হওয়াও তেমনি তার আরেকটা নিশানা। প্রাচীন দার্শনিকেরা বলতেন, যা দৃশ্য তা-ই জড়। বাইরের জগৎটাকে দেখছি—তা জড়; অন্তর্জগতের খেলা দেখছি—তাও জড়। আমাকে আমি দুভাগ করি যখন, তখন তার একটা ভাগ দাঁড়ায় দ্রষ্টা বা চিৎ হয়ে, আরেকটা ভাগ দাঁড়ায় দৃশ্য অচিৎ বা জড় হয়ে। এক আমিই দুভাগ হয়েছে; অতএব দুটি ভাগের মাঝে একটা আত্মীয়তা আছে। আত্মানুভব হতে দৃশ্য যত দূরে সরে যাচ্ছে, ততই তার জড়ত্ব বাড়ছে; যত সে কাছে আসছে, ততই সে চিন্ময় হচ্ছে। এমনি করে বোধের দৃষ্টিতে জড়কে বিচার করতে পারি। তখন জড়ত্বের নিরিখ হয় আত্মানুভব দিয়ে। আমি আত্মা, জড় অনাত্মা; আমি যা নই, আমার যা উচ্ছিষ্ট, তা-ই জড়। আত্মানুভবের নিবিড়তা শক্তি ও স্বচ্ছতার তারতম্য দিয়ে তখন জড়ত্বের তারতম্যের পরিমাপ হয়। এই তারতম্য ধরা রয়েছে বৈদিক পঞ্চভূতের ছকে। উপনিষদ্ বলেন, পঞ্চভূতের উৎপত্তি আত্মা হতে; অর্থাৎ চিৎস্বরূপই অচিৎ হয়েছেন, জড় হয়েছেন, ভূত হয়েছেন, দেহ হয়েছেন। এই সূত্র ধরে ভূতশুদ্ধির সাধনায় দেহকেও চিন্ময় করবার সঙ্কেত মেলে।

এইদিক দিয়ে জড়ের রহস্য ধরা দেয় আরেক ভঙ্গিতে। জড় হতে, পৃথিবী হতে, দেহ হতে জীবনের শুরু—একথাটা পরম আশ্বাসে আমরা আঁকড়ে আছি। এ-আশ্বাসের মূলে এই বোধ—জড় স্থাণু, সমস্ত স্পন্দনের নিবৃত্তি এবং অধিষ্ঠান দুইই সে। জড়ের তত্ত্ব জানতে তার স্থাণুত্বের অনুধ্যান করি যদি, চেতনা জগাট বেঁধে আবার ছড়িয়ে পড়ে। চরম মুহূর্তে পৃথিবী আর দ্যুলোক, অচিৎ আর চিৎ, দেহ আর বিদেহ অনুভূত হয় এক অনন্ত নিশ্চল সত্তার এপিঠ আর ওপিঠরূপে। ব্রহ্মের সদ্‌ভাবকেই তখন জানি জড়ের তত্ত্ব বলে। দেখি, শক্তির উজান-ভাটার তারা অধিষ্ঠান; শক্তি-বলয়ের দুটি মুখ এসে মিলেছে এক নিঃশব্দ স্থাণুত্বের বিন্দুতে। ব্রহ্মের সদ্‌ভাবই জড়ের স্থাণুত্ব। এই হল জড়ের চরম তত্ত্ব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জড়ের গ্রন্থি

জড়ের পরিচয় পেলাম। এইবার অধ্যাত্মচেতনার দিক থেকে সে-পরিচয়কে একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

জড়, শক্তি আর চৈতন্য—তিনটি তত্ত্বকে পর-পর সাজিয়ে নিলাম। তার মধ্যে বলতে গেলে জড়ের রূপ আছে, শক্তি আর চৈতন্য অরূপ। জড়ের রূপকে প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয় দিয়ে। জড়ের মূলে শক্তি আছে, তা অনুমান করি তার কাজ দেখে। নিজের মধ্যে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি সঙ্কল্পের অনুভব থেকে; একটা-কিছু করতে চাই যখন, তখনই পাই শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয়—একটা অন্তরঙ্গ অনুভবের স্পন্দনরূপে। এই স্পন্দনের যে-ভূমিকা, তা-ই আত্মচৈতন্য। তার বোধ সবার চাইতে নিবিড়, সবার চাইতে অন্তরঙ্গ।

ইন্দ্রিয়পথে ধরা দিচ্ছে জড়ের বিচিত্র রূপ, অগণিত বহুর মেলা। বহুর বৈচিত্র্যকে বুদ্ধি গুটিয়ে আনছে কতকগুলি সামান্যরূপে; যেমন, অনেকগুলি মানুষ ছেনে সে গড়ছে 'মনুষ্যত্বের' একটা কল্পরূপ। সামান্যের সামান্য কল্পনা করা যায়—যেমন, 'মনুষ্যত্ব', 'পশুত্ব' আর 'উদ্ভিত্ত্বের' সামান্যরূপ 'জীবত্ব'। এমনি করে জড়েরও একটা সামান্যরূপ ভাবতে পারি। যা-কিছু আমার বাইরে অনুভব করছি, তা-ই জড়; এই হল জড়ের সামান্যরূপ—তাকে বলি 'দ্রব্য' অথবা 'রূপ-ধাতু' (Substance), অর্থাৎ কিনা রূপের ধাতু বা উপাদান। রূপ-ধাতু হল জড়ের মৌলিক সামান্যরূপ। একে কখনও বলা হয় 'অব্যক্ত' (Unmanifest), যা সমস্ত ব্যক্তরূপের গর্ভাশয়। ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের সে আরেক পিঠ।

বলেছি, রূপ আমার বাইরে। আমার বাইরে বলতে প্রথম ধরলাম—আমার দেহের বাইরে। পেলাম আমার অতিপরিচিত বিরাট জড়ের জগৎ। কিন্তু আমার বাইরে বলতে 'আমার দেহের গণ্ডির মধ্যে অথচ আমার আত্ম-চেতনার বাইরে'—এ-অর্থও হতে পারে। তখন পাই আমার বুদ্ধিগ্রাহ্য

আরেকটা অতিবিচিত্র অন্তর্জগৎ। বাইরে যাকে জড় বলে জানি, এই জগতে তা ঢুকছে 'প্রত্যয়' বা বোধ হয়ে; তাছাড়া তার নিজস্ব কতগুলি বোধও টগবগ করে ফুটছে তার মধ্যে। সবটা একসঙ্গে একনজরে দেখি যদি, তাহলে বলতে পারি: বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ের জগৎ, অন্তরের বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যয়ের জগৎ, আবার তার ভূমিকায় আত্মবোধ আর সঙ্কল্পের মিথুন বা চিৎ-শক্তি—এই সমস্তটা নিয়ে রূপ-ধাতুর এলাকা। তার এক প্রান্তে জড়, আরেক প্রান্তে চিৎ।

জড় আর চিৎ যেন সত্তার দুটি মেরু। কিন্তু তারা নিঃসম্পর্ক নয়; দুয়ের মাঝে চলেছে শক্তির উজান-ভাটা। তত্ত্বদৃষ্টিতে বলা চলে: চিৎ জড়ের আত্মা, জড় চিতের দেহ; জড়ের ভাব হল চৈতন্য, চৈতন্যের রূপ হল জড়; জড়ের অর্থ হল চিৎ, চিতের বস্তু হল জড়।

কিন্তু প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুয়ের এই নিবিড় সম্পর্কটা ঘুলিয়ে যায়। জড়কে তখন মনে হয় চিৎসত্তার মূর্ত প্রতিষেধ। জড়ের বিরুদ্ধে চৈতন্যের নালিশ তখন জমে ওঠে দফায়-দফায়।

প্রথম নালিশ, জড়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই অবিদ্যার চরম ঘনিমা। চৈতন্য যদি আলো, জড় তাহলে অন্ধতমিস্রা। জড় অসাড়, তার শক্তির লীলা অর্থহীন প্রমত্ততা মাত্র।···দ্বিতীয় নালিশ, জড়ের বিধান একটা অন্ধ যান্ত্রিকতার বিধান—মূঢ় একগুঁয়েমির বশে একই ব্যাপারের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে তার ক্লান্তি নাই। প্রাণের উচ্ছল স্বাতন্ত্র্য আর মনের উদ্দীপ্ত জিজ্ঞাসার 'পরে সে যেন চেপে আছে জগদ্দল পাথর হয়ে।···তৃতীয় নালিশ, জড়ের মধ্যে ভেদ আর সংঘর্ষ যেন চরমে উঠেছে। অখণ্ড জড়ের সত্তা একটা কল্পনা মাত্র, আসলে তার গোড়ায় খণ্ডভাবের তাগিদটাই প্রবল। জড়ের রূপ আছে; কিন্তু অখণ্ডের চারদিকে সীমার রেখা না টানলে তো রূপের সৃষ্টি হয় না। আবার একটিমাত্র রূপের কোনও অর্থ হয় না; যেখানে রূপ, সেখানেই বহুর মেলা। বহু থাকলে সংঘর্ষও সম্ভাবিত। জড়ের ভেদ আর সংঘর্ষের প্রবৃত্তি সংক্রামিত হয় প্রাণ আর মনের মধ্যেও। মিলনের ছলে বহু বিভিন্নমুখী বৃত্তির হানাহানি সেখানকার আইন।

জড়ত্বের এই ত্রুটিগুলি মারাত্মক হয়ে ওঠে অধ্যাত্মসাধকের জীবনে। দেহের জড়ত্ব সেখানে অবিদ্যার ঘনবিগ্রহ, চৈতন্যের প্রকাশের সবচাইতে বড় বাধা। দেহ অবুঝ, দুর্বশ—তার চলবার ছাঁদে একটা অন্ধ জিদের বেয়াড়া

দাবি শুধু। প্রাণের স্ফূর্তি, মনের আলো—সব চাপা পড়ে ওই জড়স্তূপের তলায়। আবার, দেহকে কেন্দ্র করেই অহঙ্কার এত উগ্র হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়; তাইতে বিশ্ব জুড়ে এত রেষারেষি আর হানাহানি। দেহ আছে বলেই জগতে অবিদ্যার মূঢ়তা আছে, অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না আছে, উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব আছে—ফলে, দুঃখও আছে: সমস্ত দুঃখবাদী দর্শনের এই রায়। তাই তাদের মতে বিদেহ-কৈবল্যই পরমপুরুষার্থ; এই পৃথিবীর বুকে দেহ ধরে আর যেন আসতে না হয় এই তাদের আকিঞ্চন।

দেহের জড়ত্ব যে অধ্যাত্মসাধনার সবচাইতে বড় বাধা, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু দেহ তো শুধু জড়পিণ্ড নয়; সে প্রাণময়, মনোময়—এমন-কি চিন্ময়ও বটে। প্রাণ-মন-চেতনার ছন্দোময় প্রকাশের সে বাহন। তার জঞ্জালের বোঝার চাইতে সত্য হল তার গভীরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সে-আগুনে জড়ের রূপান্তর ঘটতে পারে চিৎশক্তিতে, দেহ জরা-ব্যাধি-মৃত্যুজিৎ যোগতনুতে পরিণত হতে পারে—প্রকৃতি-পরিণামের এই অন্তিম সম্ভাবনাকে ভুললে তো চলবে না। জড়ের বাঁধন হতে মুক্তি যেমন চাই, তেমনি তাকে চিতে রূপান্তরিত করবার শক্তিও চাই। নইলে যোগের সাধনা পূর্ণাঙ্গ হল না। পুরুষের মুক্তি আর প্রকৃতির সিদ্ধি—দুয়ে মিলে পরম-পুরুষার্থের অখণ্ড রূপ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দই বিসৃষ্টির উল্লাসে জড় পর্যন্ত নেমে এসেছেন। সেখানে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সত্তা যেন অচল-প্রতিষ্ঠ, প্রাণ নিস্পন্দ-অসাড়, চৈতন্য অন্ধতমিস্রায় বিলীন। অথচ তারই মধ্যে চলছে একটা শক্তির ঘূর্ণ্যাবর্ত—যা অখণ্ড সত্তাকে করছে বহুধা খণ্ডিত এবং পরিকীর্ণ, আবার তাদের সংহত করে গড়ছে রূপসংস্থান (organic structure), জাগাচ্ছে দুর্লক্ষ্য প্রাণের স্পন্দন, ফুটিয়ে তুলছে অবচেতনার আলো-আঁধারি। তারপর উন্মেষের পর্বে-পর্বে ব্রহ্ম আবার ফিরে চলছেন তাঁর চিৎস্বরূপে। আর এই চিৎপ্রকাশের অনড় পাদপীঠ হল জড়। জড় শুধু শব নয়, সে যেন নৃত্যপরা কালী বা কালশক্তির পায়ের তলায় যোগমগ্ন নিশ্চল শিব।

এই গূঢ়চেতন স্থাণুত্বেই জড়ের মহিমা। জড়ের স্থাণুত্ব দেহের মধ্যে আনে একটা নিশ্চলতা, এবং তার ফলে প্রাণের চঞ্চলতা সুষম হয়, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত মনটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—এককথায় দেহের স্থৈর্যকে আশ্রয় করে প্রাণের চিন্ময় অভিব্যক্তি ঘটে। এটি যোগসাধনার সুপরিচিত তথ্য। এক্ষেত্রে জড়কে দেখি চিৎএর একান্ত বশংবদ বাহন—এমন-কি তার যান্ত্রিকতার

উপর ভর দিয়ে চিৎও যেন মুক্তির স্বাতন্ত্র্য পায়। তখন বোঝা যায়, জড় বস্তুত চিৎএর বিরোধী তত্ত্ব নয়, বরং তার সবচাইতে অনুকূল সাধন। দুয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে মন, আর তার প্রমাদ ঘুচে যায় অতিমানস ভূমিতে। সেইখানেই দেখা দেয় জড়ের চিদ্‌ঘন রূপ। তখন দেহের চিন্ময় রূপান্তরে দুয়ের মধ্যে চলে এক অন্যোন্যসম্ভাবনের (mutuality) বিলাস। তখন স্পষ্ট বোঝা যায়, জড়ের ভিত্তি না হলে শূন্যে-শূন্যে চৈতন্যের বিকাশ সম্ভব হত না। বুদ্ধের শূন্যতার অনুভবও হয়েছিল শূন্যে নয়—জড়াশ্রিত তপশ্চিন্ময় দেহেই। আর অধ্যাত্মসাধনার যে-কোনও উত্তুঙ্গ অনুভব যতক্ষণ পর্যন্ত দেহগত না হয়, ততক্ষণ তার পূর্ণতায় কোথাও একটা ফাঁক থেকেই যায়।

অতএব জড়ের নিরসনে নয়, অতিমানস শক্তিতে তার গ্রন্থিমোচনেই সিদ্ধির পারম্য।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

রূপধাতুর উৎক্রমণ

বলেছি, জড় আর চিৎ—দুয়ের মধ্যে চলছে শক্তির উজান-ভাটা। শক্তির স্ফুরণের আধার চাই। সব-নীচের আধার হল আমাদের স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়—রূপধাতুর যা প্রথম পৈঠা। চিতের দিকে উঠতে গিয়ে তার আরও কয়েকটা পৈঠা যে পাওয়া যাবে, তা অসম্ভব নয়। শক্তির প্রত্যেক পর্বে একদিকে যেমন আছে বোধ, আরেকদিকে তেমনি থাকবে রূপ। যেমন জড়শক্তি: তার ক্রিয়ার যে-রূপ আর যে-বোধ ফোটে, তাদের চেহারা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। জড়শক্তির পরে আরও দুটি শক্তির কথা আমরা জানি—প্রাণশক্তি আর মনঃশক্তি। জড়শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও তিনটি শক্তির বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমাদের চোখ এড়ায় না। অগণিত রূপবিন্দুতে কুণ্ডলিত থাকা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে—জড়শক্তির এই একটা ধরন। প্রাণ চায় অন্যোন্যমিশ্রণ; কিন্তু তার উপায় হল—অপরকে গ্রাস করা। মন অপরকে গ্রাস না করেও আপন করে নিতে পারে—এই তার বৈশিষ্ট্য। বহুর বিচ্ছিন্নতা হতে ক্রমে নিবিড় ঐক্যের দিকে উজিয়ে যাওয়া—এই তাহলে তিনটি শক্তির ধর্ম। এর আসল কথাটা হচ্ছে জড়ত্বের কবল হতে চৈতন্যের মুক্তি—বোধের প্রসারে ও স্বচ্ছতায়, এবং শক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে অন্তর্মুখ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রথমেই ছাড়তে হবে সব-কিছুকে বাইরে রেখে দেখবার অভ্যাস, জগৎটাকে গুটিয়ে আনতে হবে নিজের গভীরে। বহিঃসত্তা হতে নয়, কিন্তু আমার বোধে জড়ের অন্তঃসত্তা হতে তখন মিলবে তার স্বরূপের পরিচয়। জড় তখন আর বাইরে নয়, জড় আমার বোধে—অস্তিত্বের কঠিন প্রত্যয়রূপে। একটা রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার গভীরে তখন আন্তর-বোধের সামনে খুলতে থাকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর রূপধাতুর পরম্পরা। শুদ্ধ-জড়, তার গভীরে শুদ্ধ-প্রাণ, তারও গভীরে শুদ্ধ-মন: সব অনন্ত, স্বরাট্, সুষম ও চিন্ময়। আরও গভীরে বিজ্ঞান, আনন্দ, চিৎ ও সৎ। সব বোধময় শক্তিময় এবং রূপময়। কিন্তু বোধ শক্তি আর রূপে ছাড়াছাড়ি

বা বিরোধ নাই সেখানে প্রাকৃত ভূমির মত। এক অখণ্ড অদ্বৈতবোধের নিটোল পূর্ণতা: শুধু জ্ঞানের অদ্বৈত নয়, ক্রিয়ারও অদ্বৈত। কিন্তু ক্রিয়া কারণে—কালাতীত অচলস্থিতি হতে কালের প্রবাহে শক্তির নির্ঝরণে।

গভীরের অনুভব আনে ব্যাপ্তি এবং উত্তুঙ্গতারও অনুভব—অধ্যাত্মবোধের এই ধারা। গভীরতা, ব্যাপ্তি ও তুঙ্গতা—অধ্যাত্মবোধ সুডোল হয় এই তিনটি মানে (dimension)। গভীরের অনুভব কোনও প্রাক্তন সংস্কারে সঙ্কুচিত না হয় যদি, তাহলে চিদ্‌ঘনবিন্দুতে পৌঁছে স্বভাবতই তা শক্তির বর্তুলে ছড়িয়ে পড়ে—একথা আগেই বলেছি। এই সত্যটি অনুভবে এলে দেখতে পাই, বিশ্বের সকল তত্ত্বই পরস্পর ওতপ্রোত; ওখানে যা ছড়িয়ে আছে, এখানে তা-ই আবার গুটিয়ে এসেছে। প্রত্যেক বিন্দুতে তাই সিন্ধুর আকূতি এবং আবেশ দুই আছে। রূপধাতুর শুদ্ধ-ভূমিতে আর প্রাকৃত-ভূমিতে, ঊর্ধ্বলোকে আর অধোলোকেও এই অন্যোন্যসঙ্গমের সম্বন্ধ। শুদ্ধ-ভূমি হল কারণ-জগৎ; কারণ হতে চিৎশক্তির আবেশ না ঘটলে এখানকার মূর্ছিত শক্তি জেগে ওঠে না। ওখানকার জন্যে একটা আকূতি নিয়ে এখানকার শক্তি জাগে; কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তার আপ্যায়ন চলে ওখানকারই আবেশে। রূপ যেমন ভাব হতে চাইছে, তেমনি ভাবও চাইছে রূপে ফুটতে। তাইতে ঘটছে জড়ের চিন্ময় রূপান্তর। জড়ের চরম সার্থকতা এইখানে। প্রকৃতিরও এই পরম সিদ্ধি। এ অসম্ভব কিছুই নয়, কেননা চিৎ আর জড়ের মধ্যে ওঠা-নামার পথে কাঁটা কোথাও নাই, স্বরূপসত্যের ভেদও নাই দুয়ের মাঝে।

ব্যাপারটাকে আরেকদিক থেকে দেখতে পারি। গভীরের অনুভব হল আত্মসত্তার অনুভব; নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমরা পাই নিজের স্বরূপ-সত্যের পরিচয়। এই পরিচয়েরও একটা পরম্পরা আছে। নিজের সব-চাইতে স্থূল পরিচয় পাই এই দেহে—প্রাচীন বেদান্ত যাকে বলত অন্নময় কোশ। এই কোশেরও একটা নিজস্ব চেতনা আছে অধিষ্ঠানরূপে; তাকে বলা হয় অন্নময় পুরুষ। অন্নময় কোশকে আমরা মোটামুটি চিনি; অন্নময় পুরুষকে চিনি আরও কম, কেননা অন্তর্মুখ না হলে পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। অন্নময় কোশ আর অন্নময় পুরুষের গভীরে আছেন প্রাণময় কোশে অধিষ্ঠিত প্রাণময় পুরুষ। আরও গভীরে ডুবতে-ডুবতে ক্রমে পাই মনোময় কোশে অধিষ্ঠিত মনোময় পুরুষ, বিজ্ঞানময় কোশে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানময় পুরুষ, আনন্দময় কোশে অধিষ্ঠিত আনন্দময় পুরুষ, হিরণ্ময় কোশে অধিষ্ঠিত চিন্ময় দিব্য পুরুষ।

তারও গভীরে শুদ্ধ-সন্মাত্র—মহাশূন্যের বুকে নির্বিশেষ অস্তিত্বের প্রত্যয়রূপে।

কোশ আর পুরুষের ভিতর দিয়ে এমনি করে পাই নিজের স্বরূপসত্যের পরিচয়। সে-সত্য একাধারে রূপ আর বোধের সত্য—আমারই আত্মচেতনায় আমার রূপের পরিচয়। এ-পরিচয় পাই অনুভবের ক্রমিক গভীরতার দিক থেকে। কিন্তু সেইসঙ্গে তার একটা ব্যাপ্তির দিকও আছে। গভীরতায় যদি মেলে আত্মার পরিচয়, তাকেই আশ্রয় করে ব্যাপ্তির পথে পাই বিশ্বের পরিচয়। আমার গভীরে যে-আমি গুটিয়ে আছে, সেই আমিই ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। বিশ্বের সঙ্গে তাই আমার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—অন্তত রূপের দিক দিয়ে। আমার পিণ্ড-দেহ ব্রহ্মাণ্ড-দেহেরই অঙ্গ—একথা মানতে আমার বাধে না। তেমনি বলতে পারি আমার ব্যষ্টি-প্রাণ সমষ্টি-প্রাণেরই একটা অঙ্গ। ব্যষ্টিকে সমষ্টির অঙ্গরূপে উপস্থাপিত করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী নয়। সমষ্টি-প্রাণই প্রাণভূমি বা প্রাণলোক—যেমন সমষ্টি-জড়কে বলতে পারি জড়লোক। এমনি করে আমার আত্মপরিচয়ের সমান্তরালে পাই বিশ্বপরিচয়ের একটা পরম্পরা—আমারই আত্মানুভবের ব্যাপ্তি দিয়ে। তারাই রূপধাতুর শুদ্ধ-ভূমি—প্রাচীনদের ভাষায় 'লোকসংস্থান'। বেদের সপ্ত ব্যাহৃতিতে উদ্দিষ্ট সপ্তলোকে তাদের সন্ধান পাই। এটি হল ব্রহ্মাণ্ডের কথা। তেমনি পিণ্ডেও বা মনুষ্যদেহেও প্রাচীন হঠযোগী এবং তান্ত্রিকেরা আবিষ্কার করেছিলেন সপ্তলোকের অনুরূপ সাতটি প্রাণ-মনোময় 'চক্র' বা 'পদ্ম'। তাদের বিকসিত করে পিণ্ডদেহকে ব্রহ্মাণ্ডদেহের অনুভবে বিস্ফারিত করা ছিল তাঁদের পুরুষার্থ।

এই লোকসংস্থান পরস্পর ওতপ্রোত। ঊর্ধ্বলোকের শুদ্ধশক্তির চাপে অধোলোকের ঘুমন্ত শক্তি জেগে ওঠে—প্রকৃতি-পরিণামের এই একটা আইন। আমাদের প্রাকৃত ভূমিতেও তার পরিচয় পাই—শুদ্ধসঙ্কল্পের তীব্রসংবেগে আধারশক্তিকে যখন জাগিয়ে তুলি। ঠিক এই ধারাতেই অতিমানস ভূমির চাপে জড় প্রাণ ও মনের ভূমিতে অতিমানস শক্তির স্ফুরণও অবশ্যম্ভাবী।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সত্তার সপ্ততন্ত্রী

বিশ্বের তত্ত্বনিরূপণ করতে আমরা বেরিয়েছিলাম। সদ্-ব্রহ্ম হতে শুরু করে তার পরিক্রমা এসে শেষ হল জড়ে। পর-পর পেলাম আটটি তত্ত্ব ; সদ্-ব্রহ্ম, চিৎ-শক্তি, আনন্দ ও অতিমানস ; আবার মন, প্রাণ, চৈত্যপুরুষ ও জড়। প্রথম চারটি তত্ত্বে একটি বর্গ, দ্বিতীয় চারটিতে আরেকটি। একটি পরার্ধ, আরেকটি অপরার্ধ—একটি ওখানকার, আরেকটি এখানকার। দুয়ে মিলে এক অখণ্ড পূর্ণতার ছবি।

পরার্ধে পাই ব্রহ্মের স্বরূপ, অপরার্ধে জীবের রূপ। জীব আর ব্রহ্ম এই দুটি হল আসল তত্ত্ব। দুয়ের মাঝে শক্তির বিদ্যুৎ-তরঙ্গ : এক ব্রহ্ম নিছক আপন খুশিতে বহুর মেলায় নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন অফুরন্ত বৈচিত্র্যে—এরই নাম 'জগদ্ব্যাপার'। ব্রহ্ম শক্তি আর জীব, অথবা ব্রহ্ম জগৎ আর জীব—অখণ্ড তত্ত্বভাবের এই ত্রিপুটী।

সমস্তটা ছক বুঝতে গেলে জীবকে ধরে শুরু করা সহজ। আপাতত দেখতে পাই, দেহ প্রাণ মন এই নিয়ে জীব। আরেকটু তলিয়ে দেখলে বুঝি, দেহ-প্রাণ-মন যন্ত্র বা সাধন মাত্র ; তাদের পিছনে আছে একজন যন্ত্রী বা সাধক, যার ইশারায় যন্ত্রের কাজ চলছে। এই যন্ত্রীকে বলি 'পুরুষ'। আধারের মধ্যে তিনিই আসল কর্তা এবং ভোক্তা ; তিনি একাধারে বোদ্ধা শিল্পী এবং রসিক।

বলতে পারি, জীবলীলাই জগদ্ব্যাপারের তাৎপর্য। জীব ছিল না, ছিল শুধু অন্ধ জড়শক্তির আলোড়ন—এমন-একটা অবস্থা কল্পনায় আনা চলে। কিন্তু সে-আলোড়নকে লক্ষ-কোটি যোজনে বা যুগে ছড়িয়ে দিয়েও বুদ্ধি তৃপ্ত হয় না, যতক্ষণ না তার একটা অর্থ সে আবিষ্কার করতে পারে। অন্তহীন জড়ত্বের বুকে দেখা দিল জীবত্বের একটি কণা ; অমনি তাকে ঘিরে শক্তিলীলা সার্থক হল, তার অন্ধ আলোড়নের একটা তাৎপর্য পাওয়া গেল। এই জীবকে ধরে শুরু হল জগতের ছন্দোময় একটা পরিণাম—অনেক দূরের অস্ফুট লক্ষ্যের দিকে পা টিপে-টিপে তার এগিয়ে চলা। কি সে-লক্ষ্য, তা স্পষ্ট হল আচ্ছন্ন

প্রাণ-চেতনা যখন চোখ মেলে চাইল মানুষের মনশ্চেতনায়। তখন বাইরের প্রকৃতি-পরিণাম মোড় নিল অন্তরের চিন্ময়-পরিণামের দিকে, বস্তুর ভারের চাইতে অর্থের ব্যঞ্জনা হল বড় ; মানুষ বলল, 'আমি বৃহৎ হব, আমি ব্রহ্ম হব।' জীবনবেদের এই আদিম ও অন্তিম ঋক্—মূলাধারে কুণ্ডলিতা অনক্ষরা পরা বাণীর এই তো পরমব্যোমে সহস্রাক্ষর রূপায়ণ।

মানুষের মধ্যে যা বীজ হয়ে আছে তা বিস্ফারিত হবে বনস্পতিতে—এই তার অন্তঃপ্রকৃতির আকূতি। ব্রহ্মই সে-বনস্পতি ; মানুষের রূপের যা-কিছু উপাদান, তার নিরঙ্কুশ চরম অভিব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে।

এই যেমন, জড়দেহের বনিয়াদে গড়া মানুষের জীবন, স্তব্ধ মূক মৃৎপিণ্ডের 'পরে যার প্রাণচঞ্চল অস্তিত্বের একান্ত নির্ভর। দেহবোধের মধ্যে জড়ত্বের এই আদিম আশ্বাস জড়সমাধির গহন নৈঃশব্দ্যে ফোটাল ব্রহ্মের সদ্ভাবের নিস্তরঙ্গ অনুভব, বিশ্বজড় আর ব্রহ্মসত্তা মুখামুখি হয়ে দাঁড়াল সেই অগমলোকে। ...মানুষের প্রাণে চলছে রূপায়ণের তপস্যা—জড়ের গুহায় বন্দী চেতনাকে আলোর ছন্দে মুক্তি দেবার জন্যে। ব্রহ্মের চিৎশক্তিতে তারই সিদ্ধরূপ—চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে অস্তিত্বের পারাবারে নিত্যসিদ্ধ অনন্তভুবনের বীচিভঙ্গে।...মানুষের হৃদয়গুহায় আছেন এক রসিক পুরুষ—জীবনের ফুলে-ফুলে মধু-র সন্ধানী মুগ্ধ মধুপ তিনি। তাঁর উচ্ছল রসচেতনার পরম তর্পণ ব্রহ্মের জগদানন্দে।

এমনি করে একদিকে সৎ চিৎ আনন্দে ব্রহ্মের স্বরূপে পরিচয় : আরেক দিকে ব্রহ্মেরই বিভূতি মানুষের রূপে ফুটছে দেহ প্রাণ আর রসচেতনায়। কিন্তু ব্রহ্ম অশক্ত নন, নিজের মধ্যে গুটিয়ে নন—জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছেন তিনি জীবের মেলায়। তাঁর এই ছড়িয়ে পড়ার সাধন হল অতিমানস ; তেমনি, মানুষেরও বৃহৎ হবার সাধন হল মন। ব্রহ্মের শক্তি অতিমানস, তাকে ধরে তিনি নেমে আসছেন জগৎ হয়ে, জীব হয়ে ; জীবের শক্তি হল মন, তাকে ধরে সে উঠে যাচ্ছে ব্রহ্মের দিকে। ব্রহ্মের অতিমানস আর জীবের মন—দুটি তত্ত্ব মুখামুখি। দুয়ের মাঝে আড়াল ভাঙবার সাধনাই জীবের জীবনব্রত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অতিমানস মানস ও অধিমানস মায়া

ব্রহ্ম জগৎ আর জীবের তত্ত্বানুসন্ধানে আমরা বেরিয়েছিলাম—এইবার এসে পৌঁছেছি পথের শেষে। অনুসন্ধানের ফল সূত্রাকারে এই।

জগৎ আর জীব আমাদের কাছে নিত্য পরিচিত। জীব সাধক, জগৎ তার সাধনার ক্ষেত্র। জীবের সাধনা চেতনার উত্তরায়ণের। তার মধ্যে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে এক ব্যাকুলতা: 'হেথা নয়, অন্য কোথা, আরও কোন্‌খানে।' অন্তরের এই ব্যাকুল এষণা দিয়েই সে জগৎকে আর নিজেকে ছাপিয়ে এক লোকোত্তর তত্ত্বের সন্ধান পায়—আমরা যার নাম দিয়েছি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল সৎ চিৎ আর আনন্দ, অতিমানস তাঁর স্বরূপশক্তি। এই অতিমানস হতে প্রজ্ঞানের দ্বৈতভাবনার লীলায়নে দেখা দিয়েছে জীবের মন—অখণ্ডকে খণ্ডে-খণ্ডে পরিকীর্ণ করবার সাধনরূপে। এই পরিকীর্ণতায় ব্রহ্মের আত্মবিচ্ছুরণের যে-আনন্দ, তা-ই জীবের মধ্যে ফুটেছে জীবনরসের চেতনা হয়ে—আমরা যাকে বলেছি চৈত্য-পুরুষ। ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি জীবে হয়েছে প্রাণ। আর তাঁর সদ্‌ভাব তাঁর মধ্যে হয়েছে এইসমস্তের প্রতিষ্ঠারূপী জড়াশ্রিত দেহ। এমনি করে 'মহতো মহীয়ান্‌' ব্রহ্ম আত্মসঙ্কোচের দ্বারা স্বেচ্ছায় 'অণোরণীয়ান্‌' জীব হয়েছেন তাঁর অতিমানস শক্তির একটি দোলনে, আবার আরেকটি দোলনে জীবভাব হতে আত্মস্বরূপে ফিরে যাচ্ছেন মনশ্চেতনার বিস্ফারণে। তাঁর এই উজান-ভাটার লীলাভূমি হল জগৎ। মোটামুটি এই হল ব্রহ্ম জগৎ আর জীবরূপী ত্রিপুটীর তত্ত্ব।

জীবের মন আর ব্রহ্মের অতিমানস—দুয়ের মাঝে আছে মানসলোকের পরম্পরা। অতিমানসের দিকে উঠে যেতে হলে মনকে একে-একে সেগুলি পার হয়ে যেতে হবে। এবার এই উজান-পথের একটুখানি পরিচয় চাই। তার আগে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিই।

অতিমানস বিদ্যাশক্তি, মন অবিদ্যাশক্তি। অথচ অতিমানস হতে মনের সৃষ্টি, অর্থাৎ বিদ্যা হতেই অবিদ্যার উদ্ভব। কি করে তা সম্ভব হয়?

বিদ্যা আর অবিদ্যার সঙ্গে আলো আর আঁধারের উপমা দেওয়া হয়। তার ফলে দুয়ের মাঝে একান্তবিরোধের ধারণাটাই আমাদের মধ্যে পাকা হয়ে গেছে। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুটা নিরেট বস্তু হলে দুয়ের বিরোধকে সত্য মানতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসলে ওরা ভাব বা শক্তি, অথবা ভাবের শক্তি। শক্তির জোয়ার-ভাটা আছে, অতএব তার মধ্যে ধারাবাহিক ক্রমও আছে। ক্রমগুলিকে সীমার রেখায় চিহ্নিত করে একটিকে আরেকটি হতে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করি যদি, সে হবে আমাদের ব্যাবহারিক বুদ্ধির কারসাজি। আলো-আঁধারের উপমা নিয়েই বলি। আলো মলিন হতে-হতে আঁধার হচ্ছে, আঁধার তরল হতে-হতে আলো হচ্ছে : এখানে বিরোধটা দুই প্রান্তে, এবং তাও বুদ্ধিকল্পিত। অখণ্ড অন্তরঙ্গ অনুভবে কিন্তু অমন ভাগাভাগি নাই।

বিদ্যা আর অবিদ্যার বেলায় বলতে পারি—বিদ্যার সঙ্কোচে অবিদ্যার উৎপত্তি, অবিদ্যার প্রসারে বিদ্যায় তার রূপান্তর। দুটি একান্তবিরোধী তত্ত্ব হলে, একটি কখনও আরেকটিতে পরিণত হতে পারত না। অতিমানস তাহলে কখনও মনে নেমে আসত না, মন কখনও অতিমানসে উজিয়ে যেত না ; ব্রহ্ম কখনও জীব হতেন না, জীব কখনও ব্রহ্ম হত না। দুটি তত্ত্বের মধ্যে শক্তির জোয়ার-ভাটা চলে—এই কথাটি মনে রাখলে বুদ্ধি জড়ত্বের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়, জীবনের রহস্য অখণ্ডদৃষ্টিতে সুডোল হয়ে ধরা পড়ে।

মনের আঁধার ক্রমে-ক্রমে জ্যোতিঃশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে—এ যদি সম্ভব হয়, তাহলে বলতে হবে, মনের উজানে সাধনালভ্য কতগুলি ভূমি নিশ্চয় আছে। প্রশ্ন হবে, তার প্রমাণ ?

কিছু-কিছু প্রমাণ প্রাকৃত ভূমিতেই পাই। সাধারণত মন বহিরিন্দ্রিয়ের ’পরে ভর দিয়ে চলে ; সে যেন মাটির বুকে খুঁড়িয়ে চলার মত। মাঝে-মাঝে এই মনই ইন্দ্রিয়ের বাঁধন ছিঁড়ে পাখা মেলে। তার একটি উদাহরণ : ইন্দ্রিয়ের বিশেষদর্শনকে ছাপিয়ে যায় মনের সামান্যজ্ঞান, বিশেষ বস্তু হতে মন আবিষ্কার করে সামান্য ভাবকে। ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ ভাব বস্তুর মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনের চেতনায়—এ-ব্যাপারটার ইশারা কিন্তু ওই উজানের দিকে। আরেকটা ব্যাপার, মনের ’পরে বোধির ঝলক—অকল্পিত ভাবকে আশ্রয় করে হঠাৎ একটা-কিছুর ভেসে ওঠা। জানার এই একটা নতুন ধরন। এরই সগোত্র হল আমরা যাকে বলি ‘প্রতিভা’—যার মধ্যে ফোটে মনের কৃতিত্ব। ঊর্ধ্বভূমির অস্তিত্বের সূচনা এইগুলি দিয়ে। তারও পরে আছে অধ্যাত্মচেতার লোকোত্তর

অনুভবের বিচিত্র পসরা ; তার প্রামাণ্যকে তো অস্বীকার করবার উপায় নাই।

ঊর্ধ্বভূমিতে ওঠবার দুটি সোপান আছে। প্রথম সোপান হল, অন্তরের দিকে চেতনার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে নিজের গভীরে ডোবা। বহির্মুখ মনের কারবার যে ছোট জগৎটি নিয়ে, তার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের অহং ; আর গভীরে রয়েছে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত অধিচেতনার বিপুল জগৎ, যার মণি-কোঠায় অন্তরাত্মার আসন পাতা। বহির্মন আর অধিচেতনার মাঝে যে অবিদ্যার আড়াল, তাকে ভাঙতে হবে সবার আগে। তখন অহং নয়, অন্তরাত্মাই হবেন জীবনের নিয়ন্তা ; ব্যক্তির বোধ তখন উৎসারিত হবে বিশ্ব-বোধের গভীর উৎস হতে।

অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তারপর চেতনাকে মূর্ধন্যভূমির সুমেরুর দিকে উজিয়ে দেওয়া—এই হল সাধনার দ্বিতীয় সোপান। এমনি করে পাব মহাকাশের নিস্তব্ধতায় শান্ত-আত্মার সাক্ষাৎকার। তাঁর অনুভবে, আত্মসত্তা সমুদ্রের মাঝে নুনের পুতুলের মত মিলিয়ে যেতেও পারে, অথবা কূটস্থ থেকে শান্ত-আত্মাকে সর্বভূতাত্মভূতাত্মা অসঙ্গ পুরুষরূপে দর্শন করতেও পারে। সাধারণত একেই আমরা জানি 'পরা গতি' বলে।

কিন্তু এখানে এসে সম্বোধির আরেকটি ধারাকেও অনুসরণ করা চলে। শান্ত-আত্মার অনুভবে আছে সর্বনিরোধের একটা রুদ্ধশ্বাস প্রযত্ন ; অত্যন্ত সহজভাবে এই প্রযত্নকে শিথিল করে সত্তাকে আনন্ত্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় একটা অতিবিশ্বস্ত অথচ ঊর্ধ্বমুখ প্রতীক্ষা নিয়ে। তখন আকাশ হতে নেমে আসে অনির্বচনীয় জ্যোতি আনন্দ ও শক্তির নির্ঝর। এই নির্ঝরণে চিৎশক্তির অনুভবে দেখা দেয় দুটি ভঙ্গি। একটিতে চিৎশক্তির স্ফুরণ হয় সামান্যস্পন্দে—এক আকারপ্রকারহীন নিবিড়তার ক্রমিক বোধে ; আরেকটিতে ফোটে এক চিন্ময় বিবেকদর্শন (discrimination)—যা ওই নির্বিশেষের মধ্যেই আবিষ্কার করে অপ্রাকৃত মানসভূমির পরম্পরা।

এই ধারায় চললে অপ্রাকৃত মানসভূমির চারটি পর্ব আমরা পাই—উত্তর-মানস, প্রভাসমানস, বোধিমানস আর অধিমানস। তার ওপারে অতিমানসের সাম্রাজ্য। প্রত্যেকটি ভূমি আছে বিদ্যার রাজ্যে। প্রাকৃতমন অবিদ্যার ঘোরে যে-ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে, এসব ভূমিতে তার ছোঁয়াচ নাই। অথচ অভেদজ্ঞানে

শুদ্ধ বৈচিত্র্যের উল্লাস এদের মধ্যে আছে। আলোর রাজ্যে আলোর ফুল ফোটা—এই হল ওখানকার ধরন। খেলা চলেছে বস্তু নিয়ে নয় ভাব নিয়ে, চিত্তের খণ্ডবৃত্তি নিয়ে নয় সমগ্র ভূমি নিয়ে—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকটি পর্বে যে-মনের লীলা, তা একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যোগীর মন।

মনের ওপারে প্রথমেই পাই উত্তরমানসের (Higher Mind) ভূমি। প্রাকৃতমনের সঙ্গে তার একটা মৌলিক ভেদ আছে। মন বিষয়ের বিশেষ-জ্ঞানকে আহরণ করে ইন্দ্রিয় দিয়ে ; তারপর তাকে মন্থন করে গড়ে তার সামান্যরূপ। তার মধ্যে থাকে ভাবের ব্যঞ্জনা, অর্থের ইশারা। এই ভাব আর অর্থের সন্ধান রাখে মন, কিন্তু সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে তাদের ব্যবহার করতে পারে না। অথচ উত্তরমানস তা পারে। প্রাকৃতমনের বিশিষ্ট ভাবনা সামান্যের ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন, ইন্দ্রিয়-দিয়ে-পাওয়া বস্তুর রূপ যেন হয় প্রতীকী (symbolic)—তখন আমরা পাই 'উত্তরমানস'। বোধের ভূমিকা তখন চিত্তাকাশ—যেন জ্যোছনায় ছাওয়া। এইখানথেকে শুরু হল ভাবের জগৎ—প্রাকৃতমনের একেবারে তা উল্টা পিঠ। ভাব বস্তুর জগতে নেমে আসতে পারে, কিন্তু তাবলে সে তখন বস্তুনির্ভর নয় ; বরং সে 'শাশ্বত-কাল ধরে বস্তুর অর্থের বিধাতা'।...তারপর একটা অন্তর্মুখ সঙ্কর্ষণে চেতনা আরও গভীরে ডুবে যায়, উত্তরমানসের জ্যোছনা ঘনোজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রভাস্বর সৌরমহিমায় ; চিত্তাকাশ হয় চিদাকাশ, তার বুকে প্রতীক যেন তত্ত্ববস্তুর বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ। এই হল 'প্রভাসমানস' (Illumined Mind)। চিত্তের অন্তর্বেগ তখনও কিন্তু লোকাতীতের আড়াল ভাঙতে পারে না।··· তারপর তীব্রসংবেগে চিদাকাশের ওপারে অব্যক্তের আবরণ খুলে যায়, চেতনা প্রসারিত হয় অরূপলোকে, প্রাতিভসংবিৎ আনে অগম-জগতের কল্পছবি, অকথিত বাণীর অপরূপ ব্যঞ্জনা। এইখানে পাই 'বোধিমানস' (Intuitive Mind)।···তারপর চলে বিপুল একটা সমাহরণের ক্রিয়া ; সব জড়িয়ে এক বিরাট রূপকৃৎ মানসের আবির্ভাব ঘটে দেশ-কালের সীমার বাঁধন ছিঁড়ে। তা-ই হল 'অধিমানস' (Overmind)।

কিন্তু এসমস্তই কবির দর্শন, তাঁর ক্রতু বা সিদ্ধসঙ্কল্প নয়। চেতনায় কবি-ক্রতুর আবির্ভাবে সম্ভব হয় অতিমানস ভূমিতে উত্তরণ এবং পার্থিব আধারে অতিমানস বীর্যের অবতরণ। জীব তখন শুধু শিব নয়—মহেশ্বর।

অধিমানসেই আছে অবিদ্যার বীজ—কিন্তু স্ব-তন্ত্র হয়ে নয়, বিদ্যার কুক্ষিগত

হয়ে। উপনিষদের ভাষায়, অধিমানস যেন হিরণ্ময় পাত্রের জ্যোতিরাবরণে অতিমানস সত্যের মুখকে রেখেছে আড়াল করে। অধিমানস অতিমানসের প্রতিভূ—তার অখণ্ড জ্ঞানকে ক্রিয়ার খণ্ডলীলায় বিচ্ছুরিত করা অধিমানসের কাজ। একের বহু হওয়াই সৃষ্টির তাৎপর্য ; অতিমানস সেই বিসৃষ্টির চিন্ময় সিদ্ধবীর্য, অধিমানস তার সাধন।

এককে বহু হতে গেলেই অনেকের চারদিকে একটা সীমার রেখা আঁকতে হবে। এই সীমার রেখাই অবিদ্যা—অর্থাৎ এককে না জানা, অপরকে না জানা। না জানা একদিক দিয়ে যেমন নিছক মূঢ়তা হতে পারে, আরেকদিক দিয়ে তেমনি হতে পারে 'অভিনিবেশ' (concentration) অর্থাৎ আর-সব ভুলে একটা-কিছুর মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। মূঢ়তায় চেতনা সজাগ থাকে না, কিন্তু অভিনিবেশে থাকতেও পারে ; কেননা অভিনিবেশ ইচ্ছাকৃত—বিশেষ প্রয়োজনে একটা-কিছুর দিকে ঝোঁক দেওয়া তার ধরন। প্রাকৃতমনের অবিদ্যাতে মূঢ়তার ভাবটা প্রবল ; আর অধিমানসে যে-অবিদ্যাবীজ, তাতে আছে একটা সচেতন অভিনিবেশের বেগ। প্রাকৃতমনের ভেদজ্ঞানে অভেদ-জ্ঞান তাই আচ্ছন্ন বা লুপ্ত, কিন্তু অধিমানসে ভেদজ্ঞানের ভূমিকায় অভেদজ্ঞান পূর্ণজাগ্রত। ফুলের বোঁটা থেকে পাপড়িগুলি ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি পাপড়ি নিজেকে যদি আলাদা বলে জানে, এক বোঁটা থেকেই সবার বিস্তার একথাটা যদি সে ভুলে যায়, তাহলে এ হবে মনের ধরন। কিন্তু গোটা ফুলটা তার আলাদা-আলাদা পাপড়ি সত্ত্বেও নিজেকে যদি জানে একটা ফুল বলে, তাহলে তা-ই হবে অধিমানস দৃষ্টি। সেখানে অভেদের ভূমিকায় ভেদের জ্ঞান।

অধিমানসের ক্রিয়া অতিমানসের শক্তিতে বিধৃত বলে তার মধ্যে ভেদ আর অভেদে কোনও বিরোধ নাই। অভেদ হতে ভেদের সৃষ্টি সেখানে সত্যেরই বিকল্প, মিথ্যার বিভ্রম নয়। অথচ ভেদভাব দেখা দিয়েছে বলে অদেবী মায়ার বীজও এইখানে। কিন্তু তখনও ভেদ আর অভেদ এক অদ্বৈতবোধে সম্পুটিত। যা অখণ্ড, খণ্ডতায় তা বিচিত্র হয়েছে বটে ; কিন্তু তাবলে অখণ্ডে এবং খণ্ডে কিংবা খণ্ডে-খণ্ডে বিরোধের সৃষ্টি সেখানে হয়নি। এই বিরোধ দেখা দিয়েছে মনে—অতিমানসের অন্ত্যবিভূতিতে, তার আদি- বা মধ্য-বিভূতিতে নয়। তাই অধিমানস মায়া স্বরূপত বিদ্যামায়া—অবিদ্যামায়া নয় ; যদিও এই মায়ারই ক্রিয়াতে অবিদ্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বিশ্বলীলার অপরিহার্য অঙ্গরূপে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পর্ব

অনন্তচেতনা এবং অবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অব্যাকৃত ও বিশ্বব্যাকৃতি

কোন্-কোন্ তত্ত্ব বিশ্বের মূলে, তার মোটামুটি একটা পরিচয় পেলাম। এইবার দেখা যাক, সমগ্রদৃষ্টিতে বিশ্বরহস্যের একটা কিনারা আমরা করতে পারি কি না।

বিজ্ঞানীর অনুভবে বিশ্বভুবন এক অখণ্ড সত্তা আর অনন্ত সংবিতের উচ্ছলন —চিৎশক্তিই প্রকৃতির লোকোত্তর রহস্য। তা-ই যদি হয়, তাহলে এ-জগৎও সত্য এবং চিন্ময়। অথচ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে মনে হয়, সৃষ্টির আদিতে এক মূঢ় অচিতির খেলা—এক সীমাহীন অন্ধকারের বুকে এখানে-সেখানে দু-চারটি চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ কোনরকমে নিজেদের জিইয়ে রেখে তার ঘোরকে তরল করবার চেষ্টা করছে মাত্র। প্রাণ এখানে মৃত্যুগ্রস্ত, চেতনা অচিতির কবলিত। অবিদ্যার আড়াল ভেঙে নিজেকে সহজ মহিমায় ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসে বিদ্যাশক্তি যেন এখানে শ্রান্ত এবং স্তিমিত। অথচ তার তপস্যারও বিরাম নাই। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিতে জগতের বিবর্তনের মোটামুটি ইতিহাস এই।

প্রাকৃত বুদ্ধিও মানে, জগতের যতটুকু আমরা ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি, তাতেই তার রহস্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমরা যা দেখছি, তা পূর্ণসত্যের একটা আংশিক প্রতিচ্ছবি মাত্র ; পরদার এপিঠে যা ফুটছে তা-ই দেখছি, তার ওপিঠে কি আছে জানি না। জানবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে—আলোর ছটা ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে তলিয়ে যায় অব্যক্তে, মিলিয়ে যায় মহা-শূন্যে। শূন্য বা অব্যক্তের কোনও পরিচয় নাই, বিশেষণ নাই। অব্যক্ত হতে কি করে ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, অরূপ থেকে কি করে ফোটে রূপের পসরা— তার কোনও নিশানা নাই। অব্যক্তকে বলি 'প্রকৃতি'। কিন্তু ও তো একটা সংজ্ঞা মাত্র ; প্রকৃতির তত্ত্ব কি, তা কিছুই জানি না—যদিও তার আইনের ধারাগুলিকে কিছু-কিছু হয়তো বুঝতে পারি। বাস্তবিক, বিশ্বের মূল আমাদের কাছে এক রহস্যের যবনিকায় ঢাকা। তাকে 'অনন্তই' বলি আর 'শূন্যই' বলি, তাতে আসল ব্যাপারের কোনও কিনারা হয় না—কেননা ও-দুটি সংজ্ঞাই নেতিবাচক। খুঁজে-খুঁজে শেষ পাই না যখন, তখন বলি 'অনন্ত' ; আর

খুঁজতে চাই না যখন, তখন বলি 'শূন্য'। অনন্তের মধ্যে চলার বেগের একটা রেশ যদিও-বা থাকে, শূন্যের মধ্যে সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। দুটিতেই সূচিত হয় এক অসমাধেয় রহস্যের সামনে বুদ্ধির পরাভব। অতএব বিশ্বমূল অতর্ক্য, অনির্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিকের কাছে এই অনির্দেশ্য রহস্য নিয়েছে শক্তির রূপ। এক অনির্বচনীয় মহাশক্তি বিক্ষুব্ধ বিচ্ছুরিত বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে অসংখ্য অতি-পরমাণুতে। নানা সংখ্যায়, নানা ছাঁদে, নানা পরিমাণে তারা দানা বাঁধছে—গড়ছে পরমাণু, অণু, কণা, পিণ্ড; এমন-কি সম্ভব করে তুলছে প্রাণ আর চেতনার ক্রিয়া। গণিতের সহায়ে সৃষ্টির ইতিহাস গড়ে তোলবার চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বাহাদুরি নিশ্চয় আছে; কিন্তু এতেই বিশ্বরহস্যের পূর্ণ সমাধান হয় না। 'কি করে কি হয়?' বৈজ্ঞানিক তা গুনে বলতে পারলেও চরম 'কেন'র জবাব তাঁর কাছে পাই না। বিশেষতঃ, সংখ্যা আর সংস্থানের বৈচিত্র্যে বিচিত্র গুণের আবির্ভাব হয় কেন—এ-প্রশ্নটা থেকে যায় তাঁর এলাকার বাইরে। অথচ এর একটা উত্তর না পেলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু বুদ্ধিরও তৃপ্তি হয় না।

সৃষ্টিতে শুধু একটি ধাঁধাই নয়। মূলে আকার নাই, অথচ স্থূলে আকার আছে কেন, এও একটা রহস্য। আবার সে-আকারেরও কত রকমারি। একদিক দিয়ে যা মূলপ্রকৃতির 'বিকৃতি' বা রূপান্তর, আরেকদিক দিয়ে তা-ই আবার নতুনতর বিকৃতির প্রকৃতি। বিশ্বের বিসৃষ্টি যেন একটা গাছের মত। গাছের একটি কাণ্ড; কিন্তু সেই কাণ্ড হতেই আবার শাখা, শাখা হতে উপ-শাখা, উপশাখা হতে পল্লব, পল্লব হতে পাতা, পাতা হতে শিরা, শিরা হতে উপশিরা—এমনি করে বিচিত্র ব্যাকৃতির (formulation) যেন আর শেষ নাই। যেমন মাটির উপরে, তেমনি মাটির নীচে অবচেতনার (subconscient) গহনে আবার মূল, উপমূল, তন্তুমূল, অংশুমূল—এমনি করে দেখছি অফুরন্ত ব্যাকৃতির পরম্পরা। বিশ্বের সর্বত্র একের বহুধারূপায়ণের এই চেহারা। রহস্য এই, এর যে-কোনও পর্বে কোনও-একটি বিকৃতির (mutation) কারণটিকে স্পষ্ট আকারে আমরা দেখতে পাই না। সর্বত্রই ব্যাকৃতির আবির্ভাব যেন অতর্কিত একটা বিস্ময়। যা নির্বিশেষ (indeterminate), তা কেন বিশেষ করে এই আকারই নেবে—তার কোনও জবাব নাই। এ কি তাহলে বিশ্বশক্তির খেয়ালখুশির খেলা? অসম্ভব নয়। কল্পনা করতে পারি:

এক মহাশক্তি আপনাহতে বিশ্বের আকারে ছলকে উঠেছে বটে, কিন্তু যদৃচ্ছা (chance) বা আকস্মিকতাই সে-উচ্ছলনের ধর্ম। বিশ্বশক্তি স্বরূপত অচেতন। তার কোনও কল্পনা নাই, কাজের কোনও ছক নাই ; তার বন্ধনহীন অনিয়মের মধ্যে শুধু অভ্যাসের বশেই নিয়ম বলে একটা-কিছু দেখা দেয়—নইলে নিয়ম সৃষ্টি করা তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হতেও পারে না।

অথচ যদৃচ্ছাই যে প্রকৃতির সবখানি, তাও তো বলা চলে না। বরং মনে হয়, নিয়মের বাঁধন তার সর্বত্র। সব নিয়ম আমরা জানি না, তাই অনেক-কিছুকেই মনে করি আকস্মিক। কিন্তু আমরা জানি আর না জানি, প্রত্যেক বস্তুরই একটা 'ঋত' বা স্বভাবছন্দ আছে। অতএব যদৃচ্ছা নয়, নিয়তিই (determination) হল মহাশক্তির স্বরূপ।

তখন প্রশ্ন ওঠে : নিয়তিরূপিণী এই মহাশক্তি জড় না চিন্ময় ? যদি বলি জড়, তাহলে তার মধ্যে চৈতন্য ফুটল কোন্ নিয়তির বশে ? ফোটবার তাগিদ শক্তি-পরিণামের গোড়াতেই প্রচ্ছন্ন না থাকলে আজ তা ফোটেই-বা কি করে ?

সবদিক বিচার করলে, বিশ্বজগৎ এক চিন্ময় মহাশক্তির ঋতচ্ছন্দা বিসৃষ্টি—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। বিশ্বের মূলে চিৎশক্তিকে স্বীকার করলে জড় নস্যাৎ হয়ে যায় না—শক্তি-ক্রিয়ার আধাররূপে তাকে স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া চলে। জড়কে বাহন করে চিৎশক্তি রূপের মেলা ফুটিয়ে চলেছে—একথা বোঝা সহজ। এতে চৈতন্যের মধ্যে জড়ের একটা ঠাঁই হয়, দুয়ের সম্পর্কটাও বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয়। কিন্তু জড়কে চরমতত্ত্ব বললে তার সঙ্গে চৈতন্যের সম্পর্ক নিয়ে দেখা দেয় নানান সমস্যা। নৈয়ায়িক বলবেন, যে-সিদ্ধান্ত তার উদার বক্ষে সমস্ত তত্ত্বকে অবিরোধে ঠাঁই দিতে পারে, সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন। এইহিসাবে জড়বাদের চাইতে চিদ্‌বাদ শ্রেষ্ঠ।

কথাটা এই। জগৎরহস্যের বিচার করছি বুদ্ধি দিয়ে। বুদ্ধি জাগ্রত-চেতনার ক্রিয়া। তাকে বাদ দিয়ে বিচার চলবে কি করে ? চেতনাই তো বলে দিচ্ছে, জড় আছে। চেতনা না থাকলে, কে আছে কি আছে—কিছুই বলা চলত না। ঘুম কি তা বুঝতে পারি—যখন জেগে ঘুমই বা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘুমের বিচার করি। জাগ্রৎ-অবস্থা যেমন ঘুমকে জানিয়ে দেয়, তেমনি চেতনাই জড়ের সত্তাকে সিদ্ধ করে।

তবুও তর্ক উঠবে: দেখছি, বিশ্বের গোড়ায় জড়, তারপর চেতনার আবির্ভাব; সুতরাং জড়ের সত্তাই তো সিদ্ধসত্তা।…কিন্তু গোড়ায় যে-জড় তারও গোড়াতে কি, তা তো দেখছি না। বিচ্ছিন্ন মনশ্চেতনাকেই দেখছি, অখণ্ড স্বরূপচেতনাকে দেখছি না। খণ্ডের মূলে থাকে অখণ্ড, রূপের মূলে ভাব, ক্রিয়ার মূলে শক্তি, ব্যক্তের মূলে অব্যক্ত। চেতনার ক্রমস্ফুট অভিব্যক্তিই ইশারা করে তার মূলে জ্যোতির্ময় মহা-অব্যক্তের দিকে। এই ব্রহ্মাণ্ড যদি দেহ হয়, আর দ্যুলোক হয় মূর্ধা—তাহলেই বোঝা যায়, সৃষ্টির গোড়ায় জড় না চৈতন্য। এ-অনুভব তো অসিদ্ধ নয়। অন্তর্মুখ হয়ে আত্মচেতনার পরিব্যাপ্তি আর ঊর্ধ্বায়নের সাধনা তার পথ। প্রাকৃত চেতনা পূর্ণচেতনার ভ্রূণ মাত্র। ভ্রূণের যদি দৃষ্টি খুলত, মাতৃগর্ভের অন্ধকার ছাড়া আর-কিছু সে দেখতে পেত না। তাবলে ভ্রূণচেতনার আদিতে ওই অন্ধকার, না তার মাতৃচৈতন্যের পূর্ণদীপ্তি?

এই পূর্ণচৈতন্যের নাম দিলাম ঈশ্বর। প্রশ্ন হবে, বিশ্বের সঙ্গে ঈশ্বরের কি সম্পর্ক? সাধারণত ঈশ্বরবাদীরা দ্বৈতস্পৃষ্ট মন নিয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখেন বিশ্বের বাইরে। বলেন, ঈশ্বর বিশ্বের নির্মাতা এবং বিধাতা; তার ইচ্ছায় বিশ্বের উদ্ভব এবং তার প্রতি পর্বে তাঁর শক্তির পরিচয়। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর বুদ্ধি আর শক্তির ছাপ থাকলেও স্বয়ং তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ।

কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বের বাইরে রেখে বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। পূর্ণ ঈশ্বর অপূর্ণ জগৎ গড়তে গেলেন কেন, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ঈশ্বরবাদীকে তখন নানা গোঁজামিলের আশ্রয় নিতেই হয়। আসলে, মানুষের মধ্যে বিশ্রান্তির দিকে, নিবৃত্তির দিকে, তুরীয়ের দিকে একটা ঝোঁক আছে; তাতেই তার মধ্যে ফোটে বিশ্বোত্তীর্ণ ঈশ্বরের আদর্শ। বিশ্বের ঝামেলা হতে ছুটি চাই—তাই আমার ঈশ্বর বিশ্বের ওপারে। আত্মচেতনায় পুরুষ প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, বিশ্বব্যাপারে ঈশ্বর বিশ্বোত্তীর্ণ—এ-দর্শন অবশ্য মিথ্যা নয়। কিন্তু পূর্ণদর্শনের এ হল আধখানা। স্বরূপত ঈশ্বর বিশ্বোত্তীর্ণ আর বিশ্বাত্মক দুইই; পূর্ণসিদ্ধ পুরুষের প্রকৃতি তাঁরই চিন্ময় আত্মপ্রকৃতি। ঈশ্বর লোকোত্তর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকেই জীব আর জগৎ দুইই হয়েছেন—এই হল পূর্ণাদ্বৈতের সিদ্ধান্ত।

আবার প্রশ্ন তুলি: যিনি পূর্ণচৈতন্য, অচিতিতে তিনি নিজেকে রূপায়িত করলেন কেন? প্রথমেই বলব, অচিতিতে আচ্ছন্ন হয়ে সে-ঘোর কাটিয়ে

ওঠবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য যদি তাঁর না থাকত, তাহলে এ-জবাবদিহি সঙ্গত হত। কিন্তু চোখের সামনেই দেখছি অচিতি হতে চেতনার উন্মেষ আর পূর্ণচেতনার দিকে তার মন্থর অভিযান, অপূর্ণের পূর্ণায়ন দেখছি বিশ্বের পর্বে-পর্বে। তাঁর পূর্ণবিদ্যার মধ্যেই অন্তর্জ্যোতি অবিদ্যার খেলা, পূর্ণজাগৃতির মধ্যেই যোগ-নিদ্রার নিবেশ। পূর্ণচৈতন্য গুটিয়ে আসছে অচিতির মধ্যে, আবার অচিতির বিস্ফারণ ঘটছে পূর্ণচৈতন্যের দিকে। চিৎশক্তির এই অবরোহ (descent) আর আরোহই (ascent) সৃষ্টি। নইলে পূর্ণচৈতন্য যদি পূর্ণচৈতন্যই থেকে যেত, তাকে আর সৃষ্টি বলা চলত না।

এই সৃষ্টির লীলায় প্রমাণিত হয়, ঈশ্বর স্ব-তন্ত্র এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস নিজেকে বিচ্ছুরিত করে অন্তহীন রূপের মেলায়; সৃষ্টিতে যে-আকস্মিকতা দেখি, তার মূলে এই সত্য। অথচ এই অবন্ধন উল্লাসের গভীরে আছে সুদূর ভবিষ্যতে একটি সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে রূপ দেবার সঙ্কল্প; সৃষ্টিতে নিয়তির অর্থই এই। হাজার ফুল ঝরে গিয়ে ফলে একটি ফল; আবার সেই ফলের বুকে ঘুমিয়ে থাকে লক্ষ ফুলের বিচিত্র রূপায়ণের উল্লাস। যদৃচ্ছা আর নিয়তি এমনি করে জড়িয়ে আছে বিশ্বের সর্বত্র।

পূর্ণচৈতন্যের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের এই পরিচয়। তাঁকে বিশ্বের মূল বলে স্বীকার করলেই তার রহস্যের যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। পূর্ণচৈতন্যের স্বরূপ জানতে পারা যায় একমাত্র আত্মচৈতন্যের গভীরে তলিয়ে গিয়ে। আত্মার রহস্য জানলে তবেই জানা যায় বিশ্বের রহস্য কি। জড়ও যে চিন্ময়, তার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই আমাদের দেহে; এই বাস্তব অনুভবকে ভিত্তি করে জড়ের তত্ত্ব খুঁজলে তবে আমরা তার যথার্থ স্বরূপ জানতে পারব। এমনি করে জানব প্রাণকে, জানব মনকে। বিশ্বের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে তাই অন্তরাবৃত্তচক্ষু (inwardised) হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এ-পথ বৈজ্ঞানিকের নয়—দার্শনিকেরও নয়; এ-পথ অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর—যাঁর কাছে জানা অর্থ হওয়া। বিজ্ঞানী বিশ্ব হয়ে বিশ্বকে জানতে পারেন আত্মসত্তার গভীরে ডুবে।

এই ধারা ধরে যৌগিক পন্থায় মনকে শুদ্ধ করলে পর আমরা প্রথম জানতে পারি, মনের তত্ত্ব কি। এ-তত্ত্ব জানা দরকার; কেননা, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বটা আমাদের মনগড়া। মনের রহস্য জানলে বিশ্বের রহস্য জানা তাই সহজ হয়। মনের ক্রিয়াকে শুদ্ধ করে প্রথমে পাই বিশুদ্ধ

মনোধাতু (mind-substance) বা মনঃপ্রকৃতির পরিচয়; তাকে ঘিরে দেখি বিশ্বমনের পরিবেশ আর আবেশ, তার গভীরে দেখি অধিচেতন (subliminal) মনঃশক্তির উচ্ছলন। আরও গভীরে তলিয়ে পাই মনঃপ্রকৃতির সাক্ষী মনোময়-পুরুষকে; দেখি, তিনি শুধু প্রকৃতির উপদ্রষ্টা বা সাক্ষী নন—তার অনুমন্তা আর ভর্তাও বটে।

তখন প্রশ্ন জাগে: এই মনোময়-পুরুষের সঙ্গে মনঃপ্রকৃতির কি সম্পর্ক? পুরুষ আর প্রকৃতি কি এখানে আলাদা, না দুইই এক অখণ্ড চিৎশক্তির বিলাস? প্রশ্নের জবাব পেতে উজিয়ে যেতে হয় অধিমানস ভূমিতে—যেখানে ব্যক্তি-চেতনা প্রসারিত হয়েছে বিশ্বচেতনাতে।

এইখানে এসে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: জীব আর বিশ্ব দুইই এক বিশ্বোত্তীর্ণ পরমার্থ-সৎএর (Absolute Reality) বিভূতি; জীব বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে—এই তার বৈশিষ্ট্য।…যদি প্রশ্ন করি: জীবপ্রকৃতির এই স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির তাৎপর্য কি? অথবা, শেষপর্যন্ত পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কই-বা কি দাঁড়ায়? তাহলে তার তিনটি জবাব আমরা পাই: (১) প্রকৃতি স্ব-তন্ত্র, আর পুরুষ উদাসীন নির্বিকার সাক্ষী মাত্র; (২) প্রকৃতি-পুরুষের মিথুনলীলা নির্বর্ণের পটে বর্ণের বিভ্রম (illusion) শুধু; (৩) প্রকৃতির লীলা পুরুষেরই স্বরূপসত্যের স্ফূর্তি, সুতরাং সর্বাংশে সার্থক। অখণ্ডের প্রত্যেকটি খণ্ডবিভাবকে চরম মর্যাদা দেওয়া অধিমানসের ধর্ম; তাই অধিমানস-ভূমিতে এসে এই তিনটি দর্শনকেই মনে হয় স্বতন্ত্রভাবে সত্য। যে-পরমসত্যে এ-তিনের সমন্বয় এবং সমাহার ঘটবে, তার সন্ধান দেওয়া অধিমানসের সাধ্য নয়; কেননা, প্রাকৃতমনের রাজ্যে স্বভাবত যে-দ্বন্দ্ব দেখতে পাই, অধিমানসের মধ্যেই রয়েছে তার বীজ। পরমসত্যের দর্শনেও সে-দ্বন্দ্বের জের কিছুতেই তার মিটতে চায় না। ব্রহ্ম তাই তার কাছে একবার প্রপঞ্চোপশম, নির্বিশেষ, নির্গুণ—আবার প্রপঞ্চোল্লাসময়, সবিশেষ, সগুণ। পর্যায়ক্রমে দুইই তার কাছে সত্য; দুয়ের উর্ধ্বে যা, তা অনির্দেশ্য (indeterminable)।

কিন্তু অনির্দেশ্য অক্ষরই (Immutable) যদি হয় একমাত্র চরমতত্ত্ব, তাহলে শক্তি হয় অনির্বচনীয় মায়া; আর তার সৃষ্টি হয় অর্থহীন একটা বিভ্রম। অথচ একথা বললে বিশ্বরহস্যের কোনও মীমাংসা হয় না। মীমাংসার জন্য তাই যেতে হয় অধিমানসেরও উজানে—বিশ্বচেতনার অতিমানস উৎসমূলে।

অতিমানস দর্শন তত্ত্বের অখণ্ড সম্যক্-দর্শন (integral vision)—সহস্রদল পদ্মের সুষমার মত। পদ্মের বীজকোষে সব দল এসে সংহৃত হচ্ছে—এই হল দেখবার একটি ভঙ্গি; আবার একই বীজকোষ হতে হাজারটি দলের বিস্তার—এই হল আরেকটি ভঙ্গি। যদি মন দিয়ে দেখি, তাহলে দুটি গতিভঙ্গিকে কল্পনা করি পর্যায়ক্রমে; গুটিয়ে আসা আর ছড়িয়ে পড়াকে একসঙ্গে অনুভব করা তখন সম্ভব হয় না। অথচ আমিই যদি পদ্ম হয়ে ফুটতাম, তাহলে এই দৃষ্টির দ্বৈত থাকত না; দৃষ্টি তখন হত সৃষ্টির রসে জারিত, জানার মূলে থাকত হওয়ার উল্লাস। আগেই বলেছি, অতিমানসের জানা হয়ে জানা। তাই মনের উজানে যে-তত্ত্ব অনির্দেশ্য, সৃষ্টির স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আছে বলে যাকে সে বলে 'অসম্ভূতি' (non-Being)—তাহতে সৃষ্টির নির্ঝরণকে অতিমানস অনুভব করে অস্পন্দেরই সহজ আত্মস্পন্দরূপে। নিস্পন্দ সত্তাই আত্মসত্তার বেগে স্পন্দিত হচ্ছে; অথচ তার সবখানি স্পন্দিত হচ্ছে না—স্পন্দনের আধাররূপে মর্মস্থলে একটা স্পন্দহীন সত্তা থেকেই যাচ্ছে। ব্রহ্ম বিশ্বরূপে বিচ্ছুরিত হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণতায় নিস্পন্দ হয়ে আছেন; প্রপঞ্চোপশমের আনন্দ গভীর হয়ে আছে তাঁর সেই গহন স্তব্ধতায়, আবার সেই স্তব্ধতার অবন্ধ্য বীর্য সঞ্চারিত হচ্ছে প্রপঞ্চের প্রত্যেকটি স্পন্দনে। বৈদিক ঋষি বললেন, 'ব্রহ্মের ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে—তাঁর এক পাদ এই জগৎ; দুয়ে মিলে ব্রহ্ম "চতুষ্পাৎ" বা চার-পো—অখণ্ড এবং পূর্ণ।' অতিমানস দেখে এই চতুষ্পাৎ ব্রহ্মকে; মনের মায়ায় একপাদে আর ত্রিপাদে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি সে করে না।

কথাটাকে আরেকভাবে বোঝা যাক। একই তুরীয়-চেতনায় জাগ্রৎ স্বপ্ন আর সুষুপ্তি দেখা দিচ্ছে পর্যায়ক্রমে। প্রাকৃত চেতনায় একটি যখন আছে, আরেকটি তখন নাই। অথচ সে-চেতনাও বোঝে—তিনটির মূলে একটা-কিছু আছে, যা ওই তিনের উৎস। চেতনা উজিয়ে চলল তার সন্ধানে; তার জাগ্রৎ গেল, স্বপ্ন গেল, সুষুপ্তি গেল—ফুটল তুরীয়ের নির্বর্ণ দীপ্তি। পরমসত্যকে জেনে চেতনা ফিরে এল—কিন্তু জানল সত্যের নেতিরূপকে, তার সর্বগ্রাহী ইতিরূপকে নয়। তাই এখানে এসে তিনটি প্রাকৃত অবস্থার সঙ্গে সে জুড়ল অপ্রাকৃত আরেকটি অবস্থা। চারটি অবস্থা পৃথক-পৃথকই রয়ে গেল। তুরীয় পেল লোকোত্তরের মর্যাদা, কিন্তু তার রসে আর তিনটি জারিত হল না। এই হল মনের মায়া—সত্যদর্শীর চেতনাও যার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে না।

অদ্বৈতসাধনার গভীরেও যদি দ্বৈতের সংস্কার না থাকত, তাহলে দেখা যেত ব্যাপারটা ঘটছে আরেকরকমে। যোগীর সমাধি থেকে 'ব্যুত্থান' হয় অর্থাৎ চেতনা আবার প্রাকৃত ভূমিতে ফিরে আসে। প্রাকৃত মন বলে, দুটি অবস্থা চেতনার দুটি মেরু। আসলে কিন্তু তা নয়। সমাধির পরিপাকে সমাধির মধ্যেই ব্যুত্থান হয়। তা-ই স্থিতপ্রজ্ঞের জাগ্রৎসমাধি। গীতার ভাষায়, তিনি জাগার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, আবার ঘুমের মধ্যেও জেগে আছেন। জাগা আর ঘুমে তাঁর বিরোধ নাই—দুটিতেই তিনি চেয়ে আছেন। পূর্ণ-যোগীরও সমাধি আর ব্যুত্থানে তফাত নাই। এই হল অতিমানস দর্শনের ভিত্তি—মনের মায়া যেখানে চরম তত্ত্বের মধ্যে বিকল্পের (alternation) সৃষ্টি করে না।

এই মনের মায়া কেটে গেলেই নিটোল তত্ত্বভাবনায় অদ্বৈতদর্শন সহজ হয়। বিশ্বব্যাপারে চিৎ আর অচিৎএ, বিদ্যায় আর অবিদ্যায় তখন কোনও বিরোধ থাকে না। সংবর্তুল (global) আত্মচেতনায় যুগপৎ জেগে ওঠে এক অমেয় গভীরতা ব্যাপ্তি আর তুঙ্গতা। তার স্বচ্ছ ও গহন দৃষ্টিতে অনুভূত হয়: বিশ্বমূল অতিচেতনাই নিজের মধ্যে গুটিয়ে এসে গড়ছে অব্যক্ত অচিতির গর্ভাশয়—যার মধ্যে চিদ্‌বীজের ক্রমিক স্ফুরণই সৃষ্টির রহস্য। ঠিক এই রীতিতে পূর্ণবিদ্যাই স্বেচ্ছায় নিজের মধ্যে রচেছে অবিদ্যার কুণ্ডলী—যার আয়তনে বিদ্যার অভীপ্সা ফুটিয়ে চলেছে জানার কত-না ঐশ্বর্য। এক অখণ্ড চিন্ময় সত্তার আনন্দময় আত্মবিচ্ছুরণ—তার নাম সৃষ্টি। অখণ্ড সত্তা চেতনা আর আনন্দ—তিনে এক, একে তিন। সমস্ত দ্বৈতের পরম সমাহারে অতিমানস অদ্বৈতভাবনার এই হল নিটোল পূর্ণতা।

অথচ ভাবনার এটা ইতির দিক। তার একটা নেতির দিকও আছে। প্রপঞ্চোল্লাসের হিরণ্যচ্ছটা নিঃশব্দে মিলিয়ে যাচ্ছে প্রপঞ্চোপশমের অবর্ণতায়। চিন্ময় আনন্দময় সত্তার উজানে পরঃকৃষ্ণ অব্যক্তের শূন্যতা। এও সত্য। ব্রহ্ম সগুণ, ব্রহ্ম নির্গুণ; ব্রহ্ম অনির্দেশ্য।

অনির্দেশ্য—কিন্তু অজ্ঞেয় নন, বিজ্ঞেয়। এই মন দিয়ে তাঁর পূর্ণ সৌষম্যকে জানতে পারি না, তাকে যত উঁচুতেই ওঠাই না কেন। কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানে তাঁকে পাই, ওপার হতে অবর্ণের বর্ণচ্ছটায় সত্তার পরিপ্লাবনে। তখন মহাশূন্য হয় নিরঙ্কুশ সত্তার বজ্রভিত্তি, নির্বাণের স্বাতন্ত্র্যে ফোটে কবি ক্রতুর অমেয় ঐশ্বর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর ঃ মায়া প্রকৃতি শক্তি

ব্রহ্ম স্বরূপত অক্ষর, অনির্দেশ্য ; অথচ তিনি বিশ্বের মূল ও বিস্তার—দুইই। ঋষি বলেন, মন তাঁর নাগাল না পেয়ে ফিরে আসে, বাণী মূক হয়ে যায়। কোনও ভাব বা ভাবনা দিয়ে তাঁর ইতি করা যায় না ; তাই তিনি 'নেতি—নেতি'।

আবার বুদ্ধি যখন তাঁকে বলছে 'নেতি—নেতি', সেই মুহূর্তেই হৃদয় বলছে 'এই যে—এই যে'। তাঁকে দেখা যায় না, ভাবা যায় না—অথচ বোধে তাঁর বোধ হয়। দার্শনিকের খর্ব ভাষা তাঁকে আঁটতে পারে না যখন, কবির হৃদয় হতে বাণীর মরাল তখন স্বরের পাখা মেলে তাঁর দিকে।

এই অনির্দেশ্যই উপনিষদের পরব্রহ্ম, পাশ্চাত্যদর্শনের Absolute। ঋষির মন্ত্রবর্ণে ফুটে উঠছে তাঁর অখণ্ড স্বরূপের অপূর্ব ব্যঞ্জনা : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা-কিছু সবই তিনি, তিনি 'স্ত্রী পুমান্ কুমার উত বা কুমারী', তিনিই 'নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষঃ—তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ', ভূতে-ভূতে তিনি 'অন্তর্হৃদয়ে আকাশ আনন্দঃ—রূপংরূপং প্রতিরূপং বভূব'। যেমন তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ (Transcendent), তেমনি আবার বিশ্বাত্মক (Immanent) ; যেমন তিনি পুরুষ আখ্যার অতীত, তেমনি আবার পুরুষবিধও (Personal) বটে ; যেমন তিনি শুদ্ধ সন্মাত্র (Pure Existence), তেমনি আবার তিনি সত্তনু (Pure Existant)। যেমন তাঁর চিৎস্বরূপের মধ্যে পাই ব্রহ্ম পুরুষ আর ঈশ্বরের ত্রিপুটী (Trinity), তেমনি তাঁর চিৎশক্তিকেও দেখি মায়া প্রকৃতি আর শক্তির ত্রয়ীরূপে। এই ত্রিপুট অক্ষরেরই প্রশাসনে বিশ্বের বিসৃষ্টি—তার মর্মের গহনে জীবের বিন্দুচেতনায় তাঁরই আবেশ, তার ঊর্ধ্বে বিশ্বোত্তীর্ণের নির্বিশেষ মহিমায় তাঁরই অমার আলো।

ব্রহ্ম অনন্ত। দিশাহারা বুদ্ধির কাছে সে-আনন্ত্যের উচ্ছলন একটা অপ্রমেয় ইন্দ্রজাল। অথচ আনন্ত্যের ক্রিয়ার পর্যবসান শুধু ইন্দ্রজালে নয়, তার মধ্যে যুক্তিজালও আছে। সে-যুক্তি বোধির যুক্তি—যা আনন্ত্যের সকল

বৈচিত্র্যকে অপক্ষপাতে মেনে নেয় এবং সকল বিরোধের সমাধান করে আত্ম-বোধের ভিত্তিতে। বুদ্ধির যুক্তি আর বোধির যুক্তির ধারা তাই স্বতন্ত্র।

বুদ্ধির যুক্তির মূলে আছে 'ভূয়োদর্শন' অর্থাৎ একটা-কিছুকে অনেকদিক থেকে অনেকবার দেখা। কিন্তু স্বভাবতই ভূয়োদর্শনের সীমা সঙ্কীর্ণ। যুক্তির এলাকাও তা-ই। বিশ্বের সকল তত্ত্ব এক স্তরের নয়; তাই এক স্তরের যুক্তি বা আইন আরেক স্তরে খাটে না। জড়ের আইন প্রাণের ব্যাখ্যায় অচল; প্রাণের তত্ত্বে মনের সব রহস্যের কিনারা হয় না।

তথ্যের 'পরে যুক্তির নির্ভর। অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তকে দাঁড় করানো—এই হল যুক্তির রীতি। কিন্তু ইন্দ্রিয়নির্ভর বুদ্ধির পক্ষে কোনও বিষয়েরই সমস্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সঙ্কলন সম্ভব নয়। তাই তার দর্শন অখণ্ড দর্শন নয়; সবদিক দেখে বস্তুবিচার করতে পারে না বলে তার সিদ্ধান্ত তাই একপেশে। যুক্তির দীপ একটা বিশেষ ক্ষেত্রের খানিকটা আলোকিত করতে পারে মাত্র; তার উপরে-নীচে আশে-পাশে থেকে যায় সমান অন্ধকার।

এই অন্ধকার তরল হতে পারে বোধির আলোকে—যার মধ্যে আছে অখণ্ড-দর্শনের সহজ ঔদার্য। আত্মবোধ আর আত্মব্যাপ্তি হল তার ভিত্তি। বিষয়কে জানতে হবে আমার বাইরে রেখে নয়—তাকে আমার ভিতরে টেনে এনে, নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে। এমনিতর জানাকে আগেই বলেছি 'হয়ে জানা'। সে-জানার অন্তরায় বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের কোলাহল। আগে ইন্দ্রিয়কে শান্ত করতে হবে, মনকে করতে হবে স্তব্ধ; তারপর নিস্তরঙ্গ আত্মবোধের স্বচ্ছ শূন্যতায় জাগিয়ে তুলতে হবে বিষয়ের সংস্কারকে। এমনি করে সুগভীর আত্মচেতনার বৃন্তে ফুটবে বিশ্বের সহস্রদল লীলাকমল। আত্মা আর অনাত্মার ভেদ দূর হয়ে আত্মব্যাপ্তির প্রসন্ন জ্যোতিতে তখন অনাবৃত হবে বিশ্বের মর্মরহস্য—সান্তে-অনন্তে, ব্যক্তে-অব্যক্তে, রূপে-অরূপে, সগুণে-নির্গুণে, একত্বে-বহুত্বে কোনও দ্বন্দ্ব তখন থাকবে না। আত্ম-বোধের কেন্দ্র হতে বিশ্ববোধের বৈচিত্র্য জাগবে বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবেরই সত্য বিভূতিরূপে।

ভেদবুদ্ধি দূরে গেলে অখণ্ড বোধির উদয়ে অদ্বৈতদর্শন হয় স্বচ্ছন্দ। সে-দর্শন শুধু চোখ বুজে দর্শন নয়—এই চোখ মেলেই বহুর মূলে এককে দেখা। স্থূলে বহু, কিন্তু মূলে এক—এ-সিদ্ধান্তকে বুদ্ধিও অস্বীকার করতে পারে না;

কেননা তারও ঝোঁক বহুর গোড়ায় এককে আবিষ্কার করবার দিকে। প্রাকৃত বুদ্ধি তার বহির্মুখ দৃষ্টি নিয়ে স্বচ্ছন্দে ভাবতে পারে—বিশ্বের মূলে এক জড়, তার বাইরে-ভিতরে শুধু জড়ের খেলা। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আরেকটু তলিয়ে দেখে ভাবে—বিশ্বের মূলে এক শক্তি, জড় বা চেতনা দুইই তার পরিণাম মাত্র। অধ্যাত্ম-বুদ্ধি অপরোক্ষ অনুভবের দাবি মেনে অনাত্ম-জগৎকে অনুবাদ করে আত্মচেতনার স্পন্দনে, বলে : বোধের চাইতে অন্তরঙ্গ আর অপরোক্ষ কিছুই হতে পারে না। জগতে যা-কিছু, সবার পর্যবসান এই বোধে। আমার বোধে সত্য বলেই বাইরের জগৎ সত্য। বহির্মুখ চিত্তে এই বোধ বিচিত্র ; কিন্তু তারই গভীরে অন্তর্বিজ্ঞানের তপস্যা চলছে বৈচিত্র্যকে এক অখণ্ডবোধে গুটিয়ে আনবার। বোধির উন্মেষে সে-বোধ সংহত ও রসঘন হয়ে ফোটে পরিব্যাপ্ত আত্মবোধে। তখন 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম, 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্'—এই যা-কিছু সমস্তই এই আত্মা।

এই হল চিদদ্বৈতবাদ—অপরোক্ষ অনুভবের ভিত্তিতে। জড়ের অদ্বৈত আর শক্তির অদ্বৈত তারই বিভঙ্গ। এ-দর্শন বৈজ্ঞানিকের নয়—বিজ্ঞানীর। তার সার্থকতাও বস্তুতন্ত্র জীবনে উপকরণের বাহুল্যে নয়—সমাহিত চেতনার ঐশ্বর্যে, তার বস্তুনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আনন্দে, তার ভাবোল্লাসময় শক্তির উচ্ছলনে।

বোধি দেখে, বিশ্বের অন্তরে-বাইরে এক অখণ্ড চেতনা ও ইচ্ছার ক্রিয়া। এই চিন্ময় ইচ্ছাই বৈদিক ঋষির 'কবি-ক্রতু'। আমাদের মনগড়া যুক্তির বা ধর্মাধর্মের কল্পিত মানের সে ধার ধারে না। অনেক দূরের অনেক গভীরের এক ধ্রুবলক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে চলেছে—অগণিত বস্তুর ফেনা আর অমেয় শক্তির আবর্তে উচ্ছল হয়ে। বাইরে থেকে মনে হয়, তার সবই বুঝি খেয়াল-খুশির খেলা ; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দেখে, তার সব-কিছু ঋতময়—সত্যের ছন্দে বাঁধা। অবস্থার বৈচিত্র্যে তার ক্রিয়ার বিচিত্র বিক্ষেপ—কিন্তু নৃত্যের অঙ্গবিক্ষেপের মতই তার গভীরে আছে একটা সুডোল অর্থের সৌষম্য। এইটুকু আছে বলেই অনন্ত আপন উল্লাসে বহু-বিচিত্র হয়ে ফুটতে পারে। তার সত্যকে বুঝতে হলে তার সবটুকু নিতে হবে—প্রয়োজনের গরজে প্রাকৃত বুদ্ধির মত কাটছাঁট করে নিলে চলবে না।

ব্রহ্ম অখণ্ড। প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে যেসব ধর্ম পরস্পরবিরোধী, ব্রহ্মের

অখণ্ডবোধে তারা সুসমঞ্জস। এই অখণ্ডবোধের স্বরূপ যে আমাদের নিতান্ত অজানা নয়, তার প্রমাণ পাই নিজের মধ্যেই। ভেঙে দেখলে একটি জীবদেহ অগুনতি কোষের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কোষের ধর্ম আলাদা, ক্রিয়া আলাদা। অথচ সব জড়িয়ে পাই একটি অখণ্ড দেহসত্তা বা দেহবোধ। তেমনি মনের বেলাতেও। দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান সব নিয়ে আবার একটি অখণ্ড সত্তার বোধ। ভেঙে-ভেঙে দেখতে গিয়ে বুদ্ধি বিরোধের সৃষ্টি করে যেখানে, বোধির অন্তরঙ্গ অনুভব সেখানে পায় এক অখণ্ডকে।

ব্রহ্মের অখণ্ডবোধও এমনিতর। বেলকে ভাঙলে এই তার শাঁস, এই বিচি, এই খোলা। কিন্তু গোটা বেলটাকে জানতে হলে শাঁস-বিচি-খোলা সব নিতে হয়, নইলে 'ওজনে কম পড়ে'।

তাই শুধু অচর ব্রহ্মকে দেখলেই হবে না, দেখতে হবে চর ব্রহ্মকেও। ব্রহ্ম অচর এবং চর দুইই। 'সাপ যখন চলছে না, তখনও সে সাপ—যখন চলছে তখনও সাপ।' আরও গভীর করে বলতে গেলে ব্রহ্ম 'শয়ানো যাতি সর্বতঃ'—শুয়ে থেকেই সবজায়গায় ছুটে বেড়ান। অটল থেকেই তিনি টলছেন। বুদ্ধির কাছে এ একটা হেঁয়ালি, কিন্তু বোধির কাছে নয়। অন্তর্মুখ হয়ে আমার মধ্যেই দেখি, ভাবের গহন স্তব্ধতা থেকেই জাগছে বিচিত্র ভাবনার স্পন্দন। স্তব্ধতা যেমন সত্য, স্পন্দনও তেমনি সত্য; দুইই একই সময়ে পরস্পরকে জড়িয়ে থেকে সত্য।

এমনতর সর্বত্র। পূর্ণজ্ঞানীর অনুভবে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক যেমন সত্য, তেমনি দুয়ের চিন্ময় নিত্যযোগও সত্য। 'সোঽহং' যেমন সত্য, তেমনি সত্য 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

তাঁকে নির্গুণ বলি, তাঁর মধ্যে গুণ নাই বলে নয়—যে-কোনও গুণকে তিনি প্রকাশ করতে পারেন বলেই। বস্তুর গুণ মানে বিশেষ অবস্থায় তার স্বধর্মের প্রকাশ। প্রকাশের মূলে আছে অপ্রকাশ, ব্যক্তের মূলে অব্যক্ত। তা-ই নির্গুণ। নির্গুণ হতেই গুণের প্রকাশ; তাই ব্রহ্ম নির্গুণ থেকেই সগুণ—তাঁর গুণের অন্ত নাই। নির্গুণে তিনি যেমন অমেয় অনন্ত, সগুণে তেমনি তাঁর মধ্যে মেয় (measurable) অনন্তের লীলা।

নিস্পন্দ আধার ছাড়া স্পন্দ জাগবে কোথায়? তাই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় থেকেই আবার সক্রিয়। তাঁর বিচিত্র বৈভবকে গাঁথি নামের মালায়; যখন আর অন্ত পাই না, বলি তিনি অনামা। যেমন অন্ত পাই না ইয়ত্তায়, তেমনি অন্ত পাই

না বোধের ক্রমসূক্ষ্মতায়। পেঁয়াজের খোসা পাতলা হতে-হতে শেষে আর কিছুই থাকে না। অনন্ত রূপের উল্লাস ভাবনান্দ্র অনুভবের অন্তরিক্ষ বেয়ে গিলিয়ে যায় জ্যোতির্লোকে। বলি, তিনি অরূপ।

যেমন তিনি এক, তেমনি আবার বহুও। সংখ্যা দিয়ে তাঁর একত্বকে গুনে পাওয়া যায় না। সংখ্যার কারবার খণ্ডকে নিয়ে; তার এক 'অদ্বিতীয়' নয়—একের পাশে আরেককে জুড়ে-জুড়ে সেখানে রচা হয় বহুর মেলা। কিন্তু ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অখণ্ডের গভীর বোধে সব বৃত্তি তলিয়ে গেছে, তাই তিনি 'অদ্বৈত', তিনি 'এক'। অথচ এই একের সঙ্গে বহুর বিরোধ নাই—কেননা এই একেরই মূল হতে ছড়িয়ে পড়েছে বহুর ডালপালা। বহুর প্রত্যেকের শিরায় সেই একের সঞ্জীবন রস—ব্রহ্মের অখণ্ড শক্তির ও চিন্ময় তাৎপর্যের আবেগ।

এমনি করে ক্ষরে-অক্ষরে, সগুণে-নির্গুণে, সরূপে-অরূপে, একে-বহুতে, সান্তে-অনন্তে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এর মধ্যে আমরা বিরোধের কল্পনা করি শুধু মনের মায়ায়। বলতে গেলে এসব বিরোধই একটা কথার কথা। খণ্ডবোধের প্রয়োজনে যে-ভাষার সৃষ্টি, তাকে দিয়ে বোঝাতে চাই অখণ্ডকে। বিরুদ্ধভাষণ তাইতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হার মেনে গিয়ে বলি, ব্রহ্ম অনির্বাচ্য—বচন-রচনে তাঁর পরিচয় হয় না।

যেমন তিনি সবার অতীত, তেমন আবার তিনি সবার মধ্যে—তিনিই সব। এ দর্শন পূর্ণপ্রজ্ঞার দর্শন। সমুদ্রে ডোবানো ঘটের মত অন্তরে-বাইরে জল তখন থমথম করছে। উপনিষদের ঋষি তাই বললেন : 'এই এখানে যেমন তিনি পূর্ণ, তেমনি ওই ওখানেও পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ উপচে পড়ছে; পূর্ণ থেকে পূর্ণকে নিয়ে গেলে তবু পূর্ণই থাকছে অবশিষ্ট।' এ হল অনন্তের গণিত।

বুদ্ধির কাছে এ অনির্বচনীয় মায়া। কিন্তু অনির্বচনীয়তাই তো আনন্ত্যের 'ন্যায়' (logic) বা যুক্তির রীতি। বুদ্ধি যেখানে হার মেনে বলে 'অনির্বচনীয়', বোধি সেখানেই দেখে অফুরন্ত শক্তির উল্লাস, অকুণ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের বিস্ফুরণ। আগেই বলেছি, বহুর ডালপালা থেকে ক্রমে একের মূলে উজিয়ে যাওয়া প্রাকৃত বুদ্ধির স্বভাব। কিন্তু এই এক তার কাছে আকারপ্রকারহীন নির্বিশেষ একটা ভাব মাত্র। ভাব কি করে বস্তুতে বিস্ফুরিত হয়, বুদ্ধির কাছে তা দুর্বোধ। তার কারণ, বুদ্ধি ভাবকে বস্তুর প্রাণরূপে জানে না। ভাব তার কাছে অনেকগুলি বস্তুর একটা নীরক্ত পাণ্ডুর 'সংজ্ঞা' বা সাধারণ নাম মাত্র।

তাই একত্বের শিখরে পৌঁছে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ভাব হয়ে যায় বস্তুসম্পর্কহীন। কিন্তু বোধি হৃদয়ের রসে সব-কিছুকে জারিত করে ব'লে ভাব আর বস্তুতে এমনতর বিরোধের সৃষ্টি করে না। সুতরাং চরমে পৌঁছে বুদ্ধির কাছে যা অরূপ, বোধির কাছে তা অপরূপ; বুদ্ধি যাকে ভাবে মনের মায়া—অতএব ভুল, বোধি তাকে দেখে যোগমায়া বা সচ্চিদানন্দের স্বাতন্ত্র্য-শক্তির উল্লাসরূপে।

এই মায়া ব্রহ্মের চিন্ময় মহাশক্তি। শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। ব্রহ্ম চিন্ময়, মায়া চিন্ময়ী—উপনিষদের ভাষায় তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ' অথবা বিজ্ঞানের স্বাভাবিকী 'বলক্রিয়া' (dynamism)। এই বলক্রিয়াতেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হয়েছেন পরিব্যাপ্ত বিশ্বরূপে, আবার চিদ্‌ঘন বিন্দুরূপে—লোকোত্তর অমার আকাশ রোমাঞ্চিত হয়েছে তারার স্ফুলিঙ্গে। মায়াও তাই যুগপৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মশক্তি, উচ্ছলিত বিশ্বশক্তি, আবার কেন্দ্রীভূত জীবশক্তি। একই শক্তির তিনটি বিভাবে মেলে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়: ব্রহ্ম অপ্রমেয়, ব্রহ্ম নিরঙ্কুশ—তাঁতে সব-কিছুই সম্ভব। এ যে অযৌক্তিক নয়, তার প্রমাণ পাই আত্মানুভবে। যোগীর চেতনা নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসে, বিদ্যুন্ময় ব্রহ্মনাড়ীর শূন্যবৃন্তে ফোটে সহস্রদল ব্রহ্মকমল। অনুভব হয়: 'অয়ম্‌ আত্মা ব্রহ্ম,' 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা।' এক অখণ্ড অনুভব; তার মধ্যে ব্রহ্ম জগৎ আর জীব একাত্মপ্রত্যয়ে সমরস।

মায়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য—অমেয়কে মিত করা, অসীমকে সসীম করা। অসীম রেখায়িত হল সীমার কুণ্ডলীতে—ফুটল সৃষ্টিতে রূপের মেলা, মায়ার খেলা। অথচ রূপের দিক দিয়ে বস্তুর দিক দিয়ে যা সসীম, অন্তর্গূঢ় ভাবের ব্যঞ্জনায় তা অসীম হয়েই রইল। চিৎশক্তি নিজেই নিজের চারদিকে সীমার রেখা টানছে—অজ্ঞানে নয়, সজ্ঞানে; তাই বাইরের বন্ধন অন্তরে ফুটছে মুক্তির ছন্দ হয়ে। ফলে বৈচিত্র্য দেখা দিল, কিন্তু বৈষম্যের সৃষ্টি হল না।

আবার বৈচিত্র্যের প্রকাশ হল দুটি ধারায়—একটিতে ফুটল 'লোকসংস্থান', আরেকটিতে 'ভূতগ্রাম'। একই চিৎশক্তি, অথচ তার আবেশের তারতম্যে দেখা দিল ভূলোক হতে সত্যলোক পর্যন্ত সপ্তভুবনের পরম্পরা। তারই নাম লোকসংস্থান। আবার এই চিৎশক্তিই অগণিত চিদ্‌বিন্দুতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে রচে ভূতগ্রাম বা জীবের মেলা; তাদের স্বধর্মের বৈচিত্র্যে আনে দৃষ্টির বৈচিত্র্য—একই ভুবনকে তারা দেখে নানা রঙের পরকলায়। এমনি করে অচক্ষু যিনি, তিনিই সহস্রচক্ষু হয়ে তাকান নিজেরই পুরুরূপা মায়ার দিকে।

এই যেমন শক্তির 'উন্মেষ' অর্থাৎ তার চোখ মেলে তাকানো, আর সেই দৃষ্টির বৈদ্যুতীতে আকাশের মালঞ্চে ফোটানো সৃষ্টির ফুল—তেমনি আবার আছে শক্তির 'নিমেষ'। মায়া চোখ বুজল, আর সমস্ত সৃষ্টি গুটিয়ে এল সত্তার গভীরে—আত্মসমাহিত শৈবী চেতনার প্রপঞ্চোপশম অবর্ণতায়। প্রাকৃত চেতনার দিক থেকে তার থই পাই না বলে তাকে বলি অতিচেতনা (superconscient)। কারণের পর মহাকারণ; শূন্য, কিন্তু অবাস্তব নয়—সে-ই একাধারে ব্রহ্মযোনি ও চিদ্‌বীজ। এই অতিচেতনার উল্‌টা পিঠেই আবার অচিতি (inconscient)। সেও অব্যক্ত এবং অবর্ণ। তার বাস্তব রূপ হল আমরা যাকে বলি 'জড়'। গাছ যেমন বীজের মধ্যে গুটিয়ে আসে, তেমনি প্রাণ আর চেতনা গুটিয়ে আসে জড়ে। আবার জড় হতেই তারা অঙ্কুর মেলে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে জড় তাই বিশ্বযোনি।

এমনি করে উন্মেষে আত্মবিচ্ছুরণ আর নিমেষে আত্মসংহরণ—দুইই মায়ার খেলা। প্রপঞ্চোল্লাস আর প্রপঞ্চোপশম—অবিরোধে দুইই সত্য। আত্মচেতনায় তার প্রমাণ পাই। আমারই চিৎসমুদ্রের গভীরে দেখি সাক্ষীর স্তব্ধতা, তার উপরতলায় বৃত্তির তরঙ্গ। উপর হতে দেখলে মনে হয়, তাদের সঙ্গে প্রশান্তির বিরোধ; কিন্তু প্রশান্তির গভীর অনুভব তরঙ্গের উচ্ছলনকে অবিক্ষুব্ধ থেকেই নিজের বুকে ঠাঁই দেয়। দুয়ে যে বিরোধ নাই, তার যাচাই হয় তর্কবুদ্ধির এলাকায় নয়—সমাধিজ প্রত্যয়ের গভীরে। সেইখানে নির্বিশেষ অনুভব আনে অপরা প্রকৃতির সকল বন্ধন হতে মুক্তির চেতনা। আবার প্রমুক্ত চেতনাতেই শক্তির উল্লাস হয় নিরঙ্কুশ অথচ ঋতচ্ছন্দা। নির্বিশেষ প্রমুক্ত চৈতন্যই আত্মার শাশ্বত সত্যরূপ; শক্তির প্রকাশেও তিনি স্ব-তন্ত্র—এই তাঁর মুক্তির তাৎপর্য। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যকে প্রমাণ করতে তাঁকে শক্তি হতে বিযুক্ত কল্পনা করবার কোনও প্রয়োজন নাই। বহুশোভমানা হৈমবতীকে কোলে নিয়েও দিগম্বর মহেশ্বর অসঙ্গ; আর সেই অসঙ্গের প্রতি রতিই উমার সৃষ্ট্যুন্মুখ তপঃশক্তির উৎস।

ব্রহ্ম আর মায়ার কথা বললাম। এইবার বলি পুরুষ আর প্রকৃতির কথা।

পরম সত্যকে বিশ্বোত্তীর্ণ ভূমিকায় দেখলাম নির্বিশেষ ব্রহ্ম আর তাঁরই স্বরূপশক্তি মায়ার রূপে। সেই সত্যই বিশ্বে ফুটল পুরুষ আর প্রকৃতির মিথুন-

লীলায়। ব্রহ্মকে দেখেছি বিশ্বের আধাররূপে—চিন্ময় ভাবনা তখন ছড়িয়ে পড়েছে আকাশময়, তার বুকে দুলে উঠেছে অনন্তবিথার আলোর মায়া। সেই আকাশই এবার খচিত হল তারার বিন্দুতে; বিশ্বের যিনি আধার ছিলেন, তিনি দেখা দিলেন তার শক্তিক্রিয়ার কেন্দ্ররূপে। পেলাম আত্মাকে, পেলাম পুরুষকে। ব্রহ্মবাদের মূলে আছে সমষ্টির ভাবনা; আত্মবাদের মূলে ব্যষ্টির এষণা। ব্রহ্মের মায়া চিদ্‌বিলাস—উপনিষদের ঋষির ভাষায় আকাশজোড়া বিদ্যুৎ-ঝলকের মত; আর প্রকৃতি চিৎশক্তির তপস্যা—অরণিমন্থনে আগুন জ্বালিয়ে তোলার মত।

পুরুষ-প্রকৃতির খুঁটিয়ে বর্ণনা পাই সাংখ্যদর্শনে। গোড়াতেই বলে রাখি, এ-বর্ণনা অসম্পূর্ণ—পুরুষ-প্রকৃতির স্বরূপকথা বলতে-বলতে কিছুদূর গিয়েই থেমে গেছে। তবু যেটুকু বলেছে, সাধনজীবনে তার অনেক দাম।

সাংখ্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসার শুরু আত্মবিশ্লেষণ দিয়ে। যে-কোনও মুহূর্তের অনুভবকে পরখ করতে গেলে আমার সত্তা দুভাগ হয়ে পড়ে। তার একভাগ জ্ঞাতা, আরেকভাগ জ্ঞেয়—একভাগ দ্রষ্টা, আরেকভাগ দৃশ্য। ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগৎকে দেখছি, মন দিয়ে দেখছি অন্তর্জগৎকে। বাইরে-ভিতরে দৃশ্যের রূপ আর রঙের বদল হচ্ছে; কিন্তু যে দ্রষ্টা, তার কোনও রূপ নাই, রঙেরও কোনও খেলা নাই। এই দ্রষ্টাই সাংখ্যের পুরুষ বা আত্মা—অনুভবে তার স্বরূপ শুদ্ধচৈতন্য মাত্র। আর দৃশ্য হল প্রকৃতি, সাংখ্যের লক্ষণ অনুযায়ী তা জড়। আমার শুদ্ধবোধ ছাড়া আর-সব পড়ছে প্রকৃতির এলাকায়—বাইরের জগৎ, আমার দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব।

দ্রষ্টা দৃশ্য থেকে পৃথক। কিন্তু সর্বত্র কি তা-ই? বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখি, তাথেকে আমি আলাদা; কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করি, তাথেকেও কি আমি আলাদা? আমার ভাবনা-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা—আমি কি এদের ছাড়া? সাংখ্যবাদী বলেন—হাঁ, তা-ই। উদাসীন থেকে যেমন বাইরের জগৎটাকে দেখছ, তেমনি অন্তর্জগৎটাকেও দেখা যায়। চিত্তের বৃত্তির সঙ্গে আমরা জড়িয়ে যাই—ওই আমাদের বন্ধন। যদি বৃত্তির সাক্ষী হতে পারি, তাহলেই আমরা মুক্ত। এই মুক্তির বোধ প্রথম ফোটে তিতিক্ষাতে। ভাল-মন্দ যা-কিছু আসছে, আমি টলছি না। অটলতায় চেতনা উদ্দীপ্ত হল, ভিতরে জাগল পৌরুষ—প্রকৃতির চঞ্চল শক্তির 'পরে বিজয়ী হল আত্মার অচঞ্চল শক্তি। এই আত্মবোধের একটা অন্তর্মুখ আকর্ষণ আছে—সে আমার

চেতনার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যায় সত্তার গভীরে, এক নির্বর্ণ নিশ্চল প্রত্যয়ের ধ্রুববিন্দুতে। সেখানে আমি সাক্ষী, উপদ্রষ্টা—প্রকৃতির গুণলীলার অতীত।

প্রকৃতি-শক্তির তিনটি থাক—তার মূলে সাংখ্যের তিনটি গুণের ক্রিয়া। প্রথমে দেখি স্থূল-সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের শক্তি, তা-ই দিয়ে গড়া বহির্দৃশ্য জড়ের জগৎ; তার মূলে তমোগুণের ক্রিয়া। তমঃ কি না অন্ধকার—মধ্যরাত্র থেকে ভোর হওয়ার আগপর্যন্ত যেমন। চেতনা সেখানে মূঢ় আচ্ছন্ন, যদিও তার গভীরে আলোর তপস্যা চলছেই। তারপর ফুটল প্রাণের শক্তি, জীবদেহে যা ধরা দিল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায়; তার মূলে সাংখ্যের রজোগুণ। রজঃ কিনা রক্তচ্ছটা—আলো ফোটবার মুখে উষার অরুণিমা; আঁধার তরল হয়ে এসেছে সেখানে, কিন্তু চেতনা নিঃসংশয়ে স্পষ্ট হয়নি। তারও পরে ফুটে চলল চেতনার শক্তি—জীবের মনে, অহঙ্কারে, বুদ্ধিতে; তার মূলে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। কোনও-কিছুর সত্তার নির্ভর যার 'পরে, তা-ই তার সত্ত্ব; সত্ত্ব অর্থে আত্মবস্তু বা মৌল উপাদান (essence)। প্রকৃতির সত্ত্ব হল তার প্রকাশ-ধর্ম—দিনের আলোর মত। পুরুষ দ্রষ্টা, কিন্তু আলো ছাড়া তিনি দেখবেন কী? নিজেকে দেখতে নিজের মধ্যেই যে-আলো ফোটে, তা নির্বর্ণ; তারই শুভ্রচ্ছটা প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্ব—উপদ্রষ্টা পুরুষ তাকে সামনে দেখছেন। আলো-আঁধারের মাখামাখিই প্রকৃতির গুণলীলা—সমস্ত জগৎ জুড়ে। দ্রষ্টা পুরুষ তার ঊর্ধ্বে—তিনি গুণাতীত, তিনি স্বয়ং-জ্যোতি।

এই হল উজানপথের খবর। প্রচলিত সাংখ্যের ইশারা এইপর্যন্তই। পুরুষ সেখানে বৈরাগী, অসঙ্গ—প্রকৃতি হতে বিযুক্ত। কিন্তু এ হল সত্যের আধখানা। পূর্ণসত্য হল উজান-ভাটার দুটি ধারা মিলিয়ে। যিনি অসঙ্গ, মুক্তির বীর্যে ও আনন্দে তিনিই আবার গুণভোক্তা। পুরুষ শুধু বিশ্বোত্তীর্ণ নন, পুরুষই আবার এই সব-কিছু—'পুরুষ এবেদং সর্বম্'। প্রকৃতির তিনি শুধু উপদ্রষ্টা নন—তিনি তার অনুমন্তা ভর্তা এবং ভোক্তাও। পূর্ণপ্রজ্ঞায় প্রকৃতি পুরুষের আত্মপ্রকৃতি, অবর্ণেরই বর্ণচ্ছটা। গভীরে ডুবে প্রকৃতি হতে পৃথক হতে হয় অপরা প্রকৃতির বশ্যতা হতে বাঁচবার জন্য। কিন্তু সেই গভীরেই আত্মানুভব অতিসহজে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বাত্মভাবের অনুভবে। বিশ্বকে আত্মীয় বলে জানি যখন, তখন প্রকৃতিকে আর দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। দ্রষ্টা আর দৃশ্যে তখন আর দ্বৈত নয়—দ্বিদল (bi-une)। দ্রষ্টা নিজেকেই দেখছেন যেমন নিমেষে, তেমনি উন্মেষে। তাই পুরুষ

যেমন চিন্ময়, প্রকৃতিও তেমনি চিন্ময়ী। শক্তিলীলার পর্বে-পর্বে পুরুষ-প্রকৃতির চিন্ময় নিত্যযোগ: অন্নময় প্রকৃতিতে অন্তর্গূঢ় অন্নময় পুরুষ প্রাণ-প্রকৃতিতে ফুটছেন প্রাণময় পুরুষরূপে; এমনি করে প্রকৃতির ধাপে-ধাপে পাই মনোময়, চৈত্য, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় পুরুষকে। সবার উপরে, সব জড়িয়ে পাই পুরুষোত্তম আর তাঁর পরমা প্রকৃতি।

পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলা হল। এইবার বলি পরমার্থ-সৎএর তৃতীয় বিভাব—ঈশ্বর আর শক্তির কথা।

সাংখ্যের পুরুষ উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র, আর প্রকৃতি কর্ত্রী। কিন্তু এও দেখেছি, অনুভব গভীর হলে পুরুষ আর প্রকৃতির এই একান্ত ছাড়াছাড়ির ভাবটা থাকে না। পুরুষ তখন নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকেই প্রকৃতির কাজে সায় দিয়ে চলেন—এমন-কি প্রকৃতির রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের চিন্ময় আত্মপ্রকৃতি-রূপেও সে দেখা দিতে পারে। এর প্রমাণ আমরা পাই জীবন্মুক্তের জীবনে এবং ব্যবহারে। প্রকৃতির রূপান্তর কতখানি হল, তা নির্ভর করবে অবশ্য সিদ্ধশক্তির উন্মেষের তারতম্যের 'পরে।

ব্যক্তিজীবনের এই তত্ত্বকেই যদি বিশ্বব্যাপারে প্রয়োগ করি, তাহলে আত্মার জায়গায় পাই পরমাত্মাকে, পুরুষের জায়গায় পুরুষোত্তম বা ঈশ্বরকে। প্রকৃতি তখন তাঁর চিন্ময়ী মহাশক্তি। সাংখ্যের প্রকৃতি যেমন তাত্ত্বিক, ঈশ্বরের শক্তিও তেমনি তাত্ত্বিক—কিন্তু ঈশ্বর হতে আলাদা নয়। মুক্তির দ্বারা প্রাকৃত-শক্তির শাসন হতে নিজেকে বাঁচাব বলে পুরুষকে আমরা প্রকৃতি থেকে তফাত করেছিলাম। এটা হল ব্যষ্টির প্রয়োজনে। কিন্তু ঈশ্বর সবার আত্মা, সমগ্র প্রকৃতির ঈশ্বর। তিনি নিত্যমুক্ত, অতএব শক্তির সঙ্গে নিত্যযুক্ত—কেননা শক্তি তাঁর আত্মশক্তি। নিত্যমুক্ত থেকেই তিনি আপন খুশিতে সব-কিছু হয়েছেন। এই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর শক্তির পরিচয়।

ব্রহ্মভাবনায় আর আত্মজিজ্ঞাসায় আমরা চলি চেতনার উজান বেয়ে—পৌঁছই সত্তার গঙ্গোত্রীতে। সেখানকার স্থিতিকে আমাদের সাধনার ভাষায় তর্জমা করে বলি ব্রহ্মনির্বাণ বা বিদেহকৈবল্য। কিন্তু জীবের নির্বাণ বা কৈবল্যই তো বিশ্বসত্তার সবখানি নয়। এই নির্বাণ বা কৈবল্য ঘটছে যাঁর মধ্যে এবং যাঁর প্রেরণায়—সেই ঈশ্বর-শক্তি সব ছাপিয়ে আছেন যেমন, তেমনি

আবার সব হয়েছেনও। তাঁর পূর্ণগর্ভ অদ্বৈতভাবনাতেই আমাদের চেতনার সর্বাধিক স্ফূর্তি এবং চরিতার্থতা।

মানবভাবের আরোপদ্বারা আমরা সাধারণত যে-ঈশ্বরের কল্পনা করি, এ-ঈশ্বর তা নন। কেননা, মানুষের কল্পিত ঈশ্বর সত্য বলতে সৃষ্টিছাড়া ; কিন্তু এ-ঈশ্বর বিশ্বরূপ, সৃষ্টি এঁর আত্মবিভাবনা বা নিজেকেই বিচিত্ররূপে ফুটিয়ে তোলা। আবার, বেদান্তী নির্গুণ-ব্রহ্মের নীচের ধাপে সগুণ-ব্রহ্মরূপে যে-ঈশ্বরের কল্পনা করেন, তাও ইনি নন ; কারণ এ-ঈশ্বর পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তম —সগুণ আর নির্গুণ ভাব এঁর অখণ্ডসত্তার দুটি বিভাব মাত্র।

ঈশ্বর উপনিষদের ভাষায় 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা নিয়ে একটি গোটা পুরুষ (Person) তিনি। ব্যক্তিসত্তাকে আমরা সবসময় আমাদের মাপে দেখি বলে খাটো করে ফেলি ; বিশ্বব্যাপারের নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে মনে হয় একটা পঙ্গু ও সীমিত সৃষ্টি। তাই ঈশ্বরকে পুরুষবিধ বলতে আমাদের বাধে ; ভাবি, আমরা তাঁর মর্যাদার হানি করলাম বুঝি। কিন্তু ব্যক্তিসত্তাকে বিচার করতে হবে চিৎশক্তির বিকাশের দিক থেকে। জড় হতে প্রাণ বড়, কারণ তারই মধ্যে চিৎশক্তির প্রথম স্ফুরণ। তেমনি প্রাণ হতে মন বড় এবং মন হতে পুরুষ বড়, কেননা পুরুষের মধ্যেই চিৎশক্তি ফুটতে চাইছে সব-কিছু নিয়ে সবার চাইতে নিটোল হয়ে। পুরুষের এই পূর্ণতা চরমে পৌছেছে ঈশ্বরে ; বহুপুরুষ তাঁর বিভূতি মাত্র, তিনি স্বয়ং পুরুষোত্তম—ব্যক্তিভাবের পরম ঐশ্বর্যে সকল পুরুষের সেরা পুরুষ।

ঈশ্বর বিশ্বের বিধাতা—কিন্তু বিশ্বরূপ হয়ে, বিশ্বের বাইরে থেকে নয়। তাই বিশ্বের বিধান তাঁর স্বভাবের বিধান। প্রত্যেক বস্তুর গভীরে তিনি—অন্তর্যামিরূপে ; বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়ায় তাঁরই অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির উচ্ছলন। বাইরে থেকে আমরা তার নাম দিই প্রকৃতির আইন। উপরভাসা দৃষ্টি নিয়ে দেখি বলে তার মধ্যে নিয়মের বাঁধনটাকেই আমরা দেখতে পাই বা চাই, কিন্তু ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যকে দেখি না। আসলে, তাঁর যে-কোনও বিধান বেদের ভাষায় একটা 'ব্রত' অর্থাৎ স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিশেষ-একটা ছন্দকে বরণ করে নেওয়া। বিধানের মধ্যে বাঁধনটা তাই আপতিক, তার গভীরে স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসটাই সত্য। বিশ্ববিধানে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, অথচ ঋতচ্ছন্দা। মানুষের শাসন বা যন্ত্রের শাসন কোনটা দিয়েই তাঁর জগৎশাসনকে বোঝা যায় না।

এই ঈশ্বরের শক্তি তাঁরই আত্মভূতা চিন্ময়ী মহাশক্তি। শুধু প্রপঞ্চের

উল্লাসেই যে এই শক্তির পরিচয়, তা নয়; প্রপঞ্চের উপশমও তারই লীলা। আমাদের চেতনা এই শক্তির একটা বিচ্ছুরণ। প্রপঞ্চোল্লাসের সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে যেমন জাগছে ভোগের একটা প্রবেগ, তেমনি প্রপঞ্চোপশমের ছন্দে জাগছে যোগের সংবেগ। আমাদের ভোগ আর যোগ দুইই শক্তির খেলা। দুয়ের মধ্যেই শক্তির বেগের অনুভব আমাদের চেতনায় সুস্পষ্ট। শুধু ভুক্তি নয়, আমাদের মুক্তির সাধনাও চলছে এই শক্তিরই একটা অন্তর্মুখ বেগকে আশ্রয় করে। এমন-কি শুদ্ধ-সন্মাত্রের অগম স্তব্ধতাও শক্তির চিদ্ঘন অনুভব ছাড়া কিছুই নয়। যেদিকেই যাই না কেন, শক্তিকে ছেড়ে এক পা চলবার উপায় আমাদের নাই। তাই তাঁকে বলি মা। আমার মধ্যকার ক্ষুদ্রশক্তির তরঙ্গকে অনুভব করি মায়েরই চিন্ময় মহাসমুদ্রের আন্দোলন বলে, তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণেই খুঁজি পুরুষোত্তমকে পাওয়ার পথ।

এমনি করে এক অখণ্ড-অদ্বয় তত্ত্বকেই আমরা পাই ব্রহ্ম পুরুষ ও ঈশ্বর অথবা 'ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্'রূপে। আবার এঁরই সঙ্গে নিত্যযুক্ত এক মহাশক্তিকেই অনুভব করি মায়া প্রকৃতি আর শক্তির লীলায়। ব্রহ্ম সচ্চিদা-নন্দরূপে বিশ্বের অধিষ্ঠান, আত্মা সচ্চিদানন্দঘনরূপে তার ভোক্তা, আর ভগবান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহরূপে তার বিধাতা। এক পরমার্থসৎএরই ত্রিপুটী, যার অখণ্ডভাবনা একমাত্র অতিমানস চেতনাতেই সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্য ও জীব

উপনিষদের ঋষি বলেন, ব্রহ্ম জগৎ আর জীব—এই তিনটির তত্ত্ব জানলে তবে জ্ঞান পূর্ণ হয়। আমরা জগৎরহস্য জানতে গিয়ে দেখলাম, ব্রহ্মকে সব-কিছুর মূলে স্থাপন না করলে শুধু প্রাকৃত বুদ্ধির বিচার দিয়ে বিশ্বতত্ত্বের কোনও স্পষ্ট ধারণাই সম্ভব হয় না। এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মের কি তত্ত্ব, তারও একটা আভাস আমরা পেয়েছি। বাকী রইল জীবের তত্ত্ব। কিন্তু তার আগে আরেকটা প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। প্রশ্নটা অব্যক্ত আর ব্যক্তের সম্পর্ক নিয়ে, এবং সেইসঙ্গে দেশ আর কালের স্বরূপ নিয়ে। কালতত্ত্বের সঙ্গে জীবতত্ত্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাই তার কথাটা আগে তুলতে হল।

বিশ্বের যতটুকু আমাদের চেতনায় ব্যক্ত, তাকে ঘিরে রয়েছে এক অপরিমেয় অব্যক্তের স্তব্ধতা। এই অব্যক্তের প্রতি অধ্যাত্মচেতনার একটা গভীর আকর্ষণ আছে। তার মনে হয়, অপ্রমেয় অব্যক্তই সত্য, ব্যক্ত তার ছায়া মাত্র। ছায়া দিয়ে তো স্বরূপের পরিচয় হয় না। ব্যক্তের বুকে আছে বস্তুর বিচিত্র সংস্থান, ঘটনার ধারাবাহিক স্পন্দন। দেশ আর কাল সে-সংস্থান আর স্পন্দনের আধার। অব্যক্ত দেশ-কালের অতীত, তা-ই পরম সত্য। অথচ, এই অব্যক্তই ব্যক্তের উৎস এবং অধিষ্ঠান। যা দেশ-কালের অতীত, তার সঙ্গে যা দেশ-কালের অধীন, তার তাহলে কি সম্পর্ক?

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছি, আমাকে ঘিরে অগুনতি বস্তুর মেলা। কল্পনা করছি, তার একটা আধার আছে। আধারটা ফাঁকা; তার নাম দিয়েছি 'দেশ'। এমনও ভাবতে পারি, কোনও বস্তু থাকবে না, তবুও ওই ফাঁকাটা থেকে যাবে—যদিও এ-ভাবনাটা কাঁচা মনের।...দেশের মধ্যে বস্তুগুলি স্থির হয়ে নাই; তাদের অবস্থান আর অবস্থা দুয়েরই বদল হচ্ছে।

এই বদলের হিসাব রাখি যা দিয়ে, তাকে বলি 'কাল'। আপাতত বলতে পারি, বহুর মেলা যে-জগৎ, তার স্থিতির দিকটা দেশ, আর গতির দিকটা কাল।

জগৎকে বস্তুরূপে আমার বাইরে যখন দেখছি, এ হচ্ছে তখনকার কথা। কিন্তু জগৎকে আবার ভাবরূপে আমার ভিতরেও তো দেখতে পারি। তখন দেশ আর কালের তত্ত্ব কি হবে?

ধরা যাক, একই জাতের অনেকগুলি গাছ দেখছি। প্রত্যেকটা গাছ 'বিশিষ্ট' বা আলাদা হয়ে খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে। আমার এই দেখাটা হল 'বিশেষ'-প্রত্যয়। কিন্তু গাছগুলিকে একটা জাতের খোপে পুরে ধারণা করবার চেষ্টা করি যখন, তখন পাই গাছের একটা ভাবময় আকৃতি। ইন্দ্রিয়ের কাছে তার চেহারাটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু বোধের কাছে নিশ্চিত। এই বোধকে বলতে পারি গাছের 'সামান্য'-প্রত্যয়। বিশেষ-প্রত্যয়ে যা 'বহু', সামান্য-প্রত্যয়ে তা গুটিয়ে আসে 'একের' মধ্যে। স্পষ্টই দেখছি, এই সামান্য-প্রত্যয়ের দেশ আর বিশেষ-প্রত্যয়ের দেশ একধরনের নয়।

তারপর, আরও একটা কথা। বিশ্বে অগুনতি বস্তুর পসরা। তাদের মধ্যে কতগুলি সাধারণ-ধর্মের আবিষ্কার করে সামান্য-প্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা তাদের নানা জাতিতে ভাগ করি। আবার ওই জাতিগুলির মধ্যে সাধারণ-ধর্ম আবিষ্কার করে আরও ব্যাপক অথচ সংখ্যায় কম জাতির কল্পনা করতে পারি। নৈয়ায়িক বলেন, এমনি করে আমাদের সামান্য-প্রত্যয় চরমে পৌছয় 'সত্তা-সামান্যে', বস্তু গুটিয়ে আসে ভাবে। এই সত্তা-সামান্য একটা বিশুদ্ধ বোধ মাত্র। তার মধ্যে বস্তুর বৈচিত্র্য নাই, অথচ বৈচিত্র্যের সে বীজাধার। এমনতর বীজসত্তার যে-দেশ, তাকে আর প্রসাররূপে অনুভব না করে করি বিন্দুরূপে। একটা গাছ যেমন বীজে গুটিয়ে আসে, তেমনি সমস্তটা জগৎ গুটিয়ে আসে চিদ্‌বিন্দুতে। ইন্দ্রিয়ানুভবের মত এও অনুভবের একটা বাস্তব দিক, তবে কিনা তার মোড় ফেরানো অন্তরের দিকে।

এমনিতর অন্তর্মুখ অনুভবেরও প্রয়োজন আছে—লোকব্যবহারের খাতিরে নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার খাতিরে। দেশের পরিচয় যখন নিতে হবে, তখন দেখতে হবে তার দুটা দিকই—বিশেষ-প্রত্যয়ের আধাররূপে তার প্রসার, আবার সামান্য-প্রত্যয়ের অধিষ্ঠানরূপে তার বিন্দুঘনতা। অনন্ত হয়ে যা ছড়িয়ে আছে, তা-ই আবার বিন্দুতে গুটিয়ে আসছে—অনুভবের এই দুটি মহল। মন তাদের আলাদা বলে এবং পর্যায়ক্রমে কল্পনা করে; কিন্তু অতিমানস

অনুভবে দুটি প্রত্যয় অখণ্ড এবং ওতপ্রোত। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই অদ্বৈতানুভবের মূলে রয়েছে ওই চিন্ময় দেশবোধ। দেশ তখন শুধু বস্তুবৈচিত্র্যের পরিব্যাপ্ত আধার নয়। সত্তার সে আত্মপ্রসারণ।

এই সঙ্কোচ-প্রসারের রীতি কালের বেলাতেও খাটে। বস্তুর সংস্থান বোঝবার জন্য আমাদের দরকার হয়েছিল দেশের। তেমনি, বস্তুর 'পরিণাম' বা স্বাভাবিক অবস্থান্তর বোঝাবার জন্য দরকার হয় কালের। একটা বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বনস্পতিতে পরিণত হল; বনস্পতির জীবনের ইতিহাসে পর-পর দেখা দিল কতকগুলি পর্ব। পর্বের এই পরম্পরা আর ভেদকে আমরা চিহ্নিত করি কাল দিয়ে। বনস্পতির জীবনটা যেন একটা প্রবাহ; কাল সেই প্রবাহের মাপক। কখনও বলি, কালই সেই প্রবাহ। বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখতে পারি একটা ঘটনাস্রোতের আকারে। ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু স্রোতের বেগটাকে বলতে পারি কাল। এই হল কালের সামান্যরূপ বা তার শক্তিরূপ।

বাইরের জগতে এই স্রোতের বেগের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। একটা বীজ পুঁতলাম; কতদিনে তা অঙ্কুরিত হবে অর্থাৎ তার পরিণামের পর্বগুলি পর-পর ছাড়া পাবে, তার একটা হিসাব আছে। এটা হল বস্তুজগতের আইন। কিন্তু বোধের জগতে তার বিপর্যয় ঘটতে পারে। কালের বেগ সেখানে দ্রুত বা বিলম্বিত দুইই হওয়া সম্ভব। অনেকদিন ধরে যা ঘটবে, কল্পনায় কয়েকটি মুহূর্তের খোপে তাকে আমরা বন্দী করি। বাইরের বস্তুর বেলায় পরিণামের কতকগুলি পর্ব হয়তো তখন ডিঙিয়ে যাই। কিন্তু অধ্যাত্ম-অনুভবের বেলায় কালসংক্ষেপ বাস্তবিকই সম্ভব। সে-সংক্ষেপে এত দ্রুত হতে পারে যে, শাশ্বত কালকে একটি ক্ষণের মধ্যে অনুভব করা যোগিচিত্তের পক্ষে অসাধ্য হয় না। ঘটনার প্রবাহ তখন গুটিয়ে আসে চেতনার উৎসে। আর তার পরিপূর্ণ তাৎপর্য সম্পুটিত হয় কালের একটি বিন্দুতে—যাকে বলতে পারি 'ক্ষণ-শাশ্বত' (moment-eternity)। যেমন দেশের বিন্দুতে বস্তু সংহত হয় ভাবরূপে, তেমনি কালের একটি ক্ষণে ঘটনা সংহত হয় শক্তিরূপে। কালেরও পরিচয় পূর্ণ হয় এমনতর গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্যে।

দেশ নইলে রূপের মেলা বসত কোথায়? কাল নইলে শক্তির লীলা সম্ভব হত কি করে? ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে-সঙ্গে আপনাহতেই তাই দেশ আর কালের জ্ঞান আমাদের মধ্যে গজিয়ে ওঠে। বস্তুর রূপ আর শক্তিকে আমরা আলাদা

করিতে পারি না ; তাই দেশ আর কালকেও আলাদা করা যায় না। দেশ আর কাল দুইই একই সত্তার শক্তি—বস্তুর স্ফুরণের জন্য অঙ্গাঙ্গী হয়ে কাজ করছে। দেশ ফুটিয়ে তুলছে বস্তুর রূপ, কাল ফুটিয়ে তুলছে তার পরিণাম।

দেশ রূপ ফুটিয়ে তুলছে যখন, প্রাচীনেরা তখন তাকে আর দেশ না বলে বলতেন 'আকাশ'। তাঁদের দর্শনে আকাশ শুধু বস্তু-সংস্থানের ফাঁকা আধার নয়—আকাশ চিৎশক্তিরই একটা বিভূতি। কথাটাকে বুঝতে হবে অন্তর্মুখ অতীন্দ্রিয় মন দিয়ে। দেখছি, মনের প্রত্যাহারে (withdrawal) বাইরে দেশের প্রসার আর কালের প্রবাহ গুটিয়ে আসে একটা ক্ষণ-বিন্দুতে ; সেইসঙ্গে তাদের আধেয় বস্তুজগৎও পর্যবসিত হয় সত্তা-সামান্যের বোধে। এই বোধ আবার গভীর আত্মবোধ ; অর্থাৎ বিষয় আর বিষয়ীতে সেখানে ভেদ নাই, বিষয়ের জ্ঞান সেখানে আত্মস্বরূপেরই জ্ঞান। আগেও বলেছি, এমনতর জানা হল 'হয়ে জানা' ; আর তা-ই আমাদের আসল জানা।

এই সমাধিজ বিজ্ঞানে দেশ কাল আর বস্তুর একটা সমীকরণ (equation) ঘটে বোধস্বরূপে বা আত্মাতে। সমাধি হতে ব্যুত্থানের সময় এই আত্মবোধ হতেই সৃষ্টির বিচ্ছুরণ হয়। আত্মা নিজেকেই তখন পরিক্ষিপ্ত করেন বস্তুর আকারে। সে-বস্তুর প্রাথমিক রূপ মৃন্ময় নয়, চিন্ময় ; অর্থাৎ তা আত্মারই উপাদানে গড়া। এই চিন্ময় উপাদানই আকাশ। আর তার মধ্যে শক্তির যে সৃষ্টিস্পন্দ, তা-ই কাল।

আত্মার সিসৃক্ষা (creative urge) হতে জাগছে আকাশ আর কালস্পন্দ—এই হল সৃষ্টির মূল প্রবর্তনা। এ-প্রবর্তনা অনাত্মার দিকে, রূপের দিকে ; অর্থাৎ আকাশরূপী মৌল-উপাদানের ঘনীভাবের দিকে। আকাশ ঘন হয়ে বস্তুর রূপ ধরে। এই হল ভূতাকাশের স্বরূপ এবং ধর্ম। ইন্দ্রিয়ের জগতে এই ভূতাকাশের যে-ছায়াছবি পড়ে মনের পরদায়, আমরা তাকেই বলি 'দেশ'। আত্মবোধের আকাশ হতে এমনতর দেশ-কাল-বস্তুর সৃষ্টি প্রতিদিনই আমাদের মধ্যে হচ্ছে—ঘুম থেকে জাগবার-সময়। প্রাকৃত মানুষের এটি হয় অজ্ঞানে, যোগীর হয় সজ্ঞানে—আত্মবোধের ভূমি তাঁর মধ্যে পাকা ব'লে।

বস্তুত দেশ-কাল চিৎশক্তিরই যুগলবিভূতি। চেতনার বিভিন্ন স্তরে দেশ-কালের মানের যে-বদল হয়, আমরা তা কিছু-কিছু বুঝি। সাধারণত আমাদের কারবার জাগ্রতের দেশ-কাল নিয়ে। কিন্তু স্বপ্নের জগতে যেতেই এখানকার মান সেখানে অচল হয়ে পড়ে ; সুষুপ্তিতে দেশ-কালের যে কি মান, তা আমরা

ধারণাই করতে পারি না। জাগ্রৎ থেকে স্বপ্ন, আবার স্বপ্ন থেকে সুষুপ্তি—সমস্তটাই হল চেতনার বিলোম-ক্রম (inverse process) ; অর্থাৎ এটা তার গুটিয়ে যাওয়ার পথ। সজ্ঞানে এই পথ ধরে চলতে গেলে দেখি, ইন্দ্রিয়বোধের ভূতাকাশকে ছাড়িয়ে যেতেই আমরা পাই বিজ্ঞানভূমির চিদাকাশ। বস্তুর ভার সেখানে লঘু হয়ে গেছে—বস্তুতে-বস্তুতে দেখা দিয়েছে অন্যোন্যসঙ্গমের একটা সাবলীলতা, কালের পর্ববিভাগের মধ্যে ফুটে উঠেছে যৌগপদ্যের (simultaneity) ব্যঞ্জনা। প্রাকৃত জগতেও ভাবুকের অন্তর্মুখ মন এই ভূমির খানিকটা আভাস পায়। আরও উজিয়ে গিয়ে চিদাকাশের গভীরে আমরা পাই মহাকাশ। বস্তু সেখানে বিন্দুঘন অথচ সর্বতোমুখ সত্তা মাত্র, কাল পর্যবসিত নিস্তরঙ্গ নিত্যবর্তমানে।

এই বিলোম-গতির ইশারা পরিপূর্ণ অদ্বৈতের দিকে। কিসের অদ্বৈত ? না শিব-শক্তির অদ্বৈত। শিব বোধস্বরূপ ; শক্তি সেই বোধেই স্পন্দিত দেশ-কাল-বস্তুর ত্রিপুটী। বোধ আর স্পন্দ অবিনাভূত, নিত্যযুক্ত ; তাকেই বলি চিদ্-বিলাস। এ-বিলাস অনন্ত, এ-বিলাস নিত্য। সেই অনন্তের অনন্তত্বই দেশ, নিত্যের নিত্যত্বই কাল। দেশ-কালের এই চরম তত্ত্ব।

সত্তার মধ্যে এই নিত্যত্বের দেখা দেয় তিনটি ভঙ্গি। ব্রহ্ম আত্মসমাহিত, নিস্পন্দ ; এই অনুভব আনে 'কালাতীত-নিত্যতা'র প্রত্যয়। প্রপঞ্চ সেখানে উপশান্ত, আকাশ বিশ্বযোনি শূন্যতা মাত্র।···সত্তার শুব্ধতা চিন্ময় জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠল—ফুটল নিত্যত্বের আরেকটি ভঙ্গি। যা ভাবাতীত, তা দেখা দিল ভাব হয়ে ; সেই ভাবের মর্ম স্পন্দিত হল অখণ্ড কালের চিন্ময় পরিস্পন্দে। কাল সেখানে অখণ্ড, অর্থাৎ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরম্পরায় সে প্রবাহিত নয়। ভাবের চিন্ময় পরিণামের সে আধার বলে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সেখানে ওতপ্রোত, যুগপৎ জ্ঞেয়। কালের এই যৌগপদ্যের অনুভব হতে পাই চিদাকাশে 'অখণ্ড-নিত্যতা'র প্রত্যয়।···নিত্যত্বের তৃতীয় ভঙ্গি ফুটেছে ব্যাবহারিক জগতের কালিক-প্রত্যয়ে। সেখানে কাল অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতে খণ্ডিত। তার মধ্যে শুধু বর্তমান ক্ষণটিই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। বর্তমানই কেবল আমাদের চেতনায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত, তার পিছনে-সামনে অতীত আর ভবিষ্যৎ আবছা অব্যক্ত। অথচ অনুমান করতে পারি,

অব্যক্তে লীন অতীত এই যে বর্তমানে ফুটে উঠছে ভবিষ্যতের অব্যক্ত সম্ভাবনা নিয়ে—তার সবটা একই কালের প্রবাহ, সবসুদ্ধ বয়ে চলছে একই শক্তির স্রোত। একেই বলি কালের 'প্রবাহ-নিত্যতা'।

নিত্যত্বের তিনটি ভঙ্গিকে এখানে আলাদা-আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু আসলে তারা আলাদা নয়। প্রবাহ-নিত্যতা আর অস্পন্দ-নিত্যতা কি করে একসঙ্গে থাকতে পারে, প্রাকৃত বুদ্ধি তা ধরতে পারে না—কেননা সে নিজে ভেসে চলেছে ওই প্রবাহের টানে। আবার একটানা প্রবাহটাও তার কাছে স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট শুধু বর্তমানের বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি। এইতেই তার কাছে দেখা দেয় অব্যক্তের সঙ্গে ব্যক্তের বিরোধ। অব্যক্তের মধ্যে সব তার ঘুলিয়ে যায়, ব্যক্তের মধ্যে সব দেখা দেয় ক্ষণে-ক্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে। বুদ্ধি অব্যক্তের গহনে ডুব দিয়ে নিস্পন্দ অথচ সজাগ থাকতে পারে যদি, তাহলে ক্রমে সেখান-কার আঁধার তরল হয়ে ফোটে আরেকটা আলোর জগৎ। অব্যক্ত সেখানে নিত্যব্যক্ত ; কাল সেখানে চলছে না, আবার চলছেও। তখন বুঝি, অব্যক্তই ব্যক্তের অধিষ্ঠান এবং উৎস, ব্রহ্মের অস্পন্দ-নিত্যতা হতেই জগতের প্রবাহ-নিত্যতার উৎসারণ। কালে যা ফুটছে, তার বীজ শাশ্বত হয়ে আছে কালাতীতে। কাল আর কালাতীত দুইই নিত্য এবং সত্য। কালাতীত হতে কালের অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। সৃষ্টির দুটি বিভাব—একটি জগৎ, আরেকটি জীব। দুইই ব্রহ্মের আশ্রিত।

ব্রহ্ম আর জগতের তত্ত্বসম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা এতক্ষণে আমাদের হয়েছে। এইবার আসা যাক জীবের তত্ত্বে। ব্রহ্মকে দিয়ে যেমন জগৎ-রহস্য বোঝবার চেষ্টা করেছি, তেমনি জীবকেও বুঝতে হবে তাঁকে দিয়েই। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', জীব বহু। এই বহুর সঙ্গে একের কি সম্পর্ক ? জীব ব্রহ্মের কী ?

প্রচলিত ঈশ্বরবাদ বলে : ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট ; ঈশ্বর আশ্রয়ী, জীব আশ্রিত। কিন্তু সৃষ্টির অর্থ সবাই ঠিক একভাবে বোঝে না। মোটের উপর সৃষ্টিসম্পর্কে দুটা বাদ আছে—নির্মাণবাদ আর বিভূতিবাদ। নির্মাণবাদ বলে : ঈশ্বর জগৎ গড়ছেন, কুমার যেমন হাঁড়ি গড়ে ; জীব ঈশ্বরের নির্মিতি। বিভূতি-বাদ বলে : ঈশ্বর জগৎ গড়ছেন নয়, তিনি জগৎ হয়েছেন ; জগতের তিনি শুধু

নিমিত্ত নন, উপাদানও— নিমিত্ত আর উপাদান দুইই তাঁর মধ্যে এক। অতএব জীব ঈশ্বরের বিভূতি।

এই শেষের রায় সমস্ত অদ্বৈতবাদের। ঈশ্বর দূরে নন, তটস্থ নন—তিনি অন্তঃস্থ, 'জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'। জীব ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়, স্বরূপত সে ব্রহ্মই। তার নিজেকে পাওয়া আর ব্রহ্মকে পাওয়া একই কথা। ব্রহ্মভাব আর প্রাকৃত জীবভাবের মধ্যে রয়েছে শুধু অহঙ্কারের আড়াল। এই আড়াল ভাঙ্তে হবে শরণাগতি দিয়ে, নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ মেলে ধরে। শরণাগতি সাধন—সমুদ্রের আকর্ষণে নদীর ছুটে যাওয়ার মত। তার ফল তাদাত্ম্যবোধ (experience of identity), সাগরসঙ্গম। কিন্তু সঙ্গমের কি ফল, উপমার জের টেনে তা বোঝানো যায় না। তাদাত্ম্যে জীবতত্ত্বের লয় হয় না, হয় তার চিন্ময় সম্যক্-স্ফূর্তি। কি করে. তা বলছি।

জীব ঈশ্বরের বিভূতি—একথা মানতে আমাদের বাধে না। কিন্তু সে কি তাঁর নিত্যবিভূতি? খটকা লাগে এইখানে। জীব যদি ব্রহ্মের নিত্য-বিভূতি হয়, তাহলে নদী সমুদ্রে পৌঁছেও নিজেকে হারিয়ে ফেলে না, অথচ সমুদ্রের সঙ্গে সে একাকার হয়ে থাকে। তর্কবুদ্ধি বুঝতে পারে না, কি করে তা সম্ভব হয়।

জীবত্বের বাইরের দিকটা প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ; বলতে পারি, তা প্রকৃতিরই সৃষ্টি। তার কেন্দ্রে আছে অহন্তা। প্রাকৃত বুদ্ধি এই অহংকেই মনে করে জীব। দেহ প্রাণ মন তিন নিয়ে জীবত্বের বনিয়াদ। তিনটিই প্রাকৃত শক্তির খেলা। যা এই তিনটিকে ধরে আছে সংহত করছে, তা-ই অহং। শক্তির সমুদ্র যেন একেকটা খাত বেয়ে চলেছে—এক বহু হচ্ছে তাইতে। অহং এই শক্তিপ্রবাহের খাত। সুপ্তিতে মৃত্যুতে খাতের জল সমুদ্রে ফিরে যায়। মুক্তিতেও তা-ই হয়। তখন অহং থাকে না, সুতরাং জীবত্বও থাকে না। এই হল তর্কবুদ্ধির রায়।

কিন্তু যে-অহং মনের কারবারী মাত্র, সে তো সত্যকার জীব নয়। মনের ওপারে আছে বিজ্ঞান ; মন শান্ত ও অন্তর্মুখ হলে ব্যাপ্তিচেতনার আলোতে তার রূপ ফোটে। এই বিজ্ঞানে যিনি অধিষ্ঠিত, তাঁকে বলি 'পুরুষ'। জীবের জীবত্ব এই পুরুষেরই বিভূতি। জন্ম হতে জন্মান্তরে জীবত্বের প্রবাহ বয়ে

চলেছে। প্রত্যেক জন্মে ফুটছে একটা করে অহং—সে-জন্মের গণ্ডির বাইরে তার দৃষ্টি চলে না। বর্তমান জন্মের যে সংস্কার আর পরিবেশ, তা-ই তার একমাত্র পুঁজি; সে-পুঁজিকে প্রাণপণে সে আঁকড়ে থাকে। এই আঁকড়ে-থাকাটাকে বলে 'অভিনিবেশ' (concentration)। এতে চেতনার সঙ্কোচ ঘটে। জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অহংএর মূলে যে বিজ্ঞানের সংবেগ আছে, বহির্মুখ অভিনিবেশের দরুন জীব তা বুঝতে পারে না।

পুরুষের বিজ্ঞান অহংএর গণ্ডি ভেঙে চেতনাকে চালায় ব্যাপ্তির পথে। প্রাচীন সাধনশাস্ত্রে এই ব্যাপ্তির প্রতীক হল আকাশ। অহংএর বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে চেতনা ছড়িয়ে পড়ে আকাশের বুকে আলোর মত। চিত্ত হয় প্রশান্ত, স্বচ্ছ, অনুদ্বেল আনন্দে নিবিড়—সাক্ষীর উদাসীন দৃষ্টির সামনে জগৎ ভেসে চলে স্বপ্নের মত।

ব্যাপ্তি-চেতনার এই একটা দিক। কিন্তু তার আরেকটা দিকও আছে। বিশ্বের অর্থহীন ক্রিয়া চৈতন্যের সূত্রকে আশ্রয় করে দানা বাঁধে, অর্থ পায়—একটু তলিয়ে দেখলেই একথা বুঝতে পারি। অন্ধশক্তির প্রমত্ত আলোড়ন চলছে জগতে: আমি চোখ মেলে চাইলাম, অমনি আমার দৃষ্টিকে কেন্দ্র করে তা একটা ছবি হয়ে ফুটল, আমার বাসনা আর সঙ্কল্পকে ঘিরে গড়ে উঠল আমার বিশিষ্ট জগৎ। প্রত্যেক জীবের চৈতন্যশক্তি জগতের মধ্যে এই কাজটি করছে। যা অর্থহীন এবং এলোমেলো, তাকে একটা অর্থের চারদিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলছে, 'এই আমার জগৎ।' অসংহতকে সংহত (organised) করবার এই-যে সংবেগ—এও চৈতন্যের একটা ধর্ম। এই সংবেগটুকুই জীবত্বের মর্ম-রহস্য। অধ্যক্ষ-পুরুষের ব্যাপ্তি-চেতনা শুধু উদাসীনভাবে জগৎকে যে ধরে আছে, তা নয়; তা গভীর হয়ে জগৎক্রিয়ার মূলে একটা অর্থেরও (meaning) বিধান করছে। বিশ্বব্যাপারে এই অর্থবিধানের নিমিত্ত হল জীব। বিশ্ব-শক্তির তুমুলতার মধ্যে প্রথম তার ছোট্ট অহং দিয়ে সে গড়ে একটি সার্থক জগৎ। তার চেতনার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এ-জগতের পরিধিও বাড়তে থাকে, এর সার্থকতাও হয় গভীরতর।

এমনি করে চেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতার সাধনায় প্রাকৃত জীব ধীরে-ধীরে অপ্রাকৃত পুরুষ হয়ে উঠছে। সে-পুরুষের বিগ্রহ আছে; সে-বিগ্রহ চিন্ময়—মৃন্ময় বিগ্রহের অধিষ্ঠান অন্তর্যামী ও সঞ্জীবক। এই পুরুষের স্পর্শে জীবের জীবত্ব দল মেলে—বিশ্বের মধ্যে তার যে একটি বৈশিষ্ট্য এবং

অধিকার আছে, তার পরিপূর্ণ তাৎপর্য সে খুঁজে পায়। এ-বৈশিষ্ট্য একেরই দিব্য-বিভূতি, তাই সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে স্থরে বাঁধা। এই হল জীবের 'পাকা-আমি'। পাকা-আমি বা বিস্তার-আমির মধ্যে কিছুর সঙ্গেই কোনও দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নাই। বিরোধ সৃষ্টি করে কাঁচা-আমি—হানাহানির দু'তরফা বিরোধ; বদ্ধজীবের এই লক্ষণ। মুক্তজীব নির্বিরোধ; নির্বিরোধ, কিন্তু বিশ্বকর্মের শরীক। জীবন্মুক্তের সত্য জীবত্বে এই পাকা-আমির মূলস্থর। এ-স্থর মৃত্যুর পরেও বজায় থাকতে পারে, পরমপুরুষের নিমিত্তরূপে কর্মের অধিকার যদি আরও ব্যাপক হয়। জীব তখন আধিকারিক পুরুষ। পুরুষের কর্ম মুক্তের কর্ম, চিন্ময় শক্তির লীলা। তাতে বন্ধন নাই, বিরোধ নাই—আছে বিশ্বব্যাপারের চরম তাৎপর্যের দিকে চিৎশক্তির অপ্রতিহত অভিযান, পরমেশ্বরের সত্যসঙ্কল্পের অবন্ধ্য উদ্‌যাপন।

আমরা বলি, ব্রহ্ম নির্গুণ, জীব গুণের অধীন; গুণের বন্ধন ঘুচিয়ে নির্গুণ দশায় পৌছনই তার পুরুষার্থ, তা-ই ব্রহ্মে জীবের নির্বাণ। এখানে নির্গুণে আর সগুণে একটা বিরোধ কল্পনা করি। দুয়ের মধ্যে যে শুদ্ধ-সত্ত্বের একটা ভূমি আছে, যা অশেষকল্যাণগুণের আকর—একথাটা আমরা ভুলে যাই। এই শুদ্ধসত্ত্বের অনুভবে জাগে বিজ্ঞান। তখন নির্গুণের তাৎপর্য ফোটে গুণের অভাবে নয়, আনন্ত্যে। নির্গুণকে অধিষ্ঠানরূপে রেখে অনন্ত কল্যাণগুণের লীলায়ন তখন অসম্ভব বা অযৌক্তিক মনে হয় না। এই শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিতে জীব জানতে পারে, তার সত্যকার স্বরূপ কি। সত্য-জীব পরম-পুরুষের সনাতন অংশ বা অংশু—সূর্যের রশ্মির মতই তেজোময় শক্তিময় চিন্ময়। ব্রহ্মের দিকে জীব উজিয়ে যাচ্ছে, শুধু এইদিক থেকে তার বিচার না করে, জীব যে ব্রহ্মের বিচ্ছুরণ এইদিক থেকেও তার স্বরূপকে অনুভব করতে হবে। তাহলে জ্ঞানের অনুভবের পরিশেষরূপে শক্তির অনুভবও আসবে। বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচী জীব যে পুরুষোত্তমের নিমিত্তমাত্র—এই বোধে মিলবে তার সত্য এবং সমগ্র পরিচয়।

জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। প্রাকৃত চেতনায় তার এই স্বরূপজ্ঞান আচ্ছন্ন। উজান বওয়ার সাধনায় এই স্বরূপকে আবিষ্কার করতে হবে, জীবকে ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করতে হবে—এ তার অনস্বীকার্য পুরুষার্থ।

এই তাদাত্ম্যবোধের দুটি রূপ আছে। সুষুপ্তিতে যেমন জাগ্রৎ লুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি ব্রহ্মসত্তায় ব্যক্তিসত্তার পরিনির্বাণ ঘটে, নুনের পুতুল সমুদ্রে গলে যায়। এই একধরনের তাদাত্ম্যবোধ। আবার এও হতে পারে: জাগ্রতের বোধ যেমন তেমনই রইল, কিন্তু তার মধ্যে নেমে এল সুষুপ্তির নিবিড়তা। কথাটা আজগবী নয়। প্রাকৃত চেতনাতেও এমনতর একটা ব্যাপার ঘটে, যখন বস্তুর উপরভাসা তাৎপর্যের গভীরে আরও-একটা বোধনিবিড় তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাই। বোধি তখন একটা নতুন অর্থের জগতে জেগে ওঠে, অথচ ইন্দ্রিয়বোধও সজাগ থাকে। এই ব্যাপারেরই অনুবৃত্তিতে যোগীর মধ্যে বিশ্ববোধ জাগ্রত রেখেই প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মতাৎপর্যের বোধ আসতে পারে। তখন তাঁর চোখ বুজে ধ্যান নয়, চোখ মেলে ধ্যান। উজান-সাধনার শেষেই যে কেবল মুক্তের বিলাসরূপে এ-অবস্থা আসে, তা নয়। এমনতর জাগ্রৎ-তাদাত্ম্যের বোধ দিয়েও কখনও-কখনও সাধনার শুরু হয়—'লাউ-কুমড়ার আগে ফল, তার পরে ফুলে'র মত। এই অবস্থাতেই নিত্যজীবত্ব বস্তুটি কি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন ফুল ম'রে ফল ধরছে না, ফলের প্রবেগে ফুল ফুটছে—এইধরনে জীবত্বের উল্লাসের অনুভব হয়। নিত্যজীবত্বের এই উল্লাসে ব্রহ্মতাদাত্ম্যের সমস্ত বিভাবই অনির্বচনীয় হয়ে ফুটে ওঠে, কোথাও কিছু বাদ পড়ে না বা বেসুরা বাজে না।

ব্রহ্মের সঙ্গে এমনতর জাগ্রৎ-তাদাত্ম্যের বোধেই বিজ্ঞানের পূর্ণতা। তখন 'আঁখ ন মূদূঁ, কান ন রূধূঁ।' পূর্ণযোগী চোখ বুজছেন না, কান বন্ধ করছেন না—জেগে থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়ের উল্লসনে তুর্যাতীতের অমৃতকে সম্ভোগ করেছেন। একে বলে সহজসমাধি। এ-বোধে অহং নাই, কিন্তু জীবত্ব আছে। অহং দিতে জানে না, তাই পায় না। জীব সব বিলিয়ে দেয়, তাই পায়ও। বিলিয়ে দিয়ে সে যেন হয় তাঁর চোখ, তাঁর রসনা, তাঁর দিব্য-করণ (divine instrument)। তাইতে ব্রহ্মের আস্বাদন আর জীবের আস্বাদন এক অনির্বচনীয় অন্যোন্যসঙ্গমে পূর্ণ হয়ে ফোটে। অহং যদি খুব উঁচুতে ওঠে, তাহলে বলে, 'তুমি আমার।' কিন্তু জীব গলে গিয়ে বলে, 'আমি তোমার।' তখন অহং আর অহং থাকে না, পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে যায়।

শুদ্ধ জীব যেন স্বচ্ছ শিশিরবিন্দু। সূর্য তার বুকে ঝলমল করছে, তার গভীরে স্তব্ধ হয়ে আছে অরূপ আকাশ। অহং নাই, তাই এই স্বচ্ছতা।

বিশ্বের ছবি অমনি করে দোলে তাই প্রেমের বুকে। একটি বিন্দুতেই অগণিত বিন্দুর সমাবেশ, সিন্ধুর কল্লোল, গহন-গভীরের স্তব্ধতা। 'সবই যে তুমি—রূপে-রূপে, সম্বন্ধবৈচিত্র্যের অনন্ত উল্লাসে।' অভেদের বুকে ভেদের বিলাস, শুভ্রজ্যোতি আনন্দে ঠিকরে পড়ছে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায়। অবর্ণের বর্ণলীলা ওই বিন্দুর বুকে: 'আমি যদি থেকে থাকি, আছি তোমার চোখ হয়ে, সেই চোখে আনন্দের ঝিকিমিকি হয়ে।' সে-চোখে সব সত্য—সত্য আলো সত্য আঁধার, সত্য জীবন সত্য মরণ, সত্য দুয়ের মাঝে অজর প্রাণের স্পন্দন। সব অপূর্ণতা কুড়িয়ে পূর্ণতার সত্য, সব ভেদ জড়িয়ে অভেদের সত্য।

এই ব্রহ্ম, এই অমৃত; জীব তার রসিক, তাঁর আত্ম-আস্বাদনের অভেদ সাধন।

নির্বিশেষবাদীর তর্কবুদ্ধি তবু হার মানতে চায় না। সে বলে: 'ব্রহ্ম নির্বিশেষ—জীব ও জগতের ওপারে; জীব ও জগৎ সবিশেষ। নির্বিশেষ আর সবিশেষ দুটি অন্যোন্যবিরোধী ভাব। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য অকল্পনীয় অসম্ভব এবং মিথ্যা। যতক্ষণ জীবজ্ঞান আর জগৎজ্ঞান আছে, ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়। জীব-ব্রহ্মের অন্যোন্যসম্ভোগের কল্পনাও অসিদ্ধ। যেখানে ভোগ আছে সেখানে তাদাত্ম্য থাকতে পারে না, যেখানে তাদাত্ম্য ঘটেছে সেখানে ভোগ থাকে না। অদ্বৈতই একমাত্র সত্য, দ্বৈত বিভ্রম মাত্র। কি করে এই বিভ্রমের সৃষ্টি হল, তা আমরা জানি না—জানবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের প্রয়োজন দ্বৈতের বিভ্রমকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।'

যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই যুক্তির উদ্ভব, অধ্যাত্মসাধনায় তার একটা স্থান আছে। কিন্তু এই দৃষ্টিই পূর্ণায়ত কি না, এই অনুভবই সকল অনুভবের চরম কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। পূর্ণাদ্বৈতের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে এ-যুক্তির গোড়ায় তিনটি গলদ মেলে। তাদের কথাই তুলছি।

নির্বিশেষের সত্তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। প্রাকৃত-বুদ্ধির কারবার বিশেষকে নিয়ে—যে-কোনও বস্তু বা অনুভবের চারিদিকে একটা সীমার রেখা টেনে। অথচ সেও বোঝে, বস্তুর এ-পরিচয়টা একপেশে। তাই সীমার চারদিকে অসীমের একটা পরিমণ্ডল তাকে মানতেই হয়। এমনি করে নির্বিশেষ হয় সবিশেষের অধিষ্ঠান।

এপর্যন্ত অবশ্য কোনও গোল নাই। কিন্তু গোল বাধে দুয়ের সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে। সবিশেষ-জ্ঞানের মূলে হল ভেদবুদ্ধি। কোনও-কিছুকে বিশেষণে চিহ্নিত করতে গেলেই আর-সব থেকে তাকে তফাত করতে হয়। ভেদজ্ঞানে বস্তুর পরিচয় প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তার তুলনায় অভেদবুদ্ধি বা সামান্যজ্ঞানটা ফিকা। একটা গাছ বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট। কিন্তু একটা বন ঝাপসা, বৃক্ষত্বটা আরও ঝাপসা একটা কথা—যদিও ও-ধারণা ছাড়া বুদ্ধিরও কাজ চলে না। সবিশেষের দিক থেকে নির্বিশেষের দিকে চলতে গিয়ে বুদ্ধি তাই খেই হারিয়ে ফেলে। ভেদের সংস্কার তার মধ্যে পাকা বলে নির্বিশেষকেও সে চিহ্নিত করতে চায় সবিশেষ থেকে তাকে পৃথক ক'রে। দুটি সংজ্ঞারই চারদিকে যদি গণ্ডি টানি, দুয়ের বিরোধ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নির্বিশেষ ফাঁকা, সবিশেষ নিরেট; ফাঁকা যা তা ফাঁকাই, নিরেট যা তা নিরেটই; কি করে দুয়ে জোড় মেলানো যায়? অথচ মানতে হয়, নির্বিশেষ সবিশেষের অধিষ্ঠান বা আধার। ফাঁকা আধার থেকে নিরেট আধেয়ের আবির্ভাব তখন একটা ইন্দ্রজাল। বুদ্ধি তার সামনে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু গোলমালের সৃষ্টি করেছে বুদ্ধি নিজেই। বস্তুর বিশেষজ্ঞান আর সামান্যজ্ঞানের মাঝে একটা বিজ্ঞানের ভূমি আছে, বুদ্ধি সেটাকে তড়বড় করে ডিঙিয়ে যায়। তাইতে এই বিপত্তি ঘটে। নির্গুণ আর সগুণের মাঝে আছে শুদ্ধসত্ত্ব, ব্রহ্ম আর মনের মাঝে অতিমানস। বুদ্ধিকল্পিত দুটি বিরোধের মাঝে সে-ই হচ্ছে সেতু। এই সেতুর খবর বুদ্ধি রাখে না, রাখে বোধি। বুদ্ধি যেখানে শুধু জানতে চায়, বোধি সেখানে 'হয়'। জানার পর্বে ফাঁক থাকতে পারে। কিন্তু হওয়াটা একটানা—তার মধ্যে ছেদ থাকে না বলে দুটি পর্বের বিরোধও থাকে না। জগৎ থেকে ব্রহ্মের দিকে যখন যাই, তখন বুদ্ধিকে করি দিশারী; সে পথ দেখিয়ে চলে 'নেতি নেতি' ব'লে। সে তার কাজ ঠিকমতই করে যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি নেতির পরে যদি একটুখানি যতি পড়ত, বোধি সে-ফাঁকটুকু ইতির ঐশ্বর্যে ভরে তুলতে পারত। এইটুকু হয় না বলে নির্বিশেষ শেষপর্যন্ত দেখা দেয় শূন্য হয়ে।

তাও না হয় হল; মানলাম, জীব যখন ব্রহ্মকে 'জানে' তখন এমনি হয়। কিন্তু ব্রহ্ম যখন জীব হন, তখনকার অনুভবের কি পরিচয়? 'নেতি নেতি' করে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে উঠলাম; কিন্তু নামি যখন, তখন আর নেতি বলতে

পারি না, বলি 'ইতি ইতি।' নির্বিশেষ তখন আর সবিশেষের বিরোধী নয়, তার বিচ্ছুরণ। প্রাকৃত বুদ্ধির বিচারে দর্শনের বাগ্‌জাল যতই থাকুক না কেন, এইখানে সে দিনকানা। এই তার প্রথম গলদ।

ভেদবুদ্ধির চৌহদ্দিকে অযথা বাড়ানো—এই তার দ্বিতীয় গলদ। ভেদবুদ্ধির বিধান খাটে একমাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ব্যবহারে বস্তুর চারদিকে গণ্ডি টানতে হয়। নইলে সব এক-সা হয়ে যায়। তাতে কাজ চলে না। এ-আইন শুধু জড়ের জগতে। হীরা মোতি নয়, মোতি হীরা নয়—জহুরীর প্রয়োজনে।

কিন্তু এই ভেদজ্ঞানই তো তাদের তত্ত্বজ্ঞান নয়। তত্ত্বজ্ঞান বলবে সেই ঊর্ধ্বমূল সত্যের কথা, যার একটি শাখা মোতি, আরেকটি শাখা হীরা। ব্যবহারে ভেদজ্ঞানের যেমন দরকার, তত্ত্বদর্শনে তেমনি দরকার পূর্ণায়ত অভেদজ্ঞানের। এই অভেদজ্ঞানের এলাকায় ভেদজ্ঞানকে টেনে নেওয়া অসঙ্গত। শাখায়-শাখায় ভেদ আছে মানি; কিন্তু যে-মূল থেকে শাখারা বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে শাখার ভেদ কল্পনা করলে তত্ত্বের জ্ঞান হয় না—শুধু প্রকাশ পায় প্রাকৃত বুদ্ধির জিদ।

ব্যাবহারিক জগতে দ্বন্দ্ব থাকবেই—ব্যবহারের প্রয়োজনে। কোনও-কিছুকে ভাল বা মন্দ, সুন্দর বা কুৎসিত বলি আমরা নিজের গরজে। যা ভাল, তা মন্দ নয়, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে সেই কালে সেই দৃষ্টিতে সেই প্রয়োজনে মন্দ নয়। এমনতর দাম কষাটা তাই আপেক্ষিক। নির্বিশেষবাদী বলবেন, তাহলেই তো পরমার্থত ভাল-মন্দ বলে কিছুই নাই। কিন্তু এ হল অনির্দেশ্য অব্যক্তের তত্ত্ব। এছাড়াও বিশ্বলীলার একটা আরোহ-ক্রম আছে; অপূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে ধীরে-ধীরে সে উঠে যাচ্ছে। এই দৃষ্টিতে নির্বিশেষের মধ্যে সমস্ত বিশেষই সার্থক। কুরুক্ষেত্র কারও পক্ষে ভাল, কারও পক্ষে মন্দ, অধিকাংশের পক্ষেই নিদারুণ। কিন্তু পার্থসারথির অখণ্ড শিবদৃষ্টিতে তা সার্থক, কেননা ধর্মসংস্থাপনের তা তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র সরণি। সুতরাং ঐকান্তিক ভেদের যে-দ্বন্দ্ব, তা আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টির ফল। জগৎটাকে দেখতে হবে উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আদিত্যের দৃষ্টি নিয়ে। তখন জানব, যিনি দ্বন্দ্বাতীত 'শান্তম্', তিনিই আবার সকল দ্বন্দ্বের মাঝে 'শিবম্'; এবং এ-দুয়ের সমাহারেই তিনি পরিপূর্ণ 'অদ্বৈতম্'। সে-অদ্বৈত দ্বৈতকে গ্রাস ক'রে জীর্ণ ক'রে—তাকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে নয়।

প্রাকৃত বুদ্ধির তৃতীয় গলদ, নির্বিশেষ-সবিশেষের সম্বন্ধকে কালের সংস্কার দিয়ে বিচার করা। কালজ্ঞানের মূলে রয়েছে পর্যায়বোধ—যেমন দিনের পর রাত, জাগার পর ঘুম। এই পর্যায়ের সংস্কার রয়েছে বলেই প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে ব্রহ্ম একবার নির্বিশেষ, একবার সবিশেষ। যিনি নির্বিশেষ, যুগপৎ তিনিই সবিশেষ—এ ভাবতে গিয়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অখণ্ড পূর্ণতার মধ্যে স্বরূপত কাল বা পর্যায় বলে তো কিছু নাই। অথচ তা স্থাণু নয়, শক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত। সে-স্পন্দনেই যা কালাতীত তা ছলকে পড়ছে। তবুও তা কালাতীতই থাকছে। কি ক'রে, তা বহির্দৃষ্টি দিয়ে বোঝা যায় না। কেননা, বহির্দৃষ্টি দেখে বস্তুর পাশে বস্তুকে, ঘটনার পর ঘটনাকে সাজিয়ে ; পর্যায়ের বোধ সেখানে অপরিহার্য। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে বাইরের শক্তিস্পন্দকে যখন অনুভব করি চিৎস্পন্দরূপে, তখন দেখি স্পন্দে-অস্পন্দে কোনও পর্যায় নাই, অথচ অস্পন্দই স্পন্দের উৎস। ব্রহ্ম অটল থেকেই টলছেন। মনের মায়া বলবে, তাঁর টলাটা মিথ্যা। কিন্তু দেবমায়া জানে, দুটাই যুগপৎ সত্য।

সুতরাং এক পরমার্থ-সৎই যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বরূপ ও জীবভূত; তিনটিকে জড়িয়ে এক অখণ্ড অনুভবই হল তত্ত্বজ্ঞান। বিশ্বোত্তীর্ণের কালে অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। তা-ই তাঁর বিশ্বরূপ এবং জীবভাব ; তিনি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, আবার 'জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'। জীব ব্রহ্মের সত্য এবং নিত্য বিভূতি—বিশ্ব-লীলায় তাঁর নিমিত্তরূপী সব্যসাচী আর হ্লাদিনী পরা প্রকৃতি দুইই। পরমপুরুষের দিব্যকর্মে ও দিব্যভোগে জীবের সঙ্গে যে-বিলাস, তা অদ্বৈতের ভূমিকাতেই দ্বৈতের উচ্ছলন এবং আস্বাদন। তাঁরই সব, তিনিই সব। তাঁকে ছেড়ে কেউ নাই, কিছুই নাই। সুতরাং তাঁর চিন্ময় আত্মবিচ্ছুরণের উল্লাসে অদ্বৈতহানির সম্ভাবনা কোথায় ?

চতুর্থ অধ্যায়

দিব্য ও অদিব্য

জীবত্বের স্বরূপ কি, তার একটা আভাস পেলাম। মানলাম, জীব ব্রহ্মের নিত্যবিভূতি। কিন্তু জগতের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? জীবের জীবন ফুটছে জগতের মধ্যে, বিশ্বব্যাপারের তা একটা অঙ্গ; কিন্তু তার লক্ষ্য কি?

সুদূর লক্ষ্যের কথা গোড়াতেই বলেছি: প্রাকৃত-জীবনের চরম পরিণতি দিব্য-জীবনে—প্রকৃতি-পরিণামের এই তাৎপর্য। কিন্তু এই লক্ষ্যের দিকে চলতে গিয়ে একটা বিরোধের সামনে এসে আমাদের দাঁড়াতে হয়। মনে হয়, দিব্য-জীবন সুদূরের আশ্বাস মাত্র; অথচ প্রাকৃত-জীবনে অদিব্য-শক্তির পীড়ন প্রতিদিনের একটা নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা। দিব্যে আর অদিব্যে বিরোধটা এতই স্পষ্ট যে, অখণ্ড-অদ্বয় চেতনার মধ্যে কি করে দুয়ের ঠাঁই হতে পারে তা আমরা ভেবে পাই না। কিন্তু এ-বিরোধের সমাধান না হলে জীবন-সাধনায় শক্তি ও ঋতের ছন্দও তো খুঁজে পাব না।

জীবনের অদিব্যতার দুটি লক্ষণ—অসঙ্গতি এবং অপূর্ণতা। অসঙ্গতি আসে বোধের বিকলতা হতে, আর শক্তির বিকলতা হতে অপূর্ণতা। চেতনার অঙ্গনে কত-কিছু এসে স্তূপাকার হচ্ছে—আমরা ঠিকমত তাদের গুছিয়ে নিতে পারছি না; এইথেকে দেখা দেয় আমাদের চিন্তায় এবং কর্মে নানা অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতিই নিয়ে আসে অপূর্ণতা—শক্তির দীনতা হতে। তার মধ্যে অনর্থ (Evil) আর দুঃখ (Pain)—অপূর্ণতার এই দুটি বিভাবকেই আমরা খুব বড় করে দেখি। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য প্রতিহত হলে আমরা তাকে বলি অনর্থ, আর ভোগের ব্যাঘাতকে বলি দুঃখ। অনর্থ আর দুঃখ প্রাকৃত জীবনের চিরন্তন অভিশাপ।

আসলে অপূর্ণতার কারণ হল চেতনার সঙ্কোচ। আমরা নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে আছি, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বৃহতের মধ্যে ছড়িয়ে নাই। তাই আমাদের সকল অনুভব খণ্ডবোধে জর্জরিত—চেতনার খণ্ডতায় আমরা অপূর্ণ,

বিদ্যার খণ্ডতায় অন্ধ, আনন্দের খণ্ডতায় দুঃখী, শক্তির খণ্ডতায় পঙ্গু, ঐক্যবোধের খণ্ডতায় বিরোধে কণ্টকিত। খণ্ডবোধ আমাদের চেতনাকে শুধু আচ্ছন্নই করেনি, তাকে বিকৃতও করেছে; আমাদের জীবন জুড়ে শুধু মূঢ়তার ঘোর নয়, আছে দুঃস্বপ্নেরও বঞ্চনা।

অপূর্ণতার হেতু এবং প্রকৃতি কি তা বুঝতে পারলেও, বিশ্বব্যাপারের মধ্যে তার সঙ্গতি কোথায়—এ-প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়। মানুষ যুগে-যুগে তার একটা জবাব খুঁজেছে, কিন্তু সমস্যাটাকে খুব তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেনি। অনেকক্ষেত্রে সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই হয়েছে তার সমাধান। কেউ বলেছেন, অন্তরে দিব্যের সন্ধান যদি মিলে থাকে তো তাকেই আঁকড়ে থাক, বাইরের জগতে অদিব্যের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী। কেউ বহির্জগতের প্রতি এতটা বিমুখ না হয়ে বলেছেন, হাঁ, অদিব্যেরও একটা তত্ত্ব আছে বটে; কিন্তু তত্ত্বটা অনির্বচনীয়, তার সম্পর্কে হাঁ-না কিছুই বলা চলে না; আসলে ওটা মায়া। আবার কেউ আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছেন, মায়া নয়, লীলা; তিনি সুরের রাজা, তাঁর জগতে সবই সুরে গাঁথা; যা অদিব্য, তারও একটা তাৎপর্য নিশ্চয় আছে—কিন্তু সেটা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। কেউ আবার কালাপাহাড়ী যুক্তিতে সব গুঁড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ভিতরে-বাইরে দিব্যে-অদিব্যে যে-বিরোধ দেখছি, ওটা আমাদের মনের ভুল; কি অন্তরে কি বাইরে সব অনিত্য, সব চিত্তের ক্ষণিক স্পন্দন মাত্র; এই ক্ষণভঙ্গকে নিরুদ্ধ করে শূন্যে তলিয়ে যাও—কোনও সমস্যা থাকবে না, সমাধানেরও প্রয়োজন হবে না।

প্রত্যেকটা বাদের মূল সুর হল ঔদাসীন্য। 'উদাসীনো গতব্যথঃ'—যে উদাসীন, তার ব্যথা থাকে না, নিজের মধ্যে সে গুটিয়ে আসে বলে। এই দার্শনিক ঔদাসীন্যের ব্যাবহারিক পরিণাম হল—তিতিক্ষা, সুখঃদুঃখ ভাল-মন্দ সব-কিছু সয়ে যাওয়া। তিতিক্ষা একটা মস্ত গুণ, বলতে গেলে অধ্যাত্ম-বিদ্যার এই হল প্রথম পাঠ। তিতিক্ষায় চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, প্রশান্তি আসে। তাইতে চেতনার ব্যাপ্তিতে একটা লোকোত্তর পরমবস্তুর প্রতি নির্ভরও আসে। ফলে, দুঃখের তাড়না হতে আমরা মুক্তি পাই, অবিদ্যাই যে দুঃখের হেতু এও বুঝতে পারি। কিন্তু এতে করে দুঃখকে রূপান্তরিত করবার বীর্য আমরা পাই না, দুঃখের বিশ্বরূপকে অপরিহার্য একটা নিয়তি বলেই শান্তচিত্তে স্বীকার করে নিই।

অথচ আমাদের মধ্যে শুধু যে তিতিক্ষার শক্তিই আছে তা নয়—আছে রূপান্তর ঘটাবার শক্তিও। অদিব্যের সঙ্গে লড়াইয়ে আমরা কেবল 'আঘাত খেয়ে অচল'ই থাকি না, আঘাতটা ফিরিয়েও দিই। দুঃখ অনর্থ অজ্ঞান যদি বিশ্বের সত্য হয়, তবে তাকে পরাভূত করবার বীর্য এবং আত্মার নিত্য যুযুৎসা—এও তো অন্তরের সত্য। তাই তিতিক্ষার চাইতেও বড় শক্তি হল অভীপ্সা। পুরুষের কৈবল্যে যে অবিচল বীর্য জাগে, তাকে নিয়োজিত করতে হবে প্রকৃতির রূপান্তরে—বিশ্বব্যাপারে জীব এই নিত্য অভীপ্সার বাহন। এই অভীপ্সার সত্যকে গ্রহণ করতে পারলেই দিব্যের মধ্যে অদিব্যের যথার্থ সঙ্গতি আমরা খুঁজে পাই। অদিব্যশক্তি যেন অসুরের মত তাল ঠুকে দাঁড়িয়েছে—আমাদের মধ্যে বৃত্রঘাতীর বজ্র আর বিদ্যুৎ ঝল্‌কে তুলবে বলে। সেক্ষেত্রে তিতিক্ষা আমাদের আত্মশক্তির বহিরঙ্গ পরিচয় মাত্র। তার অন্তরঙ্গ পরিচয় হল রূপান্তরসাধনার বীর্যে। অদিব্যতা বিশ্বের একটা সাময়িক বিধান শুধু; তাকে দিব্য করে তোলবার জন্যই পরমপুরুষের নিমিত্তরূপে এই কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচী হয়ে আমরা আবির্ভূত হয়েছি। এই ক্ষাত্র অনুভবেই অদিব্যের সমস্যার যথার্থ সমাধান।

কিন্তু বুদ্ধিকে তৃপ্ত করবার জন্য অন্তরের অনুভবকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দার্শনিক যুক্তির 'পরে। তার জন্য ব্রহ্ম আর জগতের অন্যোন্যসম্পর্ককে এই উপলক্ষ্যে আবার নতুন করে বিচার করা যাক।

এ নিয়ে দার্শনিকদের তিনটি সিদ্ধান্ত আছে। প্রথম সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে বিশ্বের অধিষ্ঠান, তাঁকে ছেড়ে কোনও-কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম শুধু বিশ্বের অধিষ্ঠান নন, তিনি তার অন্তর্যামীও—বিশ্ব তাঁরই বিসৃষ্টি এবং বিভূতি। এ-দুটি সিদ্ধান্ত ওতপ্রোত, তা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ব্রহ্ম হতে জগতের দিকে দৃষ্টি ফেরাই যখন, তখন আবার সিদ্ধান্ত করি, ব্রহ্ম আর জগৎ দুটি বিভিন্ন ভূমির বস্তু। ব্রহ্ম যদি সত্য, জগৎ তাহলে মিথ্যা ; অথচ ব্রহ্মই জগন্মূল। এই তৃতীয় সিদ্ধান্ত হতেই দিব্য আর অদিব্যের সমস্যার উদ্ভব।

ব্রহ্মের দিব্যভাবের সঙ্গে জগতের অদিব্যভাবকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি জগদ্ব্যাপারে নানা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। একটি কল্পনা :

ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপারে নিঃসম্পর্ক; জগৎ প্রকৃতির খেয়ালে যন্ত্রের মত চলছে। আর একটি কল্পনা: ব্রহ্ম ঠিক নিঃসম্পর্ক নন, পুরুষরূপে তিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা; তাঁর তটস্থ দৃষ্টির প্রেরণায় প্রকৃতির কাজ চলছে। তৃতীয় কল্পনা: ব্রহ্ম স্বরূপত বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত; প্রপঞ্চ তাঁর মায়ার খেলা। এই তিনটি বাদেই দেখছি, ব্রহ্ম আর জগতের মধ্যে মস্ত একটা ফাঁক। এ যে একধরনের প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ, শুধু তা-ই নয়; চৈতন্যকে উদাসীন আর শক্তিকে যন্ত্রবৎ কল্পনা করায় এ একরকম জড়বাদও বটে।...চতুর্থ কল্পনা হল: ব্রহ্ম নির্গুণ দ্রষ্টা, কিন্তু সগুণ ঈশ্বররূপে স্রষ্টা। দৃষ্টি আর সৃষ্টির মাঝে ফাঁক খানিকটা বুজল বটে, কিন্তু দ্বৈতের একটা চিড় তবু থেকেই গেল।...পঞ্চম কল্পনা: সগুণ-নির্গুণ সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় একই ব্রহ্মচৈতন্যের দুটি বিভাব। মনে হয়, এ-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম আর জগতের বিরোধ মিটল বুঝি। কিন্তু বস্তুত বিরোধ মেটে না। বুদ্ধি দুটি বিভাবকে কল্পনা করে পর্যায়ক্রমে। ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই বটে; কিন্তু যখন তাঁকে নির্গুণ বলে ধরতে যাই তখন সগুণভাব থাকে না, আবার সগুণকে ধরতে গেলে নির্গুণভাব থাকে না; দুটিকে একসঙ্গে ধরতে গেলে বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে।

প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত হল খণ্ডের ভূমি থেকে অখণ্ডকে দেখবার চেষ্টা, তাই খণ্ডবোধের ছোঁয়াচ তাদের মধ্যে থেকেই যায়। সত্যের পথে মাইল-খুঁটির মত এসব দর্শনের একটা আপেক্ষিক মর্যাদা আছে মানতে বাধা নাই। কিন্তু এদের গলদ কোথায়, তাও সুস্পষ্ট। বুদ্ধি জগৎ থেকে ব্রহ্মকে দেখছে, তাই তার দৃষ্টি হতে জগৎসম্পর্কে মনের সংস্কারকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। এটা হল তার 'জানা'র দস্তুর। কিন্তু ব্রহ্ম হতে জগতের দিকে নেমে আসার ধারাটা অন্যরকম। সে হল 'হওয়া'র দস্তুর। মন-বুদ্ধির ওপারে গেলে তবে তার হদিশ মেলে। ব্রহ্মের আবেশে তখন ফোটে ব্রহ্মের জ্ঞান, তার স্বরূপ আর শক্তির অখণ্ডবোধ, কি করে তিনি জগৎ হলেন তার নিবিড় আস্বাদন—বোধির বিদ্যুৎ-ঝলকে। ব্রহ্ম আর জগতের মধ্যে দুস্তর ফাঁকটা তখনই ভরতে পারে।

তাই 'তিনিই সব হয়েছেন' এই সিদ্ধান্ত থেকেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে—অবরোহক্রমে। যদি জানি, ব্রহ্ম বিশ্বের অধিষ্ঠান এবং অন্তর্যামী দুইই, তাহলে তাঁকে বলতে পারি না বিশ্বের প্রতি উদাসীন। এ-জগৎ তাহলে তাঁর সত্য-সঙ্কল্পের পরিণাম। এখানে যা-কিছু আছে বা ঘটছে, কিছুই তাঁর সত্তা

জ্ঞান বা ইচ্ছার এলাকার বাইরে নয়। তাঁর পূর্ণতার মধ্যে অপূর্ণতার আভাস যদি দেখা দিয়ে থাকে, তাঁর ইচ্ছাতেই দিয়েছে এবং তার একটা হেতুও আছে। এই মৌলিক সিদ্ধান্তটি স্বীকার করে নিয়ে আমাদের খুঁজতে হবে, জগতে অদিব্যভাব কোথা হতে এল, কেন এল।

বিশ্ব ভাসছে আমাদের বোধে। যাকে আমরা অদিব্য বলছি, তাও আমাদের বোধের একটা ব্যাপার। যেখানে বোধ নাই, সেখানে দিব্য-অদিব্যের সমস্যাও নাই। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত বোধ অখণ্ড সমগ্রতার বোধ নয়। আমরা একনজরে বিশ্বের সবটা দেখছি না—নিজের অহংএর গরজে তার খানিকটা দেখছি মাত্র। এই আংশিক দেখা বা খণ্ডবোধকে বলে অবিদ্যা। আর তা-ই অদিব্যভাবনার হেতু।

অবিদ্যা শুধু যে আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করেছে তা নয়, আমাদের রস-চেতনাকেও করেছে ব্যাহত। সবটা দেখি না বা জানি না বলেই আমরা দুঃখ পাই। আর দুঃখ পাই বলেই মনে হয়, আমরা শক্তিহীন। অবিদ্যা হতেই দুঃখ আর অশক্তি—জীবনের সবচাইতে বড় দুটি গ্লানির উদ্ভব।

অথচ বিশ্বব্যাপারে অবিদ্যা নিরর্থক নয়। সেও একটা শক্তির প্রকাশ, বিদ্যাশক্তিরই সে একটা বিভূতি। আমরা ক্ষোভের সঙ্গে বলি, ঈশ্বর কেন জগতে অজ্ঞান দুঃখ আর অশক্তির সৃষ্টি করলেন? অথচ তিনি জড়ের সৃষ্টি করেছেন বলে আমাদের কোনও নালিশ নাই। কিন্তু যিনি জড় সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার জড়ত্বের বাধা ভাঙবার জন্য জেনে-শুনেই অবিদ্যার সৃষ্টি করেছেন। আমরা অবিদ্যার স্থাণুরূপটাই দেখি, তার শক্তিরূপটা দেখি না। তাই বুঝি না যে, জড়ের চিৎশক্তিতে রূপান্তরের তাগিদ হতে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যপর্বে অবিদ্যার সৃষ্টি এবং সমস্তটা ঘটনার মূলে রয়েছে বিদ্যাশক্তিরই প্রবর্তনা।

জড়ের অন্ধতার মধ্যে অবিদ্যা যেন চেতনা আর শক্তির একটা খাত কেটে নিয়েছে। গোড়ায় খাতটা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ক্রমেই তার দুটি তীর প্রশস্ত হয়ে চলেছে বিদ্যার সাগরসঙ্গমের দিকে। সঙ্কীর্ণতারও প্রয়োজন ছিল—চিৎ-শক্তির স্রোতকে বেগবান করবার জন্য। একেই বলি অভিনিবেশ। অভিনিবেশ একদিক দিয়ে দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে, কিন্তু আরেকদিক দিয়ে আনে

দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। এই তীক্ষ্ণতাই আবার জড়ত্বের আবরণকে বিদীর্ণ করে। তিমিরবিদারের মূল প্রেরণা যোগায় বিদ্যার শক্তি ; আর অবিদ্যার অভিনিবেশ হয় তার সাধন। বিশ্বব্যাপারে অবিদ্যার সার্থকতা এইখানে।

মন দ্বৈতের সংস্কারকে বর্জন করতে পারে না বলে অবিদ্যাকে দাঁড় করায় বিদ্যাশক্তির বিরোধীরূপে—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের মত। কিন্তু অবিদ্যা তো একটা স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নয়। আসলে সে বিদ্যাশক্তিরই ব্যাপারের (functioning) অঙ্গীভূত। অবিদ্যার পিছনে ব্রহ্মেরই সর্বজ্ঞতা আর সর্বশক্তিমত্তা কাজ করছে—এই বোধ নিয়ে ব্রহ্মের ভূমিকা হতে তাকাতে হবে জগৎসমস্যার দিকে। যা ক্ষুদ্র, তাকে বৃহতের মধ্যে স্থাপন করতে পারলেই তার তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল কালোতে রূপের কোনও ব্যঞ্জনা নাই, বুদ্ধির বিচারে সে আলোর বিরোধী। অথচ শুধু আলোতে ছবি হয় না। সমগ্রের ভূমিকায় আলোর বুকে কালোর আঁচড়েই ফোটে রূপ, জাগে রস। রসিকের অখণ্ড দৃষ্টিতে আলো আর আলোর বিরোধকে ছাপিয়ে রূপের ব্যঞ্জনাই হয় বড়।

কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, রসিকের দৃষ্টি যেমন সত্য, তেমনি সত্য শিল্পীর সৃষ্টিও। দৃষ্টিতে আছে তটস্থ সম্ভোগ ; কিন্তু সৃষ্টিতে আছে তপস্যা। এই সৃষ্টির তপস্যার ভিতর দিয়েই দেখা দেয় দুঃখের মহত্তর রূপ। দুঃখের কাছে যারা হার মানছে, তারা সৃষ্টির লক্ষ্য নয়, সৃষ্টির তারা উচ্ছিষ্ট। মহাশক্তি খুঁজছেন তাকে 'যস্তাং জয়তি সংগ্রামে, তস্যা দর্পং ব্যপোহতি'—যে জীবন-সংগ্রামে তাঁকে জয় করবে, তাঁর দর্পকে গুঁড়িয়ে দেবে। আত্মায় এই বীর্যের উদ্‌বোধনই দুঃখের যথার্থ তাৎপর্য। 'আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতে-ঽমৃতম্'—বিদ্যা দিয়ে জীব পায় অমৃতকে, কিন্তু আত্মা দিয়ে পায় বীর্যকে। জানায় আনন্দ আছে, কিন্তু হওয়ায় আছে আনন্দ আর বীর্য দুইই। ব্রহ্মের যা শক্তি, তা-ই আত্মার বীর্য। সে-শক্তি, সে-বীর্য রূপান্তরের সাধক। রূপান্তরের তপস্যা জগৎ জুড়ে—অর্থহীন এলোমেলো রূপান্তর নয়, লক্ষ্যাভিসারী (teleogical) সার্থক রূপান্তর। সে-লক্ষ্য সুস্পষ্ট। সত্তার এক প্রান্তে চিৎ, আরেক প্রান্তে জড়। চিন্ময় ব্রহ্ম জড় হয়েছেন, আবার জড়ত্বের কুণ্ডলীকে বিস্ফারিত করে চিন্ময় হচ্ছেন। তাঁর এই আত্মবিস্ফারণের তপস্যাই আমাদের আত্মার বীর্য। সে-বীর্য শুধু নিজের মধ্যে জড়ত্বের বাধাকে নির্জিত করে নিরস্ত হয় না—আত্মাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির

দুঃখজয়ের তপস্যাকেও সে আপন করে নেয়। এমনি করে অদিব্যভাবই হয় দিব্যবীর্যের উদ্‌বোধনের হেতু। দিব্য আর অদিব্যের বিরোধের সমাধান এই বীর্যের পথে।

জগৎটাকে আমরা একনজরে দেখতে যাই যখন, তাকে কল্পনা করি একটা ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মত। তাতে বহুর মেলা, অনিত্যতার খেলা। তবুও তার তত্ত্বটা আমাদের কাছে স্থাণু, প্রাণধর্মী নয়। একটা বীজ গাছ হয়ে ফুটছে, তার মধ্যে প্রাণধর্মের একটা ক্রমিক বিকাশ ঘটছে স্পষ্ট দেখছি। অথচ সমগ্র জগতের চরম তাৎপর্য সম্বন্ধে এমন-কোনও ক্রমবিকাশের ধারণা সাধারণত আমরা পোষণ করি না। ব্রহ্ম যেমন নিত্যতার মেরু, জগৎ তেমনি অনিত্যতার মেরু—দুয়েরই চারদিকে একটা স্বভাবের গণ্ডি টানা, দুয়ের মাঝে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ। তাই সাধনার বেলায় আমাদের লক্ষ্য হয় অনিত্য জগৎ হতে নিত্য ব্রহ্মে ছিটকে পড়া। এই সংস্কার আছে বলে জগতের মধ্যে যে-গতি, দার্শনিকেরা তাকে কল্পনা করেছেন আবর্তগতির রূপে। কুমারের চাকের মত একটা ভূমিতে উত্তান থেকে জগৎ ঘুরছে, আর এই ঘূর্ণির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অজ্ঞান দুঃখ অনর্থ আর অশান্তি—এই হল দুঃখবাদী দার্শনিকের রায়। কিন্তু কুমারের চাক অমনি ঘুরছে না, তার কেন্দ্রে কাদার তাল পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে উপরদিকে, কুমারের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় ধরছে বিচিত্র ঘটের রূপ। এই রূপবিবর্তনেই তার গতির সার্থকতা। জগতের বেলাতেও তা-ই। শক্তি যখন চক্রবৎ ঘুরছে শুধু, তখন তা জড়। তার মধ্যে রূপের আবর্তন আছে, বিবর্তন নাই। কিন্তু জড়শক্তি প্রাণের ছোঁয়া পায় যখন, তার গতির চক্ররেখা রূপান্তরিত হয় কম্বুরেখায় (spiral), জড়ের তটস্থতার মধ্যে দেখা দেয় একটা ঊর্ধ্বায়ন ও উৎকর্ষণের (transvaluation) আকূতি। এই আকূতি আত্মসচেতন হয়ে ওঠে মানুষের মনে চিন্ময় ঊর্ধ্বপরিণামের আকারে। সংসারের গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে তখনই মানুষ পায় স্তরায়িত দিব্যভূমির সন্ধান। এই হল সত্তার আরোহ-ক্রম। একে বাদ দিয়ে জগতের গতিকে শুধু আবর্তগতি বলে কল্পনা করলে জড়বুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হয়, সত্যদৃষ্টির নয়।

অবিদ্যাকে দূর করতে যেমন অখণ্ডদৃষ্টির প্রয়োজন, তেমনি অশক্তিকে পরাভূত করতে অখণ্ডশক্তির অনুভবও প্রয়োজন। জড় হতে চিৎ পর্যন্ত একটানা একটা শক্তির প্রবাহ—বইছে উজান ধারায়। তার মূলে আছে

ব্রহ্মের সঙ্কল্পশক্তির প্রবেগ। কিসের সঙ্কল্প? না জড়ের চিন্ময় রূপান্তরের সঙ্কল্প। অনায়াস আনন্দে যেমন তিনি জড়ের দিকে নেমে আসছেন, তেমনি তপোবীর্যের আনন্দে চেতনার দিকে উজিয়ে চলছেন। দুটিতেই তাঁর অবন্ধন সঙ্কল্পশক্তির স্বচ্ছন্দ লীলায়ন। এই সঙ্কল্পশক্তিকে অনুভব করতে হবে প্রমুক্ত আত্মচৈতন্যেরও গভীরে।

পূর্ণযোগীর দিব্য-জীবনের সাধনায় যুগপৎ এই দুটি ছন্দই থাকবে। অবরোহ আর আরোহের প্রত্যেকটি পর্ব তাঁর পূর্ণপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। দিব্যভাবনার তুঙ্গতা হতে তিনি 'সব হয়ে সবার মাঝে আবিষ্ট' হবেন যেমন, তেমনি আবার অদিব্যতার পীঠ হতে বীর্যের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে নিশ্চিত আশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত জগৎকে নিয়ে উজিয়ে চলবেন চিন্ময় রূপান্তরের পর্বে-পর্বে। পরমপুরুষের আদিত্যদৃষ্টি আর পরমা প্রকৃতির সূর্যমুখী সৃষ্টির সামরস্য পূর্ণাদ্বৈতের সৌষম্যে ছন্দিত হবে তাঁর যোগারূঢ় জীবনে।

এই হল জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের পূর্ণচেতনা নিয়ে বীর্যের সাধনায় অদিব্যভাবের দিব্যভাবে রূপান্তরেই তাদের বিরোধ মেটে। বিশ্বব্যাপারে অদিব্যভাবের অস্তিত্বের সার্থকতাও এইখানে।

পঞ্চম অধ্যায়

জগন্মিথ্যাত্ববাদ

এতক্ষণে আমরা এইটুকু বুঝলাম, ব্রহ্ম সত্য বলে তাঁর বিসৃষ্টি ও বিভূতিও সত্য ; জগৎ ও জীব দুইই সত্য এবং জীবনের অভিযানও চলেছে এক চিন্ময় পূর্ণসত্যের অভিব্যক্তির দিকে। এটি উপলব্ধি করতে যে-অখণ্ডদৃষ্টির প্রয়োজন, তার অভাব থেকে এবিষয়ে অনেকের মনে তবুও সংশয় জাগে। সে-সংশয়ের দার্শনিক রূপ আমরা দেখতে পাই জগন্মিথ্যাত্ববাদে। সব দেশের জীবনদর্শনে তার কিছু-না-কিছু ছাপ আছে—বিশেষ করে আছে আমাদের ভারতবর্ষে। এ-মতবাদের যৌক্তিকতা কতটুকু, তা-ই আমাদের এখন আলোচ্য।

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এ আমরা চিরকাল শুনে এসেছি। সত্য-মিথ্যার লক্ষণ নিয়ে দার্শনিক যত তর্কই করুন না কেন, প্রাকৃতমন কিন্তু তার সোজা অর্থটাই বোঝে। সে-অর্থে কেন সে সায় দেয়, তার একটা ইতিহাস আছে। তা এই।

মন আমাদের এক ছাঁচের নয়। বিচার করলে দেখি, মোটের উপর তার তিনটা থাক। প্রথম জড়নির্ভর মন—সে ইন্দ্রিয়ের দেখার বাইরে কিছু মানতে চায় না। তারপর প্রাণনির্ভর মন—সে বাসনার প্ররোচনায় কল্পনার পাখা মেলে ইন্দ্রিয়ের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। সবার শেষে আসে বিচারশীল মন—সে সংশয়ী, সে জিজ্ঞাসু, বিশ্বের সব-কিছু সে খুঁটিয়ে বুঝতে চায়। কিন্তু তিনটি মনই কিছুদূর গিয়ে আর এগ'তে পারে না, তাদের দৃষ্টি যেন সামনের দেয়ালে ঠেকে যায়। জড়নির্ভর মন তখন সিদ্ধান্ত করে, জগতে কিছুই জানা যায় না ; প্রাণনির্ভর মন বলে, জীবনে কিছুই পাওয়া যায় না ; বিচারশীল মন বলে, সব সত্যই শুধু মনের কল্পনা। এই পরাভবের বেদনা হতেই জীবনদর্শনে পড়ে নেতিবাদের ছায়া।

তখন মনে হয়, জীবনের ইতিহাস একটা ব্যর্থতার ইতিহাস। মানুষের কল্পিত স্বর্গরাজ্য আজও মেঘের ওপারেই রয়ে গেছে, পৃথিবীর বুকে নেমে আসেনি। ব্যক্তিগত সিদ্ধি যদি-বা কোনও জীবনে এসেও থাকে, জাতিগত সিদ্ধি এখনও মরীচিকা মাত্র। সংসার ঘুরছে যাঁতার চাকার মত—সবাইকে পিষে গুঁড়িয়ে দিয়ে; এর মধ্যে কেউ যদি কোনরকমে মাঝের খুঁটিটা ধরে বেঁচে যায়। কর্মের কঠোর শাসন জড়েরই শাসন, তাথেকে কারও রেহাই নাই। তাই জগতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এ কেবল অন্ধ জড়শক্তির লীলা—চেতনার বিকাশ এখানে বিদ্যুতের চমক শুধু; বিশ্বব্যাপারটাই একটা অর্থহীন বিভ্রম। নিতান্ত মমতাবশে জীবত্বের 'পরে যদি কোনও গুরুত্ব আরোপও করি, তাহলেও বলব এ-জগতে জীব দুদিনের প্রবাসী মাত্র—যদিও কেন এ প্রবাসযাপনের দুঃখ তাকে পেতে হয় তা বোঝা যায় না।

প্রাকৃতমনে নেতিবাদের মোটামুটি চেহারাটা এই। দার্শনিক-বুদ্ধি তাকে যুক্তির 'পরে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে দুঃখবাদের। দুঃখ-বাদী বলেন, জগৎ দুঃখময়, জীবন ত্রিতাপে তাপিত। দুঃখ একটা অনস্বীকার্য প্রত্যক্ষ সত্য; যাকে সুখ মনে করছি, বিচার করে দেখলে তাও দুঃখেরই রকমফের—এসেছে সুখের মুখোস প'রে। দুঃখকে যে সুখ মনে করছি, এই হল আমাদের অবিদ্যা। দুঃখ হতে বাঁচবার পথ বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে সুখের মরীচিকার পিছনে ছোটা নয়—জগৎকে বাইরে রেখে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসা। গুটিয়ে-আসাটাকে কায়েমী করতে জগৎসম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে হবে, তন্ন-তন্ন করে দেখতে হবে ওর স্বরূপ কি। এই বিচারের ভূমিকা হল বিবেক। আসক্তির বন্ধন ওতে শিথিল হয়, মন অন্তর্মুখ হয়। অন্তরে ডুবি যখন, তখন জগৎ থাকে না, থাকে এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। বাইরে এলে আবার সেই চাঞ্চল্য, সেই অশান্তি—যার নাম জগৎ। দুটি অনুভব একেবারে বিপরীত। এর কোন্‌টা চাই, কোন্‌টা আমার কাছে সত্য? চাই প্রশান্তি, চাই প্রপঞ্চের উপশম। তা-ই ব্রহ্ম, তা-ই সত্য। তার তুলনায় জগৎ মিথ্যা—যেমন স্বপ্ন, যেমন মরীচিকা।

নেতিবাদী অবশ্য উপমাহিসাবে স্বপ্ন আর মরীচিকার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতমন ওদের গ্রহণ করেছে তথ্যহিসাবে এবং তাথেকে এমন-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, জীবনের 'পরে যার ফল সবসময় স্বাস্থ্যকর হয়নি। অখণ্ডদর্শনের বিচারে যে-অনুভব গণ্য হত পূর্ণসত্যের একাঙ্গ বলে, উপমার

দৌলতে তা সত্যের সবখানি এলাকা জবরদখল করে বসেছে। যুক্তির কষ্টিপাথরে উপমা দুটিকে এবার তাই যাচাই করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমে স্বপ্নের উপমাটাই নেওয়া যাক। জগৎ মিথ্যা, জগৎ একটা স্বপ্ন—এ-উক্তি আমরা হামেশাই শুনছি। কথাটার তাৎপর্য অবশ্য এই: স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, জগৎও তেমনি মিথ্যা ; জেগে উঠলে যেমন স্বপ্ন থাকে না, ব্রহ্মজ্ঞানেও তেমনি জগৎজ্ঞান থাকে না।…কিন্তু জগৎ সত্য কি মিথ্যা, তা বাস্তবিক কেউ বলতে পারে না—কেননা জগতের কতটুকুই-বা আমরা জানি ? শুধু, স্বপ্ন মিথ্যা এই অনুভবের জোরেই বলি, 'তেমনি জগৎও মিথ্যা।' যদি প্রশ্ন হয়, স্বপ্ন যে মিথ্যা তার প্রমাণ ? তখন তার অনুকূলে দুটি যুক্তি দাঁড় করানো হয়। প্রথম যুক্তি, স্বপ্নের বাধ (contradiction) আছে, তাই স্বপ্ন মিথ্যা। যখন জেগে উঠি তখন স্বপ্ন থাকে না, জাগ্রতের জ্ঞান স্বপ্নের জ্ঞানকে কেটে দেয়—এই কেটে-দেওয়াটাকে বলে 'বাধ'। কিন্তু বাধ হতে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে এক ভূমির জ্ঞান আরেক ভূমিতে থাকে না ; অথচ তখনও দুটি ভূমিই সত্য হওয়া কিন্তু সম্ভব। বাধের যুক্তিকে যদি মোক্ষম মনে করি, তাহলে এমনও বলতে পারি—যখন জগৎজ্ঞান আছে তখন ব্রহ্মজ্ঞান থাকে না, সুতরাং জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা। চার্বাকপন্থীর এ-যুক্তি তো আজও অচল হয়নি। বস্তুত বাধের যুক্তিতে যা প্রমাণিত হয়, তা বিষয়ের সত্য-মিথ্যা নয়—কিন্তু তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ, অথবা অধিকারের তারতম্য। বলতে গেলে, স্বপ্নে আমরা যেমন করে জাগ্রৎকে ভুলে যাই, জাগ্রতে কিন্তু স্বপ্নকে তেমন করে ভুলি না। জাগ্রতে স্বপ্নের স্মৃতি থাকতে পারে, সে-স্মৃতিকে জীবন্ত করেও তোলা যায়। জাগ্রৎ স্ববশ, স্বপ্ন অবশ। এই কারণেই আমাদের কাছে জাগ্রৎ উৎকৃষ্ট, স্বপ্ন অপকৃষ্ট। ব্রহ্মজ্ঞানেও তেমনি জগৎজ্ঞানের বাধ ঐকান্তিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞানেও জগৎজ্ঞান ভাসতে পারে—শুধু ভাসতে পারে নয়, আরও গভীর হতে পারে। জগৎ তখন মিথ্যা হয়ে যায় না, বরং তার অসঙ্গতি আর বৈরূপ্য দূরে গিয়ে সে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

স্বপ্নকে মিথ্যা বলবার দ্বিতীয় যুক্তি, স্বপ্ন অসংলগ্ন, তার মধ্যে কোনও সঙ্গতি বা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের জাগ্রৎটাই কি সব-সময়ে অর্থপূর্ণ বা সুসঙ্গত ? অথচ অসঙ্গতি আছে বলে তাকে আমরা উপেক্ষা

করি না—তাকে সুসঙ্গত করবার চেষ্টাই করি। আবার তলিয়ে দেখে অনেক-সময় ব্যাবহারিক অসঙ্গতিরও একটা কারণ খুঁজে পাই ; তখন আর অসঙ্গতিকে নিরর্থক মনে করি না।...স্বপ্নের বেলাতেও এই কথাটা খাটে। স্বপ্নকে যখন তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করিনি, তখন আমরা তাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজকাল তো তা পারি না। অবচেতনা নিয়ে গবেষণার ফলে নিরর্থক স্বপ্নেরও আজ অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। তার অসংলগ্নতার মূলে এখন দেখি ভাষার ভেদ মাত্র, অর্থের অভাব নয়। জাগ্রৎ-চেতনা যে-ভাষায় কথা বলে, অবচেতনা সে-ভাষায় বলে না ; তাই তার উক্তি জাগ্রতের কাছে মনে হয় প্রলাপ। কিন্তু প্রলাপেরও যদি কারণ থাকে অর্থ থাকে, তাহলে তো আর তাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

জাগ্রৎ আর স্বপ্ন প্রাকৃত অনুভবে দুটি আলাদা ভূমির ব্যাপার। জাগ্রৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের ব্যাবহারিক মন, আর স্বপ্নের নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে অবচেতনা থেকে। ব্যাবহারিক মন এই অবচেতনার কোনও খবর রাখে না, সুতরাং তার আইন-কানুনও জানে না। তাই স্বপ্ন তার কাছে মনে হয় এলোমেলো অর্থহীন অতএব মিথ্যা। কিন্তু এটা স্বপ্নানুভূতির প্রতি সুবিচার নিশ্চয় নয়। স্বপ্নকে বিচার করতে হবে স্বপ্নেরই স্বভাব ও ধর্ম অনুসারে, জাগ্রতের অনুসারে নয়। স্বপ্ন আর সুষুপ্তির স্বরূপসম্পর্কে একটু আলোচনা করলে ব্যাপারটা হয়তো পরিষ্কার হবে।

যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন আমাদের বাইরের চেতনাই গুটিয়ে আসে, কিন্তু অন্তশ্চেতনার কাজ সমানে চলতে থাকে। এই অন্তশ্চেতনার এলাকা কতদূর, তার কোনও স্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। তার একটা মহল বহিশ্চেতনার কাছাকাছি, তাকে বলা হয় অবচেতনা। সে যেন বহিশ্চেতনার গুদামঘরের মত। তার সংস্কার আর স্মৃতির মালমসলা জমা থাকে ওইখানে, সময়মত যোগানও আসে ওইখানথেকে। তারও গভীরে আরেকটা মহল আছে, তাকে বলতে পারি অচেতনা। সে যেন এক অন্ধপুরী, যদিও সে নিঃসাড় বা নিষ্ক্রিয় নয়। স্বপ্নচেতনার খানিকটা ব্যাপার চলে অবচেতনায় ; উপনিষদের ঋষি বলেন—কল্পনা নিয়ে, নৈয়ায়িক বলেন—স্মৃতি নিয়ে। আসলে কল্পনা আর স্মৃতি দুয়েরই কারবার চলে সেখানে, কিন্তু তার মূলে থাকে 'বাসনা'। এইটিই হল আসল কথা। বাসনায় যেমন জীবের জাগ্রতে ভোগ, তেমনি আবার স্বপ্নে ভোগ। দুটি ভোগই জীবের কাছে সত্য এবং সার্থক ; আর

তাদের তাৎপর্য লুকানো আছে ওই অখণ্ড বাসনার মধ্যে। অন্তর্মুখ হয়ে বাসনার বীজসত্তাকে যদি আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে দেখব তার আলোকে অবচেতনার গোধূলিলোকও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, স্বপ্নেরও অর্থসঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে।

চেতনা স্বপ্ন হতে তলিয়ে যায় সুষুপ্তিতে, ঢোকে অচিতির অন্ধপুরীতে। আমরা ভাবি, এইবার বুঝি চেতনার দীপ একেবারে নিবে গেল। কিন্তু উপনিষদের ঋষির ভাষায় 'দেহের পুরীতে প্রাণের আগুন তখনও জলছে', সুতরাং তার তাপ আর আলো যাবে কোথায়? তাই চেতনা সেখানেও আছে—মহাপ্রকৃতির নিঝুম বিশ্বযোনি চেতনা, উপরভাসা প্রাকৃত চেতনা হতে অনেক দূরে। সেই আদিবাসনা এখানেও আছে, ভোগও আছে—জীবচেতনা এখানেও অনির্বাণ।

দেখতে পাচ্ছি, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি একই বাসনার সূত্রে গাঁথা। তিনটি ভূমি বটে, কিন্তু তাদের অর্থ ওতপ্রোত। প্রাকৃত চেতনায় যে বহিশ্চর খণ্ডভাবনা, তা-ই দিয়ে আমরা সে-অর্থকে আবিষ্কার করতে চাই, কিন্তু পারি না। তখন ভাবি, স্বপ্ন অর্থহীন, সুষুপ্তি অন্ধকার।

জাগ্রৎ হতে সুষুপ্তি পর্যন্ত যে-পথের কথা বললাম, সেটা বাস্তবিক প্রাকৃত চেতনার একটা সুড়ঙ্গপথ। এই পথে রোজ জীব আনাগোনা করছে, কিন্তু আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধ হয়ে। অথচ এই পথেই যোগী চলতে পারেন ভাস্বর চেতনা নিয়ে। তখন অবচেতনা আর অচেতনার গভীরে দেখা দেয় আরেক আলোর রাজ্য, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এক অভিনব ব্যঞ্জনায় নতুন হয়ে ফোটে। এই আলোর রাজ্যকে বলি অধিচেতনা আর অতিচেতনা; তাদের একটি লক্ষণ বিজ্ঞান, অরেকটি লক্ষণ বিশ্বযোগ। দার্শনিকের ভাষায় বলতে পারি, বিজ্ঞান চেতনার সেই মর্মাবগাহী স্বচ্ছতা, যা বিষয়ের স্বরূপকে আত্মস্বরূপের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলে। বিষয় তখন আর বাইরে নয়, অন্তরের জ্যোতিতে চিন্ময়। এই দৃষ্টির স্বচ্ছতায় আত্মসত্তার গভীরে একের বৃন্তে যে বহুর উল্লাস, তা-ই হল বিশ্বযোগ। যোগীর জাগ্রৎ চেতনা ওই বিজ্ঞানে প্রভাস্বর, এই বিশ্বযোগে উল্লসিত। তাদের আবেশ তাঁর স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতে। সুতরাং তাঁর স্বপ্নে কি সুষুপ্তিতে চেতনা উবে যায় না, বরং আরও উজ্জ্বল এবং গভীর হয়। তাঁর 'নিদ্রা সমাধিস্থিতি'; তার মধ্যে ফোটে স্বপ্ন আর সুষুপ্তির দিব্যরূপ। প্রাকৃত চেতনায় যা অবচেতনার কুয়াসা, তাকে উদ্ভাসিত করে জাগে যোগীর অধিচেতনা, অচেতনা রূপান্তরিত হয় অতিচেতনার প্রজ্ঞানঘন আনন্দসান্দ্রতায়।

অধিচেতন-ভূমিতে প্রাকৃত স্বপ্নলোক ফোটে বিজ্ঞানীর ভাবলোক হয়ে। এই অধিচেতনাতেই অবচেতনার স্বপ্নের মূল; অধিচেতনায় যা নিরঞ্জন ভাব মাত্র, অবচেতনার অবিদ্যামলিন পরদায় পড়ে তার বিকৃত ছায়া। পরদাটা কখনও একটু স্বচ্ছ হলে দেখা দেয় আমরা যাকে বলি 'সত্যস্বপ্ন' বা 'দেবস্বপ্ন'। তার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানভূমির খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদে অধিচেতন পুরুষকে বলা হয়েছে 'স্বপ্ন-পুরুষ', অতিচেতন পুরুষকে 'সুষুপ্তি-পুরুষ'। কিন্তু কোনও পুরুষকেই মিথ্যা বলা হয়নি কিংবা প্রাকৃত জাগ্রৎ চেতনার নিরিখে তাঁদের দর কষা হয়নি।

তবেই দেখছি, চলতি কথায় আমরা যাকে স্বপ্ন বলি তা স্বপ্নচেতনার বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র, ও দিয়ে স্বপ্নের স্বরূপ কিছুই বোঝা যায় না। কাজে-কাজেই স্বপ্নের এই কাঁচা ধারণা নিয়ে তার সঙ্গে জগতের উপমা দেওয়াটা কোনদিক দিয়েই সঙ্গত হয় না। উপমা দেবার সময় উপমেয় আর উপমানের মাঝে গুণের সাদৃশ্য বা সমতা থাকা চাই, নইলে তুলনার ভারসাম্য বজায় থাকে না। স্বপ্নের স্বরূপ জেনে তারপর যদি উপমার জের টেনে চলি, তাহলে বলতে হয়: স্বপ্ন যেমন অমূলক নয় মিথ্যা নয়, তার যেমন একটা গভীর তাৎপর্য আছে, চেতনার উৎকর্ষে তার স্বরূপের সত্য যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তেমনি এ-জগৎও মিথ্যা নয়, এ সমূল সৎপ্রতিষ্ঠ, এরও একটা গভীর তাৎপর্য আছে, দৃষ্টির উৎকর্ষে এরও যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়ে এক চিন্ময় সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে।

জগৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে আরেকটা উপমা দেওয়া হয়—মরীচিকার। এইহতে জগৎসম্পর্কে বিভ্রমবাদ আর কুহকবাদের সৃষ্টি। একটা জিনিসকে ভুল করে যদি আরেকটা কিছু বলে দেখি, তাহলে তাকে বলে বিভ্রম (illusion)—যেমন দড়িকে সাপ দেখে আঁৎকে ওঠা। আসলে কিছুই নাই তবুও একটা-কিছু দেখছি, তাকে বলে কুহক (hallucination)—যেমন মরুভূমির শূন্যতায় মরীচিকা দেখা। দুটাই 'বিভ্রম' বা ভুল দেখা—একটা সমূল, আরেকটা অমূল। আগেরটাকে বলতে পারি মতি-বিভ্রম অর্থাৎ মনের ভুল, আর পরেরটাকে দৃষ্টি-বিভ্রম বা চোখের ভুল।

দার্শনিকেরা অধিষ্ঠান (substratum) আর আরোপের (super-imposition) সম্পর্ক দিয়ে বিভ্রমকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভুল

দেখা হল একটাতে আরেকটা কিছু দেখা। ভুলের যেটা আশ্রয় তাকে বলি অধিষ্ঠান, যেমন দড়িকে সাপ দেখার বেলায় দড়ি হল অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠানটা সত্য, ভুল করে তাতে যা আরোপ করি তা মিথ্যা—যেমন দড়িটা সত্য, সাপটা মিথ্যা। অধিষ্ঠান একটা ভাব-বস্তু হতে পারে—যেমন দড়ি আর সাপের বেলায়। আবার অধিষ্ঠান অভাব-বস্তু হতে পারে—যেমন মরুভূমির ফাঁকায় মরীচিকা, আকাশে কুসুম বা গন্ধর্বনগর ইত্যাদি। অধিষ্ঠান যদি বাস্তব-সত্য হয়, তাহলে নেতিবাদে আমরা পাই ব্রহ্মবাদ : তার সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর অধিষ্ঠান যদি অবাস্তব-সত্য হয়, তাহলে পাই শূন্যবাদ বা অজাতি-বাদ : তার সিদ্ধান্ত—শূন্যই সত্য, জগৎ মিথ্যা অথবা জগৎ হয়ইনি কোনকালে।

নেতিবাদী ব্রহ্মবাদীই হন আর শূন্যবাদীই হন, অধিষ্ঠানকে সত্য বলে মানছেন। কেননা, দুজনেই বেরিয়ে পড়েছিলেন সত্যের সন্ধানে, জীবনের মূলে একটা শাশ্বত ভিত্তি আবিষ্কারের চেষ্টায়। কিন্তু যাত্রাশেষে সত্যের চেহারা দুজনের কাছে ফুটল দুরকম হয়ে। একজনের কাছে হল ভাব সত্য, আরেক-জনের কাছে অভাব সত্য—আর প্রাকৃত বস্তু হল দুজনের কাছেই মিথ্যা। ব্যাপারটাকে চেতনার দিক থেকে দেখলে বলতে পারি, ব্রহ্মবাদী দাঁড়িয়ে আছেন শুদ্ধস্বপ্ন বা বিজ্ঞানের ভূমিতে, আর শূন্যবাদী দাঁড়িয়ে আছেন শুদ্ধসুষুপ্তি বা অতিচেতনার ভূমিতে। জাগ্রৎ দুজনের কাছেই লুপ্ত। এটা হল উজান পথের পরিচয়। কিন্তু ভাটার স্রোতে আবার যখন নেমে আসবেন, তখন জাগ্রৎকে তাঁরা কি বলবেন ? তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল মনের একটা দ্বৈত নিয়ে—'এ নয়, আরেকটা কিছু' এই ভাব নিয়ে। এই নেতির সংস্কার যদি প্রবল থাকে, তাহলে ফিরে এসে তাঁরা আবারও বলবেন, 'ওইখানে যা দেখেছি তা-ই সত্য—এ মিথ্যা।' কথাটা কিন্তু দ্বৈতবুদ্ধির কথা হবে, খাঁটি অদ্বৈত-বুদ্ধির নয়। আর প্রথম-প্রথম তা হওয়া স্বাভাবিকও। চোখধাঁধানো সত্যের ঝলককে প্রথমেই হজম করা সহজ নয়। মনকে মুক্ত রাখলে ক্রমে এই ধাঁধাটা কেটে যায়—সহজ অদ্বৈতের আবেশে মানুষের বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, দৃষ্টি উদার ও গভীর হয়। তখন এখানে-ওখানে আর ভেদ থাকে না। কিন্তু মুশকিল এই, সত্যসাধকের সংস্কারমুক্ত চিত্তের এই পরিচয়টুকু দর্শনের পাতায় পাওয়া যায় না। সেখানে, যাত্রারম্ভে সেই-যে নেতিবাদের প্রথম ঝোঁক, তা-ই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে থাকে দার্শনিকের কুটকচাল।

দার্শনিক বলছেন, অধিষ্ঠান সত্য, আরোপ মিথ্যা।…কিন্তু একেবারে

মিথ্যা কি ? ওই রজ্জু-সর্প আর আকাশ-কুসুমের উপমা নিয়েই বলি, আরোপিত সর্প আর কুসুম—কোনটাই তো মিথ্যা নয়, অবাস্তব নয়। বরং অধিষ্ঠান যতখানি সত্য, ওরাও ঠিক ততখানিই সত্য। আমার দেখাটা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু বস্তুগুলি তো মিথ্যা নয়। সুতরাং উপমার দৌলতে জগৎকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করি কি করে? বিভ্রম আসলে আমার মনে, আমার খণ্ডিত চেতনায়, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতায়। তাই তথাকথিত মায়া আমারই মনের মায়া। তাকে জগতের স্বরূপবিচারের মাপকাঠি করা কি উচিত ?

বস্তুত বিভ্রমবাদী উপমা দিতে গিয়ে দুটি সম্পূর্ণ পৃথকধরনের বিভ্রমকে একসঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেছেন। যদি বলতেন, 'রজ্জু সত্য, সর্পও সত্য—তবুও রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় কখনও-কখনও ; তেমনি ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য—তবুও ব্রহ্মে জগৎভ্রম হয়', তাহলে উপমেয় আর উপমানে সঙ্গতি থাকত। তিনি দেখাতে চাইছেন সত্য ব্রহ্মে একান্ত মিথ্যা জগতের আরোপ। তাহলে উপমাতেও দেখাতে হবে একটা সত্য বস্তুতে একান্ত মিথ্যা কোনও বস্তুর আরোপ। কিন্তু এমন একান্ত মিথ্যা বস্তু জগতে কোথাও তিনি খুঁজে পাবেন না। যাকেই এনে উপমার ক্ষেত্রে হাজির করবেন, সে-ই হবে প্রমেয় (knowable) অতএব সত্য। সুতরাং উপমা খাটবে কেমন করে ?

রজ্জু-সর্প শুক্তি-রজত আকাশ-কুসুম ইত্যাদি সকল উপমারই ওই দোষ। উপমান হিসাবে যে-বস্তুটি এনে দাঁড় করানো হচ্ছে, তা আসলে মিথ্যা নয়, সত্য। সুতরাং উপমা থেকে জগতের মিথ্যাত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে না। একটি উপমা হল দ্বিচন্দ্র-দর্শন। আকাশে একটা চাঁদ, কিন্তু চোখের দোষে কেউ দুটা চাঁদ দেখল। এখানে দ্বিত্ব মিথ্যা, একত্বই সত্য। তেমনি জগতে যে বহুত্বের মেলা তা মিথ্যা, এক ব্রহ্মই সত্য। এই হল দার্শনিকের বক্তব্য। কিন্তু এ-উপমাও সঙ্গত হচ্ছে না এইজন্য যে, একটি চাঁদ দুটি চাঁদ হয়ে দেখা দেওয়ার মত এক ব্রহ্ম তো জগতে বহু 'ব্রহ্ম' হয়ে দেখা দিচ্ছেন না। উপমাতে আছে সংখ্যার বিভ্রম ; কিন্তু জগৎ তো শুধু নির্বিশেষ একত্বের নির্বিশেষ বহুত্ব নয়। এক সোজাসুজি বহু হচ্ছেন না, বিচিত্র পরিণামের ভিতর দিয়ে বহু হচ্ছেন। উপমাতে সে-পরিণামবৈচিত্র্যের কোনও সন্ধান পাই না। সুতরাং জগদ্ব্যাপারের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায় ?

তাহলেই দেখতে পাচ্ছি, 'জগৎ মিথ্যা' বোঝাতে গিয়ে দার্শনিক যেসব

উপমার প্রয়োগ করছেন, তাদের কোনটাই নির্দোষ নয়। অথচ প্রাকৃতমন এইসব উপমাকে অধ্যাত্ম অনুভবের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবৃতির অনুকূল বলে গ্রহণ করে এবং তাইতে জীবনদর্শনের মধ্যে একটা বিভ্রম সৃষ্টি করে বসে। আর তার পরিণাম হয় গুরুতর। মুশকিল এইখানেই।

অথচ ভুল যে হচ্ছে কোথাও, একথাও মানতে হবে। দড়িতে সাপ দেখছি যখন, নিশ্চয় ভুল দেখছি এবং বুকের কাঁপুনিতে তার ফলও ভোগ করছি। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে দড়ি সাপ আর হৃৎকম্প—তিনটাই সত্য। এমন-কি ওই ভুল-হওয়া ব্যাপারটাও এক অখণ্ড সত্যেরই অঙ্গ, কেননা তারও একটা আইন আছে, ঘটবার একটা ধারা আছে। অথচ ভুল যে ভুলই, তাতেও কোনও ভুল নাই—ভুল ভাঙবার চেষ্টাও তাই ঐকান্তিক।

এই একটা ধাঁধা। ভুল তাহলে কোন্‌টা? সাপটা ভুল নয়, সাপ দেখাটা ভুল—তার মধ্যেও আবার দেখা ব্যাপারটা কিন্তু ভুল নয়। ভুলটা তাহলে শেষপর্যন্ত চাপছে চেতনার ঘাড়ে—চেতনার যে-বিষয় তার ঘাড়ে নয়, চেতনার যে-ক্রিয়া তার ঘাড়েও নয় কিন্তু। সুতরাং ভুলের বিচার করতে হবে বস্তুর জগৎ আর শক্তির জগৎ—দুটাকেই ছেড়ে দিয়ে। চেতনার সঙ্গে যুক্ত যে-দ্রষ্টা, ভুল হচ্ছে তারই; আবার সে-ভুলও হচ্ছে চেতনার একটা সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। দ্রষ্টৃচৈতন্যের সবটুকু জুড়ে ভুল হচ্ছে না; তা যদি হত, তাহলে ভুল ভাঙবার উপায় থাকত না।

চৈতন্যের যে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে ভুল ঘটছে, তাকে বলি মন। মনই আমাদের সর্বস্ব এই যদি ভাবি, তাহলে ভুলের জেরটা একেবারে চরম তত্ত্ব পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারি। সাধারণত করিও তাই। কিন্তু সেটা অন্যায়। ওই দড়ি-সাপের বেলাতেই কি করে যে ভুলটা হয় তার একটা বৈজ্ঞানিক বিবৃতি দেওয়া—পদার্থবিদ্যা শরীরবিদ্যা আর মনোবিদ্যার সাহায্যে—অসম্ভব কিছু নয়। বিবৃতি যখন দিতে পারি, তখন ভুলের ব্যাখ্যা পাই; অর্থাৎ বিদ্যার আলোকে ভুলও তখন একটা সত্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমি তখন ভুলের সাক্ষী; দেখছি, এই-এই ধারায় ভুলের সৃষ্টি হল। ভুল ব্যাপারটা তখন একটা আচমকা ঘটনা নয়, ধারাবাহিক একটা পরিণামের (process) খেলা। তার প্রত্যেকটি পর্ব সত্য—কিন্তু দৃষ্টির একটা উদার পরিপ্রেক্ষিতে।

ভুলের বেলায় তাহলে চেতনার দুটা আয়তন (dimension) পাচ্ছি—একটা সঙ্কীর্ণ যার মধ্যে ভুলটা ঘটছে, আরেকটা অবাধ যা এই ভুলেরও মর্মবেত্তা। সঙ্কীর্ণ আয়তনটা মন, আর অবাধ আয়তন হল ব্রহ্ম। মনশ্চেতনা আর ব্রহ্মচেতনা দুইই আমার মধ্যে আছে। শুধু তা-ই নয়, এই মনশ্চেতনার মধ্যেই ব্রহ্মচেতনায় বিস্ফারিত হওয়ার একটা সংবেগও আছে। আমার দেখার ভুলটা ঘটছে মনের এলাকায়। শুধু দেখার ভুলই-বা বলি কেন, আমার ভোগের দুঃখ আর সঙ্কল্পের ব্যর্থতা সবই ঘটছে চেতনার এই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। কিন্তু এই বাধার মূলে, তাকে আবৃত প্রাণিত ও প্রেরিত করে আছে ওই অবাধ চৈতন্য। সে অবাধ চৈতন্য এই সঙ্কীর্ণ চৈতন্যের বিরোধী নয়। কেননা, সে তাকে গ্রাস করে কুক্ষিগত করে আছে, তিলে-তিলে নিজের রসে তাকে জারিত করছে, ভুলকে সত্যে দুঃখকে আনন্দে শক্তির কুণ্ঠাকে স্বাতন্ত্র্যে রূপান্তরিত করছে সঙ্কোচের দেয়াল ভেঙে দিয়ে। বিরোধ সৃষ্টি করছে মন। এবং তাও অজানতে, প্রকৃতিপরিণামের গোড়ার দিকে—যতক্ষণ তার মধ্যে চরম লক্ষ্যের চেতনা না জাগছে, ততক্ষণই।

ভুলটা এই মনের মায়া। সে যখন দার্শনিক সাজে তখন বলে, ভুলটা একটা অনির্বচনীয় মিথ্যা। কিন্তু ভুলের যে সাক্ষী, সে হল দেবমায়া। সে বলে, ভুলটা একটা অপরূপ সত্য। মনের ভুলের উপমা দিয়ে জগৎরহস্য ব্যাখ্যা করতে যাওয়া শুধু যে অযৌক্তিক, তা নয়। ও হল ভুল ভাঙবার অজুহাতে আরেকটা নতুন ভুল সৃষ্টি করা।

আসল কথা, মন স্রষ্টা নয়—সৃষ্ট। কল্পনায় সে যা সৃষ্টি করে, তার উপাদান সে সংগ্রহ করে বাস্তব থেকেই। বাস্তবেরও সে সবটুকু জানে না, জানবার চেষ্টা করে চলে মাত্র। চেষ্টার ফলে বাস্তবের নানান স্তর সে আবিষ্কার করে—জড়ময়, প্রাণময়, তারও গভীরে মনোময়। মনোময় বলছি বটে, কিন্তু সেও মনের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। মনোময় স্তরেও মন অঙ্গ মাত্র, অঙ্গী নয়। এক বিরাট বিশ্বমনের সে একটা তরঙ্গ শুধু।

এইপর্যন্ত বিষয় আর বিষয়ীর দ্বৈত থাকে। এর ওপারে বিজ্ঞানের স্তর, অদ্বৈতের অধিকার। সেখানে গিয়ে মন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। ফিরে এসে তার স্বভাবগত দ্বৈতের সংস্কার নিয়ে বলে, ওখানে যা দেখেছি, এখানকার সঙ্গে তার তুলনা হয় না ; ও-ই সত্য আর এ-ই মিথ্যা, ও-ই কায়া আর এ-ই ছায়া, ও-ই শুধু আছে আর এ থেকেও নাই।

কিন্তু ওখানে গিয়ে মনের প্রলয় না ঘটে রূপান্তরও ঘটতে পারে, যে অতি-মানস চিৎশক্তির প্রবেগে মনের স্থষ্টি সেই উৎসের সঙ্গে সে যুক্ত হতে পারে। মন তখন ব্যুত্থানের মধ্যে ছিটকে পড়ে না, এক অখণ্ড চেতনার ধারায় বাহিত হয়ে এইখানে নেমে আসে নতুন রূপে। নিজের জন্মকে নিজে সে তখন প্রত্যক্ষ করে তারই গভীরে স্বযুপ্ত বোধির জাগরণে। তখন জগৎকে দেখা মানে জগৎ হওয়া। 'স সর্বো ভূত্বা সর্বম্ এবাবিবেশ'—সে সব হয়ে সবার মধ্যে আবিষ্ট হল; 'সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি'—সে সব দেখে, কেননা সে সব হয়ে দেখে। এই হয়ে-দেখাতে মনের দ্বৈত অদ্বৈতরসে জারিত হয়ে যায়। তখন সব সত্য, সব চিন্ময়—এই চোখের দেখাতেই চিন্ময়। চোখের দেখাতে তখন ঝল্‌কে ওঠে আদিত্যের আলো, বিশ্বতশ্চক্ষুর দৃষ্টি-স্থষ্টির সংবেগ। সে তখন সব হয়ে সব দেখে। তাই, দেখে স্থষ্টির বুদ্‌বুদ ফুটছে যে-সত্যের গভীর হতে, সেই অক্ষীয়মাণ উৎসকে।

এই হল বিদ্যার দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি অবিদ্যাকে ঠেকিয়ে রেখে তার সঙ্গে বিরোধ স্থষ্টি করে না, তাকে কুক্ষিগত করে তার মর্মের গহনে রয়েছে যে বিদ্যার আকূতি তাকেই প্রচোদিত করে নিজের সাবিত্রী শক্তিতে। এই প্রচোদনার অপরোক্ষ অনুভবেই স্থষ্টির রহস্য বোঝা যায়—অন্য উপায়ে নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মায়াবাদ

স্বপ্ন আর কুহকের দৃষ্টান্তে জগৎকে যে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না, তা আমরা দেখলাম। দৃষ্টান্তগুলি মায়াবাদের। তার সম্পর্কে সব কথা এখনও আমাদের বলা হয়নি। এইবার সে-প্রসঙ্গে আসা যাক।

মায়াবাদের মূল সিদ্ধান্ত হল: ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এবং জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ। প্রথম আর শেষ সিদ্ধান্ত দুটিতে আমাদের আপত্তি নাই, আপত্তি মাঝেরটিতে। 'জগৎ মিথ্যা' কথাটার তিনটি অর্থ হতে পারে: (১) জগৎ একান্ত অসৎ অর্থাৎ মোটেই নাই, (২) জগৎ আছে এবং নাইও, সুতরাং তার অস্তিত্ব অনির্বচনীয়, (৩) জগতের আপেক্ষিক সত্যতা থাকলেও আসলে তা মিথ্যা। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এই তিনটি সিদ্ধান্তই জীব-বুদ্ধির ভিন্ন-ভিন্ন ভূমি হতে জগতের দিকে তাকানোর পরিণাম। নিরোধের (trance of exclusive concentration) দিকে অভিযানের ফলে—জীবের কাছেই একসময় জগৎ থাকে না, একসময় থাকেও আবার থাকে না, একসময় থেকেও থাকে না। কিন্তু যদি বলি জগৎকারণ ব্রহ্মের কাছে জগৎ নাই, কিংবা তাঁর কাছে জগৎ অনির্বচনীয় বা আপেক্ষিক সত্য মাত্র, তাহলে কথাটা অদ্ভুত ঠেকে। প্রশ্ন হয়, ব্রহ্মচৈতন্যের এ-পরিচয় কে আনল, কি করে আনল? মনে হয় না কি, যে এনেছে সে তার নিজের খণ্ড অনুভবকেই অখণ্ডের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে?

ব্যাপারটা এই। সাধকের অন্তর্মুখ চেতনা ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসছে, প্রাণের স্পন্দন সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হচ্ছে—ক্রমে তা এমন ভূমিতে এসে পৌছল যেখানে কিছুই নাই। সেখানথেকে আর যদি সে ফিরে না আসে, তাহলে তার বেলায় এখানকার বিচারে সত্য-মিথ্যার কোনও প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু সহজবুদ্ধিতে বুঝতে পারি, নির্বাণসাধকের চিত্তের প্রলয়ে জগতের প্রলয় হয় না। অবশ্য পুরাণকার কল্পনা করেছেন, ব্রহ্মার চিত্তের প্রলয়ে কল্পান্তে

জগতের প্রলয় হয়; কিন্তু তাও ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় মাত্র—ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টির শক্তি তখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। মনে করতে পারি বটে, মহাপ্রলয়ে সে-শক্তিও নির্বাপিত হয়ে গেল; কিন্তু সে হবে কালের ভূমিতে থেকে কালাতীতের একটা বস্তুশূন্য কল্পনা শুধু। মোট কথা, জগৎ যখন একবার কারও বোধে আছে, তখন সে আছেই। তার নাই হয়ে যাওয়াটা ব্যক্তির খণ্ডচেতনায় সত্য হতে পারে, কিন্তু অখণ্ড অনন্ত ও শাশ্বত চেতনায় সত্য হতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মে জগৎ আছে, থাকবেও।

মায়াবাদী বলবেন, মানলাম আছে; কিন্তু কতখানি সত্য হয়ে আছে, সেই হল প্রশ্ন। এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে সবাই চায় না। নিত্যের সন্ধানী যে, সে চায় আকাশের আনন্ত্যে পাখা মেলতে। এই চঞ্চল অনিত্য জগতের উর্ধ্বে এক শাশ্বত অচঞ্চল সত্তার ভূমি আছে। সেখানে জগৎ নাই। সেই নাস্তিত্বের আবেশ নিয়ে কেউ যদি এখানে ফিরে আসে, তার মন হয় সটকা-কলের মত; ওখানকার টান কেবলই তাকে উপরদিকে টানতে থাকে, জোর করে মনকে তার এখানে নামিয়ে আনতে হয়। অলখের নেশার ঘোর পুরাপুরি তাতে কাটে না; তখন অধ্যাত্মচেতনার মধ্যেই আবার দেখা দেয় সুষুপ্তি স্বপ্ন আর জাগ্রতের তারতম্য।...অলখের মধ্যে মন ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে জোর করে এদিকে নামিয়ে এনেও ধরে রাখা যাচ্ছে না; এ-মনের কাছে জগৎ নাই। এইখানেই দার্শনিক অজাতিবাদের বীজ।...মনকে নামিয়ে আনা হচ্ছে, কিন্তু তার ঘোর কাটছে না—জগৎকে সে দেখছে যেন ন্যাবালাগা চোখ দিয়ে; জগৎ তার কাছে যেন স্বপ্ন, যেন ভোজবাজি—সে আছেও, আবার নাইও। এইখানে পাই বিভ্রমবাদের বীজ।...হয়তো মন নেমে এল, খোলা চোখেই চাইল জগতের দিকে। জগৎ আছে, কিন্তু আগে যেমন সত্য হয়ে ছিল, তেমন হয়ে আর নাই। আরেকটা সত্য জল্‌জল্‌ করছে চেতনার গভীরে, তার তুলনায় এ-জগৎটা ফিকা। এখানকার কাজকর্ম চলছে চলুক, তাতে যোগ দিতেও আপত্তি নাই। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে জানছি, সব ফাঁকি—দাসীর মনিবের ছেলেকে 'আমার হক্ক' বলার মত। এইখানে হল আপেক্ষিকতাবাদের গোড়া।...জগৎবোধের আরও গভীরে যাওয়া যায় কি না, সেকথাটা আপাতত খেয়ালে আসছে না।

মোটের উপর বলতে পারি, জগৎ সত্য হলেও সে-সত্যবোধের তারতম্য আছে। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির রায় মেনে জগৎকে সত্য বললেও অধ্যাত্মবোধের

বিচারে সে-রায় টেকে না। সুতরাং বিবেকীর দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা। মিথ্যাকে সত্য বলে দেখাচ্ছে যে, তাকে বলি মায়া। জীব আর ব্রহ্মের মধ্যে এই মায়ার আড়াল। ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্য, জীব চৈতন্যস্বরূপ—মাঝখানে মায়াশক্তির দৌলতে মিথ্যা প্রপঞ্চের সৃষ্টি।

স্বভাবতই তখন প্রশ্ন হয়, মায়া কার শক্তি, তার স্বরূপ কি? মায়াবাদীরা প্রথম প্রশ্নটির দুরকম জবাব দেন। কেউ বলেন, মায়া ব্রহ্মের শক্তি। আবার কেউ বলেন, মায়া জীবচৈতন্যের আশ্রিত; ব্রহ্ম মায়াতীত, জীবই মায়ার ঘোরে জগৎস্বপ্ন দেখছে। উভয়ত্র মায়া মিথ্যার জননী।

প্রথম পক্ষ নিয়ে বিচার করে দেখা যাক, মায়াবাদের অন্যান্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে এ-সিদ্ধান্ত কতখানি খাপ খায়।

ব্রহ্মের স্বরূপসম্পর্কে মায়াবাদীও বলেন, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ব্রহ্ম চিন্ময়, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, এবং ব্রহ্ম জগৎকারণ। ব্রহ্মের প্রথম তিনটি লক্ষণ আমরা পাই বস্তুত আত্মচেতনার ঊর্ধ্বায়ন এবং ব্যাপ্তি হতে। চেতনার অবিচল স্থৈর্য, অনির্বাণ দীপ্তি এবং অখণ্ড-সমাহরণের (integration) শক্তিই যদি সাধনার বলে চরমে ওঠে, তাহলে যে অনুত্তর বোধ আবিষ্কৃত হয়, তা-ই 'সচ্-চিদ্-একম্' ব্রহ্ম। দেখতেই পাচ্ছি, চেতনার উজান বেয়ে আমরা এই বোধে পৌঁছই; সুতরাং জীবের দিক থেকে এটা উৎক্রমণের এবং জগতের দিক থেকে নিরোধের পথ। এতে ব্রহ্মের যে-স্বরূপ ফোটে জীবের চেতনায়, তা যেন আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ চিন্ময় সমুদ্রের মত—তার মধ্যে 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত সাগরলহরীসমানা।' জনান্তিকে বলে রাখি, এই ব্রহ্মচৈতন্য শক্তিহীন নয়। জীবের সম্পর্কে তাঁর ওই উজান-শক্তির বলক্রিয়া ফোটে সঙ্কর্ষণে। সঙ্কর্ষণশক্তি মায়াবাদীর মায়া নয়, বলতে পারি ভাগবতের যোগমায়া। বৈষ্ণব বলবেন, অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি—যা প্রাকৃত-চেতনাকে ভিতরমুখে টেনে নিয়ে যায়।

ব্রহ্মের আরেকটি লক্ষণ, তিনি জগৎকারণ। তাঁর সৃষ্টিশক্তি মায়া। একটু আগে ব্রহ্মের যে-স্বরূপলক্ষণের কথা বললাম, তাতে যদি বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট থাকে, তাহলে ব্রহ্মের সঙ্গে এই মায়ার সম্পর্ক নিয়ে কোনও গোল হয় না—এ আমরা আগের এক অধ্যায়ে দেখেছি। মায়া তখন ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, তাঁর সৃষ্টি ব্রহ্মের আনন্ত্যের উল্লাস। জীববুদ্ধির কাছে তা অপ্রমেয় হতে পারে, তবুও মিথ্যা নয়।...কিন্তু মুমুক্ষু জীবের নেতিবাদের সংস্কার নিয়ে যদি মায়াকে

বিচার করি, তাহলে জীবের বুদ্ধিতে যেমন ইতি-নেতির একটা চিড় পড়ে, ব্রহ্মের অখণ্ড সত্তাতেও তেমনি একটা চিড় পড়ে। সদ্ব্রহ্মের দিকে উজিয়ে যেতে আমি যা তুচ্ছ বলে পিছনে ফেলে গেলাম, ভাবি ব্রহ্মচৈতন্যেও বুঝি তা তুচ্ছ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার মুমুক্ষু চৈতন্যের দ্বৈধকে চাপিয়ে দিলাম ব্রহ্মের মুক্ত ও স্ব-তন্ত্র চৈতন্যের 'পরে।

তার পর থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সম্পর্ক আলোচনায় এই দ্বিধাবিভক্ত চৈতন্যেরই জের টানতে থাকি। কখনও বলি, মায়া ব্রহ্মের কল্পনাশক্তি। সেই শক্তিতেই তিনি মহাশূন্যে বস্তুর বিভ্রম ফুটিয়ে চলেছেন।…কিন্তু কল্পনা করা পঙ্গু মনের ধর্ম ; সঙ্কল্পকে সদ্য-সদ্য রূপ দিতে পারে না বলেই সে অবাস্তব কল্পনায় বস্তুর আভাস ফোটায়। সে-আভাস কখনও-কখনও বাস্তবে সার্থকও হয়। কিন্তু চিন্ময় সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্ম মিথ্যা কল্পনা করতে যাবেন কোন্ দুঃখে? তিনিই যদি সব হয়ে থাকেন, চিদ্বীজরূপে নিহিত থেকে থাকেন সব-কিছুর মধ্যে, তাহলে তাঁর কোন্ 'হওয়া'টা অবাস্তব?

কখনও বলি, ব্রহ্ম স্বরূপত আত্মসমাহিত, নিস্তব্ধ ; সেই সমাহিতির শক্তি থেকেই বেরিয়ে আসছে জগতের অনুভব। একদিক দিয়ে তা ব্রহ্মের অনুভব বলে বাস্তব, আরেকদিক দিয়ে সমাহিত অনুভবের বাইরে বলে অবাস্তব। ব্রহ্মের এই বাস্তব-অবাস্তব অনুভবই মায়া।…প্রাকৃতমনের মধ্যে সমাধি আর ব্যুত্থানের যে-বিরোধের কথা আগে বলেছি, মায়ার এই বিবৃতিতে দেখি তারই ছাপ। ব্রহ্ম-চৈতন্য অখণ্ড সমরস ; তার মধ্যে অন্তরে-বাইরে সমাধিতে-ব্যুত্থানে বিরোধ থাকতে পারে কি করে?

কখনও বলি, ব্রহ্মের মায়ায় জীব আচ্ছন্ন, কিন্তু ব্রহ্ম আচ্ছন্ন নন ; তবুও তিনি জেনেশুনেই বিভ্রান্তের মত ব্যবহার করছেন—নট যেমন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে তেমনি।… এখানেও আমাদের প্রাকৃত-চেতনায় ভ্রমের যে-সম্ভাবনা আছে, তাকে চাপানো হচ্ছে ব্রহ্মের জগৎ-চেতনার 'পরে। আমাদের ভ্রম হয় কেন, তা আমরা জানি না ; যখন জানি, তখন ভ্রম আর ভ্রম থাকে না, তা একটা সত্য ব্যাপারের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে—একথা আগেই বলেছি। ব্রহ্ম যদি সব জানেন, তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে এবং সঙ্কল্পে জগদ্ব্যাপারের কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে না—যা ঘটছে তা যাদুকরের হাতসাফাই নয়, একটা নিগূঢ় সত্যের ক্রমিক উন্মীলন। আমরা মনে করতে পারি আমরা ঠকছি, কিন্তু সে আমাদের অবিদ্যা ; আসলে ব্রহ্ম ঠকছেনও না, ঠকাচ্ছেনও না। যদি

কোনও নালিশ চলে বা প্রশ্ন ওঠে তা এই অবিদ্যাকে নিয়ে, ব্রহ্মকে বা তাঁর চিন্ময়ী মায়াশক্তিকে নিয়ে নয়।

কখনও বলি, ব্রহ্মে কোনও বিভ্রম নাই, বিভ্রম এই মায়ার জগতে। এই-খানেই সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব, বন্ধন হতে মুক্তির তপস্যা। অনাদিকাল ধরে এই মায়ার খেলা চলছে, ব্রহ্ম তার অসঙ্গ সাক্ষী মাত্র।…এখানেও এক অখণ্ড সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছে মনের ধাঁধায়; অথচ তাতে কেন এ মায়ার খেলা, তার কোনও জবাব মিলছে না।

আসল কথাটা এই। ব্রহ্ম সব-কিছু হয়েছেন, অথচ হয়েও ফুরিয়ে যাননি; যেখানে তিনি অনিঃশেষিত, সেখানে তিনি বিশ্বের অতীত। তাঁর এই বিশ্বাতীত ভাবকে মুমুক্ষুর ভাষায় তর্জমা করে বলি, তিনি অসঙ্গ। তাঁর স্বরূপসত্যের এই একটা দিক। আরেকটা দিক, তিনি বিশ্বাতীত থেকেও সব-কিছু হয়েছেন। এই হওয়াটাও তাঁর স্বরূপের সত্য। যিনি হচ্ছেন, যা দিয়ে হচ্ছেন, যা হচ্ছেন—সবই সত্য; অর্থাৎ দার্শনিকের ভাষায়, ব্রহ্ম মায়া জগৎ তিনই সত্য—ব্রহ্মের দিক থেকে সত্য বস্তুর সত্য শক্তিতে সত্যকার পরিণাম। ব্রহ্মসম্পর্কে এই হল চিন্ময় বাস্তববাদ—মনোময় মায়াবাদের চাইতে আরও গভীর। শুধু তর্কের কথা নয়—ব্রহ্ম হয়ে যখন ব্রহ্মকে জানা যায় সহজের ছন্দে, তখনকার কথা। এ-জানা হচ্ছে 'অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস' হতে ছলকে পড়া এবং তারই সমান্তরালে প্রকৃতির চিন্ময় রূপান্তর। এই ব্যাপারটাও ঘটছে; শুধু উজান-পথের খবর রাখি বলে) আর তা-ই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্যও বটে), এ-সম্ভাবনাটা আমাদের খেয়ালে আসে না।

সদ্বস্তুর পরিণামে সবই যদি সত্য হল, তাহলে কি মিথ্যা কোথাও নাই? আছে বই কি। মিথ্যা না থাকলে সত্যের সাধনাও যে থাকত না। জীবের অজ্ঞান আছে, দুঃখ আছে, অশক্তি আছে—এগুলিকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টাও আছে; সুতরাং ইষ্টার্থের (value) বিচারে মিথ্যাও আছে। যার দিকে এগিয়ে চলেছি তা সত্য, যাকে পিছনে ফেলে যাচ্ছি তা মিথ্যা—সত্য-মিথ্যার এই হল সোজা হিসাব। কিন্তু কার কাছে? জীবচেতনার কাছে, যে উজান চলছে তার কাছে। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব সাধক-চেতনায়, সিদ্ধ-চেতনায় সবই সত্য। ব্রহ্মচেতনা সিদ্ধচেতনা। আবার সে-চেতনা শুধু দ্রষ্টা নয়, স্রষ্টাও; যেমন সিদ্ধদৃষ্টি, তেমনি সিদ্ধসৃষ্টি। সে-সৃষ্টির তাৎপর্য কি, তা প্রাকৃতমন ঠিক ধরতে পারে না; কেননা সে-মন ভাগ-ভাগ করে দেখে, ভাল-মন্দ সত্য-

মিথ্যার দ্বন্দ্ব নিয়ে দেখে বলে পুরাপুরি সবটা তো দেখতে পায় না। এই মনের সংস্কার থাকে বলেই উজানপথিক সাধকের কাছে সৃষ্টিটা মনে হয় 'বিবর্ত'। অর্থাৎ যতই সে উজিয়ে যাচ্ছে, পিছনে ফেলে যাচ্ছে মিথ্যাকে ; সামনের সত্য আর পিছনের মিথ্যা দুয়ের মধ্যে বিরোধের যে-সম্পর্ক, তা-ই হল বিবর্ত। পিছনের মিথ্যাকে যদি একেবারে নস্যাৎ করি, তাহলে পৌঁছই 'অজাতি-বাদে'—বলি জগৎ নাই, ছিলও না। যদি তাকে সত্যের ছায়ারূপে দেখি, তাহলে পৌঁছই অনির্বচনীয় মায়াবাদে—বলি জগৎ আছেও, নাইও।

মোটের উপর সবটা হল এদিকের বুদ্ধি দিয়ে দেখা। মুক্তির সাধনায় এ-দেখার একটা মূল্য আছে, কিন্তু সৃষ্টির উল্লাসে এবং উচ্ছলনে তার কী মূল্য ? জীবের গরজ, জগৎকে মায়া বলে ব্রহ্মে লীন হবার ; কিন্তু ব্রহ্মেরও কি সেই গরজ ? জীবের মন জগৎকে সৃষ্টি করেনি, তবু সে একসময়ে সরে গিয়ে জগৎকে ফুরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আসলে সৃষ্টি তাতে ফুরয় না, তার প্রবর্তনার রহস্যও মনের কাছে স্ফুরিত হয় না। বুদ্ধদেব কঠোর যুক্তিবাদী ; এইজন্যই জগৎরহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে নির্বাণপন্থীদের তিনি নিষেধ করে-ছিলেন। কিন্তু বৈদান্তিক মায়াবাদী সে-নিষেধ মানেননি। তাতে ব্রহ্মের অতিমানস মায়া আর জীবের মনের মায়াতে ঘুলিয়ে গিয়ে দার্শনিক রাজ্যে নিরর্থক বিসংবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

দেখা গেল, ব্রহ্মকে মায়ার সাক্ষী দাঁড় করালে জগৎসমস্যার কোনও যুক্তি-সঙ্গত সমাধান হয় না। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়া এই মিথ্যা জগতের জননী, অথচ মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি'—তলিয়ে দেখলে এই কথাগুলির মধ্যে ন্যায়ের বিরোধ অনেক। দেখা যাক, ব্রহ্মকে মায়ার ওপারে রেখে জীবকে মায়ার সাক্ষী করলে গোল মেটে কি না।

ব্রহ্ম মায়া জগৎ আর জীবকে এইভাবে সাজানো হল : ব্রহ্মচৈতন্য নির্দ্বন্দ্ব নির্বিকার উদাসীন ; জীবচৈতন্য বিকারী, দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ, বিষয়ে আসক্ত। এই জীবই তার চারদিকে দেখছে মায়ার জগৎকে ; সে-জগতের যতদূর পরিধি তার মধ্যে কেবল দ্বন্দ্বের সংঘাত, অনিত্যের বিভ্রম, মিথ্যার বিলাস। জীব এই মায়ার সাক্ষী। এই মিথ্যার মণ্ডল পেরিয়ে ব্রহ্মের সত্যে উত্তীর্ণ হওয়াই তার জীবনের সাধনা।

মুমুক্ষু সাধকের দিক থেকে তত্ত্বের এমনতর একটা পরিকল্পনার উপযোগিতা থাকতে পারে বটে। কিন্তু একেই তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ বিবৃতি মনে

করা সঙ্গত হবে না। এ-কল্পনায় জীব দ্রষ্টা এবং ভোক্তা মাত্র, স্রষ্টা নয়—সৃষ্টিরই সে অন্তর্গত। সৃষ্টি করছে মায়া, এবং সে-সৃষ্টি মিথ্যা ; সুতরাং জীব, জীবের বন্ধন, বন্ধন-মুক্তির সাধনা এবং মুক্তি—সমস্তই মিথ্যা। কেউ-কেউ বলেন, এই হল তত্ত্বজ্ঞান। জীব-জগৎ বন্ধন-মুক্তি সবই যে মিথ্যা, এই জানাটাই সত্যকে জানা। কিন্তু মিথ্যারও একটা প্রতিভান বা প্রতীতি আছে। কোনও-এক চেতনায় তার প্রতীতি হচ্ছে, সুতরাং তাকে তাত্ত্বিকতার এলাকা হতে তো নির্বাসিত করা চলে না। তখন প্রশ্ন ওঠে, কেন এই মিথ্যার প্রতিভান, কার গরজে? মায়াবাদে এ-প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই না। তাইতে জগৎরহস্য বুদ্ধির কাছে অনির্বচনীয়ই থেকে যায়, তার ফলে জীবনে পুরুষার্থের সাধনা হয় একাঙ্গী। জগৎ ও জীবনকে বর্জন করাই তখন হয় জীবের পুরুষার্থ, তাদের রহস্যকে তত্ত্বদৃষ্টিতে উন্মোচিত করে শক্তিকে মুক্তি দেওয়ার কথা আর সে ভাবে না। সমগ্রদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সত্যসাধনার এ হল আধখানা—কেননা এতে জ্ঞানের সঙ্গে শক্তির সামরস্য ঘটছে না।

তাছাড়া, সবই মিথ্যা—এ-কথাটা সহজবুদ্ধিতে মেনে নেওয়া চলে না। অন্তত বন্ধনের যাতনা, মুক্তির পিপাসা ও আশ্বাস—সাধনজগতের এই গোড়ার কথাগুলিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন এই ধরেই জীব আর জগৎকে আবার সত্য বলে মানতে হয়। সে-সত্যতা হল স্থিতির ভূমিকায় গতির সত্যতা। যেমন প্রবাহ-নিত্যতা নিত্যত্বের একটা দিক, তেমনি প্রবাহ-সত্যতাও সত্যের আরেকটা দিক। সমগ্রদৃষ্টিতে দুয়ে কোনও বিরোধ নাই।

কিন্তু ব্রহ্ম একমাত্র সত্য ; সুতরাং জীবের সত্যতা আসছে ব্রহ্মের স্বরূপ-সত্যতা হতে, অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব হয়েছেন বলে জীব সত্য। আগেই বলেছি, ব্রহ্মের হওয়া সত্যের পূর্ণ পরিণাম—তার মধ্যে আধখানি সত্য আধখানি মিথ্যা এমন ভাগাভাগি নাই। সুতরাং 'ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্য আর জীব আভাসচৈতন্য', অথবা 'মায়া ব্রহ্মের সংস্পর্শে কথঞ্চিৎ বাস্তবধর্মী হয় বলে সেই বাস্তবতায় অবাস্তব জীব-জগৎও বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়' এইধরনের কথা ব্রহ্মপরিণামের সঙ্গে মায়াবাদকে খাপ খাওয়ানোর জন্য গোঁজামিল ছাড়া আর-কিছুই নয়। সত্য বলতে, মায়াবাদের ন্যূনতা পূর্ণ হয় পরিণামবাদে—'নেতি-নেতি' বলে উজিয়ে যাওয়ার সার্থকতা নিটোল হয়ে দেখা দেয় 'ইতি-ইতি' বলে নেমে আসাতে।

এসব তর্কের মূলে সেই এক গলদ—মুমুক্ষু সাধকের খণ্ডিতচেতনার যে-দ্বন্দ্ব, তাকেই ব্রহ্মের সিদ্ধ অদ্বয়চেতনায় আরোপ করে তা-ই দিয়ে জগৎরহস্য-মীমাংসার চেষ্টা করা। তাই মায়াকে মিথ্যার জননী কল্পনা করে ব্রহ্মকে তার সাক্ষী করি বা জীবকেই করি, মীমাংসার পথ কোনদিক দিয়েই খুঁজে পাই না। যাকে মিথ্যা বলছি, তা খণ্ডচেতনার দৃষ্টির ভুল হতে পারে ; কিন্তু তাকেই সৃষ্টির মূল বলে ধরি যখন, তখন সমস্ত ব্যাপারটা ঘুলিয়ে যায়, তর্কের ধুলায় সহজবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ব্রহ্ম সত্য, এবং এই সত্যকে ধরেই জীব ও জগৎ-রহস্যের সমাধান করতে হবে—সত্যেরই বাস্তব পরিণামকে মূলসূত্র মেনে। মিথ্যার হেতু খুঁজতে হবে জগতের গোড়ায় নয়—আমাদের প্রাকৃত-বুদ্ধির গোড়ায় ; এবং সেখানেও তার সত্তা গুণ আর ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে হবে বিশ্বের মর্ম-সত্যেরই আলোকে। একথা ক্রমে আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট হবে।

এইবার তথাকথিত ঔপনিষদিক মায়াবাদের প্রসঙ্গে আসা যাক। উপনিষদে আছে চতুষ্পাৎ আত্মার কথা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আর তুরীয়, চেতনার এই চারটি পাদে আত্মচৈতন্যের পূর্ণতার কথা। একে ধরে মায়াবাদের এক-ধরনের বিবৃতি দেওয়া যেতে পারে। বলা চলে, চেতনার চারটি ভূমির মধ্যে তুরীয়ই পরমার্থত সত্য, সুষুপ্তি স্বপ্ন আর জাগ্রৎ হল মায়ার অধিকারে। এই মায়া সতী ; কেননা আত্মা সদ্বস্তু, আর নিচের তিনটি ভূমি আত্মচৈতন্যেরই ভূমি। আবার তাকে অসতীও বলতে পারি এই হিসাবে, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকে ছাপিয়ে তুরীয়ের অনুভবই হল আসল সত্য ; তুরীয়ে জেগে থাকাই হল সত্যকার জাগ্রৎ-দশা, এখানকার জাগ্রতের মত সুষুপ্তির অবিদ্যাঘোরের মধ্যে জেগে ওঠা নয়। প্রপঞ্চোপশম তুরীয় ভূমিতে অধিষ্ঠিত থেকেই ব্রহ্ম মায়ার সহায়ে কারণে সূক্ষ্মে এবং স্থূলে প্রপঞ্চের বিসৃষ্টি করছেন—সুষুপ্তি স্বপ্ন এবং জাগ্রতের ক্রমিক ছন্দে। তাঁর এই বিসৃষ্টি মায়ার অধিকারেই বাস্তব, তার ওপারে গেলে অবাস্তব।

এই বিবৃতির গোড়াতেও সেই একই গলদ—জীবচেতনার দ্বৈধকে ব্রহ্মের অখণ্ডচেতনায় আরোপ করা, উজানসাধকের দৃষ্টির দ্বৈত নিয়ে ব্রহ্মের আত্ম-পরিণাম (self-evolution) বা সৃষ্টির রহস্যকে বুঝতে যাওয়া। তাছাড়া উপনিষদের ঋষি কোথাও নিচের ভূমিগুলিকে তো অবাস্তব বলেননি।

উপনিষদের স্পষ্ট উক্তি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্বম্ আত্মৈব'—'সব মায়া' নয়।

আরও একটা কথা। উপনিষদের স্বপ্ন আর সুষুপ্তি যে সমাধিজ-প্রজ্ঞাকে বোঝায়, জগৎস্বপ্নবাদের আলোচনায় তা আমরা দেখেছি। এখানকার জাগ্রৎ আর ওখানকার জাগ্রৎ অর্থাৎ ব্যুত্থান আর সমাধির ভেদটাও যে অপরিহার্য নয়, এর ইঙ্গিতও আমরা আগে করেছি। প্রাকৃত জাগ্রতের স্পষ্টতা আর অপরোক্ষতাকে যদি আত্মদীপ্তির মান (standard) হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে বলতে পারি, এই জাগ্রৎকেই আরও স্পষ্ট আরও অপরোক্ষ করে তোলাও একটা সাধনপন্থা হতে পারে। তখন এই চোখ মেলেই তুরীয় ব্রহ্মদর্শন সম্ভব—এক অপ্রাকৃত স্বপ্নের অন্তঃপ্রজ্ঞতা আর অপ্রাকৃত সুষুপ্তির প্রজ্ঞানঘনতার ভিতর দিয়ে। সে-দর্শনে সব সত্য, সব চিন্ময়—মিথ্যাজননী মায়ার কল্পনা সেখানে নিষ্প্রয়োজন। ঔপনিষদদর্শনের ইশারাও এই-দিকেই।

মায়াবাদের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ আমরা পাই শাঙ্করদর্শনে। বহু শতাব্দী ধরে শাঙ্করমত ভারতবর্ষের দার্শনিক বুদ্ধিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। তবে শঙ্করের মায়াবাদকে নির্জলা মায়াবাদ না বলে বলা চলে বিশিষ্ট-মায়াবাদ, কারণ শঙ্কর জগৎকে একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে তার আপে-ক্ষিক সত্যতাকে মেনে নিয়েছেন। সত্যের আপেক্ষিকতাবাদ শাঙ্করদর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধি দিয়ে জগৎটাকে দেখছি—সে-দেখাটা মিথ্যা নয়, আবার বোধি দিয়ে ব্রহ্মকে জানছি—সে-জানাও সত্য। দুটি অনুভবই সত্য—কিন্তু ভূমিভেদে। জগতের অনুভব সংসারভূমিতে ব্যাবহারিক সত্য, আর ব্রহ্মের অনুভব মোক্ষভূমিতে পারমার্থিক সত্য। চেতনার আলাদা-আলাদা ভূমিতে দুটিই সত্য; কিন্তু দুটিকে যদি মেলাতে যাই, তাহলে একের তুলনায় আরেকটা মিথ্যা হয়ে পড়ে। অবশ্য ব্রহ্মের সত্যই বড়, তাঁর অনুভবই জোরালো। তার কাছে জগতের অনুভবটা ফিকা—ওটা একটা 'প্রতিভাস' (appearance) অর্থাৎ আপাতপ্রতীয়মান সত্য, তাত্ত্বিক সত্য নয়। তত্ত্বের উপরে প্রতিভাসের আরোপ হয় যে-শক্তিতে, তা-ই মায়া। জীব জগৎ ব্যবহার সবই সত্য—কিন্তু ওই মায়ার এলাকাতে, বুদ্ধির অধিকারে; তার

ওপারে বোধির অধিকার—সেখানে ব্রহ্মই সত্য, আর-সব মিথ্যা। ব্রহ্ম অব্যবহার্য, তিনিই তত্ত্ব ; ব্যবহারটা সত্য-মিথ্যার মিথুনে অনির্বচনীয়।

এই আপেক্ষিকতাবাদে সহজবুদ্ধির একটা তৃপ্তি হয়, সত্যের অখণ্ডভাবনার দিকে খানিকটা সে এগিয়ে যায়। ব্যবহারের মর্যাদাও এতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তটস্থ থেকে নিষ্কামকর্মের সাধনাও একেবারে অসম্ভব হয় না। কিন্তু সকল মায়াবাদের মূলে যে-ত্রুটি—অখণ্ড-অদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্যে একটা দ্বৈধভাবের আরোপ করা, তাহতে এই আপেক্ষিকতাবাদও মুক্ত নয়। শাঙ্করদর্শনে এই দ্বিধার ভাব দেখা দিয়েছে বুদ্ধি ও বোধির স্বাতন্ত্র্যে এবং বিরোধে। জগৎ-দর্শনের বেলায় শঙ্কর বুদ্ধির রায়কে পুরাপুরিই মেনে নিচ্ছেন এবং দৃষ্টত তার এলাকার বাইরে তাকে যেতে দিচ্ছেন না। বুদ্ধিতে জগৎ সত্য হ'ক, তাতে তাঁর আপত্তি নাই ; কিন্তু জগতের বাইরে যা, তার সম্পর্কে বোধির রায়ই প্রামাণিক, বুদ্ধির নয়। অথচ এই বোধির দর্শনের বিচারক হচ্ছে কিন্তু শেষপর্যন্ত বুদ্ধিই—সে-ই আবার নিজের এলাকার মত বোধিরও এলাকা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। জগৎ নিয়ে বুদ্ধির এলাকা, ব্রহ্ম নিয়ে বোধির এলাকা ; ফলে বোধি যেমন বুদ্ধি থেকে আলাদা, ব্রহ্মও তেমনি জগৎ থেকে আলাদা। অথচ ব্রহ্মকেই একমাত্র তত্ত্ব বলে মানতে হবে ; তখন জগৎকে মায়া বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। আবার এই মায়া বলাটা কিন্তু বুদ্ধিরই কাজ ; বোধির স্বরূপ যদি চিনে থাকি, তাহলে সে মায়া মানতে পারে কি না, তাতে সন্দেহ আছে।

কিন্তু ব্রহ্ম যেমন অখণ্ড-অদ্বয় তত্ত্বরূপে জগৎকে জারিত করে রয়েছেন, তেমনি বোধিও কি বুদ্ধিকে জারিত করতে পারে না ? বোধির দিকে উজিয়ে যাবার বেলায় বোধি বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকে বটে, কিন্তু বোধিতে পৌঁছলে পর তার বাঁধভাঙা প্লাবনে বুদ্ধিও কি বোধিদীপ্ত হয়ে উঠতে পারে না ? বুদ্ধি জগৎকে যতটুকু সত্য বলে জানছে, বোধি কি তাকে আরও গভীর অথচ অব্যাহতভাবে সত্য বলে জানতে পারে না ? জগৎরহস্য কি কেবল বুদ্ধি দিয়েই বোঝবার, বস্তুত বোধির আলোতেই কি তার তত্ত্ব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে না ? ব্রহ্ম হয়ে যেমন ব্রহ্মকে জানা, তেমনি জগৎ হয়ে জগৎকে জানা—এই কি তত্ত্বজ্ঞানেরও স্বাভাবিক ক্রম নয় ?

এমনতর একটা সম্ভাবনার বীজ শাঙ্করদর্শনে ছিল বলেই পরবর্তী ব্যাখ্যা-কারদের মধ্যে প্রস্থানভেদ দেখা দিয়েছে, বিদেহমুক্তি বড় না জীবন্মুক্তি বড়

তা নিয়ে তর্ক উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্শনিকের দ্বন্দ্ববুদ্ধি স্বভাবতই এসম্পর্কে কোনও সর্বসমঞ্জস সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি।

শুধু বোধি আর বুদ্ধিকে নিয়ে নয়, ব্রহ্ম আর ঈশ্বরকে নিয়েও শাঙ্করদর্শনে সেই একই দ্বিধা। ব্রহ্ম মায়াতীত, ঈশ্বর মায়াধীশ, আর জীব মায়াধীন। মায়াধীন জীবের জীবত্ব একটা প্রতিভাস মাত্র, মায়ার ওপারে গিয়ে ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভ করাই তার পুরুষার্থ। মায়ার গণ্ডি পেরিয়ে জীবত্বের নির্বাণ হয় যদিও, ঈশ্বরের প্রশাসনে মায়ার সংসার কিন্তু যেমন চলবার তেমনি চলতে থাকে। ঈশ্বর মায়ার অধীন নন বটে, কিন্তু মায়া তাঁকে ছুঁয়েছে বলে তত্ত্বহিসাবে মায়াতীত ব্রহ্মের চাইতে তিনি খাটো।...স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ-মায়া অতিমানস দেবমায়া নয়, ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপশক্তি নয়। এ সেই মনের মায়া—দ্বিধাবিষ্ট বুদ্ধির কল্পনায় বিস্ফারিত হয়ে ছায়া ফেলেছে 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' ঈশ্বর-চৈতন্যের 'পরে। তাই মায়ার ছোঁয়ায় জীবের যেমন জাত যায়, ঈশ্বরেরও তেমনি জাত যায়—কেননা মিথ্যাজগতের স্পর্শদোষ যে দুই ক্ষেত্রেই মারাত্মক! এই সহজ কথাটা তখন খেয়ালে আসে না যে, যিনি মায়াধীশ তিনি মায়াতীত বলেই মায়ার 'উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর'—সুতরাং মায়াতীতে এবং মায়াধীশে তারতম্য আর বিরোধের কল্পনাটা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবুদ্ধির কারসাজি মাত্র।

মায়াবাদের মোটামুটি একটা বিবৃতি পেলাম, কোথায় তার গলদ তারও খানিকটা আভাস মিলল। এইবার মায়াবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলিকে আরও-একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

এদেশের সব দর্শনেরই মত মায়াবাদেরও সত্যকার ভিত্তি জীবনজিজ্ঞাসার 'পরে, আধ্যাত্মিক অনুভবের 'পরে। সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় গতানুগতিক-ভাবে যতদিন জীবন কেটে যায়, ততদিন জিজ্ঞাসার কোনও বালাই থাকে না। জীবন বা জগৎ সম্পর্কে নিজেকে জড়িয়ে প্রশ্ন জাগে দুটি কারণে। হয়তো বাইরে থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভিত টলে যায়, নয়তো ভিতর থেকেই কেন জানি না মন হু-হু করে ওঠে। দুয়েরই ফল অশান্তি, অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তিই মানুষকে ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় পথের বুকে। আসে বৈরাগ্য, জাগে উত্তরায়ণের আকূতি—চেতনার মোড় ফিরে যায়

ভিতরের দিকে, অবশেষে গভীরের সঙ্কর্ষণে তলিয়ে যায় নৈঃশব্দ্যের অতলে।

জীবনপরিক্রমার এই একটা দিক—নিবৃত্তির দিক। আপাতদৃষ্টিতে এ-সাধনা ব্যক্তির—নিদ্রার মত, মৃত্যুর মত। প্রপঞ্চের উপশম ঘটছে একের চেতনায়; কিন্তু তার বাইরে চলছে প্রপঞ্চের উল্লাস। যদি বলি, যে-শক্তিতে উপশম, সেই শক্তিতেই উল্লাস, তাহলে ন্যায়ত আপত্তি করবার কিছুই থাকে না। আপাতত দেখছি ব্যষ্টিতে উপশম, সমষ্টিতে উল্লাস। 'ঘুড়ি লক্ষে দুটি-একটি কাটে'; যিনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন তাঁর কিন্তু দুয়েতেই সমান আনন্দ।

উদারবুদ্ধিতে একথা যদি মেনে নিতাম, তাহলে কোনও গোল ছিল না। কিন্তু তা আমরা করি না। ব্যষ্টির অনুভব দিয়ে বিচার করি সমষ্টির—তাও সমন্বয় আনতে নয়, বিরোধ ঘটাতে। বলি, আমার কাছে প্রপঞ্চের উপশম সত্য যখন, তখন উল্লাসটা মিথ্যা। বিশেষ ক্ষেত্রে আমার কাছে অবশ্য তা মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি বলি, ওটা আগাগোড়াই মিথ্যা—তাহলে বাড়িয়ে বলা হয় বই কি।

মায়াবাদের আসল ন্যূনতা এইখানে। ব্যষ্টির একাঙ্গী অনুভবকে এখানে দেওয়া হয় সমষ্টিসত্যের মর্যাদা। অধ্যাত্ম-অনুভবের এক স্তরে আমার চিত্তের প্রলয় ঘটে। প্রলয় হতে ফিরে আসি, নিয়ে আসি গভীরের স্পর্শ, অনুদ্‌বেল শান্তি। আমার চারদিকে জীবন ফেনিয়ে উঠছে, কিন্তু আমি তার মধ্যে পাষাণস্তূপের মত নির্বিকার। এই অচলপ্রতিষ্ঠার আনন্দকে আমি নিঃশব্দে আস্বাদন করি। বাইরের ঢেউয়ের আঘাত আমায় টলায় তো না-ই, বরং প্রত্যেকটি আঘাত যেন ওই পাষাণস্তব্ধতার আরও গভীরে তলিয়ে দেয়। তখন আর জীবন বা জগৎ সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকে না। কাঠ পুড়ছে, পুড়তে-পুড়তে নিঃশেষ হয়ে যাবে যখন, আগুনও তখন নিবে যাবে। এই নিবে যাওয়াটাই কাঠের জীবনের শেষ কথা।

শেষ কথা, তা মানি। কিন্তু সার কথাও নয়, সব কথাও নয়। কাঠে আগুন ধরা ব্যাপারটা কিছু নয়? যা ঠাণ্ডা ছিল তা তেতে উঠল, যা কালো ছিল তা আলো হল—এও কিছু নয়? কাঠের জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে অস্বীকার করাটাই কি একমাত্র সত্য?

জীবনের পরিণাম মৃত্যুতে, মনশ্চেতনার পরিণাম নির্বাণে, সৃষ্টির পরিণাম প্রলয়ে। দেখছি অস্তিত্বের দুটি প্রান্ত—একটি ইতি আরেকটি নেতি, একটি

শুরু আরেকটি সারা। কিন্তু দুয়ের মধ্যে হওয়ার যে-উল্লাস যে-বীর্য, তাকে মানছি না। কি করে বলি এতেই অস্তিত্বের পূর্ণ পরিচয়, এই একাঙ্গী অনুভবেই চেতনার পূর্ণ বিস্ফারণ ?

কথাটাকে আরেকদিক থেকে বিচার করি।

ব্রহ্মের লক্ষণ সৎ চিৎ আনন্দ। প্রত্যেকটি লক্ষণ আমার বোধ মাত্র। পরিশুদ্ধ চেতনাকে মাঝে রেখে একদিকে নিস্তরঙ্গ সত্তার শান্তি, আরেকদিকে লীলায়িত প্রপঞ্চানুভবের আনন্দ—এই হল বোধের সূত্র। চেতনা আমার অস্তিত্বের আসল অর্থ। প্রাকৃত জীবনে সে-চেতনা কুণ্ঠিত আবিল জর্জরিত; তাকে ব্যাপ্ত করা স্বচ্ছ করা স্বচ্ছন্দ করা আমার জীবনের দায়। প্রশান্ত নির্মুক্ত চেতনাই আত্মা ; আত্মচেতনার বিস্ফারণই ব্রহ্ম—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। ওই যে বললাম, এই বিস্ফারণের একটি প্রান্তে অটল স্তব্ধতা, আরেকটি প্রান্তে আনন্দের বীচিভঙ্গ। মাঝখানে চেতনা, তাতে ভাসছে সবই।

ধরলাম চেতনায় জগৎ ভাসছে—ভাবের জগৎ নয়, এই আটপৌরে ঝামেলার জগৎ। ঝামেলা কেউ চায় না, তাকে দূর করবার চেষ্টাই জীবন-সাধনা। তার দুটা ধরন : এক, বাইরের জগতের অদল-বদল ঘটিয়ে ঝামেলার হাত হতে রেহাই পাওয়া ; আর-এক, ঝামেলাকে চেতনার অন্দর-মহলে ঢুকতে না দেওয়া। অর্থাৎ হয় বাইরের রূপান্তর, নয়তো অন্তরের রূপান্তর—কিংবা দুটাই। যারা অন্তর্মুখ, তারা চায় অন্তরের রূপান্তর। 'বাইরের জগতে যা-ই থাকুক না কেন, আমার অস্বস্থ চেতনাকে স্বস্থ করতে হবে'—এই তাদের লক্ষ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, যদি সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। আঘাতে টলছি না, আপনাতে আপনি আছি—চেতনার পরদায় ঝামেলার ফুট্ ফুটছে, আমি তার উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। প্রথমত এ-অবস্থাটা থাকে সুখ-দুঃখের বাইরে। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার বনিয়াদ যত পাকা হয়, ওই শুদ্ধসত্তার ভিতর থেকে ফোটে একটা স্বচ্ছ আনন্দের আভা। ঝামেলাকে তখন আর তটস্থ হয়ে দেখি না শুধু, রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করি। সাক্ষীর দৃষ্টিতে পড়ে লীলা-কৌতুকের বর্ণভঙ্গ। জীবনসাধনার একটা দিক তখন পূর্ণ হয়—অন্তরের রূপান্তরের দিক। বাইরের রূপান্তরটাকে তখন প্রকৃতি আর কালের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকলেও চলে। অনেকে তা-ই থাকেও।

সত্তার আনন্দে রোমাঞ্চিত চেতনাকে ছড়িয়ে দিলাম জগতের 'পরে—তাপলেশহীন জ্যোৎস্নার প্লাবনে। আমার চেতনা স্বচ্ছ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ

অকুণ্ঠ ; জগতের সঙ্গে তার কোনও বিরোধ নাই, সে অজাতশত্রু। ঝামেলার জগৎ রূপান্তরিত হয়েছে লীলার জগতে। এরও পরে আরও-কিছু আছে কি না, আপাতত সে-ভাবনা নাই। মনে হয় জীবনসমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি।

রসচেতনায় এইভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারলে কোনও কথা ছিল না, আরও একটি গভীরতর সত্য ও শক্তির চেতনা হয়তো আপনাহতেই তখন ফুটত। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের এই স্বাভাবিক পরিণামকে বাধা দেয় দার্শনিক-মনের দ্বৈতসংস্কার। বৃহতের আনন্দচেতনায় জগৎকে আপ্লুত করে তার সমস্যার সমাধান খোঁজা—এ তার আসে না। ব্রহ্মের আনন্দ আর প্রাকৃত জীবের দুঃখ—তার চেতনায় এ-দুটাতে অমেটান বিরোধ।…কিন্তু সত্যি কি তা-ই? দুঃখও কি আনন্দরূপ ধরে না? এই প্রাকৃত জীবনেও দেখি, ত্যাগের দুঃখকে তপস্যার দুঃখকে ছাপিয়ে থাকে আত্মবীর্যের আনন্দ। উদ্‌বুদ্ধ চেতনায় আঘাত এসে সত্তাকে অটল করে, বোধকে তীক্ষ্ণ এবং একাগ্র করে—এ-অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন নয়। আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেই পাই চেতনার বিস্ফারণ। দুঃখের রূপান্তরের সে-ই হল পটভূমিকা। আকাশের পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি—তার বুকে মেঘের ছায়া ঝড়ের দোলা, সবই শক্তির পরিচয়। অপ্রবুদ্ধ চেতনায় সে-শক্তির লীলায় শুধু বিক্ষোভের দুঃখ, কিন্তু প্রবুদ্ধ চেতনায় তা-ই আনে সৃষ্টির বীর্য। সৃষ্টির প্রথম সামর্থ্য ফোটে আত্মচেতনার গভীরে, মুক্তের স্বারাজ্য-সিদ্ধির নিশ্চিত প্রত্যয়ে। জগতের মর্মমূলে চিন্ময় রূপান্তরের যে-সংবেগ, তারই সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে চেতনা তখন দুঃখের সাধনায় আবিষ্কার করে তপো-বীর্যের আনন্দ। দুঃখ আর তখন সম্মূঢ় পরাহত প্রাণের আর্তি নয়, অন্ধ অচিতির তিমিরবিদার জ্যোতিরভ্যুদয়ের সাধন।

এই দুঃখ একটা আর্যসত্য—জীবের অবরচেতনায় নিত্য-অনুভূত বিকার বলে নয়, শিবের পরমচেতনায় গোত্রভিৎ ইন্দ্রের বজ্রশক্তিরূপেই তা সত্য। আঘাতে চেতনা যেখানে অবসন্ন হয়ে পড়ে, দুঃখ সেখানে প্রাকৃত ; কিন্তু পাথরে পাথর ঠোকায় আগুন ঠিকরে পড়ে যেখানে, দুঃখ সেখানে অপ্রাকৃত চিদ্‌বীর্য। তাই, মূঢ় জীবচেতনায় জগৎ যদি-বা 'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্', জাগ্রত শিবচেতনায় তা-ই আবার উৎসর্পিণী মহাশক্তির নিত্যোল্লাস। সিদ্ধের জগৎ জড়ের জগৎ নয়, শক্তির জগৎ। সে-জগতের অনুভবে প্রাকৃত জীবচেতনার দুঃখ প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরিত হচ্ছে সমষ্টি চিৎশক্তির বিদ্যুদ্‌বীর্যে। এই শক্তি

ব্রহ্মেরই আত্মশক্তি। ব্রহ্মের প্রশান্তি যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই শক্তির তপস্যা ; এবং তার আধাররূপে এই জগৎও সত্য।

ব্রহ্মের লোকোত্তর আনন্দ আর জগতের প্রাকৃত দুঃখ, দুয়ের মধ্যে চিদ্-বীর্যের উল্লাসকে যদি সেতুরূপে স্থাপন করি, তাহলেই আর দুঃখ হতে অব্যাহতি পাবার জন্য জগৎকে মায়ার বিজৃম্ভণ বলে উড়িয়ে দেবার কোনও প্রয়োজন হয় না।

একটা কথা হয়তো স্পষ্ট হয়েছে, মায়াবাদ মূলত বুদ্ধির দর্শন—বোধির নয়। সবধরনের 'বৌদ্ধ'-দর্শনেরই যাত্রা শুরু হয় আত্মভাবের বিশ্লেষণ থেকে। চেতনার স্বচ্ছ রূপটি কেমন, দ্রষ্টার স্বরূপ কি, তা আবিষ্কার করা হল এই দর্শনের লক্ষ্য। স্বভাবতই দৃষ্টি তখন গুটিয়ে আসে জগৎ থেকে, জগতের মূলে ঈশ্বরকে নিয়েও মাথা ঘামাবার কোনও দরকার হয় না। এ-পথ নিরোধের পথ। বাইরের জগতে ছড়ানো চেতনা অন্তর্মুখ হয়ে সংহৃত হয় সূচীমুখ একটি বিন্দুতে—বিশুদ্ধ সত্তার বোধ ছাড়া আর-কিছুই তখন অবশিষ্ট থাকে না। প্রলয়ের সঙ্কর্ষণে এই বোধটুকুও মিলিয়ে যেতে পারে এক মহা-শূন্যতায়। এই শূন্যতা বর্জনবুদ্ধির ফল, সুতরাং বুদ্ধির দিক দিয়ে একে মনে হয় ফাঁকা। তবুও বোধের দিক দিয়ে এ কিন্তু নিঃসত্ত্ব নয়। বস্তুত শূন্য-ব্রহ্ম বা পূর্ণ-ব্রহ্ম একই ব্রহ্মসত্তার এপিঠ-ওপিঠ।

এই সত্তাসামান্য বা শূন্যতার বোধকে পরমপুরুষার্থ বলতে পারি না, যতক্ষণ না জীবনের মূলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। কিন্তু এইখানেই সাধকের গোল বাধে। সত্তাসামান্যের বোধ যদি 'ব্যায়াম' বা বুদ্ধির আয়াসের ফল হয়, তাহলে সূক্ষ্ম একটা দ্বন্দ্বের বীজ তার মধ্যে থেকে যায়। 'এ নয়—ওই' বলে বুদ্ধি উজান বাইতে শুরু করেছিল ; তার ফলে, গোড়ায় এই নেতির স্বীকৃতিটুকু সত্তার রিক্ততার প্রতি একটা অভিনিবেশ সৃষ্টি ক'রে সত্তার উল্লাসকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে। অখণ্ডবোধের মধ্যে তখন ইতি-নেতির একটা চিড় পড়ে এবং বর্জনবুদ্ধির ঝোঁকে নেতির বাস্তবতা ইতির বাস্তবতাকে ছাপিয়ে যায়।

অথচ সত্তাসামান্যের বোধ যদি ব্যায়ামের ফল না হয়ে আবেশের ফল হত, তাহলে কিন্তু এ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হত না। অবশ্য ব্যায়ামের ফলে সত্তাসামান্যের বোধে পৌঁছে আবার আবেশের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। মহাশূন্য

অলকানন্দার কলকল্লোলে তখন মুখর হয়ে ওঠে। সত্তাসামান্যের বোধ বজ্রকীলকের মত জীবনের মর্মে নিবিষ্ট হয়, অথচ তার বিভূতির উচ্ছলনের তখন বিরাম থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি এসে সাধনক্ষেত্রকে অধিকার করবার আগে শ্রদ্ধার একটি আবেশ যদি প্রসাদরূপে না নেমে আসে, তাহলে সাধারণত এটি হয় না।

ব্রহ্ম আছেন—সব-কিছুকে আবিষ্ট-আপূরিত করে আছেন। আছেন চিন্ময় হয়ে, আছেন আনন্দময় হয়ে, আছেন অন্তরে, আছেন বাইরে— অস্তিত্বের প্রত্যেকটি চিদ্‌বিন্দুকে হীরকদ্যুতিতে উদ্ভাস্বর করে আছেন। তাঁর এই সত্তার আবেশে ঘটছে প্রকৃতির চিন্ময় বিস্ফারণ, জড়ের ইন্ধন চিদগ্নিময় হয়ে উঠছে তিলে-তিলে। এই তাঁর দেবমায়া, তাঁর শক্তির উল্লাস, তাঁর জগদ্‌ব্যাপার। এই শক্তির কাছে নিজেকে মেলে ধরাই উদ্‌বুদ্ধ জীবচেতনার পুরুষার্থ।

শূন্যতার প্রসঙ্গ এখানেও ওঠে। কিন্তু সে-শূন্যতা বুদ্ধিকল্পিত ব্রহ্ম-স্বভাবের শূন্যতা নয়—নিষ্কিঞ্চন রিক্ততায় জীবচেতনার শূন্যতা। 'আমার কোনও কামনা নাই, আছে তোমার ইচ্ছা ; আমার কোনও কল্পনা নাই, আছে তোমার প্রকাশের প্রতীক্ষা ; আমার কোনও প্রয়াস নাই, আছে আধারের সমস্ত গ্রন্থি এলিয়ে দিয়ে তোমার সত্তায় নিমজ্জন। আমার শূন্য আধার নিঃশব্দে উপচে উঠুক তোমার পূর্ণতায়।'

এই হল সহজের বোধ। এ-বোধ অখণ্ড, নিঃসংশয়, নির্দ্বন্দ্ব। এ-বোধে যা 'আছে' তা এক মহাসত্তার বিভূতিরূপেই আছে, তাকে জোর করে 'নাই' বলে উড়িয়ে দেবার তো দরকার হয় না। আবার যা আছে, তা অসাড় নিস্পন্দ হয়ে নাই—আছে এক অন্তর্গূঢ় চিন্ময় শক্তিতে স্পন্দমান হয়ে। সত্তারই চেতনা, সত্তারই শক্তি—সত্তা, চেতনা আর শক্তি তিনের মধ্যে ভাগাভাগি তো নাই। প্রমাণ আমার আত্মানুভবে : আমি আছি, বোধ হয়ে আছি, ঊর্ধ্ব-পরিণামিনী শক্তির বাহন হয়ে আছি। আমার এই চিদ্‌বিন্দুর সত্তা ও শক্তিকে ঘিরে মহাসিন্ধুর আনন্দ-আন্দোলন। চেতনার মর্মমূলে এই ভূমার আশ্বাস, এই বৃহতের আবেশ ; তাই অবিদ্যা দুঃখ অশক্তি আমার কাছে অস্তিত্বের একটা অবান্তর আবর্ত মাত্র। 'মেঘ ক্ষণেকের—চিরদিবসের সূর্য।' সেই সূর্যের সত্যে আলো-ছায়ার সত্য নিয়ে জগৎ সত্য, জীবন সত্য—তার উত্তরায়ণের তপস্যাই শক্তির সত্য, দুঃখেরও সত্য।

ব্রহ্মের সত্তা ও শক্তির এই সহজ বোধে মায়ার কল্পনা অনর্থক হয়ে পড়ে। প্রপঞ্চোপশম ব্রহ্মসত্তা যেমন সত্য, তেমনি প্রপঞ্চোল্লাসময় ব্রহ্মশক্তিও সত্য—শক্তি সত্তারই চিদ্‌বিলাস ; যেমন আত্মানুভবের গভীর স্তব্ধতা হতে শুদ্ধসত্ত্বের প্রচ্ছটা। সত্তা আর শক্তিতে তো ভেদ নাই ; তবে আর মায়ার কল্পনা কেন? ব্রহ্মের দিক থেকে যখন দেখি, তখন সব সত্য। চিৎশক্তির ক্রমিক সঙ্কোচে অনুভব করি এক নিত্যজাগ্রত সঙ্কল্পের প্রবেগ ; তাই জড়ের সুষুপ্তিও অন্তর্গূঢ় প্রজ্ঞানঘনতার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। অচিতি আর অতিচেতনায় তো তখন বিরোধ থাকে না।

কিন্তু এপারে দাঁড়িয়ে বুদ্ধির দিক থেকে যখন দেখি, তখনই দ্বন্দ্বের শুরু। স্বভাবতই বুদ্ধির অনুভব সঙ্কীর্ণ, তার সকল জানার চারদিকে একটা সীমার বেড়া। এই সীমিত জ্ঞানের প্রতি তার গভীর একটা অভিনিবেশ আছে, তাকে ছাড়লে সে যেন কোথাও আর থৈ পায় না। অথচ সীমাকে লঙ্ঘন করে অসীমকে জানবার আকূতিও তার কম প্রবল নয়। এই হতে খাতবন্দী একটা প্রবেগের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে : 'কূল ছাড়তে হবে, তবে অকূলকে পাওয়া যাবে—সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে।'

এই হল বৈরাগ্যের আহ্বান। এই বৈরাগ্যের মধ্যেই মায়াবাদের জোর। এই-যে সবখোয়ানো 'হিয়া-দগদগি পরান-পোড়নি'—এ তো মিথ্যা নয় ; যে-সর্বনাশের মধ্যে এই অন্তর্জ্বালার পরম প্রশম—সেও তো মিথ্যা নয়। একটা তীব্রসংবেগ উল্কার মত ছুটিয়ে নেয় চেতনাকে—কোথাও থামবার উপায় নাই, পিছন ফিরে তাকাবার উপায় নাই। যাকে ফেলে গেলাম, তার সঙ্গে আর-কোনও সম্বন্ধ রইল না ; একটুখানি থেমে ঊর্ধ্বতন সত্যের আলোকে তার শুদ্ধসত্তাকে আবিষ্কার করা এবং তাকে অঙ্গীকার করে জীবনের পরিসরকে বাড়ানোর কোনও তাগিদ রইল না। চেতনার চরম বিস্ফারণে এক নির্বর্ণ আলোকের ঝলকে ঘটল অস্তিত্বের অবসান। 'পাঁচিলের উপরে যে-ই ওঠে, হাঃ-হাঃ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ আর ফিরে আসে না।' যদি-বা কেউ এল, এল জড় উন্মত্ত বা পিশাচের মত হয়ে ; মহাভাগ্যবান যে, সে এল বালক হয়ে। কিন্তু ষোড়শকল সোম্য পুরুষের তারুণ্য নিয়ে কেউ কি আসে না? হয়তো আসে। শ্রুতিতে-স্মৃতিতে এখানে-ওখানে আভাস পাই, কিন্তু দর্শনের পাতায় তার খবর মেলে না।

এই এক সাধনা। এরও আভিজাত্য আছে, বীর্য আছে, প্রয়োজনও

আছে বই কি। একটা নির্মম আঘাতে মোহের খোলাটা ভেঙে না দিলে চেতনার মুক্তি হয় না। প্রকৃতিতে কালের যে-মন্থরতা আছে, বিনা কশাঘাতে তাতে ক্ষিপ্রতা আসে না। কিন্তু এই উজান-ছোটা হল জীবনের সমগ্র পরিক্রমার আধখানা। মুক্তিতে পৌরুষের পরিচয় এতে মিলল, কিন্তু শক্তিতে প্রকৃতির রূপান্তর হয়তো ঘটল না।

রূপান্তর ঘটছে, ব্রহ্মবীর্যের আবেশেই ঘটছে—এই বোধটি জীবনদর্শনের আরেকটি অঙ্গ। এই-যে রূপান্তর, এই-যে কলায়-কলায় উন্মেষ—এও মায়ার খেলা। কিন্তু সে-মায়া কুহকিনী নয়, কল্যাণী জননী। তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য দুর্বোধ প্রহেলিকা নয়, অনন্ত বৈচিত্র্যের উল্লাসেও একটি সুদূর ধ্রুবলক্ষ্যের দিকে তার ইশারা। মহামায়া অর্থহীন কল্পনার বিজৃম্ভণে মহাকাশকে আবিল করছেন—এ আতুর প্রকল্প সত্য নয়। জড়ের গভীরে নিহিত চিদ্‌বীজকে আত্মরসে লালন করে কলায়-কলায় উন্মেষিত করছেন তিনি—এই দৃষ্টিই সত্য। এ-সত্যের ভিত্তি জীবের প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনায়নে, তার বৃহৎ হবার আকূতিতে। একটা পিণ্ডে যা ঘটছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েও তা-ই ঘটছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন সূর্যের আলোতে সহস্রদল পদ্মের দল মেলার মত। সূর্যও সত্য, পদ্মও সত্য, তার দল মেলাও সত্য। এই দল মেলার আবেগ যেমন পদ্মের যোগিনী-হৃদয়ে, তেমনি তার অবন্ধ্য আশ্বাস ওই আদিত্য-হৃদয়েও। দুটি হৃদয়ের এই ছন্দোবিনিময়ই যোগমায়ার লীলা, প্রপঞ্চোল্লাসের তাৎপর্য।

অথচ দল মেলা সহজ নয়—কোনও উন্মেষই কোনকালে একেবারে সহজ হয় না। তাই অজ্ঞান দুঃখ অশক্তি মৃত্যু—জীবনের যত ঝামেলা। মায়াবাদী বলেন, এই নিয়েই জগৎ, এই তার চেহারা। কিন্তু ওটা হল ক্ষোভের কথা, রাগের কথা। শুধু অজ্ঞান দুঃখ অশক্তি আর মৃত্যুর কাছে অসহায় পরাভব নিয়েই জগৎ নয়। এর প্রত্যেকটা আসে চেতনার কাছে যেন মাল-সাটের মত। চেতনা রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'এদের আমি মানব না।' এই চিদ্‌বীর্যই জীবনের মর্মসত্য। তার সার্থকতা শুধু তিতিক্ষাতে নয়, রূপান্তরের সামর্থ্যে। এই অজ্ঞান এই দুঃখ এই অশক্তি এই মৃত্যুকেই রূপান্তরিত করতে হবে প্রজ্ঞায় আনন্দে শক্তিতে আর অমৃতে। রূপান্তরের বীজ তাদের মধ্যে নিহিত আছে বলেই রূপান্তর সম্ভব এবং সাধ্যও বটে।

এই দৃষ্টিতে দেখলে জগৎরহস্যের চেহারা বদলে যায়। জগৎকে তখন আর মনে হয় না এলোমেলো রূপের মেলা বা শক্তির খেয়ালখুশির খেলা বলে।

তার গভীরে তখন দেখতে পাই একটা ঋতচ্ছন্দের দোলা। বিশ্বব্যাপার নিরর্থক বিভ্রমও নয়, লীলাকৈবল্যও নয়—তা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিসৃষ্টি। অতএব তার একটা সুনিরূপিত অর্থ এবং সুনিশ্চিত লক্ষ্য আছে। এই অর্থকে আমরা খুঁজে পাই আমাদেরই জীবনে, আমাদের অধ্যাত্মচেতনার ক্রমিক উন্মেষে—কেননা ব্যষ্টি আর সমষ্টির মূলে একই ঋতচেতনার ছন্দ। এই ছন্দের পরিচয় মায়াবাদেও পাই না, লীলাবাদেও পাই না। বিশ্বরহস্য-সম্পর্কে এ-দুটি বাদেই সূচিত হয় বুদ্ধির পরাভব মাত্র।

কিন্তু এছাড়া আরেকটা বাদ আছে—'পারার্থ্যবাদ'। প্রাচীন সাংখ্যে তার ইঙ্গিত পাই, যদিও তার ব্যঞ্জনা সেখানেও পূর্ণস্ফুট নয়। প্রকৃতির সকল ব্যাপার 'পরার্থে', অর্থাৎ তার চাইতে 'পর' বা উৎকৃষ্টতর কোনও তত্ত্বকে লক্ষ্য করে প্রবর্তিত হচ্ছে—এই হল পারার্থ্যবাদের মূল কথা। সাংখ্যে এই 'পর' চৈতন্য বা পুরুষ, প্রকৃতির ক্রিয়ার তিনিই লক্ষ্য। এই সিদ্ধান্তে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার চৈতন্যাভিমুখী হওয়ায় তাদের একটা অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্কেত পাওয়া যায়। কিন্তু সাংখ্য পুরুষকে স্বরূপত প্রকৃতি থেকে আলাদা করে রাখায় এই সঙ্কেতকে সেখানে পুরাপুরি কাজে লাগানো হয়নি। প্রকৃতি-পরিণামের সঙ্গে চিন্ময়-বিবর্তনকে অন্বিত করে পূর্ণাদ্বৈতবাদ সাংখ্যের এই ন্যূনতার আপূরণ করেছে।

প্রকৃতি যদি পুরুষের আত্মপ্রকৃতি হয়, তাহলে তার পারার্থ্য একটা চিন্ময় তপস্যার রূপ ধরে। তখন বলা চলে, বিশ্বপ্রকৃতিতে যা ঘটছে, তা তটস্থ পুরুষের উদাসীন দৃষ্টির সামনেই ঘটছে না, ঘটছে মহেশ্বর পুরুষের অবন্ধ্য প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রেরণায়। তাঁর দৃষ্টি শুধু তটস্থ সংবিৎ নয়, তা 'জ্ঞানময়ং তপঃ'। সেই তপোবীর্য নিহিত আছে প্রকৃতির গহন গভীরে, এবং তাইতে তার ঊর্ধ্ব-পরিণামের প্রবর্তনা সিদ্ধ হচ্ছে। প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া তাই অন্তর্গূঢ় চিদ্-বীজের অঙ্কুরণের তপস্যা—এ যেন তপঃক্ষামা উমাকুমারীর কুমারসম্ভবের স্বপ্ন। পারার্থ্যবাদের এই হল পরম তাৎপর্য। সাধনজীবনে তা-ই আনে পুরুষের মুক্তির সঙ্গে প্রকৃতিরও রূপান্তরের প্রবেগ। মায়াবাদের বা লীলা-বাদের তটস্থ ঔদাসীন্য তখন চিৎশক্তির অবন্ধ্য বিচ্ছুরণের অনুভবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আগাগোড়া জগদ্ব্যাপারের তখনই একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে আর মায়া বলে উড়িয়ে দেবার প্রয়োজন থাকে না।

এইবার মায়াবাদ-সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রগুলিকে একজায়গায় বিনিয়ে আনা যাক।

ব্রহ্মসম্পর্কে জগৎসম্পর্কে এবং জীবসম্পর্কে মায়াবাদের সিদ্ধান্ত হতে তার দৃষ্টির ত্রুটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ জগৎকারণ অর্থাৎ ব্রহ্মে আছে সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তি। চারটি আলাদা হয়ে নাই, আছে অখণ্ড একরস হয়ে—নতুবা অদ্বৈতচেতনা সিদ্ধ হয় না। মায়াবাদ ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মসদ্‌ভাবের অনুভবের 'পরে জোর দেয়—কিন্তু নেতিবৃত্তির প্ররোচনায় সত্তায়-চৈতন্যে এবং সত্তায়-শক্তিতে বিরোধের সৃষ্টি করে। প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বৈতাশ্রিত, তাতে এ-বিরোধ সম্ভাবিত হলেও অদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্যে তা অসম্ভব।

(২) মায়াবাদ বলে : জগৎ অনিত্য, জগৎ দুঃখময়—অতএব অধ্যাত্ম-চেতনার তা নিশ্চিত নির্ভর হতে পারে না ; বলতে হয়, জগৎ অনাত্ম অবাস্তব বা মিথ্যা। জগৎসম্পর্কে এ-দর্শন সীমিত প্রাকৃত বুদ্ধির দর্শন ; অধ্যাত্ম-সাধনার গোড়াতে তার প্রয়োজন থাকলেও জগৎরহস্যের নিরপেক্ষ মীমাংসায় তা অচল। বস্তুকে যখন তার মৌল শক্তি বা ভাব হতে বিযুক্ত করে দেখি, তখন তাকে অনিত্য বলতে পারি বটে। কিন্তু শক্তি ও ভাব নিত্য আধার, তার মধ্যে বস্তুর উদয়-বিলয়কে শক্তি বা ভাবের অভিব্যক্তি-অনভিব্যক্তির ছন্দ-রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। শক্তি ও ভাবের দৃষ্টিতে তখন জগতের বিরুদ্ধে অনিত্যতার অভিযোগ টেকে না ; আর এ-দৃষ্টি প্রাকৃত দৃষ্টির চাইতে গভীরতর মনস্বিতার পরিচয়ও বহন করে।...দুঃখের অনুভবও মূঢ় প্রাকৃত চেতনাতেই সম্ভব। প্রবুদ্ধ চেতনা জগৎকে দেখে ব্রহ্মের আনন্দময় বীর্যের প্রকাশরূপে।... জগতের মিথ্যাত্ববোধও এমনিতর কুণ্ঠিত প্রাকৃত বুদ্ধির সংস্কার হতে উৎপন্ন। জগৎ যদি শাশ্বত ব্রহ্মশক্তির চিদ্‌বিলাস হয়, তাহলে তা মিথ্যা নয়।

(৩) 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই সিদ্ধান্তের ফলে মায়াবাদ জীবের জীবনে ফেলে নৈষ্কর্ম্যবাদের ছায়া। কর্মকে তখন মনে হয় বন্ধন বলে, বুদ্ধি জীবন-সমস্যার সমাধান খোঁজে জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে, প্রকৃতির দ্বন্দ্বাহ্বানকে বীরের মত স্বীকার না করে কুরুক্ষেত্র হতে নিষ্ক্রমণের পথটাকেই মনে করে শ্রেয়স্কর।

প্রাকৃত জীবনের 'পরে মায়াবাদের এই প্রভাব খুব স্বাস্থ্যকর হয় না। অথচ মায়াবাদেরও একটা সত্যকার জোর আছে—অধ্যাত্মসাধনার তুঙ্গভূমিতে নির্বর্ণতার অনুভবের মধ্যে। স্থিতিকে জীবনের ভিত্তি না করলে গতিতে

শক্তি ও ছন্দ আবিষ্কৃত হয় না, একথাও সত্য। কিন্তু স্থিতির প্রতি একান্ত পক্ষপাতবশত গতিকে অস্বীকার করাও তো সম্যক্-দর্শন নয়। আকাশ-উজানী চেতনা গঙ্গোত্রী হতে আবার সাগরসঙ্গমে নেমে এলেই সাধনার পূর্ণতা।

মোটের উপর মায়াবাদ একাঙ্গী দর্শন। অধ্যাত্ম-অনুভবের ভিত্তিতে জগন্মিথ্যাত্ববাদের উপস্থাপনাই তার সবচাইতে বড় কীর্তি। অবাস্তবতার প্রশ্নটা এইখানেই ওঠে। কিন্তু আমরা দেখেছি, অবাস্তবতার সমস্যাটা আসলে প্রতীতিকে আশ্রয় ক'রে, বস্তুকে আশ্রয় ক'রে নয়। জগৎসম্পর্কে বিভ্রমটা আমাদেরই মনে, জগতের গোড়ায় নয়।

এই মনের ভুলকে বলি অবিদ্যা। জগৎসম্পর্কে ব্রহ্ম ভুল করছেন না, আমরাই ভুল দেখছি—আমরা অবিদ্যাগ্রস্ত। তখন প্রশ্ন হয়, এই অবিদ্যার স্বরূপ কি, নিদানই-বা কি। জগৎরহস্যের চেয়ে জীবনসমস্যার সমাধানটাই তখন বড় হয়ে ওঠে এবং সেই পথে জগৎরহস্যেরও হদিশ মেলে।

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যা ও অবিদ্যা

দেখলাম, মায়াবাদের মধ্যে আছে একটা দৃষ্টির দ্বৈত—এক অখণ্ড ব্রহ্মসত্তাকে পরস্পর-বিরোধী দুটা তত্ত্বে ভাগ-ভাগ করে দেখা। তাইতে জীবের চেতনায় ভাসে একদিকে ব্রহ্ম, আরেকদিকে জগৎ; মনে হয়, ব্রহ্ম যদি সত্য, তাহলে জগৎ মিথ্যা। অথচ এদিকে মানতে হচ্ছে, এ-জগৎ এসেছে ব্রহ্ম হতেই, শূন্য হতে নয়। সুতরাং মিথ্যা জগতের কারণ হলেন সত্য ব্রহ্ম। কি করে এ সম্ভব হল, তা বোঝা যায় না। তাই একে বলি মায়ার খেলা। এই হল মায়াবাদের মূল সুর।

কিন্তু প্রপঞ্চের ওপারে যে-সত্যব্রহ্মকে খুঁজছি, তিনি নির্গুণ না সগুণ? গোঁড়া মায়াবাদী বলবেন: তিনি নির্গুণ; তাঁকে জগৎকারণ বলতে গিয়ে যদি তাঁর সগুণভাব স্বীকার করতে হয়, তাও ওই মায়ার এলাকাতেই পড়ে। ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণ হলে জগৎও নিতান্তই মিথ্যা; জীবনেরও তাহলে নিজস্ব কোনও অর্থ নাই। সংসারে বারবার আসা শুধু দুঃখভোগের জন্য; জন্ম জরা ব্যাধি আর মৃত্যুতে জৈব-পরিণামের একটা চক্রাবর্তন চলছে, তা-ই দুঃখের হেতু। এই হল জীবনের রূপ, জগতেরও এই তত্ত্ব। একে আঁকড়ে থাকার কোনও অর্থ আছে?

কিন্তু সগুণে-নির্গুণে বিবাদটাকে সবাই অত সঙিন করে তোলেন না। অক্ষুব্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের গভীরে কেউ-কেউ অনুভব করেন শক্তির উল্লাসে টলমল এক আনন্দের পারাবার—সেই আনন্দ হতেই এ-জগৎ। এ-জগতের দুঃখকে ছাপিয়ে আছে ব্রহ্মের আনন্দ। একের হৃদয়ে যদি সে-আনন্দ জেগে থাকে জীবনের প্রমুক্তিতে, তাহলে বহুর হৃদয়েও কেন জাগবে না? এই পৃথিবীর বুকে অমরাবতীর স্বপ্ন কেন সত্য হবে না?

কত বড় আশা আর আশ্বাসের কথা। কিন্তু তবুও নিত্য-অনুভূত বর্তমানের দিকে তাকিয়ে তেমন ভরসা পাই না। ঘুরে-ফিরে সেই একই প্রশ্ন মনে জাগে: জগৎ যদি ব্রহ্মের আনন্দের উল্লাস, তাহলে এখানে এত দুঃখ কেন? সৃষ্টির মূল যদি আলো, তাহলে এখানে আঁধার এল কোথা হতে?

এই দুঃখ আর অন্ধকারকে 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দেবারও উপায় নাই।

অনুভূতিতে একবার যা এসেছে, তার একটা তাত্ত্বিক সত্তা আছে—একথা মানতেই হবে। কিন্তু বস্তুর সত্তার সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে—বস্তুর মূল্যমানের (evaluation) প্রশ্ন। একটা-কিছুর নিরপেক্ষ সত্তাই সবচাইতে বড় কথা নয়। আমার জীবনে তার মূল্য কি, সে আমার ইষ্টার্থ কি না, সেকথাটা তার চাইতেও বড়। এইদিক থেকে দেখি, জীবনে দুঃখের চাইতে আনন্দের মূল্য বেশী; কেননা দুঃখ আমার ইষ্টার্থ নয়—আনন্দই ইষ্টার্থ। যা ইষ্টার্থ, আজ তাকে হাতের কাছে না পেলেও তাকে পাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য। আবার যা লক্ষ্য, তার সিদ্ধসত্তা কোথাও চরম ও পরম হয়ে আছে একথা মানতেই হবে, নইলে মিছামিছি আমরা আলেয়ার পিছনেই-বা ছুটব কেন? অতএব লক্ষ্যের পক্ষে যা বাধা, তার সত্তাকে লক্ষ্যের সত্তার চাইতে খাটো বলতেই হবে। লক্ষ্য পারমার্থিক সত্য, বাধা আপেক্ষিক সত্য; আনন্দ পরমার্থ, দুঃখ গৌণার্থ। যা গৌণ তাকেই যদি মুখ্য বলে ধরি, তাহলে সেটা আমাদেরই বুদ্ধির দোষ।

এই বুদ্ধির দোষকে বলি অবিদ্যা। আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়ে আছি বলেই দুঃখ পাচ্ছি। ওই দুঃখের পিছনে, এমন-কি তারই গভীরে আনন্দের বৃহত্তর ও গাঢ়তর সত্তা যে জলজল করছে তা দেখতে পাচ্ছি না—সূর্যের দীপ্তির চাইতে সৌরকলঙ্কের কল্পিত কালিমাটা আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। দুঃখের হেতুকে আমাদের অনুভবের দৈন্য ও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে না খুঁজে খুঁজতে যাই বাইরে—তাকে দেখি জগতের মূলে এবং সেইসূত্রে ব্রহ্মের মধ্যে। কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের পরমার্থ বলে ন্যায়ত তাঁর মধ্যে দুঃখের আরোপ করতে পারি না, তাই দুঃখের জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজি। কিন্তু আগেই দেখেছি, মায়ার ফাঁকি যদি কোথাও থেকে থাকে তো আছে আমার ব্যষ্টিচেতনার মধ্যে, আমার অহংএর মধ্যে—জগতের মূলেও নয়, ব্রহ্মের স্বভাবেও নয়। আমার অবিদ্যাতেই জগৎ দুঃখের হয়েছে আমার কাছে। সেটা জগতের দোষ নয়, ব্রহ্মেরও কারসাজি নয়।

অতএব জগৎ- ও জীবন-সমস্যার সমাধান করতে হলে এই অবিদ্যার তত্ত্বকে আমাদের খুঁটিয়ে জানতে হবে। জীবের ব্যষ্টিচেতনায় কি করে তার উদ্ভব হয়, ব্রহ্মের সমষ্টিচেতনার সঙ্গেই-বা তার সম্পর্ক কি, তা বুঝতে হবে।

দার্শনিকেরা হয়তো বলবেন: অবিদ্যা এক অনাদি রহস্য, তার তত্ত্ব পাওয়া ভার; তুমি অবিদ্যার মধ্যে থেকে অবিদ্যাকে জানবে কি করে?…

অবশ্য একদিক দিয়ে দেখতে গেলে একথার জবাব নাই। অবিদ্যার সৃষ্টি যে-মন, তাকে. দিয়ে অবিদ্যার রহস্যের কূল পাওয়া যাবে না সত্যি। জীবনচেতনার কোনও গোড়ার কথারই মীমাংসা বুদ্ধির খণ্ডদৃষ্টিতে হবার নয়। তার জন্য জীবনকে উজিয়ে বোধির অখণ্ডদৃষ্টির আশ্রয় নিতেই হয়। তাবলে কিছুই জানা যায় না ভেবে তো মানুষ চুপ করে বসে থাকতেও পারে না। জানবার তপস্যা তাকে করতেই হয়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার মত অবিদ্যা দিয়ে অবিদ্যার রহস্যের সমাধান খুঁজতে হয়। তার এ-সাধনা ব্যর্থও হয় না; কেননা অবিদ্যার মধ্যে যে বিদ্যার সংবেগ প্রচ্ছন্ন আছে, অজানার অন্ধকারকে জানার ঊষালোকে সে-ই তরল করে আনে। আমরা সে-চেষ্টাই এবার করব।

এদেশের চিন্তাধারায় অবিদ্যার আক্ষরিক অর্থের একটা ইতিহাস আছে। মোটামুটি সে-ইতিহাসের তিনটি পর্ব—বেদের যুগে, উপনিষদের যুগে আর দর্শনের যুগে। এই তিনটি যুগের ভিতর দিয়ে এদেশের দার্শনিক চেতনা ক্রমশ বোধি থেকে বুদ্ধির দিকে নেমে এসেছে, অখণ্ড সমগ্র দর্শনের জায়গায় ক্রমে দেখা দিয়েছে বিবেকদর্শনের খণ্ডভাবনা। সেইসঙ্গে মায়া এবং অবিদ্যা এ-দুটি সংজ্ঞার অর্থেরও তারতম্য ঘটেছে।

সংহিতার ঋষি বিদ্যা আর অবিদ্যা না বলে বলেছেন 'চিত্তি' এবং 'অচিত্তি'। চিত্তি হল অখণ্ডসত্যের উদার দর্শন—বহুকে একের মধ্যে দেখা যুগপৎ গুটিয়ে নিয়ে এবং ছড়িয়ে দিয়ে, একই কালে সত্তার গভীরতা বিস্তার আর তুঙ্গতার তিনটি মানে (demension)। এমনি করে দেখার অসামর্থ্য হল 'অচিত্তি'। তা-ই বৃত্রের 'অদেবী মায়া'। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে দেবতার দেবমায়া। সে-মায়া কুহকিনী নয়—সে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপিণী, বিশ্ববিসৃষ্টির চিন্ময়ী গঙ্গোত্রী। এই উদার দর্শনের মধ্যে একটুখানি সঙ্কোচের আভাস দেখা দিল উপনিষদের যুগে। বিদ্যা আর অবিদ্যা শব্দের ব্যবহার তখন থেকে। উপনিষদের বিদ্যা হল একের জ্ঞান, আর অবিদ্যা বহুর জ্ঞান। তবুও সেখানে বিদ্যাতে আর অবিদ্যাতে একে আর বহুতে বিরোধটা উগ্র হয়ে ওঠেনি। দুয়ের মাঝে একটা সমন্বয়ের ভাবনা, জগৎকে ব্রহ্মের আত্মবিসৃষ্টি বলে জানা—এই হল ঔপনিষদদর্শনের মূল সুর।

কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যাতে বিরোধ পাকা হয়ে দেখা দিয়েছে পরবর্তী দর্শনের যুগে। সেখানে যুক্তির আসর দখল করে বসেছে. বোধি নয়—মন। তার কাছে বিদ্যা শুধু বিদ্যাই, অবিদ্যা শুধুই অবিদ্যাই। অবিদ্যা বিদ্যার বিরোধী একটা নিরেট তত্ত্ব, শুধু তার সঙ্কোচ নয়। সেই অবিদ্যা হতে এ-জগতের সৃষ্টি। অবিদ্যার সৃষ্টি অবাস্তব, তাই জগৎ মিথ্যা। সত্য শুধু ব্রহ্ম। তিনি প্রপঞ্চের অতীত। অদ্বৈত দ্বৈতকে জড়িয়ে নয়, তার ওপারে।

দেখতে পাচ্ছি, সংহিতায় অবিদ্যাকে দেখা হয়েছে একটা অখণ্ড দৃষ্টি নিয়ে। সেই দৃষ্টি উপনিষদে যদি-বা বিশিষ্ট হয়েছে, দর্শনে তা হয়েছে খণ্ডিত। অবিদ্যা যে বিদ্যার বিরোধী, এই কথাটা সেখানে চুলচেরা নানা তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনও অধ্যাত্মসত্যের নিরূপণ কখনও তর্কের দ্বারা হয় না। তার জন্য ডুবতে হয় চেতনার গভীরে, অন্তর্দৃষ্টিকে শোধন করে নিতে হয় পক্ষপাতহীন সমগ্র দৃষ্টির ঔদার্য দিয়ে।

স্বভাবতই অবিদ্যার নিদান খুঁজি আমরা মনে, কেননা চেতনার মনোময় রূপটিই আমাদের চেনা। তাইতে বলি, মনই অবিদ্যার জননী; কিংবা মন অবিদ্যার গর্ভাশয়, তার বীজ আসে মায়া থেকে। ব্রহ্ম যে-শক্তিতে নিজের 'পরে নাম-রূপের আরোপ করেন, তা-ই মায়া; আর নাম-রূপকে সত্য বলে গ্রহণ করে যে-শক্তি, তা-ই মন।...অবিদ্যা যে মনের এলাকাতে দেখা দেয়, মনের সঙ্কীর্ণ দ্বৈতদৃষ্টিতে যে তার স্ফুট পরিচয় মেলে, একথা মানতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এই মনকেই যদি বিশ্বমূল বলে ধরা হয়, আর বলা হয় অবিদ্যা মনের শক্তিরূপে সৃষ্টির গোড়ায় প্রবর্তনার কাজ করছে, তাহলে আমাদের আপত্তি আছে। কেন তা বলছি।

আগেই বলেছি, সৃষ্টির গোড়ায় যে-শক্তি কাজ করছে, তা আমাদের মন নয়। মন নিজে সৃষ্ট পদার্থ, স্রষ্টা নয়। ব্রহ্মের শক্তিই সৃষ্টির মূলে; কিন্তু সে-শক্তির ব্যাপার (function) আর মনের ব্যাপার এক পর্যায়ের নয়। ব্রহ্মের এই শক্তিকে বৈদিক ঋষির মত মায়া বলতে পারি; কিন্তু আমাদের মন যেভাবে কাজ করে, ব্রহ্মের মায়াশক্তি সেভাবে কাজ করে না। আমাদের মন অজ্ঞান, অশক্ত, বিধুর; কিন্তু ব্রহ্মের মায়া সর্বচিৎ, সর্বকৃৎ, উল্লাসময়ী। ব্রহ্মের মায়া বা অতিমানস হতে বিশ্বের সৃষ্টি এবং তারই প্রবর্তনায় বিশ্বের এক বিশেষ পর্বে প্রাকৃতমনের উদ্ভব। এই মনের আদর্শে ব্রহ্মের মায়াশক্তির স্বরূপ কল্পনা করা প্রচলিত মায়াবাদের এক মারাত্মক ত্রুটি। ব্রহ্মের মায়া

জ্ঞানশক্তি, আমাদের মন জ্ঞানের সাধন—জানবার জন্য সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ব্রহ্মের মায়াতে আছে সত্যসঙ্কল্পের অমোঘ সংবেগ, আর আমাদের মনের কল্পনা অসিদ্ধ কৃচ্ছ্রসিদ্ধ বা কচিৎসিদ্ধ সৃষ্টিশক্তির পঙ্গুতার নিদর্শন মাত্র। এই মনের কুণ্ঠাকে ব্রহ্মে আরোপ করে তা-ই দিয়ে সৃষ্টিরহস্যের মীমাংসা করতে যাওয়ার কি গলদ, মায়াবাদের আলোচনায় তা আমরা দেখেছি।

এইজন্য প্রাকৃত ভূমিতে থেকে অবিদ্যাকে যদি-বা সামান্যত বলতে পারি মনের মায়া, মনকে কিন্তু তার উৎস বলতে পারি না। আসলে মন নিজেই রয়েছে অবিদ্যার এলাকায়। আর মন যেমন দেখা দিয়েছে অতিমানসের অন্ত্যবিভূতিরূপে, অবিদ্যাও তেমনি ফুটেছে বিদ্যাশক্তির একটা বীর্যরূপে—সৃষ্টিব্যাপারের বিশেষ প্রয়োজনে। অবিদ্যার যে-অংশটুকু প্রতীতিমাত্র, মন কেবল সেইটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কিন্তু তার যা বস্তুশক্তি, তার রহস্য বুঝতে গেলে মনের এলাকা ছাড়িয়ে যেতে হবে বিজ্ঞানভূমিতে—যেখানে অবিদ্যার প্রবর্তনার মূল।

বিজ্ঞানভূমি এক অখণ্ড অদ্বয়চেতনার ভূমি। সেখানে দেখা যায় একই সত্তার দুটি মেরু—তার সুমেরুতে অতিচেতনা আর কুমেরুতে অচিতি। প্রাকৃত চেতনার কাছে দুটিই অব্যক্ত। দুটি অব্যক্তের মাঝে ব্যক্তের যে ক্রমিক স্ফুরণ, প্রাকৃত চেতনা তার একটি অংশের মাত্র খবর রাখে। আমাদের দৃষ্টিশক্তি যেমন বর্ণালির সীমায় বাঁধা—তার একটি প্রান্ত বর্ণপূর্ব, আরেকটি বর্ণোত্তর—প্রাকৃত চেতনার শক্তিও তেমনি চিৎশক্তির দুটি উপান্তের মাঝে আটকা পড়েছে। কিন্তু চেতনা অশক্ত নয়, তার মধ্যে আত্মস্ফুরণের একটা বেগ আছে। রাতের আঁধার তরল হয়ে দিনের আলো ফোটে যেমন, তেমনি অচিতির মূঢ়তা ক্রমে উন্মেষিত হচ্ছে অতিচিতির লোকোত্তর দীপ্তির দিকে। এই-যে উন্মেষের বেগ, তা-ই হল অবিদ্যার প্রাণ। সুতরাং অবিদ্যা আসলে হল বিদ্যার বীর্যময় তপস্যা, শুধু তার স্থাণু প্রতিষেধ নয়।

'আলো আঁধার নয়, আঁধার আলো নয়'—এটা বোঝা সহজ। এ হল বুদ্ধির জড়দৃষ্টি। কিন্তু আলো-আঁধারের অন্যোন্যসম্বন্ধের সকল রহস্য এই সূত্রে ধরা পড়ে না। 'আঁধার আলো হয়ে উঠছে' যদি বলি, তাহলে আলো আর আঁধারকে পরস্পরের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। আঁধারের মূলেও আলোর বীর্য কাজ করছে, একথা তখন

মানতেই হয়। 'আঁধার আলো নয়' এই উক্তির ন্যূনতা তখন পূরিত হয় 'আঁধার আলো হচ্ছে' এরই সূচনায়।

বিদ্যা আর অবিদ্যার সম্পর্কও তেমনি। প্রাকৃত জগৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু তাবলে এ-অবিদ্যা অসাড় নয়, কিংবা অনন্তকাল ধরে একই ধাঁচের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে তাও নয়। অবিদ্যার মূলে আছে বিদ্যার বেগ। তাইতে তার মধ্যে ফুটছে ক্রমবিকাশের একটা ছন্দ, অবিদ্যা ধীরে-ধীরে বিদ্যা হয়ে উঠছে। অবিদ্যার মধ্যে বিদ্যাই রয়েছে অনতিব্যক্ত ভ্রূণ হয়ে। অবিদ্যার তত্ত্ব নিরূপণ করতে হবে ওই ভ্রূণের প্রাণস্পন্দ দিয়ে। এখানে বিদ্যাশক্তিই মুখ্য, অবিদ্যা তার গৌণ সাধন মাত্র।

আমাদের মধ্যে অবিদ্যা দেখা দিয়েছে মনের মায়া হয়ে, আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে। কিন্তু এই মায়া বা দ্বন্দ্ববোধ বিশ্বের একমাত্র সত্য নয়। আলোই সত্য। কিন্তু তার সত্যের দুটি রূপ—এক তার স্বরূপসত্য, আরেক তার হওয়ার সত্য। যেখানে শুধু আলো, সে হল স্বরূপসত্য; যেখানে আঁধারকে তরল করে আলো ফুটছে, সেখানে তার হওয়ার সত্য। দুটি মিলিয়ে বলতে পারি, সবই আলোর ব্যাপার—এমন-কি যেখানে আপাত-আঁধার সেখানেও। সবটাই 'আঁধারের ব্যাপার' একথার কোনও অর্থ হয় না—বিশেষত দেখছি যখন আদিত্যমণ্ডল হতে, দিন-রাত্রির আবর্তনের উর্ধ্বে থেকে।

এই অর্থে বলা চলে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাঁর দেবমায়া বা বিদ্যাশক্তি একমাত্র শক্তি। এই শক্তির ব্যাপারের দিক থেকে দেখলে সত্য ব্রহ্মের বিরোধী একটা মিথ্যা জগৎ দাঁড় করাবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মই সব; অতএব জগৎও ব্রহ্ম, জগৎও সত্য। অচর ব্রহ্ম আর চর ব্রহ্ম, কিন্তু একই ব্রহ্ম—এই অখণ্ড জ্ঞান হল বিদ্যা। বিদ্যাতে সব ভাসছে—অচর এবং চর দুয়েরই জ্ঞান। অবিদ্যাও ভাসছে এই বিদ্যাতে।

বিদ্যা আর অবিদ্যা একই আদিত্যচেতনার ছায়াতপের সুষমা।

অষ্টম অধ্যায়

অবিদ্যা স্মৃতি ও অহন্তা

যখন ব্রহ্মের দিক থেকে দেখি, তখন এই হল অবিদ্যার তত্ত্ব : সে বিদ্যার একটা সংবেগ বা তপস্যা। বিশ্বব্যাপারে এই তপঃশক্তির সার্থকতা কোথায়, তা আমরা পরে দেখব। তার আগে দেখা যাক, আমাদের প্রাকৃতচেতনায় অবিদ্যাশক্তি কিভাবে কাজ করছে।

অবিদ্যার দুটি অর্থ হতে পারে—না জানা, আর খানিকটা জানা। বস্তুত প্রাকৃত চেতনার বেলায় অবিদ্যার এই শেষের অর্থই খাটে। মন হল সে-চেতনার মুখ্য করণ বা সাধন। মন যে কিছু জানে না, তা নয়। অনেক-কিছুই সে জানে, অথচ পুরাপুরি কোনটাই জানে না—যদিও তার জানবার আগ্রহের শেষ নাই। এই যে একটুখানি জানাকে পুরা করবার একটা অবিচ্ছেদ প্রয়াস, এই হল মনের মধ্যে অবিদ্যাশক্তির ক্রিয়া। তার একটা প্রবেগ আছে। আসলে সে জীবধর্মী।

জানার জগৎ দুটা—বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ। কিন্তু সর্বত্র জানার একটা মৌলিক ধরন—বিষয়কে সত্যি-সত্যি আত্মসাৎ করা। বাইরের বিষয়কেও আমরা জানতে গিয়ে ভিতরে টেনে আনছি, তার ফলে অন্তর্জগতের প্রাণস্পন্দকে দ্রুত বা মন্থর করছি। তাইতে আমাদের আমিত্বের পুষ্টি হচ্ছে, আহারে যেমন দেহের পুষ্টি হয় তেমনি করে।

জানার সাধনা তাহলে বস্তুত আত্মভাবের পুষ্টির সাধনা। আমরা একটু-একটু করে জানছি—জ্ঞানশক্তির হজম করবার সামর্থ্য অনুযায়ী। জেনে ক্রমে পুষ্ট হচ্ছি, বৃহৎ হচ্ছি—অহংএর ছোট্ট একটি অঙ্কুর আত্মভাবের বনস্পতি হয়ে উঠছে তিলে-তিলে। বিদ্যাশক্তির আশ্রিত থেকে এই হল আমাদের জীবনে অবিদ্যার কাজ।

এই কাজটি করতে অবিদ্যাকে কতগুলি নিমিত্ত বা সাধনের আশ্রয় নিতে হয়। একটা মুখ্য সাধন হল ইন্দ্রিয়সংবিৎ (sensation)—ইন্দ্রিয় দিয়ে সাক্ষাৎ-ভাবে বাইরের জগৎকে জানা। এই জানাতে ভিতরটাও সাড়া দেয় এবং তার ফলে একটা অস্ফুট বা স্ফুট আত্মসংবিৎও জাগে আমাদের মধ্যে। ইন্দ্রিয়-সংবিৎ আর আত্মসংবিৎ দুটি মিলিয়ে আত্মভাবের পুষ্টি।

কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়সংবিতের আয়ু আর কতটুকু? বলতে গেলে বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখা দিয়েই সে মিলিয়ে যায়। বাইরের জগতে বা অন্তর্জগতে যে শক্তির স্পন্দন, তাও বিদ্যুৎ-চমকের মত—ক্ষণে-ক্ষণে সে জ্বলছে নিবছে আবার জ্বলছে। এই 'ক্ষণভঙ্গ' অস্তিত্বের একটা দিকের নিরেট সত্য। তাতে আমাদের চেতনার পরদায় অবিরাম চাঞ্চল্যের ফুট কাটছে।

অথচ এই চাঞ্চল্য বস্তুর বা বোধের সবটুকু নয়। একটা স্থায়িত্বের ভিত্তি যে তার আছে, এও অস্বীকার করবার উপায় নাই। নইলে বাইরের জগতে বা অন্তর্জগতে কিছুই দানা বাঁধত না, সব-কিছুর স্বরূপ হত শূন্যতা। একটা গাছ দেখছি: সত্য বলতে ক্ষণে-ক্ষণে তার রূপ বদলাচ্ছে, সুতরাং প্রতিক্ষণে একই গাছ দেখছি না। অথচ এই দেখার একটা ধারাবাহিকতা আছে, গাছের একটা ইতিহাস আছে। তেমনি আমার ভিতরের আমিটা প্রতি-মুহূর্তে বদলালেও তার একটা ধারাবাহিকতা আছে।

একদিকে ক্ষণভঙ্গ, আরেকদিকে ধারাবাহিকতা—দুয়ের মাঝে যা সংযোগসাধন করছে, তা-ই হল স্মৃতি। প্রতিমুহূর্তে জানার বা হওয়ার যে-স্পন্দন, পরমুহূর্তে তা মিলিয়ে গেলেও তার একটা সংস্কার থেকে যায়। যা বাস্তব, যা এইক্ষণে বর্তমান, সংস্কার যেন তাকে ভাবময় করে কালিক ঘটনার খানিক উর্ধ্বে নিয়ে যায়। চেতনার ভাণ্ডারে অভিজ্ঞতার কিছু পুঁজি রইল, দরকারমত তাকে বের করে দেওয়া—এই হল সংস্কারের কাজ। স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে তার মূলে পাই সংস্কার। সংস্কারের মূলে কি অর্থাৎ কেন একেক জীবচেতনায় একেকধরনের সংস্কার উৎপন্ন হয়, তা খুঁজতে গিয়ে পাই বাসনাকে। বাসনারও গোড়ার কথা হল অবিদ্যা। আর এই অবিদ্যার গোড়ায় আছে একের বহু হওয়ার প্রবেগ।

ব্যাপারটা এই। এক অখণ্ড অদ্বয়চেতনা নিজের শক্তির বেগে স্পন্দিত হয়ে বহু খণ্ডচেতনায় রূপ নিচ্ছে। উপনিষদের ঋষি উপমা দেন, 'জ্বলন্ত আগুনের ফুলকির মত।' বহু হতে গেলে একের সঙ্গে অপরের ভেদ ঘটা অনিবার্য। আবার জ্ঞানের ও শক্তির চারদিকে একটা সীমার কুণ্ডলী না রচলে ভেদ সিদ্ধ হতে পারে না। একই জ্ঞান একই শক্তি, অথচ আধারভেদে তার খানিকটা ব্যক্ত বাকীটা অব্যক্ত। বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিশেষ-বিশেষ শক্তি ও চেতনার প্রকাশ (অথচ মূলে সেই এক)—এই হল বহুর জগতের চেহারা। প্রত্যেক ব্যক্তিতে তার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলবার যে একরোখা

একটা সংবেগ, তা-ই হল অবিদ্যাশক্তি। সেই শক্তিতে ফুটছে বিশিষ্ট জীববাসনা বা 'অভিমান'—'আমি এই হব' এমনতর একটা আকূতি। এই বাসনা বা অভিমান হতেই সংস্কারের উৎপত্তি। তার কাজ চেতনার বিশেষ প্রেরণা অনুযায়ী শক্তির ক্ষেত্র থেকে আত্মগঠনের অনুকূল উপাদান বাছাই করে নেওয়া। জগতের অনন্ত শক্তিতরঙ্গ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি কিন্তু তার প্রত্যেকটাতে সাড়া দিচ্ছি না। দিচ্ছি আমার সংস্কার অনুসারে, আমার অন্তরাত্মা যা হতে চায় সেই নিগূঢ় বাসনা অনুসারে। এই যে বিশেষের দিকে আমার একটা ঝোঁক সৃষ্টি করা, তা-ই হল অবিদ্যাশক্তির কাজ।

বিশেষ একটা-কিছু গড়ে তুলতে হলে আরেকটা জিনিস চাই—পৌনঃপুনিকতা বা অভ্যাস। যা গড়তে চাই, তা একেবারে গড়ে তুলতে পারি না—গড়ি তিলে-তিলে। দীর্ঘ সাধনায় অস্পষ্ট আদরাটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—রঙের উপর রঙের পোঁচ দিতে-দিতে। এমনি করে বারবার পোঁচ দেওয়ার ব্যাপারে স্মৃতির দরকার হয়। শক্তির ক্ষেত্র হতে সংস্কার অনুসারে আমরা অভিজ্ঞতার উপাদান বাছাই করি, আর স্মৃতির সহায়ে বারবার তাকে অভ্যাস করে আত্মভাবের চেহারাটা স্পষ্ট করে তুলি। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে অবিদ্যার এলাকায়, তার বিশেষ একটা-কিছু গড়ে তোলবার ঝোঁক থেকে।

এই হল স্মৃতির নিদানকথা, অবিদ্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক। অবশ্য এটা স্মৃতির বাস্তব রূপ, এছাড়া তার একটা ভাবময় রূপও আছে। তার কথা পরে হবে।

নবম অধ্যায়

স্মৃতি অহন্তা ও স্বানুভব

আমাদের মন বস্তুমুখী, তাই সাধারণত আমরা স্মৃতি বলতে ঘটনার স্মৃতি বুঝি। কিন্তু সত্য বলতে আমাদের জীবনে বাইরের ঘটনাগুলি গৌণ; তাদের উপলক্ষ্য করে আমাদের ভিতরটা যে গড়ে উঠছে, সে-ই হল আসল কথা। স্মৃতিও আমাদের সাহায্য করছে এই আত্মপুষ্টির সাধনায়। এইদিক থেকে স্মৃতিকে আমরা আত্মস্মৃতি আর অনুভবের স্মৃতি—এই দুটি পর্যায়ে ফেলতে পারি। আত্মস্মৃতিতে আমাদের মধ্যে পুষ্ট হয় বিশুদ্ধ আমিত্বের বোধ; আর অনুভবের স্মৃতিতে আমাদের আত্মপ্রকৃতির ক্রিয়াগুলি সংহত হয়। অবশ্য দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আত্মস্মৃতির প্রসঙ্গ আগে তোলা যাক। তার ভূমিকাস্বরূপ বলতে হয় কালের কথা। কালকে আমরা অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই তিনটি পর্বে ভাগ করি। এর মধ্যে বর্তমানের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ, আমাদের চেতনাও তীব্র হয়ে উঠছে সেইখানেই। যদি দৃষ্টিকে অন্তরের দিকে ফিরিয়ে রাখি, তাহলে অনুভবের বৈচিত্র্য সত্তার গভীরে একটা একরস (homogeneous) প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়, এবং কালের ত্রিভঙ্গ গুটিয়ে আসে এক নিত্য-বর্তমানে। এই হল আমাদের 'শাশ্বত' আত্মবোধের ভিত্তি। প্রাকৃত ভূমিতেও তার একটা আভাস আমাদের চেতনার পিছনে জেগে থাকে বটে; কিন্তু চেতনার মোড় সেখানে বাইরের দিকে ফেরানো বলে একটা ভাবে স্থির না থেকে ঘটনার প্রবাহে সে ভেসে চলে। ঘটনাগুলি স্থির থাকছে না, অথচ তাদের একটা স্থায়িত্ব প্রয়োজন—কেননা বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতেই আমাদের আত্মবোধ গড়ে উঠবে। এই স্থায়িত্ববিধানের কাজটি করে স্মৃতি, একথা আগে বলেছি। যা চলে গেছে, তার সংস্কারকে বর্তমানের গরজে সে ফিরিয়ে আনে।

অতীতকে এমনি করে বারবার ফিরিয়ে আনার দুটি পরিণাম হতে পারে। প্রথমত, এতে অনুভবের সংস্কার পাকা হয় এবং তার ফলে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি ঘটে চেতনার বাইরের মহলে। অন্দরমহলে চেতনার গভীরে আরেকটি ব্যাপার ঘটে, যাকে বলতে পারি স্মৃতির

অন্তরঙ্গ পরিণাম। বিষয়ের জ্ঞান স্মৃতির সহায়ে যেমন পাকা হচ্ছে, তেমনি তাদের সবাইকে ধরে আছে যে-বিষয়ী বা অহংবোধ, তারও সংস্কার পাকা হচ্ছে ওই স্মৃতিতেই। আগেই বলেছি, প্রকৃতির অগুনতি শক্তিসংঘাতের মধ্যে সেই ঘটনাগুলি আমি বেছে নিই যাতে আমি রস পাই। অন্তরাত্মাকে এই রসের যোগানটি দিয়ে চলে স্মৃতি—যেমন অনুকূল অনুভবকে জাগিয়ে তুলে, তেমনি কখনও-কখনও প্রতিকূল অনুভবকেও চেতনার কাছে একটা দ্বন্দ্বাহ্বানের মত হাজির ক'রে। সুখ-দুঃখ দুয়ের মধ্যেই একটা নিগূঢ় রস আছে, যা আমাদের আত্মপুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। 'মধ্বদ' চৈত্যপুরুষ দুয়েরই মধু পান করে চলেছেন—বর্তমানকে কেন্দ্র করে সুখ-দুঃখ দুয়ের স্মৃতিতে জীবনের একটা পরিসর রচনা করা তাঁর ধর্ম। আবার বর্তমান বিন্দুটাও একটা ধ্রুব বিন্দু নয়। সে সামনের দিকে সরে-সরে একটা রেখার সৃষ্টি করছে। এই রেখাটা চলন্ত কালের রেখা, আর তার প্রত্যেক বিন্দুতে রয়েছে 'আমি'। কালের প্রতিটি ক্ষণ ভিন্ন, প্রতিক্ষণের অনুভবও ভিন্ন; কিন্তু অনুভবিতা 'আমি' আসলে এক, প্রতিটি ক্ষণে দেখা দিচ্ছে একই 'আমি'। 'একই আমি' এই বোধ আসছে একটা সূক্ষ্ম স্মৃতি হতে—আমার আত্মবোধের স্মৃতি হতে, যা বিষয়স্মৃতির পিছনে থেকে আমিত্বের সূত্রে তাদের গেঁথে চলেছে। এই হল স্মৃতির অন্তরঙ্গ পরিণাম।

কিন্তু এই-যে আমিত্বের প্রবাহ, যার দৌলতে কালের ক্ষণভঙ্গের মধ্যে শাশ্বতের একটা অন্তর্গূঢ় আভাস মিলল, তার গতি কতদূর? খুব বেশী নয়। স্পষ্টই দেখছি, আমার আমিত্ব একটা জীবনের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা। তার স্মৃতির দৌড়ও শৈশবের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছয় না, আরও পিছিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। অথচ আশ্চর্য, এই সীমিত অহংবোধকে ভিত্তি করে মানুষের মনে জেগেছে আত্মার অমরত্বের কল্পনা: আমি অনন্তকাল ধরে ছিলাম, অনন্তকাল ধরে থাকবও। এ-প্রত্যাশার ভিত্তি কি, এর কোনও সার্থকতা আছে কি না এই দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা পরে আমাদের করতে হবে—জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গে। আপাতত এইটুকু বলা চলে, আমাদের প্রাকৃত 'আমি' অমর নয়, হতে পারে না। তার স্মৃতি পঙ্গু। নিতান্ত বাইরের ঘটনার স্মৃতি দিয়ে একটা উপরভাসা আত্মবোধের ধারাবাহিকতা সে গড়ে তুলেছে—যার অনুভব অন্তর্মুখও নয়, সত্তার গভীরেও ডোবেনি। এ-আমি অবিদ্যার আমি। তারও গভীরে আছে বিদ্যার 'আমি'। অমরত্বের অপরোক্ষ অনুভবের একটা ছটা

সেইখান থেকে ঠিকরে পড়ে এই বাইরের 'আমি'র 'পরে। তা-ই প্রাকৃত জীবে ধরে জীবনতৃষ্ণার রূপ। অমরত্বের কল্পনা এই তৃষ্ণার তির্যক অভিব্যক্তি।

অথচ প্রাকৃত স্মৃতি যে একটা স্থায়ী আত্মবোধ গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে, তাও কিন্তু নিরর্থক নয়। যথার্থ আত্মবোধ হল কালাতীত শাশ্বত—তা-ই হল বিদ্যার আমির মর্মকথা। আর ক্ষণভঙ্গের মধ্যে অবিদ্যার আমি এই-যে একটা শাশ্বত আত্মবোধ গড়ে তুলতে চাইছে অনবরত, এ হল তার ওই বিদ্যার মধ্যে পৌঁছবার তপস্যা। কালাতীতও যেমন সত্য, কালও তেমনি সত্য। কাল হতে কালাতীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা হল অবিদ্যার সাধনা। এই অবিদ্যার সাধনায় যদি মৃত্যুকে আমরা পেরিয়ে যেতে পারি, তাহলেই বিদ্যার দ্বারা অমৃতকে লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। উপনিষদের ঋষি তাই বিদ্যাকে এবং অবিদ্যাকে, কালাতীতকে এবং কালকে একসঙ্গে জানাই বলছেন সম্যক্ বিজ্ঞান। মায়াবাদ এবং শূন্যবাদের মধ্যে কালকে বর্জন করে কালাতীতে পৌঁছবার যে-সঙ্কেত আমরা পাই, তা সাধনার একটা দিক মাত্র। কালাতীত অমৃতত্বের সম্ভোগকে আপূরিত করতে হবে কালগত অমৃতত্বের সম্ভোগদ্বারা ; নিত্যস্থিতির সঙ্গে নিত্যগতির, শিবের সঙ্গে শক্তির সামরস্যসাধনার দ্বারা ঘটাতে হবে প্রজ্ঞা এবং বীর্যের পূর্ণতা। একমাত্র অতিমানস-বিজ্ঞানে তা সম্ভব। কেননা কাল হতে কালাতীতের দিকে উজিয়ে যাওয়ার ধারাটা মন হয়তো বোঝে ; কিন্তু ভাটিয়ে এসে কালের ক্ষণভঙ্গে কালাতীতের পরিপূর্ণ আবেশের শুদ্ধসত্ত্বময় উল্লাসকে আস্বাদন করা তার সাধ্য নয়।

আত্মস্মৃতির কথা হল, এইবার অনুভবের স্মৃতির কথায় আসা যাক। এখানেও কালের নিত্যতা আর ক্ষণভঙ্গের মাঝে অঙ্গাঙ্গিভাবের প্রসঙ্গ আবার তুলতে হয়। আগেই বলেছি, আত্মবোধ হল ভিতরের একটা অন্তরঙ্গ অনুভব, আর বিষয়ের অনুভব হল বহিরঙ্গ—যদিও উভয়ক্ষেত্রে অনুভবের ব্যাপারটা ঘটছে আমার মধ্যে। নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে আত্মবোধ যদি কালাতীত সত্তার অনুভবে জেগে ওঠে, তাহলে সাধারণত মনে হয় সেখানে বিষয়ের জ্ঞান থাকে না—আত্মার অনুভবে জগতের অনুভব লোপ পায়। কিন্তু বস্তুত বিষয়ের জ্ঞান সেখানেও থাকতে পারে—যদিও তা দেশে বিক্ষিপ্ত এবং কালে চঞ্চল বহিরঙ্গ জ্ঞান নয়, কিন্তু বিষয়ের শুদ্ধসত্ত্বের বা মর্মের বা তত্ত্বের

জ্ঞান। সে-জ্ঞানে বিষয়কে আর বিষয়ী হতে আলাদা বলে অনুভব হয় না। একেই বলে 'তাদাত্ম্যবিজ্ঞান' বা হয়ে জানা—একটু পরেই এর কথা আমাদের তুলতে হবে। এই তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের মধ্যে কাল যেমন গুটিয়ে এসে একটা স্থাণু নিত্যত্বের বোধ জাগায়, তেমনি আবার বিষয় আর বিষয়ীর অভেদ-বোধ থেকে ওই নিত্যের ভূমিকাতে একটা শক্তিস্পন্দের বোধও জাগে। এই শক্তির বোধে কালের নিত্যতা আর ক্ষণভঙ্গকে অনুভব করা যায় একই সত্তার দুটি দলরূপে।

এটি হল সমাধির অনুভব। কিন্তু ব্যুত্থানে এই অনুভব যেন দুভাগ হয়ে পড়ে—নিত্য-কাল ভূমিকারূপে পিছনে সরে যায়, আর তার সংস্কারকে আশ্রয় করে ক্ষণভঙ্গের নৃত্য চলতে থাকে চেতনার বহিরঙ্গনে। প্রাকৃত চেতনার মোড় ফেরানো বাইরের দিকে—উপনিষদের ভাষায় সে 'পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।' তাই সে দেখে ঘটনার চাঞ্চল্য। কিন্তু ঠিক সেইসময়ে চৈত্য-সত্তা ওই ঘটনার চাঞ্চল্যের মূলে অনুভব করে একটা 'অর্থের' স্থির ব্যঞ্জনাকে : নানান ছন্দে অনেক-কিছুই ঘটছে, কিন্তু সব-কিছু মিলিয়ে ঘটনা-সংঘাতের একটা অর্থও আছে। ঘটনা যদি পড়ে ক্ষণভঙ্গের এলাকায়, অর্থটা পড়ে নিত্যের এলাকায়। উপনিষদের ভাষায়, 'স্বয়ম্ভূ পুরুষ শাশ্বতকালের প্রবাহের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে ঠিক-ঠিক অর্থের বিধান করে চলেছেন' ; আর এমনি করেই নিত্যতা আর ক্ষণভঙ্গে যোগ এবং সামঞ্জস্য সাধন করছেন। ঘটনার চাঞ্চল্যের মধ্যে অর্থের আবিষ্কার করে চলেছে অবিদ্যা—বিদ্যাশক্তিরই নিগূঢ় প্রেরণায়। এই অর্থ-আবিষ্কারের কাজে স্মৃতি তার একটা প্রধান অবলম্বন।

শক্তির স্পন্দন যেমন বাইরে, তেমনি ভিতরে। মুহূর্তে-মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের ঘিরে কত-কী যে ঘটে যাচ্ছে তার লেখাজোখা নাই। এই অগুনতি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অন্তত আমার জীবনের একটা অর্থ-বিধানের প্রয়াস অহরহ আমার মধ্যে চলছে। গোটামুটি বলতে গেলে এই প্রয়াসের তিনটি সাধন—স্মৃতি কল্পনা আর ভাবনা। এর মধ্যে স্মৃতির কারবার অতীতকে নিয়ে, আর কল্পনা ভবিষ্যতের কারবারী ; স্মৃতি আর কল্পনার যোগান নিয়ে আত্মভাবের ইমারতকে একটা অর্থের আদর্শে মুহূর্তে-মুহূর্তে গেঁথে তুলছে আমাদের ভাবনা। আবার ভাবনার প্রধান সহায় হচ্ছে 'বিবেক' (discrimination), কিনা অনুভব থেকে অনুভবিতাকে আলাদা করবার শক্তি। অনুভব স্মৃতি হ'ক কল্পনা হ'ক বা বর্তমানের কোনও সংবিৎ হ'ক, আমি যদি চোখ

বুজে তার স্রোতে ভেসে চলি তাহলে ভাবনার কোনও কূলকিনারা থাকে না। কিন্তু যদি সাক্ষীর আসনে থেকে আমার অনুভবের দিকে নজর রাখি, তাহলে ভাবনার মধ্যে একটা শক্তি জেগে ওঠে, অনুভবের এলোমেলো ধারাকে সংহত করে অর্থের বিধান করা তখন সম্ভব হয়।

এই হল অনুভবের এলাকার মোটামুটি একটা ছবি। বিষয়-অনুভবের মূল লক্ষ্য যদি হয় অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে আত্মবোধকে পাকা করে তোলা এবং সেইসঙ্গে জীবনের একটা সুস্পষ্ট অর্থ আবিষ্কার করা, তাহলে আত্মস্মৃতি আর অনুভবের স্মৃতি দুয়েরই কাজ হবে একধরনের : অর্থাৎ কালের ক্ষণভঙ্গের দরুন যে-অনুভব সপ্রয়োজন হয়েও স্থায়ী হতে পারছে না, বারবার বর্তমানে ফিরিয়ে এনে অভ্যাসের দ্বারা তাকে স্পষ্ট এবং ধ্রুব করা; আর শক্তির বিক্ষেপের ফলে অনুভবেরও যে-বিক্ষেপ ঘটছে, তার মধ্যে একটি সংহতির সৃষ্টি করা। দুয়েরই লক্ষ্য হল অহংবোধকে উপলক্ষ্য করে আত্ম-বোধের একটা বনিয়াদ গড়ে তোলা।

এই থেকে স্মৃতির সামর্থ্যের সীমা কতটুকু, তাও বোঝা যায়। অনেকে মনে করে মানুষ স্মৃতিসর্বস্ব—অতীতের স্মৃতিই তার ব্যক্তিসত্তার ভিত্তি, স্মৃতি যদি গেল তাহলে তার আর কী রইল! কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। প্রাকৃত চেতনা বাইরের ঘটনার উপর একান্ত নির্ভর করে বলে ঘটনার স্মৃতিকে সে একটু বেশী দাম দেয়। বস্তুত ঘটনাগুলি হাতুড়ির ঘায়ের মত। আঘাতে-আঘাতে আত্মধাতুকে তা একটা গড়ন দিচ্ছে বটে, কিন্তু ভাবলে হাতুড়িটাই তো আর ধাতু নয়। বরং বলা চলে, মানুষ মনঃ-সর্বস্ব বা অহং-সর্বস্ব; আরও গভীর করে বলা চলে সে আত্ম-সর্বস্ব। স্মৃতি মনের একটা বৃত্তি, অস্ফুট অহংবোধ নিজেকে স্ফুট করে তোলে ওই দিয়ে। সুতরাং অহংবোধই হল গোড়ার কথা, সাধনহিসাবে স্মৃতি এল তার পরে। পশুর মধ্যে স্মৃতি বেশ সজাগ রয়েছে, কিন্তু তার অহংবোধ স্পষ্ট নয়। একটা মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় নামে যখন, তখন প্রত্যেক ভূমিকার উপযোগী উপাদানের যোগান দিয়ে যায় স্মৃতি। তাই বাইরে থেকে মনে হয়, স্মৃতিই বুঝি তার সব। কিন্তু বস্তুত বিভিন্ন ভূমিকার গভীরে রয়েছে একটি অহংএরই সুতার টানা। আবার, জন্ম-জন্মান্তরে স্মৃতির অনুবৃত্তিতে ছেদ পড়তে পারে, কিন্তু জীবসত্তার বিবর্তনে তাবলে কোনও ছেদ পড়ে না। এখানে দেখছি আত্মভাবই সাধক, স্মৃতি তার সাধন মাত্র।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'তোমার-আমার বহু জন্ম পার হয়ে গেছে, তুমি তা জান না কিন্তু আমি জানি।' এই জানাটা সম্ভব হয় আত্মসত্তার গভীরে ডুবে শাশ্বত আত্মভাবে স্থিত হয়ে। সেখানে অনুভব হয়, এক মূল তত্ত্বভাব হতে পরা শক্তির বিক্ষেপে ঘটনার বিচ্ছুরণ হচ্ছে বাইরের দিকে। ঘটনার বিচ্ছুরণ আর তার হেতুকে তখন একনজরে স্পষ্ট দেখা যায়। যোগীর দৃষ্টি অতীতের মূল থেকে ভবিষ্যতের শাখা-প্রশাখায় প্রসর্পিত হয়ে পড়ে—স্মৃতি আর কল্পনা তখন এক অখণ্ড সত্যের ধৃতিতে পর্যবসিত হয়। ঘটনার দিক থেকে উজিয়ে না গেলে এ-দর্শন সম্ভব হয় না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শুধু উজিয়ে গেলে চলবে না—সে-কাজ আমাদের প্রাকৃত মনের স্মৃতিও খানিকটা করে; একেবারে ডুব দিয়ে উজিয়ে যেতে হবে, একটা অন্তর্মুখ সংবেগ দিয়ে ঘটনার মূলে অর্থকে আবিষ্কার করতে হবে। এই কাজটি একলা মনের সাহায্যে হয় না। এইখানে দরকার পড়ে বিজ্ঞানের।

মনের স্মৃতি আর বিজ্ঞানের স্মৃতি ঠিক এক বস্তু নয়। বিষয়-অনুভবের এলাকায় হল মনের স্মৃতি; আর বিজ্ঞানের স্মৃতি আত্মানুভবের এলাকায়। আমরা দেখেছি, অনুভবের স্মৃতির চাইতে আত্মস্মৃতি আরও গভীর—আর সেইখানে হল স্মৃতির আসল কাজ; কেননা সে-ই কালের ক্ষণভঙ্গে বাহিত হয়ে ঘটনার চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়ে আমাদের শাশ্বত আত্মানুভবকে গড়ে তুলছে। গভীরতর অন্তর্মুখীনতার ফলে আত্মস্মৃতি যখন অহংএর এলাকা পার হয়ে যায়, তখন মনের স্মৃতির জায়গা এসে দখল করে বিজ্ঞানের স্মৃতি। এই বিজ্ঞানের স্মৃতিই 'ধ্রুবা স্মৃতি'; অর্থাৎ প্রাক্তন ঘটনার বিক্ষিপ্ত জ্ঞান নয়, চিরন্তন চিৎশক্তির নিত্যবিচ্ছুরণের সংহত বোধ। আত্মস্মৃতি এইখানে চরমে ওঠে—অবিদ্যার সকল আবরণ বিলীন হয়ে শাশ্বত আত্মভাবের সৌরবিম্ব ঝলসে ওঠে চিদাকাশে। সেইসঙ্গে অনুভব হয়, কালের প্রবাহ সত্তার গঙ্গোত্রীতে উত্তীর্ণ হয়ে আবার ভাগীরথীর মুক্তধারায় ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। সিদ্ধ-চেতনা হয় তখন সেই অনিরুদ্ধ শক্তিস্রোতের প্রণালিকা। ধ্রুবা স্মৃতির বীর্যে ও সংবেগে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তখন অবন্ধ্য দিব্যনিয়তির দ্যোতনায় প্রভাস্বর।

এইটি বিদ্যাশক্তির কাজ। চরমে তাকে সম্ভব করবার জন্য স্মৃতি কল্পনা ও ভাবনার সহায়ে অবিদ্যা ক্ষণভঙ্গের মেরুকুহরে আত্মভাবের হিরণ্য-সূত্রটি আবিষ্কারের তপস্যা করছে আমাদের জীবনে—এই তার সার্থকতা।

দশম অধ্যায়

অবিদ্যা : তাদাত্ম্যবিজ্ঞান বনাম ভেদজ্ঞান

অবিদ্যার খানিকটা পরিচয় পেলাম। দেখলাম, প্রাকৃত চেতনার ভূমিতে স্মৃতি কল্পনা ভাবনা আর অহন্তার সহায়ে কি করে সে জগৎ-বোধকে স্পষ্ট এবং আত্ম-বোধকে পুষ্ট করে চলেছে। এইবার জ্ঞানের দিক থেকে বিদ্যা আর অবিদ্যার সম্পর্ককে বিচার করে দেখা যাক, অবিদ্যার স্বরূপ কি।

আমাদের জ্ঞানের জগৎ দুটি—একটি বাইরে, আরেকটি অন্তরে। প্রাকৃত ভূমিতে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের আগে জাগে এবং জীবনে তারই স্থান হয় মুখ্য। উপনিষদের ঋষির ভাষায়, 'আমরা স্বভাবত বাইরটাই দেখি, দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে অন্তরের দিকে তাকাই না'—যদিও বাইরের অভিঘাতে ভিতরটা প্রতি মুহূর্তে সাড়া দিয়ে চলেছে বলেই বহির্জগৎকে জানা আমাদের সম্ভব হচ্ছে।

বহির্জগতের জ্ঞানের মুখ্য সাধন হল ইন্দ্রিয়। আমরা যে কতখানি ইন্দ্রিয়-নির্ভর তা বুঝতে পারি, যখন একমাত্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে বলি 'প্রত্যক্ষ' আর তার প্রামাণ্যকে ঠাঁই দিই সবার উপরে। অথচ একটু বিচার করলে দেখতে পেতাম, ইন্দ্রিয়জ্ঞান সবসময় একেবারে নির্ভুল নয়, স্ব-তন্ত্রও নয়। তাছাড়া, গ্রাহ্য-বস্তু সম্পর্কে সে আমাদের কাছে হাজির করে কতকগুলি তথ্য মাত্র—যা থেকে আমরা বস্তুর একটা উপরভাসা পরিচয়ই পাই, তার তত্ত্ব পাই না। বস্তুর তত্ত্ব জানতে সাহায্য নিতে হয় মনের। সে এসে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ন্যূনতাকে পূরণ করে—খানিকটা বোধি দিয়ে, খানিকটা বুদ্ধি দিয়ে। বোধি সাক্ষাৎ-ভাবে বস্তুর কিছুটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দেয় আমাদের সঙ্গে—আমরা যেন রূপের আড়ালে একটা 'অর্থের' সন্ধান পাই। কিন্তু বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের নানা সংস্কারে সে-পরিচয় আবছা থেকে যায়। তাকে স্পষ্ট করবার জন্য সাহায্য নিতে হয় বুদ্ধির। বুদ্ধি সে-কাজ করে স্মৃতি অনুমান কল্পনা ভাবনা জল্পনা ইত্যাদি অনেক-কিছুর জোড়াতাড়া দিয়ে।

বহির্জগতের তত্ত্বজ্ঞান হয় এমনি করে। বস্তু যদি জড়ধর্মী হয়, তাহলে তার তত্ত্বের ঐশ্বর্যে আর শক্তির প্রয়োগে কী বিস্ময়কর বৈচিত্র্য থাকতে পারে,

তা দেখিয়েছে আধুনিক জড়বিজ্ঞান। কিন্তু বস্তু যদি প্রাণধর্মী বা মনোধর্মী হয়, তাহলে শুধু ইন্দ্রিয়ের সহায়ে নিখুঁতভাবে কি পুরাপুরি তার তত্ত্ব জানা সম্ভব হয় না। প্রাণ বা মনের যে-ক্রিয়া বাইরে দেখি, তাথেকে খানিকটা বোধি দিয়ে খানিকটা অনুমান বা কল্পনা দিয়ে আমরা তার অর্থ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি —যা নাকি আমাদের ইন্দ্রিয়নির্ভর তত্ত্বজ্ঞানের ধরন। কিন্তু আমাদের সে-চেষ্টা যে সবসময় সফল হয় না, তার পরিচয় পাই পদে-পদে। নিজের প্রাণ-মনকেই আমরা ভাল করে জানি না, অপরের প্রাণ-মনের খবর রাখি আর কতটুকু। জড়শক্তির একটা বাঁধা আইন আছে—অন্তত তার আটপৌরে ব্যবহারে ; তাই তার তত্ত্বনিরূপণ করা বা তাকে বশে আনা চলে। কিন্তু প্রাণ বা মনের শক্তি অমন বাঁধা রাস্তায় চলে না। তাকে বোঝা বা বশ করা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ব্যক্তির জীবনে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র।

এই হল আমাদের জগৎ-জ্ঞানের মোটামুটি চেহারা। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-নির্ভর মনের দৌলতে জড়কে আমরা যদি-বা কিছুটা জানি, প্রাণ আর মনকে জানি তার চাইতে অনেক কম। এই সঙ্কীর্ণতা জগৎ-জ্ঞানের একটা মস্ত ত্রুটি। আরেকটা ত্রুটি হল, এ-জ্ঞান অপরোক্ষ নয়—এতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার বাইরে পড়ে থাকে, সুতরাং বিষয়ের মর্মসত্যটি চেতনায় অন্তরঙ্গ হয়ে ফোটে না। ইন্দ্রিয়সহায়ে জড়ের জ্ঞানকে আমরা অপরোক্ষ বলি—তার স্পষ্টতা আর কার্যকারিতার দাবি মেনে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনের বিচারে সে-জ্ঞানও যে অপরোক্ষ এবং নিঃসংশয় নয়, এ-ভাবনা বৈজ্ঞানিকের মনেও সম্প্রতি জাগতে শুরু করেছে।

যে-জ্ঞান সঙ্কীর্ণ এবং পরোক্ষ, তা বিজ্ঞান নয়। জ্ঞান বলেই তার মধ্যে বিদ্যার আবেশ নিশ্চয় আছে, কিন্তু তবুও সে অবিদ্যাগ্রস্ত। এই ইন্দ্রিয়নির্ভর বহির্মুখ জগৎ-জ্ঞানে আমাদের অন্তরাত্মা কখনও তৃপ্ত হয় না—যদিও অতৃপ্তির বেদনাসম্পর্কে সচেতন হতে তার সময় লাগে।

বাইরের জগতের পরোক্ষজ্ঞানকে ছেড়ে এইবার অন্তরের দিকে ফেরা যাক। এইখানে আমরা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রথম আভাস পাই। আমাকে আমি যেমন নিবিড়ভাবে জানি, এমন করে কাউকে বা কিছুকে জানি না। আমার এই মুহূর্তের আত্মবোধ এ-জগতের সব-কিছুর বোধের চাইতে অন্তরঙ্গ,

অপরোক্ষতা (immediacy) তার স্বাভাবিক ধর্ম। অথচ এ-বোধ সম্পর্কে সচেতনতা আমার প্রথম হতেই আসেনি। মানুষ হয়েও আমি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর মত বস্তু-সচেতন হয়েছি আগে, আত্ম-সচেতন হয়েছি অনেক পরে। তার ফলে বস্তুচেতনার যে-ত্রুটি, তা আমার আত্মচেতনাতেও সংক্রামিত হয়েছে।

বস্তুচেতনায় বাইরের দিকে ঝোঁক হয় প্রবল, তাইতে আত্মচেতনা ফিকা হয়ে যায়। বাইরের ঘটনার সংঘাতে অন্তশ্চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে অবিরত। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল নাই—আমি সেখানে পশুরই মত প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে চলেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখি কিন্তু নিজের অন্দর-মহলের খবর রাখি না, কিংবা 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'—এ-দশা আমাদের অনেকেরই। তাছাড়া বস্তুচেতনার বিষয় অস্থির বলে সে নিজেও বিক্ষিপ্ত। এই বিক্ষেপে আমাদের আত্মচেতনা আড়াল হয়ে পড়ে, নিজেকে খুঁজতে গিয়ে কতকগুলি চঞ্চল বৃত্তি ছাড়া একটা স্থির ভূমিকা আমরা খুঁজে পাই না।

অথচ আবছা হলেও অনুভব করি, সব জড়িয়ে আমার একটা আমিত্ব আছে, তাকে কেন্দ্র করে সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-দ্বেষ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব আছে—এককথায় আমার একটা নিজস্ব অন্তর্জগৎ আছে। আর এই জগতের বোধই আমার অন্তরঙ্গ। বাইরের জগতের ক্রিয়ায় চেতনার যে-প্রতিক্রিয়া, তার ধরনের রকমফের হয় এই অন্তর্জগতের তাগিদে। এই অন্তশ্চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে জ্ঞানক্রিয়ার একটা পুরা ছক হয়তো মিলতে পারে।

জ্ঞানের একপ্রান্তে জ্ঞেয় বা বিষয়, আরেক প্রান্তে জ্ঞাতা বা বিষয়ী। বিষয় যদি বিষয়ীর কাছে আসে, তাহলেই জ্ঞান হয়। এই কাছে-আসাটাকে দার্শনিক ভাষায় বলে 'সন্নিকর্ষ' (contact)। বিষয় যদি বিষয়ীর এত কাছে আসে যে দুয়ের মাঝে ব্যবধান ঘুচে যায়, তাহলে তাকে বলে 'অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ'। আর দুয়ের মাঝে যদি খানিকটা ফাঁক থাকে অথচ বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহলে তাকে বলে 'পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ।'

ধরা যাক, আমি একটা ফুল দেখছি। এ-দেখাটা খুবই স্পষ্ট, ফুলের কল্পনার চাইতে ঢের স্পষ্ট। তাহলেও ফুলটা আমার কাছে একটা বস্তু, তার চেতনা বস্তু-চেতনা—আমার আত্ম-চেতনার বাইরে তার স্থান। ইন্দ্রিয়ের পথ ধরে ফুল আমার কাছে এলেও পুরাপুরি আমার হয়ে যায়নি, তাতে-আমাতে খানিকটা ফাঁক থেকেই গেছে। এইভাবে যে বিষয়কে জানা, তাকে

বলে 'পরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান।' বিষয়ের জ্ঞান সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও সে থাকে বিষয়ীর বাইরে।

মনে করা যাক, ফুলটা আমার খুব ভাল লেগেছে, ওআর্ডস্‌ওআর্থের সেই ড্যাফোডিল দেখার মত কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না। এখানেও ফুলের জ্ঞান হচ্ছে, কিন্তু ফুল আর তখন আমার বাইরে নাই—স্মৃতি এবং কল্পনার সংবেগে আমার মধ্যে সে ফুটেছে 'ভাবের ফুল' হয়ে। এইবার ফুলের সঙ্গে আমার ব্যবধান দূর হয়ে গেল বলতে পারি। তাই এ-জ্ঞান এখন 'অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান'।

তবুও এ-জ্ঞান বহিরঙ্গ, কেননা সন্নিকর্ষ অপরোক্ষ হলেও বিষয়-বিষয়ীর সূক্ষ্ম ভেদটা কিন্তু এখানেও আছে। এই বহিরঙ্গ-জ্ঞানেরও গভীরে আছে আরেকটা অন্তরঙ্গ-জ্ঞান—সে ওই ফুলকে যে ভাল লেগেছিল, সেই রসবোধকে আশ্রয় করে। আমার ভাল-লাগাটা আমার আত্মচেতনার পরিণাম, সুতরাং আমার সত্তার একটা অন্তরঙ্গ অনুভব। এই ভাল-লাগার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই ফুলটি—আমার 'ভাবের ফুল' অন্তরের আরও গভীরে ফুটেছে 'রসের ফুল' হয়ে। ফুলের সৌন্দর্য আর আমার আনন্দ সেখানে একাকার হয়ে গেছে। রসচেতনার ভিতর দিয়ে এই যে ফুলকে জানা, তাতেই ফুলের যথাযথ অর্থটি আমার কাছে ধরা পড়ে। এও অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান, কিন্তু আগের চাইতে আরও অন্তরঙ্গ।

ফুলকে নিয়ে অন্তরে ঢুকতে গিয়ে তিন ধরনের জ্ঞানের সন্ধান পেলাম। আরেকটু ভিতরে গেলে আরও একধরনের জ্ঞানের দেখা মিলত। কিন্তু তার জন্য ফুলের উদাহরণ ছেড়ে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

ধরা যাক, আমি কাউকে ভালবাসি। সে আমার সামনে, তাকে দেখছি। এই দেখার সঙ্গে রসের যোগ আছে বলে ফুলকে দেখার মত এও অন্তরের পথে ক্রমে-ক্রমে জানার তিনটি স্তর পার হয়ে যাবে। শুধু চোখে দেখাটা হবে প্রিয়জনকে 'পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ' দিয়ে জানা। সেই দেখার মধ্যেই ভাবের চোখে দেখাটা হবে 'বহিরঙ্গ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ' দিয়ে জানা। ভাব আরও গভীর হয়ে অন্তরে রসের সমুদ্র উথলে তোলে যখন, তখন প্রিয়জনকে জানি আমারই অনন্যরূপ বলে; এই হল 'অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ' দিয়ে জানা। এই জানা আরও গভীর হলে আমাতে আর প্রিয়জনে যখন কোনও

ভেদ থাকে না, তাকে আমার আমি বলেই সত্তার গহনে যখন জানি—তখনই হল সকল জানার চরম জানা বা 'তাদাত্ম্য-বিজ্ঞান' (knowledge by identity) দিয়ে জানা। আগে অনেকবার এরই উল্লেখ করেছি 'হয়ে জানা' বলে।

জানার এই চারটি ধরন সার্বভৌম—যোগে ভোগে বা কর্মে জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা এদের ব্যবহার করছি। পরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত যে-জ্ঞান, তার আরেক নাম হল 'ভেদ-জ্ঞান'—জ্ঞানক্রিয়ার এই হল একটি মেরু। আরেকটি মেরু হল 'তাদাত্ম্য-বিজ্ঞান' বা হয়ে জানা। দুয়ের মাঝে 'অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান', যা অন্তর্বিজ্ঞানের এলাকাতেই পড়ে; কেননা আমার কাছে একমাত্র ভাবই অপরোক্ষ হতে পারে—এখন সে আমার স্ব-ভাবই হ'ক বা বস্তুর সংস্পর্শে জেগে-ওঠা তার ভাবচ্ছায়াই হ'ক।

জ্ঞানের এই ছক হতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা পৌছতে পারি। প্রথমত দেখতে পাচ্ছি, জ্ঞানক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি ভিতরের দিকে। আমরা যাকে জানতে চাই, তাকে নিবিড় করে পেতে চাই, সম্পূর্ণভাবে আমার করে নিতে চাই। অর্থাৎ জানার ব্যাপারটা আসলে আত্মসাৎ করবার ব্যাপার—শিশু যেমন যা জানতে চায় তা-ই মুখে পুরে দেয় তেমনি। সব জানার ব্যাপারেই বিষয় আর বিষয়ীর মধ্যে খানিকটা একাত্মতা না ঘটলে জানাই সম্ভব হয় না। এদেশের দার্শনিকরা তাই বলেন—জ্ঞাতা, জ্ঞানের সাধন আর জ্ঞেয়ের মধ্যে মৌলিক-তত্ত্বের একটা একতা আছে। ফুল দেখার দৃষ্টান্তই আবার নেওয়া যাক। প্রাচীনেরা বলবেন, ফুল তো একটা নাম মাত্র, আসলে দেখছি আলো; আর এই দেখার সাধন হল চোখ, চোখের সঙ্গে আলোর যোগে আমার মধ্যে জাগল রূপবোধ। এখন রূপবোধ, রূপগ্রহণের ইন্দ্রিয় আর রূপ—এ-তিনটা এক রূপ-প্রকৃতিরই সাত্ত্বিক ক্রিয়াশীল আর ভৌতিক পরিণাম মাত্র। এক প্রকৃতি না হলে বাইরের রূপ ভিতরে বোধ জাগাতে পারত না। কথাটা হাতে-কলমে প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু এছাড়া জ্ঞানক্রিয়ার সুষ্ঠু কোনও ব্যাখ্যাও হতে পারে না।

জানার ব্যাপারে বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে যে একাত্মতা ঘটে, তা আরেক-ভাবে আমরা পরখ করে দেখতে পারি। জ্ঞানের সঙ্গে রসবোধের একটা নিবিড় যোগ আছে। আমরা যাতে রস পাই, তা-ই আমাদের জানার আগ্রহকে জিইয়ে রাখে। 'রস' কথাটা এখানে ভাল-লাগা মন্দ-লাগার অপেক্ষা না রেখে ব্যবহার

করছি। মন্দ-লাগারও গভীরে যে-কোনও কারণেই হ'ক একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে বলেই চেতনা তাকে ধরে রাখে, মনস্তত্ত্বের এটা একটা গোড়ার কথা। প্রকাশ তির্যক্ হলেও মন্দ-লাগার ওই হল রস। এই রসবোধ বিশেষ করে উদ্রিক্ত হয়, যখন বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে প্রকৃতিগত একটা সাম্য থাকে। স্বভাবত জড়বস্তুতে আমরা যে-রস পাই, তার চাইতে বেশী পাই যার প্রাণ আছে তার মধ্যে, আরও বেশী পাই যেখানে মন আছে, মনের মিল আছে। রসবোধের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার দিক দিয়ে জ্ঞানের একটা সমানুপাত আছে। রসবোধের পরিমাপে যে আমার যত কাছে, তাকে তত ভাল করে জানি। এই হিসাবে আমি সব চাইতে বেশী রস পাই নিজের মধ্যে। তাই আত্মজ্ঞানই আমার সবচাইতে অপরোক্ষ এবং অন্তরঙ্গ। তাকে মান (standard) করেই আমার বস্তু-জ্ঞানের অপরোক্ষতার নিরিখ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, জ্ঞানক্রিয়ার একটা গতি অন্তর্মুখীনতা অন্তরঙ্গতা অপরোক্ষতা এবং একাত্মতার দিকে। এটাকে বলতে পারি তার আত্মমুখী গতি। বাইরের দিকে তার একটা বিশ্বমুখী গতিও আছে—সেখানে পরোক্ষজ্ঞানের রাজ্য। পরোক্ষজ্ঞানের সাধনাতেও একটা রস আছে—প্রবৃত্তির রস। বৈজ্ঞানিকের জিজ্ঞাসার মূলে প্রেরণা দিচ্ছে সে-ই। একদিকে আত্মজিজ্ঞাসা, আরেকদিকে বিশ্বজিজ্ঞাসা—মানুষের চেতনা আছে এই দোটানার মধ্যে। এর একটাতে ঝোঁক দিতে গিয়ে আরেকটার বেলায় সে দেউলিয়া হয়ে গেছে। তার সভ্যতার সঙ্কট এইখানে। আত্মজ্ঞান আর বিশ্বজ্ঞানকে যেদিন সে মিলিয়ে নিতে পারবে, সেইদিন তার বিজ্ঞানসাধনার সিদ্ধি।

জ্ঞানের একটা কাঠামো পেলাম। এইবার চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে তার ক্রিয়া কি, লক্ষ্য করে দেখা যাক। তাহলে বিদ্যা আর অবিদ্যার সম্পর্কটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম ধরা যাক প্রাকৃত চেতনার ভূমি। এর প্রায় সবখানি জুড়ে আছে পরোক্ষজ্ঞান ; বাইরের জগৎ নিয়েই আমরা মেতে আছি। এর মধ্যে কোনও কারণে নিজের দিকে যখন দৃষ্টি ফেরাই, নিজের ভাবনা-বেদনা সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হই, তখন অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানও আমাদের হয়। কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে 'আমি কি বা কে', নিরপেক্ষভাবে এ-বিচার আমরা বড়

করি না। যদি করতাম, তাহলে আমিই আমার শুদ্ধজ্ঞানের বিষয় হতাম এবং বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মতার ফলে আমার মধ্যে জন্মাত 'তাদাত্ম্যবিজ্ঞান'।

প্রাকৃত ভূমিতে তাদাত্ম্যবিজ্ঞান যে একেবারেই থাকে না, তা নয়। কেননা, অস্পষ্ট হলেও একটা অহংবোধকে আমরা সবসময় বহন করছি এবং তাকে কেন্দ্র করে আমাদের পরোক্ষজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সাজিয়ে একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলছি। অবশ্য ঝোঁকটা আমাদের এই জগৎ গড়বার দিকেই, নিজেকে জানবার বা গড়বার দিকে নয়। এরও মূলে রয়েছে একাত্মতা। কিন্তু বিশুদ্ধ তাদাত্ম্যবিজ্ঞানে যেধরনের একাত্মতা জন্মায়, এ তা নয়। এখানে বিষয় বিষয়ীকে গ্রাস করে। চলতি কথায়, আমি বিষয়ে ডুবে যাই। তাকে ছাপিয়ে আমার যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তা ভুলে যাই। আর শুদ্ধ তাদাত্ম্যবিজ্ঞানে আমার আত্মসত্তা বিষয়সত্তাকে গ্রাস করে, বিষয়ই আমার মধ্যে ডুবে যায়। ভোগের আর যোগের আনন্দের তফাত এইখানে।

বিষয়ের মধ্যে আমরা ডুবে থাকি, তবুও তাকে পুরাপুরি জানতে পারি না—এই হল প্রাকৃত জীবনে অবিদ্যার মার। জড়কে হয়তো কিছুটা জানি, কিন্তু প্রাণ আর মনকে জানি আরও কম। নিজের প্রাণ-মনের ক্রিয়ার অপরোক্ষ অনুভব খানিকটা যদিও-বা হয়, পরের প্রাণ-মনের খবর আমরা কিছুই পাই না—যেটুকু পাই তার ভিত্তি হল অনুমান বা কল্পনা। এই জানার মধ্যে গোঁজামিলের যেমন অন্ত নাই, তেমনি তার দরুন ঝামেলারও অন্ত নাই। ভালবাসায় পরকে হয়তো খানিকটা জানি, কিন্তু ভুল বোঝার দুর্দৈব সেখানেও কি কিছু কম? মন হতাশ হয়ে বলে, হৃদয়ে-হৃদয়ে এই-যে যবনিকার আড়াল, এ কি কিছুতেই ঘোচবার নয়? যোগী বলেন, আড়াল ঘোচে—কিন্তু প্রাকৃত চেতনার ভূমিতেও নয়, প্রাকৃত উপায়েও নয়। এই চেতনার পিছনে এবং গভীরে আছে এক অন্তশ্চেতনার সমুদ্র—হৃদয়ে-হৃদয়ে আড়াল ঘুচতে পারে সেইখানে ডুবলে।

এই অন্তশ্চেতনার একটা বিভাব হল 'অধিচেতনা' (subliminal consciousness), স্বপ্নতত্ত্বের বিচার করতে গিয়ে যার কথা আগেও বলেছি। তার স্বরূপ বোঝবার জন্য একটু ভূমিকার বোধ হয় দরকার আছে।

সোজাসুজি জগতের দিকে তাকাই যদি, দেখি তার মধ্যে বৈচিত্র্যের শেষ নাই। একই গাছের দুটা পাতা কখনও এক হয় না, দুটা মানুষের

আঙুলের ছাপ কখনও মিলে যায় না। অথচ এত ভেদের মধ্যেও একটা সামান্যধর্ম সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, যাথেকে জাতিরূপের (type) সৃষ্টি। জাতিরূপকে বাইরে কোথাও দেখতে পাব না, ও আমাদের নিতান্ত মনগড়া। অথচ ও যে ভাবের সত্য, ওকে ছাড়া যে আমাদের কাজ চলে না, একথাও মানতে হবে। এই থেকে একটা সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দেই করা চলে, বৈচিত্র্য এবং তার দরুন ভেদটা রূপের জগতে, তার মূলে ভাব বা শক্তির জগতে আছে একটা ঐক্যের অধিষ্ঠান এবং প্রবর্তনা। মূলে ভাব বা শক্তির ঐক্য আছে বলেই রূপের ভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে প্রাণ-মনের ঐক্যও সম্ভব হয়—যা আমাদের সমাজবন্ধনের মূল।

ঐক্য অন্তরে, কিন্তু ব্যবহারে বৈচিত্র্য। অন্তরের ঐক্যবোধ যদি উজ্জ্বল ও নিবিড় থাকে, তাহলে ব্যবহারের বৈচিত্র্য পরস্পরের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়, ঐক্যে আর বৈচিত্র্যে মিলিয়ে একটি সুডোল আর নিটোল জগতের সৃষ্টি হয়। প্রীতির এই নিয়মটি আমাদের অজানা নয়। এই-যে ঐক্যবোধ, প্রীতির রস সঞ্চারিত করে বাইরের বৈচিত্র্যে যা সঙ্গতি আনল, তার স্বরূপ কি ? একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝব, এ-ঐক্যবোধ আমার সত্তার গভীরে আত্ম-বোধ ছাড়া আর-কিছুই নয়। আমি যখন আমাকে পাই সত্য করে, তখন তোমাকেও পাই—আমার আত্মসত্তার চিদ্‌বিন্দু হতে বিচ্ছুরিত তুমি তখন আমারই আনন্দরূপ।

এমনি করে নিজের গভীরে নিজেকে পাওয়ায় বাইরের জগৎ কি লোপ পেয়ে যায় ? অনেকে বলেন, যায়—নইলে নিজেকে পুরাপুরি পাওয়া হয় না। কিন্তু একথা সত্য নয়। গভীর আত্মবোধ আর অন্তরঙ্গ জগদ্‌বোধ দুইই একসঙ্গে থাকতে পারে, একথার ইঙ্গিত আগেও করেছি। এই গভীর অখণ্ড সংবর্তুল বিশ্বাত্মবোধের মধ্যে দেখা দেয় চেতনার চারটি থাক। সবার উপরে আত্ম-চেতনা, সবার নীচে প্রাকৃত চেতনা ; আর দুয়ের মাঝে বিশ্বচেতনা এবং অধি-চেতনা। এ-আত্মচেতনা কিন্তু সাংখ্যের বিবিক্ত আত্মচেতনা নয় (যদিও প্রাকৃত ভূমি হতে সাধনার শুরু হয় সাংখ্যের আত্মচেতনাকে লক্ষ্য করেই)। এ হল উপনিষদের সেই আত্মচেতনা, যাতে পুরুষ 'সর্বভূতকে দেখেন আত্মাতে, আত্মাকে দেখেন সর্বভূতে এবং আত্মাই হয় সর্বভূত।' এই আত্মবোধ শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের তাদাত্ম্যবোধ এবং তাহতেই জগতের বিসৃষ্টি।

চেতনার এই চারটি থাককে যদি বিদ্যার তারতম্য দিয়ে পরিমাপ করি,

তাহলে বলতে পারি: প্রাকৃত চেতনা পড়ে অবিদ্যার অধিকারে; অধিচেতনার নীচের দিকের খানিকটা অবিদ্যার এলাকায় থাকলেও তার উপরের দিকটায় বিদ্যার আলোক; আর বিশ্বচেতনা এবং আত্মচেতনা আছে পূর্ণ-বিদ্যার অধিকারে। আমাদের প্রাকৃত বিশ্ববোধ বিদ্যাশক্তির প্রেরণায় আত্ম-বোধ হয়ে উঠেছে—এই মূলসূত্র ধরে অধিকারের এই বিভিন্নতা।

অবিদ্যার প্রভাবহেতু প্রাকৃত চেতনায় জ্ঞানের সীমা যে কত সঙ্কীর্ণ, তা আমরা দেখেছি। এখানে বুদ্ধি হল জানবার সবচাইতে উজ্জ্বল সাধন। বুদ্ধির উপরে খানিকটা বোধির আলো এসে পড়ায় সে সামান্যজ্ঞানের কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করে এবং তা-ই দিয়ে জগৎকে বুঝতে চায়। এমনি করে সে বিজ্ঞান আর দর্শনের ইমারত গড়ে তোলে। কিন্তু এতে জানার বিষয় তার বাইরে পড়ে থাকে, কখনও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে না। তাকে অন্তরঙ্গ করতে পারে একমাত্র বোধি। কিন্তু বোধিকে জ্ঞানের সাধন করতে হলে ইন্দ্রিয়কে শান্ত করতে হবে, চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে ভিতরপানে।

তখন অন্তর্মুখ চেতনায় এই স্থূলজগতের অন্তরালে ধীরে-ধীরে ভেসে ওঠে আরেকটা সূক্ষ্ম জগৎ। সেখানে সূক্ষ্মতর করণের (instrument) সহায়ে বস্তুর শক্তিরূপ এবং ভাবরূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই হল অধি-চেতনার ভূমি—যোগিচিত্তে যেখানে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির বিভূতি ফোটে।

অধিচেতনার খানিকটা পরিচয় আমরা স্বপ্নের বেলায় পেয়েছি—বিশেষত যেসব স্বপ্ন জাগ্রতের সংস্কারের কেবল রোমন্থন নয় তাদের বেলায়। বাইরের কোনও উদ্‌বোধক কারণ (stimulus) নাই, অথচ ইন্দ্রিয়বোধ ফুটছে—এই হল স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য। বিষয়ী নিজের ভিতর থেকে যেন সেখানে বিষয়কে সৃষ্টি করছে। অধিচেতনারও এই ধরন। বিষয়ের সূক্ষ্মজ্ঞান এমন-কি তার স্থূলজ্ঞানও সেখানে ভিতর থেকে বুদ্‌বুদের মত ভেসে ওঠে, বাইরের ধাক্কা খেয়ে ভিতরে জ্ঞান জাগে না। ব্যাপারটা আজগবী কিছু নয়। এমনতর প্রাতিভ-জ্ঞানের (intuitive knowledge) এক-এক ঝলক আমাদের প্রাকৃত চেতনাতেও সময়-সময় ফোটে, যাকে ঠিক কাকতালীয়ের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু প্রাকৃত চেতনায় ব্যাপারটা আকস্মিক, অধিচেতনায় স্বাভাবিক। প্রাকৃত চেতনায় সূক্ষ্মজ্ঞানের বরাত দেওয়া আছে অনুমান আর কল্পনার ’পরে; সবসময় তাদের ক্রিয়াটা আগে শুরু হয়ে যায় বলে প্রাতিভজ্ঞান পরদার আড়াল

হতে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পায় না। কিন্তু বাইরের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেলে এ-জ্ঞানের ক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যেমন খানিকটা স্বপ্নে (বিশেষত স্ববশ থেকে স্বপ্ন দেখবার কৌশল যার জানা আছে তার স্বপ্নে), সম্মোহিত ব্যক্তির অলৌকিক অনুভবে, যোগীর প্রত্যাহৃত চেতনায়।

বাসনামুক্ত স্বচ্ছ শান্ত চিত্ত নিয়ে দীর্ঘকাল অন্তর্মুখ থাকবার ফলে অধিচেতনার ক্রিয়া প্রাকৃত চেতনার ভূমিতেও অবিকৃত এবং স্বাভাবিক ভাবে ফুটতে পারে। তখন এই চোখ দিয়ে যেন সব-কিছুর ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায় ; মন কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায় বলে ইন্দ্রিয়বোধ এবং বোধির মাঝে আর সে কল্পনা-জল্পনার আড়াল রচে না। সহজ কথায়, নিজের অহংকে যদি সম্পূর্ণ মুছে ফেলে সাদা মন নিয়ে জগতের দিকে তাকাই, সাদা মন নিয়ে তাকে ভালবাসি, তাহলে তার কোনও রহস্যই আমাদের কাছে ঢাকা থাকে না। সবার হৃদয়কে তখন নিজের হৃদয়ে পাওয়ারও কোনও বাধা থাকে না। ভালবাসায় যে এটা খানিকটা হয়, তা আমরা প্রাকৃত ভূমিতেও দেখতে পাই। কিন্তু ভালবাসা সম্পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব না হলে, আধারে চৈত্যসত্তার পরিপূর্ণ উন্মীলন না ঘটলে অধি-চেতনার অবিকৃত প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। কেননা আগেই বলেছি, অধি-চেতনা আমাদের প্রাকৃত চেতনারও বাহক বলে তার খানিকটা অংশে অবিদ্যার ছায়া পড়েছে ; তাইতে সম্পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব না হয়ে অধিচেতনার রাজ্যে ঢুকলে জ্ঞান ও শক্তির বিকার ঘটা কিছুই আশ্চর্য নয়। যোগসিদ্ধির অপরিণত অবস্থায় অনেকসময় ভেজাল দেখা দেয় এই কারণে।

অধিচেতনা অহংএর কুণ্ডলী মোচন ক'রে আমাদের চেতনাকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে, হৃদয়ের বিস্ফারিত জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে বিশ্বের সব-কিছুকে সে ডেকে আনে। বিশ্ব তখন আর আমার বাইরে নয়, আমার অন্তরে। সে আর দুর্বোধ বস্তুপিণ্ড নয় শুধু, তার ভাব আর শক্তির স্পন্দে আমারই আত্মার স্পন্দন। তবুও অধিচেতন ভূমিতে বিশ্বের জ্ঞান তাদাত্ম্যবিজ্ঞান নয়—এ হল অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান। তার কারণ, এখানেও বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে সূক্ষ্ম একটা ভেদের রেখা থেকে যায়—যেমন থাকে, আমি যখন তটস্থ হয়ে আমারই চিত্তের কোনও বৃত্তিকে জানি। অধিচেতনাতেও এই ভেদটুকু থাকে এইজন্য যে, ব্যক্তিচেতনা এখানে পরিশুদ্ধ হলেও পরিপূর্ণ নির্মুক্ত বা স্ব-তন্ত্র নয়, বিশ্বচেতনার ঐশ্বর্য এবং উল্লাস এখনও তার মধ্যে অনিবাধ বৈপুল্য নিয়ে ফোটেনি। অধিচেতনায় ব্যক্তির একটি বিন্দু হতে বিশ্বের অনুভব,

কিন্তু যুগপৎ বহু বিন্দু হতে অন্যোন্য-অনুভবের সমাহারে একটি অখণ্ড-সংবর্তুল অনুভব নয়। এইজন্য তারও পূর্ণতার অপেক্ষা রয়েছে।

এই পূর্ণতা আসে, অধিচেতনা যখন রূপান্তরিত হয় বিশ্বচেতনাতে। অধিচেতনার স্বভাবেই সে-রূপান্তরের সংবেগ রয়েছে। অধিচেতনার প্রাতিভ-শক্তিতে যুগপৎ দুটি ক্রিয়া চলতে থাকে—একটি ব্যাপ্তির, আরেকটি অনুপ্রবেশের। তাতে অন্তর্মুখ চেতনা যেমন ক্রমে স্বচ্ছ ও লঘু হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি সে যেন বিশ্বের মর্মের গভীরে তলিয়ে গিয়ে আত্মার স্পন্দনে অনুভব করে তার হৃদয়ের স্পন্দন। একদিকে আকাশের মত পরিব্যাপ্ত উদার চেতনায় আত্মসত্তার নির্মুক্ত নির্দ্বন্দ্ব অবিচল স্ফটিক-স্বচ্ছ অনুভব, আরেকদিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় সেই আত্মানুভবের সহস্ররশ্মি বিচ্ছুরণ জীবে-জীবে ভূতে-ভূতে বিশ্বের অণুতে-অণুতে। এই দুটি অনুভবের সমাহারে অধিচেতনা উত্তীর্ণ হয় বৈশ্বানর পুরুষের বিশ্বচেতনায়। ওই আদি-অন্তহীন চেতনার নীলাকাশ, তারও উজানে অমানিশার মহাশূন্যতা, আকাশের অঙ্গনে চিৎসূর্যের প্রভাতরল জ্যোতির প্লাবন। তারই বুকে দুলছে বিশ্বের হিরন্ময় সহস্রদল লীলাকমল, অচিতি আর অতিচিতির পরঃকৃষ্ণ দুটি বেষ্টনীর মধ্যে চিতিশক্তির অযুতভঙ্গিম বর্ণোচ্ছ্বাসে—আনন্দে-বেদনায় অনুরাগে-বিরাগে জয়ে-পরাজয়ে প্রজ্ঞায়-মূঢ়তায় সব সেই বৈশ্বানর 'আমি'র চিদ্‌বিলাস! সে-আমি জীব নয়, শিব—প্রতি জীবের গভীরে চেতনার চরমকোটিতে স্বয়ম্ভূসত্তার অমৃত-আশ্বাস। এই শৈবচেতনা তার আত্মচেতনা, এইখানেই নিস্পন্দ সত্তার মর্মে নিখাত বজ্রবিন্দু হতে ছড়িয়ে পড়ছে ব্রহ্মের বিশ্বরূপে আত্মরূপায়ণের রশ্মিজাল।

এই বিশ্বচেতনা বৈশ্বানর পুরুষের আত্মচেতনা—বৈশ্বানর আর বিশ্ব এখানে এক। আপনাকে জানাই এখন বিশ্বকে জানা, তাই জানায় আর হওয়ায় এখানে তফাত নাই। এই হল তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের রীতি। এইখানে এসে অবিদ্যার আঁকাবাঁকা দীর্ঘ অভিসার শেষ হয় বিদ্যার সাগরসঙ্গমে। বস্তু বা ঘটনার সত্তা এখানে আত্মসত্তা হতে অভিন্ন যখন, তখন স্বভাবতই এ-বিজ্ঞান কালাতীত। একটি বীজের মধ্যে একটা গাছের ক্রমিক ইতিহাস যেমন গুটিয়ে থাকে—জনক-ভাব আর জননী-শক্তির আত্মসংহতিতে, তেমনি এখানে একটি অঘটন ক্ষণের বিন্দুতে শাশ্বত ঘটনার উত্তাল সিন্ধু স্তব্ধ হয়ে আছে। অথচ আছে অচেতন হয়ে নয়, অক্রিয় হয়ে নয়; কেননা বিন্দুর চেতনা ও শক্তি এখানে সিন্ধুর সংকোচ বা প্রতিষেধ নয়। উপমা তথ্যের আরেকটু কাছাকাছি

যায়, যদি বলি কবিচেতনার উজ্জ্বলতম মুহূর্তের মধ্যে কাব্যের রূপায়ণ সংহত অথচ স্ফুরণোন্মুখ হয়ে থাকে যেমন তেমনি।

দেখলাম চেতনার তিনটি থাক। সবার উপরে এবং সবাইকে জারিত করে বিশ্বচেতনা, তার জ্ঞানাশক্তির (power of knowledge) বাহনরূপে অধিচেতনা এবং সবার নীচে আমাদের নিত্যপরিচিত প্রাকৃত চেতনা। আবার এই তিনটিই বৈশ্বানর পুরুষের আত্মচেতনার সহজ বিভূতি। তিনটি চেতনায় জ্ঞানের বিশিষ্ট সাধনও আলাদা-আলাদা—যদিও চেতনা মূলত এক বলে এক-স্তরের সাধনশক্তির ক্রিয়া আরেক স্তরে দেখা দেবার কোনও বাধা নাই। বিশ্ব-চেতনায় জ্ঞানের সাধন হল তাদাত্ম্যবিজ্ঞান, অধিচেতনায় অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ আর প্রাকৃত চেতনায় পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ। তাদাত্ম্যবিজ্ঞানে যেমন বিষয় আর বিষয়ীতে ভেদ থাকে না, তেমনি আবার প্রাকৃত চেতনা বিশেষ করে ভেদজ্ঞানের ভূমি, আর অধিচেতনা দুয়ের মাঝামাঝি।

এই হল বিদ্যার অবিদ্যায় পরিণামের ছক। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিদ্যার শক্তি অবিদ্যার মধ্যে যখন নেমে আসে, তখনও বস্তুত সে তার স্বরূপ হারায় না ; অর্থাৎ তখনও বিদ্যা অবিদ্যাকে জানে, যদিও অবিদ্যা বিদ্যাকে জানে না। বৈশ্বানর পুরুষের মধ্যে বিদ্যা আর অবিদ্যা দুয়েরই জ্ঞান ভাসছে এবং অবিদ্যা সেখানে ভাসছে বিদ্যার সপ্রয়োজন বিলাসরূপে। এই আমিই সেখানে ভেঙে গিয়ে আমি-তুমির ভেদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু সে-ভেদ বিলাসের জন্য—আমাকে তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আমার মধ্যে নিবিড় করে আস্বাদন করবার জন্য। এই আস্বাদনে ভাবের সঙ্গে জাগে শক্তির উল্লাস, আর অধিচেতনা হয় সে-উল্লাসের আশ্রয়। অধিচেতনার বীর্য না জাগলে আমাকে তোমাতে ভাঙিয়ে আস্বাদন করতে গিয়ে তোমাকে আমার কাছে থেকে দূরে সরিয়েও দিতে পারি। প্রাকৃত চেতনাতে আমরা তা-ই দিই, আবার সে-হারানিধিকে খুঁজে পাবার জন্য আঁকুপাকুও করি। প্রাকৃত দৃষ্টিতে 'আমি' হতে 'তুমি' একটু দূর, আবার 'সে' যেন আরও দূর—সমস্তটা দুনিয়া অধম-পুরুষের মেলা। এইখানে সত্তার সঙ্গে সত্তার বিচ্ছেদে অবিদ্যার ভরা পূর্ণ হয়, যদিও বিচ্ছেদকে মিলনে নিটোল করবার জন্য তার আকুলিবিকুলিরও অন্ত নাই।

কিন্তু এই আপাতবিচ্ছেদের মধ্যেও বৈশ্বানর পুরুষের নিগূঢ় চেতনায় চলছে প্রপঞ্চের রাসমঞ্চে এক অনির্বচনীয় রসের উল্লাস—এক চিন্ময় অনাদিমিথুনকে ঘিরে আনন্দবৃন্দাবনের নিত্যরসোদ্‌গার। অভেদের প্রজ্ঞানঘন ব্যঞ্জনায় ভেদ সেখানে অনির্বচনীয় রসশক্তির উচ্ছলনেই সত্য। প্রাকৃতমনের কাছে এ-অনুভব কল্পনাতীত। সত্তার বজ্রকন্দে চেতনার বিস্ফোরণ না ঘটলে এই সাদা চোখের দেখা ব্রহ্মদর্শনে রূপান্তরিত হয় না। অথচ এই অনুভবই বৈশ্বানর পুরুষের সহজ ও স্বচ্ছন্দ অনুভব—পূর্ণযোগীর সহজসমাধি।

এই সহজসমাধির দিকে উজিয়ে যাওয়ার সাধনাই বিদ্যার বুকে অবিদ্যার উত্তরায়ণের তপস্যা। তাদাত্ম্যবিজ্ঞান বনাম ভেদজ্ঞানের দ্বন্দ্বের সমাধান এইখানে।

একাদশ অধ্যায়

অবিদ্যার অবধি

এইবার দেখা যাক, অবিদ্যা আমাদের প্রাকৃত চেতনার কতখানি জুড়ে আছে। আমরা কি জানি আর কি জানি না, তার একটা হিসাব নেওয়া যাক। তাহলে কেন জানি না, তা তলিয়ে বোঝা সহজ হবে।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে দর্শন আর- বিজ্ঞান-চর্চায় মানুষ এত উন্নতি করেছে যে, তার জ্ঞানের ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে প্রথমে মনে হয় সে আজ সবজান্তা। কিন্তু একটু আগে জ্ঞানের প্রকার (mode) নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, এ-জানার বেশির ভাগ বস্তুর সদরমহলের পরিচয়, অন্দরমহলের নয়—এই তার মারাত্মক ত্রুটি। এতে জড়ের আইনকানুন আমাদের খানিকটা রপ্ত হয়েছে, ভোগোপকরণের সঞ্চয়ও বেড়েছে—কিন্তু প্রাণ এবং মনের জগৎ আমাদের বশে আসেনি, সেখানে আমরা আজও অনেকটা দিন-কানা। প্রাণ আর মনের পরিচয় সবচাইতে অন্তরঙ্গ আমার নিজের চেতনায়, সুতরাং আমাকে আমার সবচাইতে ভাল করে জানবার কথা। অথচ এইখানেই আমরা অন্ধ। আত্ম-অবিদ্যা হল আমাদের চেতনায় অবিদ্যার প্রথম ঘোর।

নিজেকে আমরা কতটুকু জানি ?—বলতে গেলে কিছুই নয়। আমাদের প্রাকৃত চেতনার যে তিনটা থাক জাগ্রৎ স্বপ্ন আর সুষুপ্তি নিয়ে, তার মধ্যে একমাত্র জাগ্রতের পরিচয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট। তারও সদরটা বোঝাই বাইরের জগতের তথ্যের স্তূপে ; অন্দরে ঢুকে দেখি, সেখানে সবই আবছা। সেখানকার স্মৃতি পঙ্গু, কল্পনা অস্পষ্ট, ভাবনা এলোমেলো—শুধু সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার বেদনা তীক্ষ্ণ হয়ে অন্ধপ্রবৃত্তির মূলে প্রেরণার যোগান দিয়ে চলেছে। আমাদের চেতনার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে আছে মনের বেষ্টনীতে। যা মনের এলাকার বাইরে, আগে তাকে ফেলতাম অচেতনার কোঠায়। আজকাল মনের তলাতেও চেতনার একটা চোরকুঠুরির সন্ধান পেয়েছি, তাই এখন তাকে ফেলি অবচেতনার এলাকায়।...কিন্তু অবচেতনার ধারণা সবার কাছে খুব পরিষ্কার নয় বলে এখানে তার কথা একটুখানি বলে নিই।

যা মনশ্চেতনার এলাকায় পড়ে না, তার নাম যদি দিই অন্তশ্চেতনা, তাহলে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধা হবে। এই অন্তশ্চেতনার মধ্যে প্রাকৃত স্বপ্নচেতনা আর সুষুপ্তিচেতনা তো পড়বেই, তাছাড়া পড়বে দৈহ্যচেতনা আর প্রাণ-চেতনা—যাদের আমরা অনেকসময় অবচেতনার সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলি। দেহ আর প্রাণের ক্রিয়ার মূলে একটা ঋত-চেতনার (truth-consciousness) প্রেরণা আছে, যা প্রাকৃত শক্তির নানা বিপর্যাসেও অভ্রান্তভাবে তাদের চালিয়ে নেয়। মানুষের মধ্যে মনের শক্তি প্রবল বলে ঋত-চেতনা অনেকটা নেপথ্যে পড়ে গেছে, কিন্তু পশুর মধ্যে এ-চেতনা এখনও বেশ সক্রিয়। তাই পশু বিচার না করেও দেহ-প্রাণের অনেকগুলি তাগিদ নির্ভুলভাবে তামিল করে চলে, অথচ মনের ধাঁধাতেই মানুষ সেখানে ভুল করে বসে। দেহ-প্রাণের এই ঋত-চেতনা বস্তুত অধিচেতনার অন্তর্গত—যার কথা আগে বলেছি। এ-চেতনা মনের অগোচর বলে 'অবমানস' (sub-mental) বলতে পারি, কিন্তু একে অবচেতনা বলা ঠিক হবে না।

ব্যক্তি বিশ্ব হতে আলাদা একটা-কিছু নয়, বিশ্বের ঋতম্ভরা শক্তিই তার মধ্যে নানা ছন্দে কাজ করে চলেছে। এই শক্তিক্রিয়ার খানিকটা শাসনভার যেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মনের 'পরে। মন তার সম্বন্ধে সচেতন, আর ব্যক্তির অহং হল তার নিয়ন্তা। মন যে এখানে পূর্ণজ্ঞান নিয়ে তার অধিকার পরিচালনা করছে, তা নয়। ব্যাপারটা চলছে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকারে, তাই ভুলচুক তার মধ্যে হচ্ছে যথেষ্ট। কিন্তু মনের আড়ালে মহাপ্রকৃতির ঋতের শাসন তারও মধ্যে অব্যাহত আছে। এই শাসনভার রয়েছে অধিচেতনার 'পরে। অধিচেতনাই প্রাকৃত চেতনার সব বিভাগের বাহক এবং নিয়ন্তা: তার জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, তার দৈহ্য- ও প্রাণ-চেতনার সব-কিছুর নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে ওই অধিচেতনা থেকে। প্রাকৃতমন সাক্ষাৎভাবে অধিচেতনার কোনও খবর রাখে না—ও তার কাছে অনেকটা অগম-অতল নিদ্‌মহলের মত। কিন্তু জাগ্রতের উপকণ্ঠে তার নিজস্ব একটা নিদ্‌মহল আছে, যার মধ্যে সে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার নানা সংস্কার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল পুঁজি করে রাখে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে। এই হল সত্যকার অব-চেতনা। অধিচেতনার নিদ্‌মহলের সঙ্গে তার তফাত এই, অবচেতনায় অবিদ্যার পুরা দখল, সেখানে সব ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন; কিন্তু অধিচেতনার নিদ্‌মহলে জ্বলছে প্রজ্ঞার মণিদীপ—বিদ্যা সেখানে আচ্ছন্ন বা বিকৃত নয়, নিগূঢ় মাত্র।

তাহলে আমাদের ব্যক্তিচেতনার চেহারাটা দাঁড়াচ্ছে যেন সমুদ্রে নিমজ্জিত তুষারশৈলের মত। শৈলের একটু অংশ উপরে জেগে আছে—সেই হল আমাদের জাগ্রৎচেতনা; আর তার বেশির ভাগ জলের তলে—ওই হল আমাদের অন্তশ্চেতনা। অন্তশ্চেতনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে অধিচেতনা—বিশ্বের সত্যের বাহন ও শক্তির করণ হয়ে; সে-ই আমাদের অন্তর্গূঢ় স্বপ্নপুরুষ, সুষুপ্তিপুরুষ এবং 'প্রাণ-শরীর-নেতা' মনোময় পুরুষের আশ্রয়। এমন-কি বিশ্বজড়ের গভীরে আন্দোলিত যে ঋত-চেতনার ক্রিয়া, সত্তার অতিগহনে তারও সঙ্গে সে আমাদের যোগ ঘটাচ্ছে। এই নিগূঢ় অধিচেতনা আর ওই উপরভাসা জাগ্রৎচেতনা—দুয়ের মাঝামাঝি একটা বাষ্পাচ্ছন্ন জগৎ; তা-ই হল অবচেতনা। তারই ঘোর জাগ্রতে এবং স্বপ্নে নানা বিকারের আকারে দেখা দেয়।

কিন্তু এতেই আমাদের আত্মপরিচয় শেষ হয়ে যায়নি। অধিচেতনাকে ছাপিয়ে এবং তাকে জারিত করে আছে এক সীমাহীন অতিচেতনা—যেন তুষারশৈলকে ঘিরে তার তলায় এক অতল সমুদ্র, তার উপরে এক অপার সমুদ্র। দুটি সমুদ্র মিলে এক অদিতি-চেতনার পরিমণ্ডল—তাকে আমরা বলি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান। এই অন্তহীন ব্যাপ্তি-চৈতন্য ওই তুষার-শৃঙ্গের বজ্রকূটে একটি মণিবিন্দুতে সংহত হয়েছে—তা-ই আমাদের আত্মা। তার অন্তর্দীপ্তি জাগ্রতের একটুকু পরিসরকে আবছা আলোকিত করে রেখেছে—এই আমাদের প্রাকৃত চেতনার পরিচয়।

অতিচেতনা আর অধিচেতনার বিশাল জ্যোতির্মণ্ডল, আর প্রাকৃত চেতনার ওইটুকু খদ্যোতদ্যুতি—দুয়ে তুলনা করলে বুঝি, অবিদ্যা আমাদের কাছে সত্যের কতটুকু প্রকাশ করেছে আর কতটুকুই-বা আড়াল করে রেখেছে।

অথচ তার দায়ও কত বড়। তুষারশৃঙ্গের ওই খদ্যোতবিন্দু আপনাকে একদিন বিস্ফারিত করবে মহাসূর্যের অনির্বাণ দ্যুতিতে। এই চেতনাতেই কালের অনন্ত কলনা আর দেশের অসীম বিস্তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে সর্বাবগাহী অস্তিত্বের আত্মবিভাবনার উল্লাসে—এই তার দিব্য নিয়তি। আর তারই জন্যে অনেক মৃত্যুকে অতিক্রম করে শাশ্বত অমৃতের দিকে অবিদ্যারও এই অশ্রান্ত উত্তরায়ণের তপস্যা।

দ্বাদশ অধ্যায়

অবিদ্যার নিদান

অবিদ্যার রীতের পরিচয় মোটামুটি পাওয়া গেল। এবার আসা যাক তার নিদানকথায়, অবিদ্যার সত্যকার স্বরূপ কি তা-ই বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

জগৎরহস্যকে যেমন আমরা বুঝতে চেয়েছি অদ্বয়ব্রহ্মের ভাবনা দিয়ে, অবিদ্যার তত্ত্বও তেমনি খুঁজতে হবে ব্রহ্মের মধ্যে। 'ব্রহ্মই সব-কিছু হয়েছেন' এই যদি পূর্ণাদ্বৈতের মূল সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে মানতে হবে অবিদ্যাও বস্তুত ব্রহ্মস্পন্দ, ব্রহ্ম থেকে সে আলাদা একটা-কিছু নয়। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান; সুতরাং তিনি অবিদ্যারও জ্ঞাতা এবং নিয়ন্তা, সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনে জেনেশুনেই তিনি অবিদ্যাকে একটা অর্থপূর্ণ সাধনরূপে ব্যবহার করছেন। সূর্যের কিরণে জল মেঘ হয়ে সূর্যকে যেন ঢেকে ফেলে, আবার বৃষ্টির সঞ্জীবন ধারায় পৃথিবীর 'পরে গলে পড়ে। কিন্তু মেঘ আমাদের দৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করে, সৌরতেজকে আচ্ছন্ন করতে পারে কি? আমরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দেখি, সূর্যের চাইতে যেন মেঘের শক্তি বেশী। কিন্তু সূর্যে থাকলে দেখতাম, আগাগোড়া সমস্তটা ব্যাপার সৌরতেজেরই লীলা। সৌরশক্তিই পৃথিবীর বুকে প্রাণ হয়ে ফুটবে বলে এই মেঘ আর বৃষ্টির আয়োজন। এই পৃথিবীও সেই শক্তির বিগ্রহ।

এই কথাটি মনে রেখে অবিদ্যার তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। অবিদ্যাশক্তি ব্রহ্ম হতেই বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তাঁর বিদ্যাশক্তিকে আচ্ছন্ন বা পঙ্গু করছে না। তাই উপনিষদের ঋষি বললেন, তিনি কিরকম শুদ্ধ, না 'অপাপবিদ্ধ'রূপে শুদ্ধ—পাপ আছে, অথচ তাঁকে বিদ্ধ করছে না। সাপের বিষ সাপকে কিছু করে না, কিন্তু মানুষের শরীরে ঢুকলেই সর্বনাশ। অবিদ্যা আচ্ছন্ন করে জীবের দৃষ্টিকেই; তাও সবসময়ের জন্য নয়, কিংবা নিষ্প্রয়োজনেও নয়।

কিন্তু এই আচ্ছন্ন দৃষ্টির জন্যই অবিদ্যার আসল তত্ত্ব বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয়। প্রথমেই এ-প্রসঙ্গে ধাঁধা লাগে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিয়ে।

কেউ বলেন, 'ব্রহ্মে আছে বিদ্যা, আর জীবে অবিদ্যা। বিদ্যা আর অবিদ্যায় নিত্যবিরোধ, সুতরাং জীব আর ব্রহ্মেও নিত্যভেদ। তাই জীবের জীবত্ব সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিতে পারলে অবিদ্যার নিরসনে তার ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে।' এতে অবিদ্যানিবৃত্তির পথ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার তত্ত্ব বোঝা গেল না, ব্রহ্মের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও পরিষ্কার হল না।···কেউ আবার ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত দিয়ে মাঝামাঝি একটা রফা করতে চান। বলেন, 'স্বরূপসম্বন্ধে জীব আর ব্রহ্ম অভেদ বটে, কিন্তু ক্রিয়াতে দুয়ের মাঝে ভেদ আছে। আর এই ক্রিয়ার জগৎটাই অবিদ্যার জগৎ।' এতেও অবিদ্যা ব্রহ্ম থেকে তফাতে রয়ে গেল, সুতরাং তার আবির্ভাব-রহস্যের কোনও কিনারা হল না। তাছাড়া স্বরূপের অদ্বৈতকে একমাত্র অদ্বৈত বলে ক্রিয়ার অদ্বৈতকে যদি অস্বীকার করি, তাতে কি বস্তুত অদ্বৈতহানি ঘটে না?···আবার কেউ-কেউ এ-প্রসঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় নেন। বলেন, 'এ-জগৎ যে অবিদ্যার জগৎ, তাতে কোনও ভুল নাই। কিন্তু জগতের মূল আমরা কোনকালেই খুঁজে পাব না, সুতরাং অবিদ্যারও মূল কি তা জানা যাবে না। অবিদ্যার নিরসনই হল আমাদের পরম পুরুষার্থ। অবিদ্যার তত্ত্ব না জেনেও আমাদের চেতনায় যদি তার ক্রিয়াকে রুদ্ধ করতে পারি, তাহলেই আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেল। একটা কথা খুবই স্পষ্ট। ব্রহ্মকে জানতে হলে আমাদের অবিদ্যার উজানে সুতরাং জগদ্‌বোধের বাইরে যেতেই হবে। সকল খণ্ডিত অনুভব পেরিয়ে পাই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের অনুভব। "ইতি"র অনুভব চরমে ওঠে ওইখানে। তারও ওপারে মহাশূন্য, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে "অসৎ"। বলতে পার, সে-ই জগন্মূল, সুতরাং অবিদ্যারও মূল ওইখানে। কিন্তু অসতের তো কোনও লক্ষণ নাই, তত্ত্বও নাই।'

এই একধরনের অজ্ঞেয়বাদে মানুষের সকল জিজ্ঞাসার শেষ হয়ে এসেছে এতকাল। সমস্ত ইতির পিছনে নেতির পটভূমিকা, পূর্ণের পিছনে শূন্যের অমানিশা—এও বিজ্ঞানের একটা দিক এবং এই সর্বনাশের আকর্ষণও মানুষকে কম পাগল করে তোলে না। কিন্তু সব অজ্ঞেয়বাদের যে-ত্রুটি, এরও তা-ই। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, এও বুদ্ধির পরাভব মাত্র। 'পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে শেষপর্যন্ত আর-কিছুই থাকে না'—তা ঠিক। কিন্তু ওই কিছু না-থাকাটাই তো আর পেঁয়াজের তত্ত্ব নয়। তাছাড়া এক বুদ্ধির কাছে যা অজ্ঞেয়, তার চাইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে তা বিজ্ঞেয় হতেও পারে। বুদ্ধি যেখানে এসে হাল ছেড়ে দিয়ে বলছে, 'এর পরে আর-কিছু দেখতে পাচ্ছি

না', সেখানেও সে অনুভব করে সামনের ফাঁকাটা শূন্য হলেও নাস্তি নয়, একটা-কিছু সেখানে আছেই। দর্শনে শূন্যবাদীর নির্বাণও তো নাস্তিবাচক সংজ্ঞা নয়—তিনি তাকে বলেন, 'অসংস্কার অমৃত অনুভব।' অর্থাৎ বুদ্ধি যেখানে খেই হারিয়ে বলে 'কিছুই নাই', বোধি সেখানে নিঃশব্দে সমস্ত সত্তাকে পূর্ণ করে তোলে। নইলে শূন্যের সাধনা হত আত্মহত্যার শামিল। বুদ্ধি যাকে শূন্য বলছে, তারও বোধ যদি বাস্তবজীবনের ব্যবহারে না নেমে আসে, তাহলে তার সার্থকতা কি ?

এইজন্য অসৎ বা শূন্য স্বরূপত কখনও চরম তত্ত্ব হতে পারে না। তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হওয়া চাই। আর উপলব্ধির প্রকার নাস্তিবাচক হলেও, তার অন্তঃসত্ত্ব (content) সবসময়েই অস্তিবাচক—কেননা উপলব্ধি আর সত্তায় কখনও ছাড়াছাড়ি হতে পারে না। চেতনার চরম রিক্ততাতেও 'একটা-কিছু' থাকেই ; এই 'একটা-কিছু'ই ব্রহ্ম বা জগন্মূল। বুদ্ধির দৃষ্টিতে যে অস্তি-নাস্তির দ্বৈত, তা এই অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার বিলাস। তাইতে উপনিষদের ঋষি বলেন, 'আঁধার ঘুচে গেলে দেখি, দিনও নাই রাতও নাই, সৎও নাই অসৎও নাই—আছেন কেবল শিব।'

আবার এই শিব অশক্ত নন, তিনি নিত্যশক্তিযুক্ত। প্রাকৃত বুদ্ধিতে আমরা ক্রিয়া দেখে শক্তির অনুমান করি, তাই নিষ্ক্রিয়কে মনে করি শক্তিহীন। কিন্তু একটু তলালেই বুঝি, আপাতত যেখানে ক্রিয়া দেখছি না, সেখানেও হয় সূক্ষ্মতর ক্রিয়া আছে কিংবা কোনও-না-কোনও ক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে ; অর্থাৎ শক্তি সেখানে অব্যক্ত, কিন্তু অসৎ নয়। এই অব্যক্ত শক্তির নিবিড় পরিচয় পেতে পারি নিজের মধ্যে—কেননা শক্তির সাক্ষাৎ উপলব্ধি বস্তুত আত্মানুভবে, তাছাড়া সর্বত্র শক্তি অনুমানগম্য মাত্র। ধরা যাক চিত্তের স্পন্দন। নিশ্চয় এটা চেতনার শক্তির খেলা। এই স্পন্দনকে যদি রুদ্ধ করে দিই, তাহলে শক্তির ক্রিয়া রইল না, কিন্তু শক্তিও কি রইল না ? যোগিমাত্রেই জানেন, নিস্পন্দ চিত্তে কি প্রচণ্ড জ্যোতিঃশক্তির আবির্ভাব হয়—ক্রিয়া গুটিয়ে আসে জ্ঞানে, জ্ঞান গুটিয়ে আসে ইচ্ছাতে, আর সেই অণুপ্রমাণ ইচ্ছার চিদ্-বিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ড-টলানো শক্তি স্তব্ধ হয়ে থাকে। দেশ কাল নিমিত্তের কোনও বাঁধন নাই, তাই শক্তি সেখানে চিন্মাত্র—সত্তা চেতনা ও শক্তি তিনে এক, একে তিন। এই ব্রহ্ম, এই জগন্মূল।

এই ব্রহ্মশক্তিকে প্রাচীনেরা বলতেন 'তপঃ', আর বলতেন এই তপ সৃষ্টির

গোড়ায়। এখানে যা-কিছু আছে বা ঘটছে, তা ব্রহ্মের চিন্ময় তপের পরিণাম। উপমা দিতে পারি সূর্যের বা 'সবিতার'। আলো আর তাপ যেমন তার মধ্যে গুটিয়ে আছে, তেমনি বিকীর্ণ হচ্ছে জড় প্রাণ মন আর বিজ্ঞানের আনন্দ-লীলায়নে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলে এক তপস্বান্ সবিতা আর তাঁর তপঃ-শক্তি সাবিত্রী।

ব্রহ্মের তপ যেমন সৃষ্টিতে, তেমনি প্রলয়ে। সৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ, প্রলয়ে নির্গুণ; একটিতে তাঁর তপঃশক্তির উচ্ছলন, আরেকটিতে তার সংহরণ। ক্রিয়ার দুটি ধারা, কিন্তু মূলে একই শক্তি। সে-শক্তি যাঁর, তিনি যুগপৎ সগুণ-নির্গুণ ক্ষর-অক্ষর দুইই। দুইই তাঁর বিলাস, আবার তিনি দুয়েরও বাড়া। তাই গীতায় তিনি 'পুরুষোত্তম'। পুরুষোত্তমরূপে যেমন তিনি অক্ষরস্থিতিতে নিস্পন্দ, তেমনি আবার ক্ষরবিভূতিতে উচ্ছলিত—পর্যায়ক্রমে নয়, যুগপৎ। পর্যায়দৃষ্টি হল প্রাকৃত বুদ্ধির—যে একসঙ্গে সবটাকে দেখতে পাচ্ছে না। বুদ্ধির দীপ ঘুরে-ঘুরে যার উপরে পড়ে, শুধু তাকেই আলো করে, বাকীটা থাকে আঁধারে। তাই চরম তত্ত্বের বিচারে দৃষ্টির দ্বৈতকে কিছুতেই সে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।

ব্রহ্মের অক্ষরভাব আর ক্ষরভাব দুয়েরই মূলে অবিরোধে একই তপঃশক্তির প্রেষণা, এটি বুঝতে হলে তপঃশক্তির স্বরূপকে ভাল করে জানা দরকার। তপ বলতে সাধারণত আমাদের মনে পড়ে কৃচ্ছ্রসাধনার কথা। ওটা কিন্তু তপের আসল অর্থ নয়। চেতনাকে অন্তর্মুখ করবার জন্য তপের মধ্যে সংযম (control) আছে, কিন্তু নিগ্রহ (repression) নাই। আমরা সংযম করি স্বেচ্ছায়, জেনে-শুনে—চেতনার উৎকর্ষসাধনের জন্য; আর নিগ্রহ করি বোকার মত, হয়তো বাধ্য হয়ে। এলোমেলো শক্তির খেলা চলছে চেতনার অঙ্গনে; তার ধারাকে খাতবন্দী না করতে পারলে তাকে আমরা বশে আনতে পারি না। এখানে সংযমের দরকার, শক্তির খপ্পরে না পড়ে রাস টেনে ধরবার জন্য একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ানো দরকার। চিত্ত তখন স্বভাবতই অন্তর্মুখ হয়। এই অন্তর্মুখীনতা সংযম আর বিবেকের শক্তি হল আসল তপঃশক্তি। তাতে চেতনার গুণের উৎকর্ষ ঘটে।

আমরা তপঃশক্তির সাধনা জীবনে করি আর না করি, দেবতার তপঃশক্তি কিন্তু সৃষ্টির সবত্র কাজ করছে। কালের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কল্পনা করা যেতে পারে, সৃষ্টির গোড়ায় যেন একটা অসাড় অন্ধতমঃ। তার মধ্যে শক্তির স্পন্দন

প্রথম জাগল এলোমেলো হয়ে—ঋষির ভাষায় নির্ঋতি (chaos) হয়ে। নির্ঋতির মধ্যে ক্রমে দেখা দিল ঋতের (order) ছন্দ। আমরা তাকে বলি প্রকৃতির আইন; ঋষিরা চৈতন্যের দিক থেকে সব-কিছু দেখতেন বলে বলতেন, 'দেবতার ব্রত'। 'ব্রত' কি না নির্ঋতির মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তাদের মধ্য থেকে কতকগুলিকে ঋতের ছন্দে রূপ দেবার জন্য 'বেছে নেওয়া'। বিশ্বের সর্বত্র—কি বস্তুর স্বভাবে, কি ঘটনার প্রবাহে—এই ব্রতের ভিতর দিয়ে দেবতার ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কাজ করে চলছে একটা সুদূর ভব্যার্থকে (possibility) লক্ষ্য করে। ঋষির ভাষায় এই তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ', সৃষ্টির মূলে তাঁর সত্যসঙ্কল্পের প্রবর্তনা।

শক্তির বিক্ষেপকে ঋতের ছন্দে একটি ধ্রুবলক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নেওয়া যদি তপঃশক্তির পরিচয় হয়, তাহলে স্পষ্টই দেখছি, তার মধ্যে অক্ষর আর ক্ষর দুয়ের ধর্মের সমন্বয় ঘটছে। শক্তির ক্রিয়াকে চলতে দিতে হবে—এই হল ক্ষরের ভাব; কিন্তু তাকে বেচাল হতে দেওয়া হবে না, এই হল ঋষিয় ভাষায় 'অক্ষরের প্রশাসন'। এ যেন ভিড়ের মধ্যে ওস্তাদ ড্রাইভারের মোটর হাঁকিয়ে যাওয়ার মত: বাইরে হাত-পা-চোখ সব নির্ভুলভাবে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরের মানুষটি ষোল-আনা হুঁশে থেকেও যেন পাথর হয়ে আছে, নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। অথচ ওই স্তব্ধতা থেকে স্থিরসঙ্কল্পের একটা বিদ্যুৎস্রোত তার মন জ্ঞানেন্দ্রিয় এমন-কি গাড়িখানাকেও যেন একটু এদিক-ওদিক না করে সচল রাখছে। এর মধ্যে তপঃশক্তির দুটি ক্রিয়াই যুগপৎ চলছে দেখছি: চেতনা যেমন ভিতরে গুটিয়ে এসে আত্মসমাহিত হয়ে আছে, তেমনি বাইরে স্বচ্ছন্দকর্মে স্ফুরিতও হচ্ছে। সমাধিতে আর কর্মে এখানে কোনও বিরোধ ঘটছে না, বরং কর্ম আরও সার্থক হচ্ছে ওতেই।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, তপঃশক্তি যখন বিশিষ্ট কোনও পরিণামকে লক্ষ্য করে সক্রিয় হয়, তখন তার ফলে চেতনার মধ্যে আত্মসংহরণের (self-gathering) একটা সংবেগ দেখা দেয়। তপশ্চেতনার এই আত্মসংহরণই আমাদের অবিদ্যাপ্রবৃত্তির মূলে কাজ করছে। কিভাবে তা পরের পরিচ্ছেদে স্পষ্ট হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অবিদ্যা ও অভিনিবেশ

বলেছি, তপঃশক্তির মূলে হল অন্তর্মুখীনতা আর সংযম। তাতে ভিতরে একটা আত্মস্থ নিরেট ভাব জন্মায়, তারই খানিকটা বাইরের কর্মে উপচে পড়ে নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে। এখন বাইরের দিক ছেড়ে তপঃশক্তির ভিতরের দিকে তাকালে দেখব, তার মধ্যে শক্তিকে খাতবন্দী করবার একটা তাগিদ আছে। দেবতার 'ব্রতের' মধ্যে আমরা তার ইঙ্গিত পেয়েছি। শক্তি যদি তার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় (equilibrium) থাকে, তাহলে ক্রিয়া দেখা দেয় না। সাম্যের মধ্যে কোথাও একটা টান (tension) উৎপন্ন হওয়া চাই, তাহলেই তাকে ধরে শক্তি সক্রিয় হতে পারে। চেতনার ক্ষেত্রে এই টান উৎপন্ন করে যে-বৃত্তি, তাকে বলে 'অভিনিবেশ (exclusive concentration) অর্থাৎ কিনা একটা-কিছুর দিকে ঐকান্তিক ঝোঁক। এই অভিনিবেশের মধ্যেই আমরা অবিত্মার স্বরূপ আর শক্তিকে খুঁজে পাব। কেমন করে তা বলছি।

প্রাকৃত ভূমির একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আমি শূন্যমনে বসে আছি : বাইরের দৃশ্য দৃষ্টিক্ষেত্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, সবই দেখছি কিন্তু মনকে কোথাও নিবিষ্ট করছি না। বলা চলে, চেতনার ক্ষেত্র আর দৃষ্টির ক্ষেত্র এখানে সমব্যাপ্ত, উদাসীন ব্যাপ্তির বোধ চিত্তের মধ্যে একটা স্বচ্ছ লঘুতাকে যেন আদিগন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ দৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা-কিছু জেগে উঠে ইন্দ্রিয়বোধকে সজোরে আঘাত করল—চেতনা গুটিয়ে এসে নিবিষ্ট হল পরিদৃশ্যের একটি বিন্দুতে, চেতনার গোধূলি-আকাশে যেন একটি তারা ফুটল। ওই দৃশ্যবিন্দুটিকে কেন্দ্র করে চেতনা এখন সতর্ক ও ঘনীভূত হল, আর সেই-সঙ্গে চারপাশটা আবছা হয়ে গেল। দৃশ্যবিন্দুটি যদি চেতনাকে সম্পূর্ণ শুষে নেয়, তাহলে চিত্তের যে-অবস্থা হয়, চলতি কথায় তাকে বলে তন্ময়তা। তারই দার্শনিক সংজ্ঞা হল 'অভিনিবেশ'।

উপরে দেওয়া অভিনিবেশের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে চেতনার ক্রিয়া সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত দেখতে পাচ্ছি, চেতনার মধ্যেই

চেতনার ক্রিয়ার একটা পটভূমিকা আছে যা আকাশের মত ফাঁকা আর ছড়ানো—যদিও তার সম্পর্কে প্রাকৃত চেতনা খুব সজাগ নয়। এই ভূমিকার উপরে চেতনার বিষয়গুলি এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে থাকতে পারে। বহু বিষয়ের চেতনা থাকলেও চিত্তে তখন কোনটাই খুব স্পষ্ট নয়, সব মিলিয়ে একটা আলো-আঁধারি ভাব যেন। বাইরের ধাক্কায় বা ভিতরের তাগিদে সবাইকে ছাপিয়ে একটা-কিছু যখন চিত্তক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন শুরু হয় অভিনিবেশের ক্রিয়া। অভিনিবেশই চিত্তক্ষেত্রের আপতিক সাম্যাবস্থার মধ্যে একটা টানের সৃষ্টি করে এবং চেতনার নিষ্ক্রিয় ব্যাপ্তিকে খাতবন্দী করে সক্রিয় করে তোলে। একটা বিষয়ের বোধ তখন তীক্ষ্ণ হয়, কিন্তু সেইসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের বোধ আবছা বা আড়াল হয়ে যায়। এইখানে আমরা অবিদ্যার মূল লক্ষণটির দেখা পাই। অবিদ্যাকে আমরা বরাবর অচিতি থেকে আলাদা রেখেছি। বলেছি, অবিদ্যা একেবারে 'না জানা' নয়—'ঈষৎ জানা'। অভিনিবেশ যখন চেতনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে আনে, তখন অনেক-কিছুকে সে জানার এলাকার বাইরে ফেলে দেয়, কিন্তু একটা-কিছুকে অন্তত জানার বিষয় করে রাখে। অবিদ্যার কারবার চলে তাকে নিয়ে।

একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব, অভিনিবেশ আমাদের প্রাকৃত জীবনে অপরিহার্য। প্রাকৃত চেতনা জাগছে অচিতির অন্ধকার থেকে—যেখানে সবই আছে, কিন্তু আছে অব্যক্ত নির্বিশেষ হয়ে। এই নির্বিশেষকে সবিশেষ করছে অহংবোধ। আমাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট একটি অহংকে কেন্দ্র করে এক-একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠছে। স্পষ্টই দেখছি, অব্যক্তের মধ্যে এমনি করে ব্যক্তি-অহংএর কেন্দ্র রচনা করা অভিনিবেশের কাজ—তবে কিনা এক্ষেত্রে তার প্রবেগ আসছে বিশ্বশক্তির উৎস থেকে। অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্য বহু হওয়ার উল্লাসে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, আর সেই রোমাঞ্চের প্রত্যেকটি সূচীমুখ ফুটছে জীবাত্মার বিদ্যুদ্‌বিন্দু হয়ে। প্রত্যেকটি বিন্দুর গভীরে ব্রহ্মচৈতন্যের অভিনিবেশ বৈচিত্র্যের মেলায় অনন্ত হয়ে ফোটবার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে। ব্যক্তিচৈতন্য ফুটছে—সেখানেও তার অহংকে আশ্রয় করে অভিনিবেশের ক্রিয়া বিশ্বশক্তির উত্তালতার মধ্যে স্ব-ভাবের অনুকূল একটা ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

তারপর ব্যক্তিজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারে আবার দেখছি অভিনিবেশের ক্রিয়া। যেমন আমাদের অহংবুদ্ধির মূলে অভিনিবেশের একটা স্বাভাবিক

অনুবৃত্তি আছে, তেমনি আবার ব্যবহারে আছে বিক্ষিপ্ত অভিনিবেশ অর্থাৎ বাইরের চাপে বা ভিতরের গরজে কিছুক্ষণের জন্য একটা-কিছুর মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। যখন যাতে তলিয়ে যাচ্ছি, তখন তার বাইরে আর-কিছুকে হয় একেবারেই জানছি না, কিংবা জানছি আবছা-আবছা। অভিনিবেশের সাহায্যে বিষয়ের জ্ঞানকে আমরা যেমন স্পষ্ট করে তুলছি, তেমনি শক্তির ক্রিয়াকেও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত করছি—প্রাকৃত জীবনে এই হল অভিনিবেশের সার্থকতা। কর্মের প্রয়োজনে অভিনিবেশকে আমরা নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করছি যেমন, তেমনি আবার বুদ্ধিনিষ্ঠ অভিনিবেশের মধ্যে সেই বিক্ষেপগুলিকে গুটিয়েও আনছি। যেমন, সংসারে গৃহিণীর অনেক কাজ, প্রত্যেকটি কাজ তাঁর অভিনিবেশের দাবি রাখে। অথচ এই টুকরা-টুকরা অভিনিবেশগুলি চিত্তের গভীরে সংহত হচ্ছে একটি মমত্বময় সেবাবুদ্ধিতে। অভিনিবেশের স্বরূপ সেখানে প্রিয়-পরিজনের প্রতি তন্ময় ভালবাসা।

এইখানে অভিনিবেশের মধ্যে আমরা বিদ্যা আর অবিদ্যা দুয়েরই ক্রিয়া দেখতে পাই। বিক্ষিপ্ত অভিনিবেশে একহিসাবে অবিদ্যার ক্রিয়া প্রধান, কেননা সেখানে জ্ঞান ও শক্তির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে আসে। অথচ এই সঙ্কোচ ঘটে বিদ্যারই প্রয়োজনে—বিষয়ের পরিধিকে সঙ্কুচিত এবং চেতনাকে একাগ্র করে আমরা জ্ঞানকে স্পষ্ট এবং শক্তিকে খাতবন্দী করি। আবার বিক্ষিপ্ত অভিনিবেশের পিছনে যে সামান্য অভিনিবেশ রয়েছে, যার মধ্যে জ্ঞান আর শক্তির বিক্ষেপকে আমরা সংহত করছি, সেখানে বিদ্যার ক্রিয়া প্রধান। বিক্ষিপ্ত অভিনিবেশ আর সামান্য অভিনিবেশকে যথাক্রমে বলতে পারি মনের অভিনিবেশ আর বুদ্ধির অভিনিবেশ। মনের কারবার বাইরের জগৎকে নিয়ে, তাই সে চঞ্চল। কিন্তু ভিতরে বুদ্ধি যদি তার লাগাম ধরে থাকে, তাহলে তার চাঞ্চল্যের মধ্যে একটা ছন্দ দেখা দেয়। বুদ্ধির মধ্যে আছে বিদ্যার দীপ্তি, সে বাহির-ভিতর সব একনজরে দেখে নিয়ে গুছিয়ে কাজ করতে পারে। তাই তার অভিনিবেশ বিদ্যার সামান্য অভিনিবেশ। আর মন হল বাইরের জগতে বুদ্ধির প্রতিভূ—তার হুকুমে এখানে-ওখানে তাকে ছোটাছুটি করতে হয়। তাই তার অভিনিবেশ অবিদ্যার বিক্ষিপ্ত অভিনিবেশ। বুদ্ধির পিছনে আছে বোধি, তার মধ্যে বিদ্যার দীপ্তি আরও উজ্জ্বল এবং অভিনিবেশের পরিধি আরও পরিব্যাপ্ত। কিন্তু সাধারণত প্রাকৃত চেতনায় তার ক্রিয়া স্পষ্ট নয়। আমাদের জীবনের আটপৌরে কারবার চলে মনের অভিনিবেশ

আর বুদ্ধির অভিনিবেশ নিয়ে। সেখানে যার বুদ্ধির অভিনিবেশ যত স্বচ্ছ, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাও তত বেশী।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, অভিনিবেশের দুটি ধরন—একটির লক্ষ্য চেতনার সঙ্কোচ, আরেকটির লক্ষ্য চেতনার ব্যাপ্তি। অভিনিবেশের গতি যখন সঙ্কোচের দিকে, তখনই প্রাকৃত চেতনায় অবিদ্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু সাধারণ জীবনেও একটা ব্যাপ্তির ভূমিকাতে এই সঙ্কোচ ঘটে, যদিও জীব এই ব্যাপ্তির সম্পর্কে সচেতন নয়। প্রতি মুহূর্তের দাবি আমাদের কাছে এত প্রবল যে চেতনার সবটুকু সে-ই গ্রাস করে বসে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে জগৎকে দেখবার সুযোগ বা শক্তি আমাদের থাকে না। যদি কারও থাকে, সে দেখে জগতে যা-কিছু ঘটছে, প্রতিমুহূর্তের ঘটনাহিসাবে তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকলেও তার প্রেরণা আসছে কিন্তু একটা ব্যাপক সামান্যের উৎস হতে। এই মুহূর্তে আমার চিত্তে যে-ভাব জাগল, ক্ষণভঙ্গবাদের বিচারে সে একক, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও সে আমার চিত্তেরই বৃত্তি। বৃত্তিহিসাবে সে বিশিষ্ট হলেও চিত্তের সামান্য-ভূমিকা হতে যে তার উদ্ভব, তাতেও ভুল নাই। জগতের প্রত্যেক বিশেষের মূলে এমনিতর সামান্যের একটা ভূমিকা আছে। আমরা অভিনিবেশকে নিয়োজিত করতে পারি দুদিকেই। সামান্যের দিকে যে-অভিনিবেশ, তা-ই হল বিদ্যার সাধন। সামান্যকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, কেননা ইন্দ্রিয় বিশেষদর্শী। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিশেষদর্শন হতে মন সামান্যের একটা আঁচ করতে পারে। মনের এই আঁচ স্পষ্ট হয় বুদ্ধির মধ্যে। কিন্তু সামান্যও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষের স্পষ্টতা নিয়ে ফুটতে পারে বোধির রাজ্যে—যেখানে বস্তুর ভাবরূপ করামলকের মত প্রত্যক্ষ।

আমাদের মধ্যে তাহলে দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের অভিনিবেশ—মনের, বুদ্ধির, আর বোধির। মনের আর বুদ্ধির অভিনিবেশ দিয়ে আমাদের রোজকার কারবার চলে। আর বোধির অভিনিবেশ হল যোগিচিত্তের বৈশিষ্ট্য—সমনস্কতা, স্থিতপ্রজ্ঞতা, ধ্রুবা স্মৃতি ইত্যাদি তার অনেক লক্ষণ। এখন ব্যষ্টি-চেতনার এই অভিনিবেশকে যদি সমষ্টিচেতনার ভূমিতে তুলে নিই, তাহলে অভিনিবেশের দিক থেকে ব্রহ্মচৈতন্যের একটা নতুন পরিচয় পাই। এবার তার কথাই বলছি।

যোগীর যেমন বোধিগত অভিনিবেশ অর্থাৎ অন্তহীন নিস্পন্দ আকাশে আলোর নিঃশব্দ বিস্তারের মত জাগ্রৎ-সমাধির একটা অনস্তমিত ভাবনা, তেমনি ব্রহ্মেরও স্বগত এবং সর্বগত অভিনিবেশ। তাঁর স্বগত অভিনিবেশ যেন নির্বর্ণ আকাশের স্তব্ধতা—ব্রহ্ম সব ছাপিয়ে নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে আছেন। আর তাঁর সর্বগত অভিনিবেশ যেন সেই অবর্ণ আকাশের রোমকূপ হতে সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও অতিমানস শক্তির জ্যোতির্ময় নিবিড় বিকিরণ। স্বগত অভিনিবেশ সীমাহীন দিগ্‌বর্তুলের মত ঘিরে আছে সর্বগত অভিনিবেশকে। বর্তুলের উপরভাগ অতিচিতি, নীচের ভাগ অচিতি—দুইই যেন চেতনার অমানিশা।

সর্বগত অভিনিবেশের মধ্যে দেখা দেয় ব্রহ্মের বহুধাবৃত্ত (multifarious) অভিনিবেশ—এক বহু হচ্ছেন এই আনন্দের উল্লাসে। যেন আকাশের বুকে সৌরবিম্ব, আর তাহতে বিচ্ছুরিত সহস্র রশ্মিরেখা। বিচ্ছুরণের দিকে যদি তাকাই, রশ্মিগুলি আলাদা। কিন্তু সব রশ্মি গিয়ে মিলেছে একই বিম্বে, এইভাবে দেখলে তারা আলাদা নয়। একেই আমরা আগে বলেছি অধিমানস মায়া। আমাদের বুদ্ধিগত অভিনিবেশের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। এইথেকে অবিদ্যার উদ্ভব, যদিও এখানে বিদ্যার সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।

এর পরেই বিচ্ছেদ এল মনের মায়ায়। অভিনিবেশ আরও গাঢ় হয়ে ধরল বিবিক্ত (separative) অভিনিবেশের রূপ; চলতি কথায় ব্রহ্ম 'পঞ্চভূতের ফাঁদে' পড়ে জীব হলেন। আমরা এলাম অবিদ্যার অধিকারে।

এখানে তবুও প্রাণের চাঞ্চল্য আছে, আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব আছে, চেতনা কম্বুরেখায় পাক খেয়ে চললেও উজিয়ে যাবার একটা অলক্ষ্য প্রয়াস আছে তার মধ্যে। কিন্তু অভিনিবেশ যদি আরও গাঢ় হয়, তাহলে ব্রহ্ম হন জড় —আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয় নিষ্প্রাণ, নিশ্চেতন। এখানে আর অবিদ্যা নয় —অচিতি, যাকে বলতে পারি অতিচিতিরই আরেক মেরু।

এমনি করে অভিনিবেশের শক্তিকে আশ্রয় করে ব্রহ্ম চিৎস্বভাব হতে নেমে আসছেন জড়ে। আবার জড় হতে চিৎস্বভাবের দিকে উজিয়ে যাচ্ছেন এই অভিনিবেশের স্বতঃপ্রসারী শক্তিতে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, অভিনিবেশ ব্রহ্মের চিৎস্বভাবের একটা মৌলিক ধর্ম। উজান-ভাটায় প্রলয়-সৃষ্টির দুটি ছন্দে তার প্রকাশ। ব্রহ্ম সর্বদা সর্বত্র সব-কিছুতে অভিনিবিষ্ট। দেখেছি, আমাদের প্রাকৃত চেতনার ধর্মও তাই, সেও মুহূর্তে-মুহূর্তে একটা-না-একটা কিছুতে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সে-অভিনিবেশ বিক্ষিপ্ত, যদিও বুদ্ধি আড়ালে থেকে বিক্ষেপকে সংহত করবার চেষ্টাও করছে। ব্রহ্মচৈতন্য এই সংহতির চরম। তাঁর মধ্যে সব আছে, সব হচ্ছে—এক নিত্যজাগ্রত দৃষ্টির আবেশে চলছে সৃষ্টি আর প্রলয়ের লীলা। তার সবটাই অভিনিবেশ।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন আমাদের দেহচেতনা। সাধারণত আমাদের মধ্যে তা আবছা থাকে, কিন্তু কোনও গভীর ভাবের আবেগে আবার স্পষ্ট এবং তীব্র হয়েও উঠতে পারে। এমনও হতে পারে, যেন শিরায়-শিরায় আগুন বইছে, দেহের অণু-পরমাণু বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জলে উঠছে। এই আণবিক বোধ কিন্তু আগে ছিল না, এখন এল। দেহচেতনায় তখন একসঙ্গে জাগছে দুটি বোধ : একটা সর্বগত সমরস বোধ—স্বাভাবিক সুস্থ দেহের বোধের মত, অথচ তার চাইতে হাজারগুণ স্পষ্ট ; আবার তারই মধ্যে ওই লক্ষকোটি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের তীক্ষ্ণ বিবিক্ত অথচ অন্যোন্যসঙ্গত বোধ। এই যুগ্মবোধকে বলতে পারি একই সঙ্গে মহান্ এবং অণুর, এক এবং বহুর বোধ—আবার দুটি বোধের মধ্যে একটা সামরস্যের বিদ্যুৎ-বিনিময়। যেমন আমাদের এমনিতর উদ্দীপ্ত দেহবোধ, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডশরীরে ব্রহ্মচৈতন্যেরও উদ্দীপন। তিনি 'মহতো মহীয়ান্' থেকেই 'অণোরণীয়ান্' হয়েছেন, এক থেকেই বহু হয়েছেন। মহতে তাঁর যে-অভিনিবেশ, অণুতেও সেই অভি-নিবেশ। সমস্তটাই এক সর্বগত নিত্যজাগ্রত আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্রিয়া।

এমনি করে ব্রহ্মের মধ্যে যেমন একত্বে বিদ্যার অভিনিবেশ, তেমনি বহুত্বে অবিদ্যার অভিনিবেশ। কিন্তু সবই ব্রহ্মের স্ফুটচৈতন্যে ঘটছে বলে অবিদ্যার দ্বারা বিদ্যা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে না। অথচ আমাদের বেলায় ঘটছে তার উলটা। আমরা আছি অবিদ্যার অভিনিবেশের মধ্যে। ওই হল আমাদের পক্ষে একান্ত, বিদ্যার ভাবনা আবছা। তাই অবিদ্যার অভিনিবেশে আমরা সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও শক্তির পরিধিকে ক্রমে সঙ্কুচিত ও স্তিমিত করে আনছি এবং অবশেষে ডুবে যাচ্ছি এক অন্ধতমিস্রার মধ্যে (যেমন সুষুপ্তিতে)—যেখানে অবিদ্যার অভিনিবেশ গাঢ়তম হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা ঘটছে বিদ্যার দিকে পিছন ফিরে। অথচ কেন এই পিছন-ফেরা, অবিদ্যা তা না জানলেও বিদ্যা কিন্তু জানছে।

অবিদ্যার অভিনিবেশ সবচাইতে গাঢ় হচ্ছে জড়ে, অচিতিতে। সেখানে দেখছি চেতনা অসাড়, প্রাণ সুপ্ত। অথচ শক্তির স্পন্দ সেখানেও আছে,

নির্দিষ্ট ধারায় শক্তির ক্রিয়া সেখানেও চলছে। বরং সে-ক্রিয়া এতই সুনিয়ন্ত্রিত যে বৈজ্ঞানিক তার হিসাব কষে ইচ্ছামত তাকে কাজে লাগাতে পারছেন। জড়ের ক্রিয়ায় যে ঋতের ছন্দ দেখতে পাচ্ছি, তা নিশ্চয় নিগূঢ় বিদ্যাশক্তির কাজ। জড় অন্ধ ও নিষ্প্রাণ হয়েও অবশভাবে সে-শক্তির অনুশাসন মেনে চলছে। নিজের বাইরে কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ নিজের স্বধর্ম ও ঋতচ্ছন্দকে চোখ বুজে আঁকড়ে আছে। এই হল অভিনিবেশের চরম কোটি।

আমাদের অবস্থাও কতকটা এমনিতর। আমরাও নিজের চারদিকে অহন্তার একটা গণ্ডি টেনে বৃহতের আবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি। তবে আমাদের চলন জড়ের মত নিছক অন্ধ আবর্তন নয়। ওর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, খানিকটা স্বাতন্ত্র্য আছে, অনেক দূরের একটা-কিছুর আভাসে চমকে উঠে তার জন্য উতলা হওয়া আছে। এসবই হল চৈতন্যের লক্ষণ। অবিদ্যার ঘোরে সব ভুলে নিজেকে নিয়ে আছি যেমন, তেমনি আবার বিদ্যার প্রেরণায় নিজেকে প্রসারিত করবার চেষ্টাও করছি নানাধরনে। বিদ্যার অভিনিবেশ আর অবিদ্যার অভিনিবেশ দুইই আমাদের মধ্যে সক্রিয়। আমরা আছি একটা দোটানার মধ্যে, যদিও উপরের টানে সাড়া দেওয়াটাই যে আমাদের নিয়তি, এও বেশ বুঝতে পারি।

অভিনিবেশের এই আলোচনা হতে অবিদ্যার স্বরূপ এবার আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। দেখলাম, ব্রহ্মচৈতন্যের সর্বত্র অভিনিবেশের একটা আবেশ আছে, যাকে বলতে পারি তপঃশক্তির পরিণাম। অভিনিবেশ যে চিৎশক্তির স্বাভাবিক ধর্ম, তার পরিচয় আমাদের প্রাকৃত জীবনেও পাচ্ছি। কোনও-না-কোনও কিছুতে অভিনিবেশ ছাড়া আমাদের এক পা চলবার উপায় নাই। আবার দেখছি, অভিনিবেশের দুটি ছন্দ—একটির প্রকাশ চেতনার প্রসারে, আরেকটির চেতনার সঙ্কোচে। অভিনিবেশ যখন চেতনার সঙ্কোচ ঘটায়, তখন তা-ই হয় অবিদ্যা; আর চেতনার প্রসার ঘটালে হয় বিদ্যা। ব্রহ্ম-চৈতন্যে দুইই আছে, কিন্তু অবিদ্যা আছে বিদ্যার কুক্ষিগত হয়ে। প্রসারের নিত্যবুদ্ধ চৈতন্যের মধ্যেই সঙ্কুচিত চৈতন্যের ক্রিয়া চলছে সেখানে। প্রাকৃত ভূমিতেও সেই সঙ্কুচিত চৈতন্যের ক্রিয়া চলছে—কিন্তু তার সাক্ষী এবং

অন্তর্যামী প্রসারিত চৈতন্যকে ভুলে গিয়ে। এমনি করে ভূমাকে ভুলে অল্পের মধ্যে যে-অভিনবেশ, তা-ই হল অবিদ্যা।

প্রশ্ন হবে, বৃহৎকে ভুলে অবিদ্যার ঘোরে আমাদের জড়িয়ে পড়বার কি দরকার ছিল? সাধারণত অবিদ্যাকে একান্ত মনে করে কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে আমরা এ-প্রশ্নটা করে থাকি। অবিদ্যায় চেতনার যে-সঙ্কোচ তার একটা জ্বালা আছে, দুঃখ আছে। তার হাত থেকে বাঁচবার পথ সহজে খুঁজে পাই না বলেই আমাদের এই নালিশ। কিন্তু প্রশ্নটা সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত বলে অবিদ্যার ভূমিতে থেকে তার সুষ্ঠু মীমাংসা হয় না। এর জবাব খুঁজতে হবে ব্রহ্মচৈতন্যের ভূমি হতে, বিদ্যার ভূমি হতে।

পৃথিবীর বুকে আলো-ছায়া ঝড়-বৃষ্টি সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সবই আছে। আবার এই পৃথিবীকে ঘিরে তাকে অভিষিক্ত আর আপ্লুত করে আছে সবিতার অমৃত আনন্দের দীপ্তি। এই দীপ্তির চেতনা যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল, তিনি দেখেন, অবিদ্যার ঘোরই জীবনের শেষ কথা নয়। এ যেন অরুণোদয়ের আগে অন্ধকারের মত। অন্ধকার থাকবে না, এই পৃথিবীর বুক আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। আত্মোপলব্ধির গভীরে এই সত্যকে যদি উপলব্ধি করি, আর যদি জানি ব্যক্তির উপলব্ধিতে সমূহের উপলব্ধির পূর্বসূচনা, আমার আজকার স্বচ্ছন্দ নির্বিকল্প অনুভব সবারই অনুভবগোচর হবে একদিন, তাহলে তো কোনও নালিশ থাকে না। তখন দেখি, চিরমুক্ত যিনি, তিনিই স্বচ্ছন্দে বন্ধন স্বীকার করতে পারেন—বন্ধনমোচনের কৌশল জানেন বলেই। ঘোর কাটবার জন্যই তিনি ঘোর সৃষ্টি করেন। এই তাঁর আনন্দ, তাঁর শক্তির উল্লাস।

তাছাড়া অনন্ত কাল যদি ক্ষণভঙ্গে সঙ্কুচিত না হত, অসীম দেশ যদি বিন্দুতে না গুটিয়ে আসত, অবিদ্যার মধ্যে চেতনার সঙ্কোচ যদি না ঘটত, তাহলে এই সৃষ্টির গোড়াপত্তন হত কি করে? অনন্ত কালে অসীম দেশে অসঙ্কুচিত চেতনায় নিত্যসৃষ্টির উল্লাস ব্রহ্মের মধ্যে নিশ্চয় আছে—আকাশপ্লাবী আলোর উচ্ছলনের মত। কিন্তু ওই অনিবাধ বৈপুল্য আছে বলেই তো এই আকীর্ণতার সৃষ্টিতে কোনও আশঙ্কা নাই—এর মধ্যে থেকেও নাই কোনও বিদ্যার সঙ্কোচ, আনন্দের গ্লানি বা শক্তির দৈন্য। আমরা এখন তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু বোঝবার পথ তাবলে রুদ্ধ হয়ে নাই। বুঝতে গেলে আয়াস স্বীকার করতে হয় নিশ্চয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের কোন্ সাধনাই-বা অনায়াস? বীর্যের অভি-

ঘাতেই চেতনা উদ্দীপ্ত হয়। তার আনন্দ পৌরুষের আনন্দ, নির্বীর্যের ক্লিন্ন সুখের সঙ্গে তার তুলনা চলে ?

অতএব এই অবিদ্যাকবলিত জগতের সৃষ্টিতে ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ জ্ঞান আনন্দ শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যেরই প্রকাশ ঘটছে। অচিতির অন্ধতমিস্রায় হারিয়ে গিয়ে আবার চেতনার পর্বে-পর্বে এ তাঁর নিজেকে বিস্ফুরিত করবার তপস্যা। লোকোত্তর জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে এক লোকবিসৃষ্টির তপস্যা চলছে বলে পূর্ণ-প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে এর মধ্যে অশক্তি বা মালিন্যের লাঞ্ছন কোথাও নাই।

প্রাকৃত জীব অবিদ্যাগ্রস্ত, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তারও অন্তরের গভীর গহনে জ্বলছে বিদ্যার মণিদীপ। দেবতা সেখানে নিত্যজাগ্রত, আর তাঁর প্রশাসনে চলছে জীবের অবিদ্যাপ্রবৃত্তিও। এই হতে অবিদ্যার অধি-কারের একটা নিশানা পাওয়া যায়। অবিদ্যা ব্রহ্মের অতিচিতিতে নাই, তাঁর ঋতচিন্ময় অতিমানসেও নাই—কেননা অখণ্ড-চিন্ময় ঐশ্বর্য এ-দুটি ভূমির স্বরূপ। অবিদ্যা দেখা দিতে পারে মনের ভূমিতে, যেখানে খণ্ডভাবনার শুরু। যদি অতিমানস আর মনের মধ্যে এমন-একটা আড়াল গড়ে ওঠে, যার ভিতর দিয়ে অতিমানসের পূর্ণজ্যোতি মনে অবিকল প্রতিফলিত না হয়ে বহুবিকীর্ণ রশ্মিরেখায় ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সেইখানে অবিদ্যার প্রথম আবির্ভাব সম্ভব।

আগেই বলেছি, অধিমানস হল মন আর অতিমানসের মাঝে এই আলোর আড়াল, উপনিষৎ যাকে বর্ণনা করেছেন 'হিরণ্ময় পাত্র' বলে। এই অধি-মানসে অবিদ্যাশক্তির প্রথম স্ফুরণ, যদিও বিদ্যার চেতনা সেখানে অম্লান থাকায় অবিদ্যা অনুভূত হয় বিদ্যার স্ববশ সাধনরূপে। যে-খণ্ডভাবনায় অবিদ্যার শুরু হয়েছিল, তা গাঢ় হয় প্রাকৃতমনের ভূমিতে। অবিদ্যার পিছনে বিদ্যার চেতনা তখন আড়াল হয়ে পড়ে, আর আপাতদৃষ্টিতে অবিদ্যার সঙ্কীর্ণ চেতনা যেন জীবনের দিশারী হয়ে দেখা দেয়। দিশারী নিজে যেখানে অন্ধ অথচ অহঙ্কৃত, তার দেশনাও সেখানে বিশৃঙ্খল এবং বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। জীবনে তা-ই ধরে অনর্থের রূপ, যার কথা পরের অধ্যায়ে তুলব।

ব্যাপারটা অবিদ্যার দিক থেকে যখন দেখছি, এ হল তখনকার ছবি। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত মনের অহঙ্কার এবং মূঢ়তাই আমাদের জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয়। অবিদ্যা বিদ্যাকে আড়াল করতে পারে, কিন্তু তাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না—কেননা অবিদ্যার প্রবৃত্তিকে চলতে হয় বিদ্যারই প্রশাসন মেনে। ভাটার টানে আমরা গড়িয়ে চললেও একটা অন্তঃস্রোত

অন্তর্যামী প্রসারিত চৈতন্যকে ভুলে গিয়ে। এমনি করে ভূমাকে ভুলে অল্পের মধ্যে যে-অভিনিবেশ, তা-ই হল অবিদ্যা।

প্রশ্ন হবে, বৃহৎকে ভুলে অবিদ্যার ঘোরে আমাদের জড়িয়ে পড়বার কি দরকার ছিল? সাধারণত অবিদ্যাকে একান্ত মনে করে কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে আমরা এ-প্রশ্নটা করে থাকি। অবিদ্যায় চেতনার যে-সঙ্কোচ তার একটা জ্বালা আছে, দুঃখ আছে। তার হাত থেকে বাঁচবার পথ সহজে খুঁজে পাই না বলেই আমাদের এই নালিশ। কিন্তু প্রশ্নটা সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত বলে অবিদ্যার ভূমিতে থেকে তার সুষ্ঠু মীমাংসা হয় না। এর জবাব খুঁজতে হবে ব্রহ্মচৈতন্যের ভূমি হতে, বিদ্যার ভূমি হতে।

পৃথিবীর বুকে আলো-ছায়া ঝড়-বৃষ্টি সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সবই আছে। আবার এই পৃথিবীকে ঘিরে তাকে অভিষিক্ত আর আপ্লুত করে আছে সবিতার অমৃত আনন্দের দীপ্তি। এই দীপ্তির চেতনা যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল, তিনি দেখেন, অবিদ্যার ঘোরই জীবনের শেষ কথা নয়। এ যেন অরুণোদয়ের আগে অন্ধকারের মত। অন্ধকার থাকবে না, এই পৃথিবীর বুক আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। আত্মোপলব্ধির গভীরে এই সত্যকে যদি উপলব্ধি করি, আর যদি জানি ব্যক্তির উপলব্ধিতে সমূহের উপলব্ধির পূর্বসূচনা, আমার আজকার স্বচ্ছন্দ নির্বিকল্প অনুভব সবারই অনুভবগোচর হবে একদিন, তাহলে তো কোনও নালিশ থাকে না। তখন দেখি, চিরমুক্ত যিনি, তিনিই স্বচ্ছন্দে বন্ধন স্বীকার করতে পারেন—বন্ধনমোচনের কৌশল জানেন বলেই। ঘোর কাটবার জন্যই তিনি ঘোর সৃষ্টি করেন। এই তাঁর আনন্দ, তাঁর শক্তির উল্লাস।

তাছাড়া অনন্ত কাল যদি ক্ষণভঙ্গে সঙ্কুচিত না হত, অসীম দেশ যদি বিন্দুতে না গুটিয়ে আসত, অবিদ্যার মধ্যে চেতনার সঙ্কোচ যদি না ঘটত, তাহলে এই সৃষ্টির গোড়াপত্তন হত কি করে? অনন্ত কালে অসীম দেশে অসঙ্কুচিত চেতনায় নিত্যসৃষ্টির উল্লাস ব্রহ্মের মধ্যে নিশ্চয় আছে—আকাশপ্লাবী আলোর উচ্ছলনের মত। কিন্তু ওই অনিবাধ বৈপুল্য আছে বলেই তো এই আকীর্ণতার সৃষ্টিতে কোনও আশঙ্কা নাই—এর মধ্যে থেকেও নাই কোনও বিদ্যার সঙ্কোচ, আনন্দের গ্লানি বা শক্তির দৈন্য। আমরা এখন তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু বোঝবার পথ তাবলে রুদ্ধ হয়ে নাই। বুঝতে গেলে আয়াস স্বীকার করতে হয় নিশ্চয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের কোন্ সাধনাই-বা অনায়াস? বীর্যের অভি-

ঘাতেই চেতনা উদ্দীপ্ত হয়। তার আনন্দ পৌরুষের আনন্দ, নির্বীর্যের ক্লিন্ন সুখের সঙ্গে তার তুলনা চলে ?

অতএব এই অবিদ্যাকবলিত জগতের সৃষ্টিতে ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ জ্ঞান আনন্দ শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যেরই প্রকাশ ঘটছে। অচিতির অন্ধতমিস্রায় হারিয়ে গিয়ে আবার চেতনার পর্বে-পর্বে এ তাঁর নিজেকে বিস্ফুরিত করবার তপস্যা। লোকোত্তর জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে এক লোকবিসৃষ্টির তপস্যা চলছে বলে পূর্ণ-প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে এর মধ্যে অশক্তি বা মালিন্যের লাঞ্ছন কোথাও নাই।

প্রাকৃত জীব অবিদ্যাগ্রস্ত, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তারও অন্তরের গভীর গহনে জ্বলছে বিদ্যার মণিদীপ। দেবতা সেখানে নিত্যজাগ্রত, আর তাঁর প্রশাসনে চলছে জীবের অবিদ্যাপ্রবৃত্তিও। এই হতে অবিদ্যার অধি-কারের একটা নিশানা পাওয়া যায়। অবিদ্যা ব্রহ্মের অতিচিতিতে নাই, তাঁর ঋতচিন্ময় অতিমানসেও নাই—কেননা অখণ্ড-চিন্ময় ঐশ্বর্য এ-দুটি ভূমির স্বরূপ। অবিদ্যা দেখা দিতে পারে মনের ভূমিতে, যেখানে খণ্ডভাবনার শুরু। যদি অতিমানস আর মনের মধ্যে এমন-একটা আড়াল গড়ে ওঠে, যার ভিতর দিয়ে অতিমানসের পূর্ণজ্যোতি মনে অবিকল প্রতিফলিত না হয়ে বহুবিকীর্ণ রশ্মিরেখায় ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সেইখানে অবিদ্যার প্রথম আবির্ভাব সম্ভব।

আগেই বলেছি, অধিমানস হল মন আর অতিমানসের মাঝে এই আলোর আড়াল, উপনিষৎ যাকে বর্ণনা করেছেন 'হিরণ্ময় পাত্র' বলে। এই অধি-মানসে অবিদ্যাশক্তির প্রথম স্ফুরণ, যদিও বিদ্যার চেতনা সেখানে অম্লান থাকায় অবিদ্যা অনুভূত হয় বিদ্যার স্ববশ সাধনরূপে। যে-খণ্ডভাবনায় অবিদ্যার শুরু হয়েছিল, তা গাঢ় হয় প্রাকৃতমনের ভূমিতে। অবিদ্যার পিছনে বিদ্যার চেতনা তখন আড়াল হয়ে পড়ে, আর আপাতদৃষ্টিতে অবিদ্যার সঙ্কীর্ণ চেতনা যেন জীবনের দিশারী হয়ে দেখা দেয়। দিশারী নিজে যেখানে অন্ধ অথচ অহঙ্কৃত, তার দেশনাও সেখানে বিশৃঙ্খল এবং বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। জীবনে তা-ই ধরে অনর্থের রূপ, যার কথা পরের অধ্যায়ে তুলব।

ব্যাপারটা অবিদ্যার দিক থেকে যখন দেখছি, এ হল তখনকার ছবি। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত মনের অহঙ্কার এবং মূঢ়তাই আমাদের জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয়। অবিদ্যা বিদ্যাকে আড়াল করতে পারে, কিন্তু তাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না—কেননা অবিদ্যার প্রবৃত্তিকে চলতে হয় বিদ্যারই প্রশাসন মেনে। ভাটার টানে আমরা গড়িয়ে চললেও একটা অন্তঃস্রোত

উজানপানে আমাদের নিয়ত টানছেই। সে-টান চেতনায় স্পষ্ট হয়ে উঠলেই শুরু হয় জীবনায়নের আরেকটা পর্ব। অবিদ্যার অভিনিবেশকে ছাপিয়ে তখন জাগে বিদ্যার অভিনিবেশ। একটা প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব চলে কিছুদিন ধরে, তার পরে চিত্তের দিগন্তে অন্ধকারকে নির্জিত করে জাগে নতুন উষার আলো।

কিন্তু তখনও সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। বিদ্যার অভিনিবেশ অবিদ্যার অভিনিবেশকে পরাভূত করতে গিয়ে উগ্র দুরাগ্রহে কখনও তার সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন করে ফেলে। রূপান্তর-সাধনার পক্ষে এই একটা মস্ত বাধা এবং এও অবিদ্যামূল খণ্ডভাবনার একটা সূক্ষ্ম ছলনা। বলা বাহুল্য, এতে পূর্ণপ্রজ্ঞার পরিচয় মেলে না। অতিমানস আর অধিমানসের সন্ধিভূমিতে অবিদ্যাশক্তি যেখানে বিদ্যাশক্তির স্ববশ সাধন, সেইখানে চিৎশক্তির যে নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যের সঞ্চয় আছে, তাকে অধিগত করে প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়। অবিদ্যা তখন আর তুচ্ছ অথবা হেয় নয়, নিত্য-বুদ্ধ ব্রহ্মশক্তির সে সপ্রয়োজন সাধন। ব্রহ্মবীর্যের আবেশে অবিদ্যা তখন হয় মৃত্যুতরণের অপরিহার্য নিমিত্ত এবং উত্তরায়ণের প্রতি পর্বসন্ধিতে তার গভীরে সমিদ্ধ আতাপ (energising) বিকীর্ণ হয় বিদ্যার উপচীয়মান অমৃতদ্যুতিতে।

অবিদ্যার এই সার্থকতা।

চতুর্দশ অধ্যায়

অনর্থের নিদান ও প্রতিকার

অবিদ্যার তত্ত্ব কি, কোথা হতে তার উদ্ভব, মোটামুটি তার একটা পরিচয় পেলাম। এইবার ব্যাবহারিক জগতে অবিদ্যার পরিণাম নিয়ে বিচারের পালা।

প্রাচীন দার্শনিকেরা বলতেন, অবিদ্যাই আমাদের যত-কিছু দুঃখের হেতু। কথাটা খুবই সত্য। অবিদ্যা চেতনার সঙ্কোচ ছাড়া আর-কিছু নয়। চেতনার সঙ্কোচে দুঃখ এবং চেতনার প্রসারে আনন্দ—এটাকে আমরা একটা জৈববিধান বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের তিনটি আশ্রয়—জ্ঞান, ইচ্ছা, আর বেদনা (feeling) : আমরা জানতে পারি না বা ভুল করে জানি, পদে-পদে আমাদের ইচ্ছা ব্যাহত হয় কিংবা বিপথে চলে, অন্ধপ্রাণ তার রসের পিপাসা মেটাবার সুযোগ পায় না—মোটামুটি এই নিয়ে আমাদের দুঃখ। এককথায় এদের বলতে পারি 'অনর্থ' (Evil), অর্থাৎ যা আমরা চাই না অথচ যার ঝামেলা আমাদের পোয়াতেই হয়।

সারা জগৎ জুড়ে এই অনর্থের করাল ছায়া, অথচ এ-জগৎ সৎ-চিৎ-আনন্দের বিসৃষ্টি! আবার সেই প্রশ্ন : ব্রহ্মই যদি জগৎ হয়ে থাকেন, তাহলে এ-জগতে অনর্থ এল কোথা হতে? ব্রহ্মচৈতন্যে কি তার বীজ রয়েছে?

আগেও বলেছি, জগৎরহস্য সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের জবাব জগৎচক্রের ভিতর থেকে আমরা পেতে পারি না, তার জন্য উঠতে হয় চক্রাবর্তনের উর্ধ্বে। সব চরম প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যের ভূমি থেকে। ভূমার বৈপুল্যের মধ্যে আবিষ্কৃত হবে অল্পের নিদান এবং প্রয়োজন। অনর্থের সমস্যাকেও বিচার করতে হবে এইভাবে।

অনর্থ যে জগতে আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তবুও বলব, সে-ই কি একান্ত হয়ে আছে? এ-জগতে অনর্থ ছাড়া আর-কিছুই কি নাই? জীবনের সমস্ত দুর্দৈব ছাপিয়ে একটা বৃহত্তর কল্যাণ ও আনন্দের সম্ভাবনা আছে মেনেই মানুষ দিনের পর দিন দুর্দৈবের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

এমন-কি দুঃখবাদী যে-দার্শনিক, জগতের কপালে দুঃখের ছাপ মেরে দিয়েও তিনি স্বীকার করেন, দুঃখ যেমন সত্য তেমনি দুঃখাভাবও সত্য, আর দুঃখাভাবের ভূমিতে পৌছবার একটা পথও আছে। আপতিক অনর্থকে বড় করে দেখি বলেই তার বাইরে পরমার্থকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু এও সত্য, পরমার্থের অনুভব আভাসেও যদি আমাদের মধ্যে ফোটে, তাহলে অনর্থের ভার লঘু হয়ে যায়, তাকে জয় করবার বীর্যও আমরা পাই। এই পরমার্থই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান—এককথায় জীবনের মর্মমূলে একটা বৃহৎ সত্য চৈতন্য ও আনন্দের অনির্বাণ অনুভব। অবশ্য এ-অনুভব সহজ নয়, দীর্ঘদিনের আয়াসে একে আবিষ্কার করতে হয়। কিন্তু একবার তাকে পেলে জীবনের সকল সমস্যা দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়বোধের যেমন একটা স্বতঃপ্রামাণ্য আছে, চোখের দেখার উপর যেমন আর কথা চলে না, তেমনি এই অনুভবেরও একটা স্বতঃপ্রামাণ্য আছে। তবে কিনা এ-স্বতঃপ্রামাণ্য বাহ্যবিষয়ের বোধ সম্পর্কে নয়, জীবনের গভীরতর অর্থ সম্পর্কে। ভূমার অনুভবে অল্পের ঝামেলা তুচ্ছ হয়ে পড়ে, পরমার্থের প্রত্যয়ে অর্থের বোধ ম্লান হয়ে যায়। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—বৃহতের আনন্দকে যে জানে, কোথাও থেকে তার আর ভয় থাকে না। আর ভয়ই সকল অনর্থের মূল।

বৃহতের দৃষ্টি নিয়ে যখন দেখি, তখন জানি পরমার্থই সত্য—নিরপেক্ষ (absolute) সত্য। আর অনর্থের সত্য সাপেক্ষ (relative), পরমার্থেরই আশ্রিত। অনর্থ আছে; তাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিচ্ছি না, বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করছি না। কিন্তু জানছি, সে আছে পরমার্থের প্রয়োজনে। আর আছে অনড় নিরেট একটা-কিছু হয়ে নয়—কয়লার আগুনের মত নিগূঢ় তাপ আর আলো বিকীর্ণ করবার জ্বলন্ত চেষ্টা নিয়েই সে আছে। পরমার্থের সত্তা আর প্রয়োজনকে আশ্রয় করেই অনর্থের সত্তা, বিদ্যার সচেতন আত্মসঙ্কোচেই অবিদ্যার উদ্ভব—ব্রহ্ম আছেন বলেই জগৎ আছে। পর (higher) সত্য আর অবর (lower) সত্য—দুটি মিলিয়ে সত্যের অখণ্ড রূপ। কিন্তু অবর-সত্য পর-সত্যেরই অধীন। পৃথিবীর দিন-রাত্রির আবর্তনের উর্ধ্বে সূর্যের নিত্যদীপ্তি। আরও গভীর করে বলা যেতে পারে, আকাশের সত্তার রিক্ততাই প্রপঞ্চের বর্ণৈশ্বর্যের আশ্রয়।

অতএব পরমার্থে অনর্থের কোনও ছায়া নাই। কিন্তু তাঁরই সঙ্কল্পবশে

সে-ছায়া আছে তাঁর বিশ্বক্রিয়ায়। সেখানেও সে বিশ্বের সবখানি জুড়ে নাই, রয়েছে মাত্র খানিকটাতে। কোথায় আছে এবং কেন আছে, এবার তা-ই দেখা যাক।

গোড়াতেই একটা কথা খেয়াল করতে হবে, অনর্থের সত্তা নির্ভর করছে বোধের 'পরে। চেতনা যেখানে অসাড়, সেখানে অর্থ-অনর্থের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এইজন্য জড়ের জগতে অনর্থের কোনও অস্তিত্ব নাই। জড়ের গুণ আছে, ক্রিয়া আছে। কিন্তু সে গুণ-ক্রিয়া চেতনার সংস্পর্শে না আসে যতক্ষণ, ততক্ষণ তার কোনও সার্থক অভিব্যক্তি ঘটে না। বিষ আর অমৃতের ক্রিয়ায় যে অর্থের তফাত ঘটে, তা জীবের কাছে। নইলে বিশুদ্ধ জড়ের রাজ্যে ক্রিয়ার তফাতে কারও ব্যক্তিগত ইষ্টানিষ্টের কোনও বালাই নাই।

অনর্থের এলাকার তাহলে উপরে-নীচে দুটা সীমা পাওয়া গেল। উপরের দিকে যেমন পরমার্থ-চেতনায় অনর্থের অস্তিত্ব নাই, নীচের দিকে তেমনি অচেতন জড়ের মধ্যেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনর্থবোধ চেতনার ধর্ম বলে অতিচিতি বা অচিতি দুইই পড়ে তার গণ্ডির বাইরে। আরেকটু তলিয়ে দেখলে বুঝব, চেতনারও সবটুকুতে তার অধিকার ব্যাপ্ত নয়। প্রাকৃত চেতনার একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ভূমি আছে, যেখানে অনর্থবোধের কোনও পীড়া নাই। কিন্তু চেতনার এ-স্বাস্থ্য সবসময় বজায় থাকে না। বাইরের আঘাতে বা ভিতরের তাগিদে চেতনার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় যখন, তখন প্রতিকূল-বেদনার (feeling of contrariety) আকারে অনর্থের বোধ জাগে। অমনি চেতনাও সক্রিয় হয়ে ওঠে, অনর্থকে পরাভূত করবার জন্য তার মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। দেহে রোগের সম্ভাবনাতেও প্রাণক্রিয়ার মধ্যে এমনি-একটা সাড়া পড়ে। কিন্তু লড়াইটা সেখানে নেপথ্যে ঘটে। তাই তার তুমুলতা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না, শুধু রোগযন্ত্রণায় বা ক্রমিক আরোগ্যে তার পরিণাম অনুভব করি। কিন্তু অনর্থবোধের সঙ্গে চেতনার দ্বন্দ্বের অনেক-খানিই আমাদের প্রত্যক্ষ। আর এখানে সংগ্রাম চলে বলতে গেলে সারা জীবন ধরে। দেহে সুস্থ থেকেও আমরা প্রায় সবাই অল্প-বিস্তর মনের রোগী—প্রাচীনেরা বলতেন, ভবরোগে কাতর।

অনর্থবোধের সঙ্গে লড়তে গিয়ে চেতনার শক্তি বাড়ে—এটা আমাদের একটা প্রত্যক্ষ সত্য। দুঃখের আঘাতেই মোহ ছুটে যায়, সুপ্ত বীর্য জেগে ওঠে—তিতিক্ষায় আমরা দিই উদ্দীপ্ত আত্মচেতনার পরিচয়। সুতরাং চিৎশক্তির উদ্‌বোধনের জন্য অনর্থেরও একটা প্রয়োজন আছে। তাকে মাঝখানে রেখে জগতের আলো আর আঁধার দুটা দিকই আমরা দেখতে পাই। আত্মশক্তি প্রবল হয়ে অনর্থবোধের উপরে জয়ী হয় যদি, আমরা আস্বাদন করি একটা স্বারাজ্যের মহিমা। অনর্থ থেকেও তখন আর আমাদের পীড়িত করতে পারে না, তার উর্ধ্বে আমরা আবিষ্কার করি একটা আলোর জগৎ। আর অনর্থ যদি প্রবল হয়ে আত্মশক্তিকে পরাভূত করে, চেতনা ক্রমে ঝিমিয়ে প'ড়ে আবার ফিরে যায় অচিতির অন্ধকারে। অনর্থকে আশ্রয় করে চেতনার এই উজান-ভাটা আমাদের জীবনের নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য।

এমনি করে অনর্থের প্রসঙ্গে চিৎশক্তির ক্রিয়াকে চারটি পর্বে ভাগ করতে পারি: অচিতি আর অতিচিতির দুটি প্রত্যন্ত পর্ব, যার মধ্যে অনর্থবোধের কোনও নিশানা নাই; আর এ-দুটির মাঝে আরও দুটি পর্ব—যার একটিতে অনর্থবোধ আছে, আরেকটিতে থেকেও নাই। বলা বাহুল্য, আগেরটি আমা-দের সুপরিচিত অবিদ্যার জগৎ, আর পরেরটি তার উর্ধ্বে বিদ্যার জগৎ। বিদ্যার জগৎ 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্'। বিদ্যা অবিদ্যার শুধু তটস্থ সাক্ষী নয়, তার প্রবর্তক এবং নিয়ন্তা। এবং এই বিদ্যা অতিচিতির শক্তি।

ব্যক্তিচেতনার দিক দিয়ে অনর্থবোধের একটা চৌহদ্দি পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন হবে, বিশ্বের লোকসংস্থানেও কি অনর্থের একটা নির্দিষ্ট এলাকা আছে? সব দেশের প্রাচীন রহস্যবিদ্যাই বলে, আছে। এ-বলাটা অযৌক্তিকও নয়। শক্তির যে-কোনও বিভূতির একটা বিপুল উৎস আছেই। অব্যক্ত থেকেই ব্যক্তের আবির্ভাব হয়, আর ব্যক্তের তুলনায় সে-অব্যক্তের পরিসর সবসময় বৃহত্তর। ব্যক্তকে আমরা দেখি ব্যক্তিচেতনার সীমিত দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু সেই সীমার বাইরেও যে কারণশক্তির একটা স্বধাম আছে, তা আমাদের বুদ্ধিও আন্দাজ করতে পারে। তবে কিনা বোধির কাছেই এটা খুব স্পষ্ট।

অনর্থশক্তির স্বধামকে প্রাচীনেরা স্থাপন করেছেন জড়ভূমির উর্ধ্বে—অন্তরিক্ষে, প্রাণের অবরলোকে। নানাদেশের পুরাণকাহিনীতে তার ফলাও বর্ণনা আছে। আমাদের পুরাণে দেবাসুরের দ্বন্দ্বের কথা সবাই জানি।

দেবতারা আলোর শক্তি, অস্থরেরা অন্ধপ্রাণের শক্তি—স্বাধিকারের সীমানা নিয়ে দুয়ের মধ্যে ঝুটাপুটি লেগেই আছে। পুরাণে এই ঝুটাপুটির বর্ণনাকে আমরা অনেকসময় ব্যক্তিচেতনার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপক বলে ব্যাখ্যা করি। তাতে কিন্তু সব কথা বলা হয় না। ব্যাপারটাকে শুধু ব্যক্তির দিকে থেকে না দেখে বিশ্বের দিক থেকেও দেখা উচিত। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব তো আছেই, তাছাড়া বিশ্বেরও একটা শক্তি-ক্ষোভ আছে। ব্যক্তি বিশ্বেরই অংশ, তার শক্তির একটা সীমিত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি। ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটছে, তার কারণ রয়েছে বিশ্বের শক্তিতে। ব্যক্তির মর্ম ও নিয়তিকে বিচার করবার সময় সে-শক্তিরও হিসাব নেওয়া উচিত।

আমার আত্মচৈতন্যকে অনর্থের প্রভাব হতে মুক্ত করলাম, অন্তরে আমি স্বচ্ছ হলাম। কিন্তু আমার প্রকৃতিতে আধি-ব্যাধির আকারে অনর্থের বীজ থেকেই গেল। তাহলে কিন্তু আমার দায় মিটল না। প্রকৃতি হতে নিজেকে আলাদা করে অনর্থকে এড়িয়ে যেতে পারি; আর এই আলাদা করার শক্তিটাও একটা কম শক্তি নয়। কিন্তু বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে তটস্থ থাকাটাই চরম কথা নয়। প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে অনর্থের জড় মারতে হবে, তবেই ব্যক্তিগত সাধনার পূর্ণসিদ্ধি। তারও পরে আছে বিশ্বগত সিদ্ধির সাধনা। আমটি খেয়ে মুখ পুঁছে ফেললে চলবে না, রসের ভাগ সবাইকে দিতে হবে। আত্মমুক্তির পরও জগদ্ধিতের একটা দায় আছে। অবশ্য ওটা মুখের দায় নয়, প্রাণের দায়। আত্মচেতনার বিশ্বচেতনায় বিস্ফারণে তার উদ্ভব। তখন জগৎজোড়া অনর্থের সঙ্গে সিদ্ধের লড়াই। কতকগুলি আধিভৌতিক অথচ সর্বজনীন অনর্থের সঙ্গে আমরা প্রাকৃত উপায় প্রকাশ্যে লড়াই করতে পারি এবং বিশেষ করে আজকাল করছিও। কিন্তু সাংখ্যকার বলেছিলেন, লৌকিক উপায়ে কখনও অনর্থের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় না। কথাটা খুবই সত্য। সমষ্টিচেতনার রূপান্তর না ঘটলে সমষ্টি-অনর্থেরও কায়েমী নিবৃত্তি ঘটবে না। কিন্তু সমষ্টিচেতনার অনুভব ঠিক বুদ্ধি দিয়ে হয় না। বিশ্বমানব, বিশ্বসমাজ, বিশ্বরাষ্ট্র—ওগুলি বুদ্ধির ফাঁকা কল্পনা। ওদের নিরেট করতে হলে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সত্তার গভীরে বিশ্বকে আবিষ্কার করতে হবে। অধিচেতনারও ওপারে সর্বাত্ম-ভাবের গভীরে বিশ্বচেতনার যে-দীপ্তি, তার আলোকে অর্থ আর অনর্থ দুয়েরই বিশ্বগত রূপ যোগীর চোখে ভেসে ওঠে। অস্থরশক্তি তখন আর শুধু রূপক নয় এবং তার সঙ্গে লড়াইটা শুধু ব্যক্তির গুহাগ্রন্থি-বিকিরণের ব্যাপারও নয়।

তবে এসমস্তই পড়ে রহস্যবিজ্ঞানের এলাকায়। সেখানে ঢোকবার ছাড়পত্র পাওয়া চাই, নইলে ও নিয়ে কল্পনা-জল্পনায় কিছু লাভ হয় না।

পরমার্থ আর অনর্থ দুয়েরই তাহলে স্বধাম আছে। আমরা মানি, পরমার্থের সত্তা নিরপেক্ষ, তার বীর্য অনন্ত। চেতনা যখন উজান বইতে থাকে, তখন এই নিরপেক্ষতা ও আনন্ত্যের পরিচয় পাই। কিন্তু অনর্থও কি নিরপেক্ষ, তার শক্তিও কি অনন্ত? অনর্থের আমরা যে-চৌহদ্দি দেগে দিয়েছি, তাথেকে এ-প্রশ্নের জবাব মিলবে।

দেখেছি, অনর্থ অবিদ্যাজগতের ব্যাপার। অবিদ্যার স্ব-তন্ত্র কোনও শক্তি নাই। সে বিদ্যার আশ্রিত, তারই সংপ্রয়োজন শক্তি। সুতরাং অনর্থের স্ব-তন্ত্র কোনও সত্তা নাই। আর অনর্থবোধ থেকে যে-পীড়া জন্মায়, তীক্ষ্ণতায় তা অপরিমেয় হতে পারে, কিন্তু অনন্ত কখনই নয়। তার কারণ ওই অবিদ্যার মধ্যে। অবিদ্যা হল চেতনার সঙ্কুচিত বৃত্তি। এই সঙ্কোচের দুটা সীমারেখা আছে—উপরে আর নীচে। উপরে বিদ্যা এবং অতিচিতি, আর নীচে অচিতি—এই দুয়ের মাঝে অবিদ্যা। অনর্থবোধ এই এলাকার মধ্যে পর্দায়-পর্দায় ওঠানামা করতে পারে। কতটুকু সে উঠবে বা নামবে, তা নির্ভর করছে চিৎশক্তির প্রতিক্রিয়ার উপরে। অনর্থবোধের তীব্রতায় চিৎশক্তি ঝিমিয়ে পড়তে পারে, আবার বিস্ফুরিতও হতে পারে। চিৎশক্তি যদি ঝিমিয়ে পড়ে, অনর্থবোধ অচিতির অসাড়তায় তলিয়ে যাবে। আর বিস্ফোরণে তার রূপান্তর ঘটবে বিদ্যার উল্লাসে। যে-কোনও নিরোধের ব্যাপারে এটি লক্ষ্য করা যায়। নিরোধে চেতনার স্বচ্ছন্দপ্রবাহে একটা টান পড়ে এবং তাহতে প্রতিকূল বেদনার সৃষ্টি হয়। সে-বেদনা হয় অসাড়তায় নয়তো চরম উদ্দীপনে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিশেষ করে এইটি ঘটে মৃত্যুতে—যাকে আমরা সাধারণত বলি চরম অনর্থ। জীবনের দুটি প্রান্তে দুটি অব্যক্ত—একটি আঁধারের, আরেকটি আলোর। জীবন-মৃত্যুর চরম দ্বন্দ্বে অবিদ্যাচেতনা শ্রান্ত হয়ে ফিরে যায় আঁধারে। আর বিদ্যাচেতনা জ্যোতির্বিস্ফোরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তা-ই হল যোগীর মৃত্যুঞ্জয় মরণ।

অনর্থের অধিকার আর ধরন বোঝা গেল। এখন প্রশ্ন হবে, কোথাহতে তার উৎপত্তি এবং কি তার প্রয়োজন। এ-প্রশ্নের মূল জবাব আগেই হয়ে

গেছে। অনর্থবোধ যদি অবিদ্যাচেতনার ধর্ম হয়, তাহলে অবিদ্যার মতই তারও নিদান হবে অচিতি। অচিতির মধ্যে যে-বিদ্যাশক্তি অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে, তারই ক্রমিক স্ফুরণ হল অবিদ্যার ব্যাপার। অনর্থবোধ এই অবিদ্যা-ব্যাপারের অঙ্গ। অচিতি হতে চিৎশক্তির স্ফুরণ হয় অত্যন্ত মন্থরগতিতে, অনেক বাধা ঠেলে। বাধা ঠেলবার যে-আয়াস, তা-ই চেতনায় ধরে অনর্থ-বোধের রূপ। এ-বোধ আছে বলেই চেতনা উদ্দীপ্ত হয়, বাধাকে নির্জিত করবার বীর্য জাগে তার মধ্যে। এইখানে অনর্থবোধের সার্থকতা। অসাড়ের মধ্যে সাড়া আনতে হলে একটা ধাক্কা দেওয়া দরকার। ধাক্কায় যে-বিক্ষোভ জাগে, যে দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তা অচিতির অন্ধতমিস্রাকে ক্রমে রূপান্তরিত করে বিদ্যার আলোতে। বিক্ষোভের এই হল আসল লক্ষ্য। অবশ্য ব্যাপারটা অত সহজে ঘটে না, লক্ষ্যের চেতনাও আমাদের মধ্যে সব-সময় সুস্পষ্ট থাকে না। তবুও এই যে প্রকৃতিপরিণামের মূল নীতি, তাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অভীপ্সাকে দ্যুলোকের নিত্যদ্যুতিতে পৌঁছতে হলে অন্তরিক্ষের রাজ্য পার হয়ে যেতেই হবে। সেইখানেই মেঘ ঝঞ্ঝা আর বজ্রের তাণ্ডব। সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত চেতনা এই তাণ্ডবে দিশেহারা হয়ে যায়। অর্জুনের মতই সে বাসুদেবকে প্রশ্ন করে, কেন আমায় এ-ঝামেলার মধ্যে টেনে আনলে। কিন্তু বাসুদেব জানেন, পৃথিবীতে বৃন্দাবনের স্বপ্নকে রূপ দিতে হলে কুরুক্ষেত্র না ঘটিয়ে উপায় নাই। অনেক ক্লৈব্য অনেক হৃদয়-দৌর্বল্য এই তাণ্ডবে অসহায় আর্তনাদে গুঁড়িয়ে যাবে—তারা প্রকৃতির আবর্জনা। কিন্তু যে বীর, যে সব্যসাচী, সে-ই বেঁচে থাকবে মহাকালের স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য। অনেকের মৃত্যুকে পার হয়ে অমৃতের কূলে উত্তীর্ণ হবে সে-ই। ক্ষুদ্রের মৃত্যুতে দুঃখের কিছুই নাই; তার মূক আত্মবলিদানও বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অঙ্গ। সব মিলে এক অখণ্ড চিৎশক্তির সার্থক বিলাস।

এইবার চেতনার উন্মেষের দিক থেকে অনর্থবোধের বিচার করা যাক, তাহলে তার তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হবে।

উদ্ভিদে চেতনা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন বলে অনর্থবোধের রূপ তার মধ্যে আবছা। বেদনাবোধ তারও আছে, কিন্তু প্রতিবাদে চেতনার উদ্দীপন তার মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ। অনর্থবোধ স্পষ্ট হয়েছে পশুতে। সাধারণত

প্রাণাশ্রয়ী চেতনা সেখানে অনর্থবোধের বাহন। নিজের প্রাণ বাঁচানো আর বংশধারায় তাকে প্রসর্পিত করা—এই হল জৈবধর্মের গোড়ার কথা। জৈবধর্মের যা প্রতিকূল, তার সঙ্গে পশু খানিকটা সচেতনভাবে লড়াই করে এবং তাইতে তার মধ্যে অনর্থবোধের উদ্ভব হয়। অনর্থের বিরুদ্ধে পশুচেতনার যে-প্রতিক্রিয়া, তার মধ্যে নানারকম জটিলতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সমস্তটা ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয় পশুর সহজ-প্রবৃত্তির (instinct) দ্বারা। সহজ-প্রবৃত্তির নানা বিস্ময়কর নিদর্শন আমরা পশুর জীবনে দেখতে পাই। তবুও তার দৃষ্টি এবং ক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যায় না। একেবারে নতুন পরিবেশে পড়লে পশুচেতনা অসহায় হয়ে পড়ে, তার প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি সেখানে পঙ্গু। চিৎশক্তির এই সঙ্কোচ পশুর অনর্থবোধকেও সঙ্কুচিত করে। মূলত তার অনর্থবোধ ইন্দ্রিয়সংবিৎকে আশ্রয় করে বলে প্রাণের ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে সুস্পষ্ট মনশ্চেতনার পর্যায়ে বড় ওঠে না। তার ফলে দেখি, পশুচেতনায় অনর্থবোধ থাকলেও অধর্মবোধ নাই। পশুর মধ্যে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব নাই। ওটি মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষের কাছে একমাত্র দুঃখই অনর্থ নয়, অসত্য এবং অশিবও তার কাছে অনর্থ। তারাই তার অধর্মবোধের হেতু।

অধর্মবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাল-মন্দের প্রশ্ন। অবশ্য ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কথাটা প্রথমে ওঠে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সংবিৎকে ধরে। আমার ব্যক্তিগত প্রাণবাসনাকে ইন্দ্রিয়সংবিতের মাধ্যমে যা তৃপ্ত করে তা ভাল, যা তাকে আঘাত করে তা মন্দ— এই হল ভাল-মন্দ সম্পর্কে মানুষের প্রথম রায়। ক্রমে এ-বোধ অনুশাসিত হয় সমাজচেতনার দ্বারা : যা সমষ্টির প্রাণবাসনার অনুকূল তা ভাল, যা নয় তা মন্দ। ধর্মাধর্মের কথাটা এইখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সমষ্টির জন্য ব্যক্তির দুঃখস্বীকারে একটা মহিমাবোধ জাগে এইখানেই। 'দশের জন্যে আমি নিজের সুখ ছাড়লাম'—এর মধ্যে বাসনাগ্রস্ত সঙ্কীর্ণ 'আমি'র ঊর্ধ্বে একটা বৃহত্তর 'আমি'র সন্ধান পাওয়া গেল। ধর্মবোধ এমনি করে আনে আত্মবোধের সূচনা। কিন্তু এমনতর সামাজিক ধর্মবোধেও মূঢ়তা থাকতে পারে। কেননা, যাকে আমি দশের হিত মনে করছি, তা বস্তুত কোনও অন্ধ আচার বা প্রবৃত্তির দাসত্বও হতে পারে—দশের গতানুগতিকতা বা জৈব-বাসনাই যার প্রাণ। এইজন্য চিন্তনশীল মনের সুস্থ ও জাগ্রত বিচারবুদ্ধি দিয়ে ধর্মবোধের সংস্কার করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু যথার্থ ধর্মবোধের

উন্মেষের জন্য তাও যথেষ্ট নয়। লোকব্যবহারকে ছাপিয়ে 'যতঃ প্রবৃত্তি-ভূর্তানাম্'—সর্বভূতের প্রবৃত্তি উৎসারিত হচ্ছে যে-চিৎশক্তির উৎস হতে, তাকে নিজের চৈত্যসত্তার গহনে অনুভব না করলে কি ভাল কি মন্দ, কি ধর্ম কি অধর্ম তার সত্যকার মীমাংসা হয় না।

এর জন্য চাই চেতনার উর্ধ্বায়ন, দৃষ্টির প্রসার এবং পরমসত্যের সাক্ষাৎকার। বস্তুত সত্যের বোধ আর ধর্মের বোধ একই অনুভবের এপিঠ-ওপিঠ। দৃষ্টির সত্যই আচারের ঋতচ্ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করে এবং তা-ই ধর্ম। এই ধর্মের পরিণামই সুখ। এমনি করে সত্য শিব আর আনন্দের ত্রিপুটীতে যে-পরমার্থের নিত্যদীপ্তি, অবিদ্যাচ্ছন্ন হলেও আমাদের চেতনার অভিযান তারই দিকে। আর তার পথচলতি উপসৃষ্টি (by-products) হল অসত্য অশিব এবং দুঃখ—এককথায় যাদের বলি অনর্থ।

অবিদ্যা চলছে বিদ্যার দিকে, অনর্থের অনেক বাধা অতিক্রম করে তাকে পৌছতে হবে পরমার্থে। এই পথের বাধার কথা আলোচনা করলে অনর্থের তত্ত্ব হয়তো আরও পরিষ্কার হবে।

সৃষ্টি কালের একটা ব্যাপার। তার মধ্যে পরিণাম আছে, বৈচিত্র্য আছে, বৈষম্যও আছে। কালের ধারা আবর্তিত হয়ে যদি না বইত, তাহলে সৃষ্টি হত না—অন্তত প্রাকৃত চেতনা সে-সৃষ্টির ধারণা করতে পারত না। সব যখন একরস হয়, আমাদের বোধ তখন লোপ পেয়ে যায়। তখন কালও থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না। বস্তুত চেতনার একটা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে সৃষ্টি টিকে আছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আয়াস আছে, সুতরাং খানিকটা দুঃখও আছে—শিশুর প্রথম হাঁটতে শেখার মত। কিন্তু আয়াস শেষপর্যন্ত থাকে না, চলা ক্রমে সহজ হয়ে যায়। অথচ তখনও দ্বন্দ্ব থাকে—তবে তাকে দ্বন্দ্ব না বলে দ্বৈত বলাই ভাল। এ-দ্বৈত রসের দ্বৈত। দুই আছে, কিন্তু পরমসামরস্যে এক হয়ে আছে। তখন আর কৃচ্ছ্রতার দুঃখ নাই, আছে রসের উল্লাস। তা-ই নিত্যসৃষ্টি; তারই দিকে অনিত্যের অভিযান। অভিযানের শেষ লক্ষ্য যদি জানি এবং সেখানে পৌছনো যায় বলে যদি মানি, তাহলে আর চলার আয়াস নিয়ে নালিশ করতে পারি না। আয়াস তখন রূপান্তরিত হয় বীর্যে। সেটা পরম লাভ।

অচিতি হতে পূর্ণচিতির দিকে প্রকৃতির কৃচ্ছ্র ও মন্থর অভিযান—এই হল প্রাকৃত সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই অভিযানের দুটি নিয়ামক তত্ত্ব: মনশ্চেতনার ক্রমিক উন্মীলন, আর প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠা। অসত্য আর অশিবের সাময়িক উৎপত্তির তারাই হেতু। কি করে, তা-ই বলছি।

মনের প্রথম উন্মেষ দেখি পশুচেতনায়। পশু আত্মসচেতন নয়, তবুও বাইরের জগতের সঙ্গে একটা সচেতন সম্পর্ক তার আছে। ইন্দ্রিয়সংবিতের সহায়ে তার জগতের জ্ঞান। তার আড়ালে বোধির ক্রিয়া থাকলেও সেটা খুব সুস্পষ্ট নয়, ভাবনা ও কল্পনার দৈন্যবশত বিচারবুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ নয়। এগুলি বিশেষ করে ফুটেছে মানুষের মধ্যে। তবুও সহজসংস্কারের বশে পশু তার সীমিত জগতের মধ্যে এমনভাবে সবদিকের সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। পশুর দিক থেকে এটা মস্ত লাভ নিশ্চয়ই, কিন্তু এর বিপদও আছে। পশুর জীবন অনেকটা যান্ত্রিক, পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে তার যন্ত্রজীবন বিকল হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ পরিস্থিতিকে অনুকূল করে নিতে পারে—এই তার বৈশিষ্ট্য। এটি বুদ্ধির দান। ইন্দ্রিয়সংবিতের জগতের চাইতে বুদ্ধির জগৎ অনেক বড়, মানুষ সেই জগতের অধিবাসী। কিন্তু তার জগতের পরিধি বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে। পশুর যত না ভুল হয়, মানুষের ভুল হয় তার চাইতে অনেক বেশী। অথচ পশুর চাইতে সে অনেক বেশী জানেও। ভুলের মাশুল দিয়ে জানাকে তার আয়ত্ত করতে হয়—এই এক বিপত্তি। প্রমাদ আর অসত্যের ভিতর দিয়েই তার বিজ্ঞানের সাধনা।

অধিচেতন ভূমি হতে যদি বোধির আলো মানুষের মধ্যে সোজাসুজি এসে পড়ত, তাহলে প্রমাদের সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু তা হবার নয়। অচিতি থেকে পূর্ণচিতির দিকে যেতে আলোয়-আঁধারে ছাওয়া একটা অন্তরিক্ষলোক পার হতেই হবে। তার দায় আছে, দুর্দৈবও আছে। কিন্তু সান্ত্বনা এই, অন্তরিক্ষলোকে এসেই মানুষের গতি থেমে যায় না; আর এখানকার ঝড়ঝাপটার সঙ্গে লড়াই তার পাখার জোর বাড়াবার জন্যই। সবাই যে একবারেই এ ঝড়ের রাজ্য নির্বিবাদে পেরিয়ে যেতে পারে তা নয়, ডানা ভেঙে মাটিতে পড়তে হয় অনেককেই। কিন্তু আবার তাদের উঠতে হবে, আবার ঝড়ের তাণ্ডবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অমৃতের জন্য মৃত্যুতরণ প্রাণের এই তপস্যা সৃষ্টির নিয়তি।

উত্তরায়ণের পথে এই যেমন মনের বাধা, তেমনি আবার আছে প্রাণের বাধা। প্রাণ বুভুক্ষু। সসীম আধারে থেকে অসীমকে সে আত্মসাৎ করতে চায়। এই হতে তার মধ্যে জাগে অহন্তার দুরাগ্রহ, বাসনার ব্যাকুলতা। আমার ভোগ অবাধ হ'ক, আমার ঐশ্বর্য (mastery) অকুণ্ঠ হ'ক—এই তার আকূতি। কিন্তু জড়ের বাধায় এ-আকূতি সহজে সার্থক হয় না, নানা দুর্দৈবে প্রাণকে বারবার লাঞ্ছিত হতে হয়। জরা ব্যাধি মৃত্যু অতৃপ্ত বাসনার বেদনা ইচ্ছার অপঘাত—এরা যেন তার নিত্যসঙ্গী। মনের বেলাতে যেমন জ্ঞানের সঙ্কোচে প্রমাদের সৃষ্টি হয়েছিল, এখানেও তেমনি শক্তির সঙ্কোচে সৃষ্ট হয় অশিব বা অকল্যাণ, মানুষের সঙ্কল্প ও কর্মের ক্ষেত্রে একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ততা।

সাংখ্যের ভাষায় বলতে গেলে মানুষের মধ্যে গণচেতনা আজও তামসিক মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, অথচ রাজসিক চাঞ্চল্যে বিক্ষুব্ধ। তারই এখানে-ওখানে সাত্ত্বিক দীপ্তির এক-এক ঝলক। তামসিক চেতনায় বুদ্ধি জড়ধর্মী অসাড় একগুঁয়ে, পরের প্ররোচনায় চলতে অভ্যস্ত; সাধারণত এই হল গণচিত্তের চেহারা। তার চালক হল রাজসিক বুদ্ধি—প্রাণবাসনায় সে উত্তাল দুর্ধর্ষ যুযুৎসু, নিত্য-নতুনের নেশায় মাতাল। এরই পিছনে আছে মুষ্টিমেয় সাত্ত্বিক বুদ্ধির দীপ্তি। দর্শনে-বিজ্ঞানে তাদের মনস্বিতার দানকে রাজসিক বুদ্ধির জন-নেতারা ভাঙিয়ে খায়। কিন্তু এই তিন বুদ্ধিই অপরা প্রকৃতির বিভূতি—এমন-কি সাত্ত্বিক বুদ্ধিও মনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে পৌঁছতে পারে ক্বচিৎ।

মানুষের প্রাকৃত সমাজের কাঠামো তৈরী হয়েছে এই দিয়ে। তার মধ্যে তামসিক জড়ত্বের ভাগই বেশী, রাজসিক প্রাণচাঞ্চল্য তার চাইতে কম, সাত্ত্বিক মনের দীপ্তি আরও কম। সব জড়িয়ে সমাজচেতনার যে-ছবি চোখের সামনে জাগে, তাতে অচিতির জগদ্দল পাষাণ হটিয়ে চেতনার ধারাকে মুক্ত করবার তপস্যার কথাই মনে পড়ে। এ-তপস্যা করছে প্রাণ আর মন, তাদের পিছনে নিগূঢ় থেকে কাজ করছে অতিমানস বিজ্ঞানের শক্তি। প্রাকৃত ভূমিতে প্রাণ অনেকক্ষেত্রে বাসনায় উত্তাল, মন প্রমাদে ব্যাহত; অনর্থের সৃষ্টিও তাদের ওই বৈকল্য হতে। তবুও মানতে হবে, প্রমাদের সবটুকু যেমন অসত্য নয়, তেমনি প্রাণবাসনারও সবটুকু অশিব নয়। সত্য ও শিবের নির্বাধ ছন্দোময় প্রকাশ হল বিজ্ঞানভূমির বৈভব। জড়ত্বের বাধা ঠেলে প্রাণ আর মন চলেছে

সেই আদর্শলোকের দিকে। অনর্থের বিকার তাদের পথচলতি উপসৃষ্টি মাত্র। এ যেমন আদিতে ছিল না, তেমন অন্তেও থাকবে না।

অনর্থের পরিচয় তাহলে মোটামুটি এই দাঁড়াচ্ছে। অনর্থের প্রধানত দুটি ধারা—একটি অসত্য, আরেকটি অশিব ; একটি জ্ঞানের বাধা, আরেকটি সঙ্কল্পের বাধা। বেদনা বা দুঃখের সৃষ্টি হয় দুটি থেকেই। সবার গোড়াতে হল অবিদ্যা বা চেতনার সঙ্কোচ। চেতনার সঙ্কোচে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হয়, মন একনজরে তত্ত্বের সবটুকু দেখতে পায় না। অথচ দেখবার জানবার আগ্রহ তার দুর্দম। সে-আগ্রহ মেটাতে গিয়ে বারবার তাকে ঠেকতে বা ঠকতে হয়—তা-ই হল প্রমাদ। কখনও-বা বুদ্ধির ফেরে ওই প্রমাদকে সে আঁকড়ে থাকে, যতদিন না কোনও-একটা ধাক্কায় তার নেশা ছুটে যায়। প্রমাদকে এমনি করে আঁকড়ে থাকা হল অসত্য, প্রাচীনেরা যাকে বলতেন 'মিথ্যাদৃষ্টি'। দৃষ্টির সঙ্কোচে শক্তিরও সঙ্কোচ ঘটে, যদিও ভিতরে-ভিতরে একটা শক্তির তপস্যা চলতেই থাকে। শক্তির আধার হল প্রাণ। অচিতির অন্ধকার হতে প্রাণ জাগে অহং নিয়ে। অহং স্বভাবতই ক্ষুদ্র, অথচ তার মধ্যে আছে বৃহৎ হবার প্রেরণা। নিরঙ্কুশ ভোগে আর ঐশ্বর্যে নিজেকে সে ফাঁপিয়ে তুলতে চায়। এই থেকে দেখা দেয় প্রাণবাসনার ব্যাকুলতা। তারই তর্পণ করতে গিয়ে অশিবের সৃষ্টি হয় সমাজে।

এখন প্রশ্ন, অনর্থের প্রতিকার হবে কিসে। গোড়াতেই বলে রাখি, সাধারণত দুঃখকে আমরা বড়রকমের একটা অনর্থ বলে ধরে নিলেও আসলে দুঃখ জন্য (derivative) বোধ মাত্র। দুঃখকে জীবনের মর্মান্তিক সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েও তাকে প্রাধান্য না দিয়ে দিতে হবে তার হেতুকে। দুঃখের হেতু আমরা খুঁজি বাইরে—এটাও আমাদের ভুল। দুঃখ যখন বোধের ব্যাপার, তখন বোধশক্তির পরিশীলনের দ্বারা তার মাত্রার হ্রাস করাও তো সম্ভব। এই হল প্রাচীন তিতিক্ষা আর নির্দ্বন্দ্বতার সাধনা। 'ব্যাঘাত আসুক নব-নব, আঘাত খেয়ে অচল রব।' কিন্তু অচল থাকতে হলে স্থিরবুদ্ধি হওয়া চাই, নইলে তিতিক্ষার সাধনা মূঢ়তায় পর্যবসিত হতে পারে। বুদ্ধি স্থির হলে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। তখন দেখি, আমরা দুঃখ পাই—বুঝি না বলেই। অর্থাৎ প্রাচীনদের ভাষায় দুঃখের হেতু হল অবিদ্যা কিনা চেতনার সঙ্কোচ।

আগেও দেখেছি, চেতনার সঙ্কোচ হতেই অসত্য আর অশিবরূপে অনর্থের উৎপত্তি।

সুতরাং অনর্থের সত্যকার প্রতিকার হবে চেতনার প্রসারে। তাতে দৃষ্টির বিকার দূর হয়ে অখণ্ডসত্যের দর্শন যেমন সহজ হবে, তেমনি বাসনার মত্ততা শান্ত হয়ে কল্যাণপ্রবৃত্তিরও উন্মেষ হবে। অসত্যে আর অশিবে তৈরী অনর্থের বনিয়াদ ভেঙে পড়বে এমনি করে। অসত্য দৃষ্টি আর অশিব প্রবৃত্তি না থাকলে দুঃখও থাকবে না।

কিন্তু চেতনার প্রসার ধাঁ করে হয় না, হয় ধাপে-ধাপে। এ যেন পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মত। যত উপরে ওঠা যাবে, দিগন্ত ততই প্রসারিত হবে, সমস্ত বৈষম্য ছাপিয়ে ফুটবে পৃথিবীর নতুন শ্রী। এক-এক ধাপে চেতনার যতটুকু প্রসার হবে, সত্যদৃষ্টি ও শিবপ্রবৃত্তিও হবে তার অনুরূপ। এই দিয়ে দেশে-দেশে যুগে-যুগে রচিত হয়েছে জীবনের নানা দর্শন, সংহিতার নানা বিধান, ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের নানা নিরিখ। এদেরও একটা আপেক্ষিক সার্থকতা নিশ্চয় আছে। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অখণ্ড তত্ত্বের দর্শন না হওয়া পর্যন্ত অনর্থের ঐকান্তিক প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না, একথাও মনে রাখতে হবে।

অনর্থ যখন অবিদ্যার পরিণাম, তখন বস্তুত অবিদ্যার নিরসনেই অনর্থের প্রতিকার সম্ভব। অবিদ্যার খণ্ড দৃষ্টিকে বিদ্যার অখণ্ড দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে হবে, তবেই বুঝতে পারব সত্যের স্বরূপ কি, শিবেরই-বা স্বরূপ কি। এই বিদ্যার সাধনা মানুষ করে চলছে চিরকাল, তবুও তার চরম লক্ষ্যে আজও পৌঁছতে পারেনি। অন্তরের বিজ্ঞান দিয়ে বাইরের আচারকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ধর্মশাস্ত্রের নানা বিধান সে রচেছে। কিন্তু তার মধ্যে অনু-শাসনের পীড়নটাই মোটের উপর জোর ধরেছে, চিন্ময় প্রাণের ঋতচ্ছন্দ বড়-একটা আমল পায়নি। বিশ্বহিতৈষণার আদর্শের প্রচার এবং অনুশীলন করে নিজের ক্ষুদ্র অহংকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সে বড় হতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে অলক্ষ্যে তার অহংই হয়েছে স্ফীতকায়, বিশ্বহিতের জল্পনা আচমকা ফেঁসে গিয়েছে নানা দুর্বিপাকের গুপ্তঘাতে।

বিদ্যার সাধনা পূর্ণসিদ্ধির কূলে উত্তীর্ণ হয়নি, সমষ্টিচেতনায় অবিদ্যার ঘোর এখনও ফিকা হয়নি। তবে উপায়?

উপায়, সর্বাত্মভাবের সাধনার 'পরে জীবনের ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করা। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা', আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার তপস্যা বিশ্বহিতের জন্যে, অপরের অধ্যাত্মসিদ্ধিতে আমারই সিদ্ধি—এই বোধে সবার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। শুধু প্রাণে মনে হৃদয়ে অহমিকায় এক হওয়া নয়—আত্মায়-আত্মায় এক হয়ে যাওয়া : এই হল সর্বাত্মভাবের লক্ষ্য। এই সর্বাত্মভাবের সাধনায় বিশ্বচেতনার উন্মেষ ঘটলেই সত্য ও শিবের যথার্থ স্বরূপ আমরা চিনতে পারব। তখনই অবিদ্যানিরসনের সাধনা হবে সার্থক এবং সর্বগত।

তার জন্যে সবার আগে প্রয়োজন আত্মার স্বরূপোপলব্ধি। এ হলেই আর-সব হবে। এইজন্য আধ্যাত্মিকতার আহ্বান সকল আহ্বানের উপরে, এর ডাকে সাড়া না দিয়ে আমাদের উপায় নাই।

আত্মোপলব্ধির তিনটি ধাপ—যদিও তারা এক আত্মজ্ঞানের তিনটি বিভাব মাত্র। প্রথম ধাপ, অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে চৈত্য-পুরুষের সাক্ষাৎকার দ্বারা আমাদের সত্যকার জীবস্বরূপকে চিনে নেওয়া, অন্তরপুরুষকে আমাদের 'শুদ্ধ-মনোময় প্রাণ-শরীর-নেতা' করে তোলা। দ্বিতীয় ধাপ, আমাদের মধ্যে গুহাশায়ী কূটস্থ-পুরুষের সংবিৎকে জাগিয়ে তোলা, অহংশূন্য চেতনার মুক্তিতে তার প্রসার ঘটানো। তৃতীয় ধাপ, পুরুষোত্তমের উপলব্ধি—যিনি যুগপৎ পরা সংবিৎ বিশ্বচেতনা এবং অন্তর্যামিরূপে আমাদের কূটস্থাত্মা বিশ্বাত্মা এবং অন্তরাত্মা, তাঁকে পাওয়া। পুরুষোত্তমকে যদি জানি আমাদের মহেশ্বর-রূপে, তাহলে নিজেকে তাঁর অবন্ধ্যবীর্যের বাহন বলে অনুভব করতে পারি। আমাদের প্রাণ তখন হবে ঋতময়, কর্ম দিব্যচ্ছন্দোময়, সঙ্কল্প অমোঘ এবং প্রমুক্ত। পুরুষোত্তমের পরমা প্রকৃতির দিব্যভাবে ও দিব্যবীর্যে আধারের সব-কিছু তখন ঢালা হবে নতুন ছাঁচে। এক স্বতঃস্ফূর্ত সত্য-সংবিৎ, সত্য-সঙ্কল্প, সত্য-বেদনা (feeling), সত্য-স্পন্দ ও সত্য-কৃতি হবে আমাদের আত্মপ্রকৃতির সত্য ও সম্যক্ ছন্দ।

অবিদ্যাজনিত অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের আত্যন্তিক প্রতিকারের এই পথ।

এতদূরে এসে অনন্ত চেতনার সঙ্গে অবিদ্যার কি সম্পর্ক, সে-প্রসঙ্গ শেষ হল। অবিদ্যা নিয়ে আরেকটা আলোচনা বাকী রইল—সপ্তধা অবিদ্যা হতে সপ্তধা বিদ্যায় চেতনার উত্তরণ। চিন্ময়-রূপান্তরের প্রসঙ্গে যথাস্থানে আমরা তার কথা তুলব।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পর্ব

বিদ্যা এবং চিন্ময় পরিণাম

পঞ্চদশ অধ্যায়

সম্যক্-জ্ঞানের স্বরূপ

এতদূর এসে পূর্ণব্রহ্মবাদের একটা দিকের আলোচনা শেষ হল। ফলে প্রথমে আমরা পেলাম বিশ্বমূল তত্ত্বগুলির পরিচয়, জানলাম সৎ চিৎ আনন্দ অতিমানস মন জীব প্রাণ আর জড়ের স্বরূপ কি। তারপর দেখলাম, অনন্ত-চেতন ব্রহ্মের বিদ্যাশক্তি কোন্ ধারা ধরে জীবের প্রাকৃত চেতনায় অবিদ্যার আবর্ত হয়ে নেমে এল। সেইসঙ্গে এও জেনেছি, অবিদ্যা শুধু বিদ্যার প্রতিষেধ নয়, তার মধ্যেও বিদ্যার অন্তর্গূঢ় একটা তপস্যা চলছে। এই তপস্যা উত্তরায়ণের পথিকের চেতনায় ফুটছে অভীপ্সার সংবেগ হয়ে। শক্তির স্রোত অবিদ্যা হতে বিদ্যার দিকে উজান বইছে, এই হল শক্তিপরিণামের আরেকটা ধারা। এবার এই চিন্ময়-পরিণামের (spiritual evolution) একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেবার সময় এসেছে। সে-পরিচিতিতে দিব্য-জীবনের সাধনাও স্পষ্ট হবে।

দিব্য-জীবনের সাধনা মুখ্যত আধারে বিদ্যাশক্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণের সাধনা। শক্তিকে সত্তাতে সিদ্ধ করতে হলে তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। পূর্ণযোগের লক্ষ্য যখন আধারের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর, তখন শক্তির জ্ঞানের মধ্যেও কোনও সীমার সঙ্কোচ মানলে চলবে না। অসীম সর্বাবগাহী জ্ঞানকে বলে সম্যক্-জ্ঞান (integral knowledge), আর সে-জ্ঞানেই তত্ত্ব-ভাবের (Reality) অখণ্ড পরিচিতি সম্ভব। সম্যক্-জ্ঞান সাধনার শেষ কথা হলেও গোড়াতে তার অনুকূল একটা দৃষ্টিভঙ্গি সাধকের থাকা চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হবে, অনুভবের কোনও পর্বকে প্রত্যাখ্যান না করে একটা সার্বভৌম ঔদার্যের মধ্যে অবিরোধে সব-কিছুর ঠাঁই করে দেওয়া। অবিদ্যাগ্রস্ত বুদ্ধির দ্বারা এটি সম্ভব হয় না। কেননা, অবিদ্যার দস্তুর হল অখণ্ডকে খণ্ডিত করা, বিষয়ের একটি বিভাবের দিকে ঝোঁক দিয়ে তার অন্যান্য

বিভাবকে আড়াল করে রাখা। কিন্তু বিদ্যার স্বভাব ঠিক তার বিপরীত। তার আলো কোনও-কিছুকে আড়াল না করে অচিতি হতে অতিচিতি পর্যন্ত তত্ত্বের সমস্ত বিভাবকে একটি নিটোল সামঞ্জস্যের ছন্দে প্রকাশ করে। বিদ্যার দৃষ্টিতে সবই সত্য, সত্য-মিথ্যার বিরোধ অথবা পারমার্থিক (noumenal) ও প্রাতিভাসিক (phenomenal) সত্যে ভাগাভাগি সেখানে নাই। অথচ অবিদ্যার দৃষ্টিতে এই-যে আপাত-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, তারও মীমাংসা আছে।

বিদ্যার এই সর্বসমঞ্জস উদার দৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেও যে সবসময় সহজলভ্য নয়, তার প্রমাণ পাই প্রচলিত বেদান্তের নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদে। এই মতে একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা অথবা তাদের সত্যতা প্রাতিভাসিক মাত্র, পারমার্থিক নয়। অথচ একথা স্বীকার করতে হবে, চেতনায় একবার যা ভেসেছে, তার কোনও-না-কোনও রকমের একটা সত্যতা আছেই। সে-সত্যতাকে আপেক্ষিক বললেও তার মধ্যে যে ধারাবাহিকতা ও ঋতচ্ছন্দ আছে, তা প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি এবং তাদের অবলম্বন করে নানা বিদ্যা-স্থানও (schools of scientific thought) আমরা গড়ছি। তাদের অস্বীকার করার অর্থ হল জীবনকেই অস্বীকার করা। তাছাড়া প্রাকৃত জীবনের একটা বনিয়াদ না থাকলে নির্বিশেষ-তত্ত্বের ইমারতই-বা আমরা খাড়া করতাম কিসের 'পরে ? অবশ্য প্রাকৃত জীবনই যে একমাত্র সত্য, একথা বলছি না। তেমনি নির্বিশেষের মধ্যে সমস্ত জীবনস্পন্দের উপশমই যে একমাত্র পুরুষার্থ, একথাও সহজবুদ্ধিতে মেনে নিতে পারি না। আসল কথা, জীবনের মধ্যে একটা প্রগতির সংবেগ আছে। নিজেকে প্রতিমুহূর্তে সে ছাড়িয়ে গিয়ে আরও বিকশিত করে তুলছে—এই প্রাণধর্মের তাগিদ তার মর্মচর রহস্য। এখানে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা জীবনের পক্ষে বড় কথা নয়, তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই উপলক্ষ্যে নিজেকে বাড়িয়ে তোলা, বৃহৎ করা। প্রপঞ্চোপশম অবর্ণতা অস্তিত্বের পটভূমিকা মাত্র। তার বুকে বর্ণৈশ্বর্যের বিচ্ছুরণ তার আরেকটা সার্থক দিক। অখণ্ড তত্ত্বভাবনা অবিরোধে গ্রহণ করে দুটিকেই।

উপনিষদের ঋষির ছিল এই দৃষ্টি। ব্রহ্ম তাঁর কাছে স্বয়ম্ভূই নন, পরিভূও— অর্থাৎ তিনি শুধু আপনাতে আপনি আছেন তা নয়, তিনিই যা-কিছু সব হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তাঁর একলা থাকাটা যেমন সত্য, বহু হওয়াটাও তেমনি

সত্য এবং যুগপৎ সত্য। যিনি এক, তিনি বহু হতে পারেন না—একথা বলা সৃষ্টির একটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে অস্বীকার করা। 'একং বীজং বহুধা যঃ করোতি'—একই বীজকে বহুরূপে ফুটিয়ে তোলা, একই কাণ্ড হতে বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তার এক থেকে বহু হওয়ার স্থূল দৃষ্টান্ত হিসাবেও উপেক্ষণীয় নয়। এক আর বহুর যৌগপদ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই আমাদের নিজেদের অনুভবে। আমার মধ্যে চিত্তসত্ত্ব (conciousness-stuff) দানা বেঁধেছে একটি অহং-এ, আর সে-অহন্তা হতে অহরহ বিকীর্ণ হচ্ছে অগণিত চিত্তবৃত্তির স্ফুলিঙ্গ। এক স্বয়ম্ভূ অহন্তা চিত্তবৃত্তিতে পরিভূ হয়ে দেখা দিচ্ছে পরস্পর অবিনাভূত (inalienable) থেকে। এর দুটিই আমি, এবং দুয়ের মধ্যে কোনও বিরোধও অনুভব করছি না। পিছনের অহংসম্পর্কে সজাগ না থেকে বৃত্তির বিক্ষেপে ছড়িয়ে পড়া—এই হল প্রাকৃত চেতনার একটা দিক। আবার বৃত্তিগুলিকে গুটিয়ে এনে অহং-এ (উপনিষদের ভাষায় 'জ্ঞান-আত্মাতে') নিয়ত (self-gathered) থাকা—এও হল যোগিচেতনার একটা দিক। কিন্তু যোগিচেতনার আরেকটা দিক হতে পারে আত্মনিষ্ঠ থেকেই বৃত্তিতে বিচরণ করা। এই অবস্থাতে প্রসাদযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের কর্মযোগ সম্ভব হয়। আগের অবস্থাটি আসে বৃত্তিসংযম বা নিরোধের দ্বারা চেতনাকে উজান বইয়ে দিয়ে। আবার চেতনার সেই গঙ্গোত্রী থেকে ভাটার টানে নেমে এলে পরের অবস্থাটি মেলে। প্রবর্তদশায় যোগীর উজান বওয়ার দিকে স্বভাবতই ঝোঁক হয় বেশী। কিন্তু এই ঝোঁক যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, তাহলে যোগিমাত্রেই জানেন কি করে সিদ্ধ-দশায় ওখানে-এখানে সমান স্বচ্ছন্দ থাকাটা সহজ হয়ে আসে। এই সহজের একটি লক্ষণ, যোগী তখন 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' (গীতা)। গোড়া থেকেই এই প্রসাদের ভাব অবলম্বন করে সাধনা শুরু করা কিছু অযৌক্তিক বা অসম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য চাই দৃষ্টির ঔদার্য এবং স্বচ্ছতা—আকাশের মত বুক পেতে দিয়ে সব-কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা এবং তার ভিতর দিয়ে পরম নির্ভরতায় চরম সত্যের দিকে নিজেকে উন্মীলিত করা।

এটি ঠিক নিরোধের পথ নয়, অথচ নিরোধের ধারা এরও মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে বইতে থাকে। কিন্তু সাধনায় নিরোধকে যদি একান্ত করে তুলি, নিবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যকে যদি স্বীকার না করি, তাহলে বিলীয়মান বৃত্তির চরম তীক্ষ্ণতা দিয়ে অস্তিত্বের পুটকে বিদীর্ণ করে আমরা উত্তীর্ণ হতে

পারি মহাশূন্যের কূলে। শক্তি-প্রবৃত্তির প্রতি অভ্যস্ত বিরাগবশত এই শূন্যকে তখন একমাত্র তত্ত্ব বলে মনে হতে পারে। এ-অবস্থা থেকে কেউ যদি ফিরে না আসত, তাহলে শূন্যকে একমাত্র তত্ত্ব বলে ঘোষণা করবারও কেউ থাকত না। 'সা রে গা মা পা ধা নি—কিন্তু নি-তে মানুষ বেশীক্ষণ থাকতে পারে না' ; নীচের পর্দায় আবার তাকে নেমে আসতেই হয়। শূন্যের অনুভব যদি অবিদ্যার সমস্ত সংস্কারকে নির্মূল করে দিত, তাহলে নেমে আসার পরিণাম হত সহজস্থিতি। বৌদ্ধ-মরমীয়ার ভাষায়, ভব আর নির্বাণ তখন এক হয়ে যেত এবং সত্তার প্রসন্ন বৈভব জীবনে অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের ফুল ফুটিয়ে চলত। কিন্তু নিরোধের নিগূঢ় সংস্কার এই মহনীয় সম্ভাবনাতে বাদ সাধে, আর তাকে আশ্রয় করে দেখা দেয় অবিদ্যার এক নিগূঢ় বিপাক। সম্বুদ্ধ চেতনা যখন বলে, 'শুধু ব্রহ্ম আছেন, জীব ও জগৎ নাই', তখন তার সে-দর্শনকে বিদ্যা না বলে বলতে পারি উচ্চকোটির একটা অবিদ্যা। কেননা, একদেশদর্শন যে অবিদ্যাগ্রস্ত মনের ধর্ম, তার সংস্কার হতে এ-দর্শন তো মুক্ত নয়। এ-দর্শনের আভিজাত্য আছে, বীর্য আছে, সত্যতাও আছে। কিন্তু পূর্ণতা নাই বলে একে সম্যক্-দর্শন বলতে পারি না।

নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ ও শূন্যবাদের ভিত্তি শুদ্ধ সন্মাত্রের অনুভবের 'পরে। প্রাকৃত চেতনার ভূমির সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে, সুষুপ্তিতে চিত্তবৃত্তির যে-প্রলয় হয় অথচ সত্তার একটা অবিশিষ্ট বোধ থাকে, এখানকার অনুভবও সেই ধরনের। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্ররোচনায় সদ্‌বাদ আর অসদ্‌বাদ নিয়ে আমরা যত তর্কই করি না কেন, অনুভবী জানেন, সৎ-অসতের দ্বন্দ্বটা বস্তুত দ্বৈতবুদ্ধির কারসাজি। সামান্য-প্রত্যয়ের চরমে সৎ ; 'আমি কিছু হয়ে নাই, শুধু আছি' —এই নির্বিশেষ অনুভব ইতিবাদের শেষ সীমা। কিন্তু শুদ্ধভাবনার যে-সংবেগ সত্তার এই শুভ্রতায় চেতনাকে উত্তীর্ণ করে, তা আপনাহতেই তারও উজানে এক আনন্ত্যের পরঃকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে প্রসর্পিত হয়। চিদ্‌বৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে তখন ইতিভাবকে ছাপিয়ে দেখা দেয় নেতিভাব। মরমীয়া দুয়ের মাঝে সহজে বিলসিত থাকতে পারেন বলেই বলেন, 'নিরস্তমসো ন দিবা ন রাত্রিঃ, ন সন্ ন চাসঞ্ শিব এব কেবলঃ।'

এমনি করে তত্ত্বভাবের একটি বিভাব যেমন ফুটে ওঠে শুদ্ধ-সত্তার ভাবনায়, তেমনি শুদ্ধ-চিতের ভাবনায় ফোটে তার আরেকটি বিভাব—বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং সাংখ্য পুরুষবাদে আমরা যার দার্শনিক বিবৃতি পাই। কিন্তু সেখানেও

দার্শনিকের দ্বৈতবুদ্ধি বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার ভেজাল দিয়ে সম্যক্-দর্শনকে ব্যাহত করেছে। বিশ্বজগৎ এক চিৎশক্তির বিসৃষ্টি অতএব চিন্ময়, তত্ত্ব-দর্শীর এই অন্তরঙ্গ অনুভবকে পরাহত করেছে দার্শনিকের এই সিদ্ধান্ত : 'এ-জগৎ মনের প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) কল্পনা মাত্র, এ কেবল "বিজ্ঞানের" একটা প্রবাহ। এখানে গোল বেধেছে চিৎ এবং চিত্তকে একই পর্যায়ের মনে করে। আমার চিত্ত বিশ্বদৃষ্টির সাধন (instrument) হতে পারে, বিশ্বসৃষ্টির সাধন তো নয়। আমার চিত্তের প্রলয়ে আমার জগতের প্রলয় হতে পারে ; কিন্তু তাতে বিশ্বজগতের প্রলয় হয় না। অথচ জগতের অর্থনিরূপণে আমার চিত্তেরও যে খানিকটা দান আছে, তা অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয়সংবিৎ বস্তুর শুধু একটা রূপরেখা আমার কাছে এনে হাজির করে, তাকে অর্থ দিয়ে ভরাট ক'রে একটা ভাবের লোক গড়ে তোলে কিন্তু আমার চিত্তই। আচ্ছন্ন চেতনার ভূমিতে এই ভাব থাকে আবছা। কিন্তু চেতনা যতই স্বচ্ছ পরিব্যাপ্ত এবং গভীর হয়, ততই এই ভাবের জগৎ ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই তীক্ষ্ণতা ও বীর্য নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৃষ্টিতে আর সৃষ্টিতে ভেদ তখন ক্রমেই কমে আসে, সঙ্কল্প ও সত্যের মাঝেও ব্যবধান দূর হয়ে যায়। এই অবস্থাতে বিশ্বকে চিত্তের নয়—কিন্তু ঋত-চিতের সত্য বিসৃষ্টি বলে অনুভব হয়। বোঝা যায়, ঋত-চিতের সত্যভাবনার অস্ফুট প্রতিবিম্বই প্রাকৃত চিত্তে ধরে কল্পনাশক্তির রূপ, যার মধ্যে সচরাচর আমরা দেখি সত্য ও মিথ্যার একটা সম্মিশ্রণ, ভাব ও বস্তুর একটা অসম্পূর্ণ প্রত্যাসত্তি (rapprochement)।

সাংখ্যের চিদ্‌ভাবনা প্রকৃতির মূলে আবিষ্কার করল চিন্ময় পুরুষের অধি-ষ্ঠান—এইখানে তার অনুভব সম্যক্-দর্শনের অনুকূল। কিন্তু প্রাকৃত দৃষ্টির বহুত্বকে পুরুষতত্ত্বে উপচরিত করে আবার সে-দর্শনকে সে করল কুণ্ঠিত। অখণ্ড প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরুষ যেন পরিপ্রেক্ষার বিভিন্ন বিন্দু—একই আকাশে অনেক নক্ষত্রের মত : সাংখ্যের এ-প্রকল্পনায় বহুত্ব চিৎস্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাস্তবতার একটা মর্যাদা পেল বটে। কিন্তু বহুধাবৃত্তি (multiplicity) যেমন চিৎশক্তির একটা বিভাব, তেমনি অন্যোন্যভাবনার (mutuality) দ্বারা একত্বে সংহত হওয়াও তো তার আরেকটা বিভাব। অবিদ্যার আমিটা যতক্ষণ সঙিন উঁচিয়ে থাকে, ততক্ষণ তুমি-আমি-সে সবাই আলাদা। কিন্তু এই প্রাকৃত জগতেই দেখি, ভালবাসায় ভেদবুদ্ধির ধার মরে যায় যখন,

তখন বিদ্যার আমিতে-আমিতে আর রেষারেষি থাকে না। তাছাড়া প্রকৃতির এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মূলে এক অখণ্ড প্রকৃতিকে যদি স্বীকার করতে পারি, তাহলে এক অদ্বিতীয় পুরুষকে স্বীকার করতেই-বা আপত্তি কি ?

দেখলাম, নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ আর সাংখ্যবাদ—উজান-সাধনার 'পরে প্রতিষ্ঠিত এই চারটি বাদই তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেও তার বিবৃতিতে সম্যক্-দর্শনের পরিচয় দিতে পারেনি—কেননা প্রাকৃত ভাবনার উজানে গিয়েও অবিদ্যামনের সূক্ষ্ম সংস্কার হতে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। দার্শনিকের যদি এই দশা, তাহলে সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে সম্যক্-জ্ঞানের স্বরূপ যে বিকল হয়ে দেখা দেবে, একথা বলাই বাহুল্য। তবুও পূর্বপক্ষ হিসাবে তাদের প্রসঙ্গ এখানে তুলছি এইজন্য যে, সম্প্রতি প্রাকৃত চিত্তের লোকায়ত সিদ্ধান্তকে দর্শনের মর্যাদা দেওয়া অভিজাত-মহলে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক প্রতীকবাদ, যাকে দার্শনিক মায়াবাদের সগোত্র বলা যেতে পার। বলা হয়, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে জগতের সব-কিছুই আমাদের কাছে প্রতীক মাত্র, কেননা আমরা কোনও-কিছুর সবটুকু দেখতে পাই না। সত্তার একদিকে অচিতির আনন্ত্য, আরেকদিকে অতিচিতির আনন্ত্য; দুয়ের মাঝখানে চিদ্-বিলাসের যে-বিবর্তন, আমাদের শুধু তাকেই জানা সম্ভব। তার মধ্যে যা দেখছি, তা তো নির্ব্যূঢ় সত্য নয়, সত্যের তা প্রতিবিম্ব।…'প্রাকৃতমনের শক্তি সীমিত'—এই বোধ হতে এমনতর প্রতীকবাদের উৎপত্তি। এর জবাবে বলা যেতে পারে, প্রতীকদর্শনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাকৃতচেতনার অভিযান, একথা স্বীকার করলেও প্রতীক মিথ্যা হয়ে যায় না। ব্রহ্মের প্রতীক গণিতের প্রতীকের মত বস্তু-শূন্য সঙ্কেতমাত্র নয়। মরমীয়া দেখেন, বিশ্বের যা-কিছু সমস্তের তাৎপর্য ব্রহ্মে; তারা কেউ ব্রহ্মকে পূর্ণপ্রকটিত করতে পারছে না বটে, কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুকেও তো ব্যক্ত করছে না—কেননা সিদ্ধদৃষ্টিতে তারা বস্তুত ব্রহ্মের প্রকাশ, তাঁরই শক্তিরূপ। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চাইতে মানসজ্ঞানের ব্যঞ্জনা যে আরও ব্যাপক এবং গভীর—এ আমরা সহজেই বুঝি। তার চাইতে আরও ব্যাপক ও গভীর হল বোধিজাত প্রজ্ঞার ব্যঞ্জনা। তার দিব্যদৃষ্টি বস্তুর মর্মমূলে আবিষ্কার করে বৃহৎকে। অপরোক্ষানুভূতির সর্বাবগাহী প্রত্যয়ে তখন 'সর্বং

খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্’; সৃষ্টি আর তখন কোনও অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের মনঃকল্পিত প্রতীক নয়, ব্রহ্মেরই সত্য সম্ভূতি।

প্রতীকবাদ তবুও বস্তুর পিছনে ভাবের একটা অস্পষ্ট আভাস স্বীকার করে, কিন্তু জড়বাদ বিশ্বের মূলে জড় ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পায় না। অবশ্য নিছক জড়বাদ আজকালকার দিনে অচল। বিশ্বমূল হিসাবে জড়ের জায়গা এখন দখল করেছে জড়শক্তি। শক্তিবাদীর তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে দার্শনিক রূপ দিলে গোড়ার প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়, বিষয় আর বিষয়ীর মধ্যে কার প্রাধান্য বেশী, কে কার উপর নির্ভর করে? জড়বাদীর কাছে জড়ের সত্তাই প্রাক্‌সিদ্ধ বলে তিনি বলবেন, আগে বিষয় তার পর বিষয়ী; জড়ের পরিণামেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছে—বস্তু আগেই ছিল, অনুভব এসেছে তার পরে।…প্রাকৃত অনুভবের বেলায় একথা সত্য বটে। জীব প্রায় জড়পিণ্ড হয়েই জন্মায়, ধীরে-ধীরে তার মধ্যে চেতনার উন্মেষ হয়, একটু-একটু করে সে বাইরের জগৎকে জানতে থাকে। এই জানাতে তাকে বিষয়ের 'পরেই মুখ্যত নির্ভর করতে হয়। কিন্তু চেতনা যেমন বাইরের জগৎকে আবিষ্কার করে, তেমনি একসময় ভিতরপানে দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে সে নিজেকে আবিষ্কার করতেও লেগে যায়। এই আত্মানুসন্ধানের ফলে চেতনার যে-পরিণাম ঘটে, তাতে তার জড়-নিরপেক্ষ সত্তার অনুভব ক্রমেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরোক্ষানুভূতিতে তখন সিদ্ধ হয়, জড়ের নয়—চৈতন্যেরই প্রাক্‌-সত্তা। জড়জগতের অনুভবের মত এই অন্তর্জগতের অনুভবও বিজ্ঞানসম্মত; তবে কিনা এখানে বিজ্ঞানসাধনার ধারা অন্যরকম। বস্তুজ্ঞানের প্রামাণ্য যে-রীতিতে সিদ্ধ হয়, আত্মজ্ঞানের প্রামাণ্য সে-রীতিতে সিদ্ধ হতে পারে না। একটির সাধন হল ইন্দ্রিয়নির্ভর মন, যার মোড় ফেরানো আছে বাইরের দিকে; আরেকটির সাধন হল ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বোধি বা আন্তর অনুভব, যা নিজের গভীরে গুটিয়ে এসে তলিয়ে যায়। এই অন্তর্মুখীনতার ফলে বিষয় আর বিষয়ীর মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ যোগাযোগের সূত্র আবিষ্কৃত হয়—যাতে মনে হয়, বিষয় আর বিষয়ী বিবিক্ত দুটি সত্তা নয়, তারা একই সত্তার দুটি বিভাব মাত্র। তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের প্রসঙ্গে আমরা এই চিৎ-পরিণামের কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। জড়বিজ্ঞানের মত অন্তর্বিজ্ঞানেরও রহস্যের অবধি নাই। কিন্তু আগেই বলেছি, তাদের আবিষ্কারের ধারা স্বতন্ত্র। জড়বিজ্ঞানের নিয়ম এখানে খাটে না বলেই যে রহস্যবিজ্ঞানের কোনও প্রামাণ্য নাই, একথা বলা অযৌক্তিক। তন্ত্রেরও

বিভিন্ন ভূমি আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ তার একটা ভূমি মাত্র। জড়কে বা জড়শক্তিকেই যদি বিশ্বমূল মনে করে তার মান (standard) দিয়ে তত্ত্বনিরূপণ করতে যাই, আমাদের দর্শন হবে একদেশী। তাতে তত্ত্বভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে না। জড় দিয়ে চিতের রহস্য বেড়ে পাওয়া যায় না, কিন্তু চিৎ দিয়ে জড়কে বরং বোঝা যায়—একথাও ভুললে চলবে না।

জড়বাদের পাশাপাশি আরেকটা বাদ বেশ জোর ধরেছে কিছুদিন ধরে, যাকে বলতে পারি একটা নতুনধরনের 'লোকায়তবাদ'। এ বলে, 'আমার ব্যক্তিগত অনুভবই সত্যের মাপকাঠি; অথবা যা সর্বসাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা-ই সত্য।' স্পষ্টই বোঝা যায়, সাধারণ চিত্তকে এইভাবে একান্ত প্রাধান্য দিলে জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত হতে পারে না। চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সকলেরই আছে—এইটুকুই স্বীকার করা চলে। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসার পথকে উন্মুক্ত রাখাও আমাদের কর্তব্য। আপত্তি হতে পারে, বাস্তবের প্রামাণ্যকে উপেক্ষা করলে ব্যক্তি-মনের খেয়াল-খুশির আবর্জনায় জ্ঞানের রাজ্য যে ভরে উঠবে। কিন্তু ব্যক্তি-মনের ছাপ কি বাস্তবজ্ঞানের উপরেও পড়ে না? ভ্রমের সম্ভাবনা আছে বলেই কি জিজ্ঞাসা হতে নিবৃত্ত হওয়া চলে?

তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপসম্বন্ধে দার্শনিক বুদ্ধি আর প্রাকৃত বুদ্ধি দুয়েরই রায় আলোচনা করে দেখা গেল, অখণ্ড সর্বাবগাহী সম্যক্-জ্ঞানের রূপটি কারও কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। লোকোত্তরের প্রতি পক্ষপাতবশত দার্শনিক যেমন জগৎকে উপেক্ষা করেছেন, লৌকায়তিকও তেমনি এখানকার তাত্ত্বিকতাকে একান্ত করতে গিয়ে ওখানকার প্রতি অন্ধ হয়ে রয়েছেন। সুতরাং অপক্ষপাতে তত্ত্বনিরূপণ কোনও পক্ষের দ্বারাই সম্ভব হয়নি। বস্তুত সম্যক্-বিজ্ঞান হবে সর্বাবগাহী। চেতনা ও অনুভবের সকল রাজ্যে তার গতি হবে অবাধ, তার কাছে সকল রহস্যের আবরণ হবে অনাবৃত। বিশ্বজিজ্ঞাসা আর আত্মজিজ্ঞাসা বিজ্ঞানের এই দুটি ধারাকেই সম্যক্-জ্ঞানের অঙ্গীভূত করে নিতে হবে। আবার বিশ্বজিজ্ঞাসাকে শুধু ইন্দ্রিয়নির্ভর জ্ঞানের অনুশীলনেই আবদ্ধ রাখলে হবে না। যা জড়োত্তর এবং অতীন্দ্রিয়, তার সাধনাতেও তাকে নিয়োজিত করতে হবে—অতীন্দ্রিয়কে আজগবী বলে মুখ বাঁকানো চলবে না।

সম্যক্-জ্ঞানের স্বরূপ

অবিদ্যা হতে আমাদের যাত্রা শুরু, অতএব অবিদ্যার রহস্য আর অধিকার নিরূপণ করতে হবে সবার আগে। মৌল, বিশ্বগত, অহন্তামূঢ়, কালাবচ্ছিন্ন, চিত্তগত, সাংস্থানিক এবং ব্যাবহারিক—এই সাতটি অবিদ্যার আবরণে আমরা আবৃত। সম্যক্-জ্ঞানের অর্থ হবে এই সপ্তপর্বা অবিদ্যাকে নিরাকৃত করে চেতনায় আত্মজ্যোতির সাতটি কমলকে ফুটিয়ে তোলা এবং সেই জ্যোতিঃ-শক্তিকে বিশ্বের আধারে প্রয়োগসিদ্ধ করা।

কিন্তু এই জ্ঞান ও শক্তি চেতনার বর্তমান ছাঁচকে বজায় রেখে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করা যাবে না। তার জন্য চাই আধার ও চেতনার সম্যক্ রূপান্তর। সে-রূপান্তর অপ্রত্যাশিতও নয়, কেননা প্রকৃতিপরিণামের মধ্যেই তার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তার স্বরূপ এবং রীতিকে আবিষ্কার করাই হবে আমাদের কাজ।

ষোড়শ অধ্যায়

তত্ত্বজ্ঞান ও পুরুষার্থ

সম্যক্-জ্ঞানের তাহলে এই কয়েকটি মূলসূত্র পাওয়া গেল। সম্যক্-জ্ঞান এক অখণ্ড সর্বাবগাহী অনুত্তর বিজ্ঞান, অবিদ্যার কোনও দ্বৈতসংস্কার তার মধ্যে নাই। স্বভাবতই এ-জ্ঞান মানসভূমির হতে পারে না। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপী ত্রিপুটীর লয় নয়, কিন্তু যে অতিমানস-বিজ্ঞানের সংবর্তুল দৃষ্টিতে তার সমীকরণ ঘটে, সম্যক্-জ্ঞান তার বিভূতি। এই জ্ঞানে অনুভব হবে, ব্রহ্মই সব-কিছুর উৎস আশ্রয় এবং তত্ত্ব। ব্রহ্মের দুটি বিভাব: একটি তাঁর স্বয়ম্ভূ-স্থিতি—তিনি আপনাতে আপনি আছেন; আরেকটি তাঁর সম্ভূতি-রূপ—তিনিই আবার আত্মশক্তির আনন্দময় উচ্ছলনে সব-কিছু হয়েছেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম যেমন স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ, তাঁরই নিত্যধর্মরূপে এই ব্যক্ত বিশ্বের তত্ত্বও তেমনি স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম যখন, তখন ব্রহ্মের স্বয়ম্ভাবে (self-existence) উত্তীর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর সম্ভূতিতে (self-becoming) উল্লসিত হওয়াই তার পুরুষার্থ।

সম্যক্-জ্ঞানের একটি বিভাবের উপর বিশেষ করে জোর দিতে হবে। জানতে হবে, বিশ্বোত্তীর্ণ তত্ত্বই বিশ্ব ও জীবের আশ্রয়। সান্তকে ঘিরে এক আনন্ত্যের পরিমণ্ডল, দৃশ্যকে ছাপিয়ে এক অতীন্দ্রিয় অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃক্শক্তির বৈভব—এই ভাবনা দিয়ে চেতনাকে অহরহ জারিত রাখতে হবে। অনুভব যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, তারও ওপারে থাকবে সর্ববিশেষণের অতীত অথচ সকল বিশেষের প্রসূতি এক অনির্বচনীয়ের মার্মিক প্রত্যয়। এই বিশ্বোত্তীর্ণকে বাদ দিয়ে কোনও দর্শনই পূর্ণাঙ্গ হবে না—এমন-কি সর্বব্রহ্মবাদও (Pantheism) নয়। বস্তুত এদেশের কোনও দর্শন সর্বব্রহ্মবাদকে আমল দেয়নি, ব্রহ্ম জগৎ হয়ে ফুরিয়ে গেছেন একথা কেউ বলেনি। বরং বলেছে, ব্রহ্ম যেমন বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, আবার তেমনি তিনি অতিষ্ঠাও অর্থাৎ সব-কিছুকেই ছাপিয়ে গেছেন। আবার বিশ্বোত্তীর্ণকে বাদ দিয়ে শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব, এমনতর নির্ব্যূঢ়-শক্তিবাদ (Energism) অথবা বিশ্বের সত্তা রয়েছে একমাত্র জীবের চেতনাতে, এমনতর প্রত্যক্-বাদও (Subjectivism)

কখনও সম্যক্‌-জ্ঞানের অঙ্গীভূত হতে পারে না। এমন-কি ঈশ্বরবাদ (Theism) এবং দ্বৈতবাদও (Dualism) যদি ভাব ও শক্তির উল্লাসকে বড় করতে গিয়ে পরমসাম্যের অদ্বৈতরসনিবিড় অনুভবকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাদের দর্শনকেও একদেশীই বলব, সম্যক্‌-দর্শন বলব না। আর সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, বিশ্বোত্তীর্ণকে সব-কিছুর উৎস আশ্রয় ও অবসান বলে মানলেও সম্যক্‌-বিজ্ঞানী কিন্তু মায়াবাদী নন—যদিও সাধনার একটি বিশেষভূমিতে মায়াবাদের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন না। সম্যক্‌-বিজ্ঞানী জানেন, ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক এবং জীবভূত—তাঁর তিনটি বিভাবই সত্য এবং ওতপ্রোত।

সম্যক্‌-বিজ্ঞানী যেমন বিশ্বোত্তীর্ণকে জানেন, তেমনি জানেন বিশ্বাতীত কি করে হলেন বিশ্বরূপ—আত্মবিসৃষ্টির প্রেরণায় কি করে চিৎ-সত্তা হতে চিৎ-পরিণামের সাতটি পর্বে নেমে এলেন অচিতির গুহাশয়নে ; আবার সেখান থেকে কি করে তিনি উত্তরায়ণের পথ ধরে ফিরে চলেছেন পূর্বচিতির পরমধামের দিকে, আর সেই চলার বেগে উন্মীলিত করেছেন অবচেতনার কুহরে নিগূহিত প্রচেতনার ভাস্বর ঐশ্বর্য। এই সাতটি পর্বের কথা আমরা আগেও বলেছি। সাতটি পর্বের তিনটি আমাদের সুপরিচিত জড় প্রাণ আর মন—এই নিয়ে তত্ত্বভাবের অবরার্ধ (lower hemisphere) : এরা অচিতির কবলিত। কিন্তু সে-অচিতিও তার গভীরে বহন করছে চিৎ-শক্তির এক নিগূঢ় প্রচোদনা, এবং তাইতে জীবের আধারে অবিদ্যার মন্থর সর্পিল অভিযান চলেছে বিদ্যার দিকে। এ-তিনটি ছাড়া আর চারটি পর্ব হল সৎ চিৎ আনন্দ আর অতিমানস, তাদের নিয়ে তত্ত্বভাবের পরার্ধ (higher hemisphere)। এরাই বিশ্বের প্রথমজ অনাদিতত্ত্ব এবং আমাদের পুরুষার্থ। উপর হতে ওই দিব্য-চতুষ্টয়ীর চাপে নীচের অদিব্য-ত্রিপুটী রূপান্তরের ঋতচ্ছন্দে উজিয়ে চলেছে সহস্রদল সৌষম্যের দিকে—এই হল বিশ্বব্যাপারের মর্মপরিচয়। এই ক্রমোন্মীলনের তত্ত্ব জীবনায়নেরও নিয়ামক।

কিন্তু এই আত্মোন্মীলনের ছন্দ সম্পর্কে সবার ধারণা এক নয়, কেননা পরমার্থতত্ত্বকে সবাই ঠিক এক ভূমি হতে দেখে না। তত্ত্বদর্শনসম্পর্কে সংস্কারের বিভিন্নতা হতে পুরুষার্থ (aim of existence) বা জীবনদর্শন-সম্পর্কেও ভেদ দেখা দেয়। এই দর্শনের ভেদকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বিশ্বোত্তর-দর্শন, ঐহিক-দর্শন, পারত্রিক-দর্শন আর সবার

শেষে সম্যক্-দর্শন। বলা বাহুল্য, প্রথম তিনটি দর্শনের ন্যূনতার পূরণ হয়েছে শেষের দর্শনে এবং তা-ই পূর্ণযোগীরও পুরুষার্থ। জীবনের প্রতিষ্ঠা কোথায়, এই হল সব দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। তার জবাবে ঐহিক-দর্শন বলে ইহলোকে, পারত্রিক-দর্শন বলে লোকান্তরে আর বিশ্বোত্তর-দর্শন বলে লোকোত্তরে। সম্যক্-দর্শন বলে, লোকোত্তর হল জীবনের ঊর্ধ্বমূল, লোকান্তর তার ঊর্ধ্বায়নের আশ্রয় আর ইহলোক তার সাধনার ক্ষেত্র—জীবনের সার্বভৌম পূর্ণতা তিনটিকে নিয়েই। সংক্ষেপে পুরুষার্থের এই ভেদ নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথমে ধরা যাক বিশ্বোত্তর-দর্শনের কথা। এ-দর্শনে লোকোত্তর পরমার্থ-সৎই তত্ত্ব। এতে আপত্তি করবার কিছুই থাকত না—যদি না সেমিটিক একান্তবাদীদের মত সেইসঙ্গে একথাও জুড়ে দেওয়া হত: 'তা ছাড়া আর কিছুই তত্ত্ব নয়।' অর্থাৎ পরমার্থ-সৎই আছেন—তাছাড়া জগৎ ও জীব হয় নাস্তি, নয়তো বিভ্রম। এই সিদ্ধান্তই দর্শনে অজাতিবাদ এবং মায়াবাদ নামে খ্যাত, আমরা ইতিপূর্বে তাদের সঙ্গতি নিয়ে বিচার করেছি। বলা বাহুল্য, মায়াবাদ বিশ্বোত্তর-দর্শনের একমাত্র পরিণাম হতে পারে না। উপনিষদ ব্রহ্মকে লোকোত্তর বা অতিষ্ঠা বলেছেন, কিন্তু তাবলে জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি।

কেউ হয়তো বলবেন, না হয় মানলাম জগৎ আছে, পুরুষোত্তমের নিত্যলীলার রঙ্গভূমি হয়েই আছে। কিন্তু জীবের দিক থেকে দেখতে গেলে তার চরম নিয়তি হচ্ছে, লীলার আস্বাদন চরিতার্থ হবার পরে আবার ফিরে যাওয়া লোকোত্তরের সেই রিক্ততায়। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝব, এ-সিদ্ধান্তের মধ্যে জীবের স্বরূপসম্বন্ধে প্রাকৃত দৃষ্টির সংস্কার কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি। চলতি কথায় আমরা জীবকে বলি বিন্দু, ব্রহ্মকে সিন্ধু এবং বিন্দুর সিন্ধুতে মিলিয়ে যাওয়াকেই বলি তার পুরুষার্থ। এই উপমায় ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অবয়বী (whole) এবং অবয়বের (part) সম্পর্কটিই উজ্জ্বল হয়ে ফোটে—যা নাকি প্রাকৃত ভূমির কথা। কিন্তু বিন্দুর মধ্যে যে-ঘনতা আছে, তাকে শক্তি ও চৈতন্যের দিক থেকে যদি মেপে দেখি, তাহলে বিন্দুতে আর সিন্ধুতে সাম্যের আরেকটা দিক চোখের সামনে খুলে যায়। বস্তুকণা হিসাবে একটি অণু সান্ত; কিন্তু অণুর এই পরিচয় যে সম্পূর্ণ নয়, শক্তিবিন্দু হিসাবে সে যে অনন্ত, তার প্রমাণ সম্প্রতি আমরা পেয়েছি। চিৎ-কণা আর জড়-

কণাতেও এই সাম্য আছে—শুদ্ধ-জীবের পরিচয় নিতে গিয়ে এই কথাটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ জীবত্বকেও বিচার করতে হবে ব্রহ্মের দিক থেকে—ব্রহ্ম তাঁর অখণ্ড অনন্ত শক্তি নিয়েই জীবত্বে সংহত হয়েছেন, এই দৃষ্টি নিয়ে। জীবত্ব তখন পূর্ণব্রহ্মের একটি সান্দ্র বৈভব এবং তাকে আশ্রয় করে বিশ্বলীলার নিত্যোল্লাস। বস্তুত নিত্যে ও লীলায় কোনও তফাত নাই। ব্রহ্ম জীবে গুটিয়ে আসেন, কিন্তু তাবলে তিনি খাটো হয়ে যান না। ব্রহ্মসত্তায় প্রাকৃত জীবত্বের পরিনির্বাণ অস্তিত্বের চক্রাবর্তনের একটা দিক মাত্র—উত্তরণের দিক। কিন্তু ওইখানেই তার শেষ নয়, তার একটা অবতরণের দিকও আছে। অবতার-বাদের স্বীকৃতিতে ব্রহ্মের জৈব-বিভূতির আরেকটা দিকের ইশারা আমরা পাই—যেখানে নিত্য আর লীলারও সমন্বয় হয়েছে বলতে পারি।

লোকোত্তর-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত হল ঐহিক-দর্শন। তার মতে একমাত্র জগৎই সত্য এবং সে-জগৎ এই জড়ের জগৎ। জড়বিজ্ঞানের দৌলতে এই দর্শনই আজকালকার লোকায়ত দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-দর্শনে জীব সত্য, জগৎও সত্য—কিন্তু তাবলে তারা জড়োত্তর সত্য নয়। জড়ের বুকে প্রাণ ও মনের স্ফুরণ যেন ক্ষণেকের একটা দীপ্তি মাত্র; এই ক্ষণিকার চমককে ভিত্তি করে কোনও শাশ্বত পুরুষার্থের কল্পনা করা নিছক পাগলামি। আত্মার অমরত্ব একটা ভুয়া কথা; জাতির আপেক্ষিক অমরত্ব বলে একটা-কিছুকে মানতে পারি—এই পর্যন্ত। আমার ইহকাল আছে, দেখছি; পরকাল আছে কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার দেখছি না। নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করব, তারপর আমার অর্জিত সম্পদ দিয়ে যাব সন্ততিকে অথবা ভবিষ্য সমাজকে—এই আমার দায়। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ আছে, ততদিন তার প্রগতির আর কল্যাণের তপস্যা আমাদের ঐহিক জীবনের পুরুষার্থ—এর বেশী কিছু নয়।

এই ঐহিক-দর্শনের পাশাপাশি আরেকটি দর্শন আছে—পারত্রিক-দর্শন। ইহলোকই সব নয়, এছাড়া আরও লোক আছে—এই হল সে-দর্শনের একটা মুখ্য সিদ্ধান্ত। মানুষ মরলেই সব ফুরিয়ে যায় না, দেহ নশ্বর হলেও তার আত্মা অমর। মৃত্যুর পর এই আত্মা লোকান্তরে যায়। সেখান থেকে কারও মতে সে পৃথিবীতে বার-বার ফিরে আসে চেতনার উন্মীলনকে সার্থক করবার জন্য। কারও মতে আত্মা একবারই পৃথিবীতে আসে, সুতরাং মৃত্যুর পর চরম ব্যবস্থা-পনের প্রতীক্ষায় পৃথিবীর অবসান পর্যন্ত কোনও অপার্থিব লোকে সে অবস্থান

করে। যা-ই হ'ক, ইহলোক ছাড়া পরলোকও আছে—স্বর্গ-নরক আছে। ইহলোক নশ্বর, দুঃখময়; স্বর্গলোক শাশ্বত, আনন্দময়। তা-ই আত্মার স্বধাম। সেখান থেকে সে পৃথিবীতে আসে দুদিনের প্রবাসী হয়ে মাত্র।

জীবনের প্রতি এই তিনটি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিও তিনরকম। প্রায় সব মানুষেরই ঝোঁক পড়ে ঐহিক-দর্শনের প্রতি। পার্থিব-জীবনকে সমৃদ্ধ করাই হল তাদের পুরুষার্থ। ঐহিক-জীবন নির্ভর করছে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়শক্তির 'পরে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যকে মার্জিত এবং প্রবৃদ্ধ করাতেই জীবনের সার্থকতা। মানুষের মনোজগৎ নিশ্চয় আছে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি করার তাগিদও সে অনুভব করে। কিন্তু তার মানসিক ঐশ্বর্যের ভিত্তি হল ওই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। মন যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্রকে ছিন্ন করলে তার চলবে না। বস্তুশূন্য সামান্যজ্ঞানের 'পরে অপার্থিব একটা তত্ত্বের বা জগতের কাঠামো গড়ে তোলা নিরর্থক কল্পনা-বিলাস মাত্র। এই হল ঐহিক-দর্শনের রায়।

পারত্রিক-দর্শন ইহলোকের ভোগসুখ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না। এখানকার সব-কিছুই তার কাছে ফিকা আর আলুনি লাগে। আনন্দ সে চায়, জীবনের সার্থকতাও চায়; কিন্তু এখানকার সংস্পর্শে তো শাশ্বত আনন্দের সন্ধান মেলে না। তাই তার দৃষ্টি ওপারের দিকে। ওখানে দেবতা আছেন, তাঁকে পাওয়াই মানুষের পুরুষার্থ। তাঁকে পেতে হলে এখানকার মায়া কাটাতে হবে। পারত্রিক-দর্শনের মধ্যে তাই শুনি একটা বৈরাগ্যের সুর। কিন্তু সে-বৈরাগ্য ইহ-বিমুখ হলেও অমুত্র-বিমুখ নয়। এখানকার নশ্বর আনন্দকে ছেড়ে সে চায় দেবসাযুজ্যের চিন্ময় আনন্দ।

কিন্তু লোকোত্তর-দর্শনের আকূতি লোকৈষণাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে শুধু ইহ-বিমুখ নয়, অমুত্র-বিমুখও। তার বৈরাগ্য সর্বনাশা। পথের কোথাও সে খুঁটি গেড়ে বসতে চায় না, যেপর্যন্ত না উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে নির্বর্ণ অস্তিত্বের রিক্ততায় সে অবগাহন করতে পেরেছে। আনন্দ তার লক্ষ্য নয়, সম্ভূতির কোনও ভূমিতেই সে বাঁধা পড়তে চায় না। যা সে চায়, তা ইতিধর্মী নয়—নেতি-নেতিতেই তার সত্যকার পরিচয়। পারত্রিক-দর্শনের মত সেও মুক্তিবাদী, অমৃতের পিপাসী—কিন্তু তার মুক্তি সুখের প্রত্যাশাহীন দুঃখাভাব মাত্র, তার অমৃতত্ব জীবত্বের প্রলয়ে।

বলা বাহুল্য, তিনটি দর্শনের কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা, তারা কেউই

অস্তিত্বকে অখণ্ডভাবে দেখেনি, চেতনার ক্রমিক উন্মেষের অনুপাতে তার এক-একটা ভূমির উপর জোর দিয়েছে মাত্র। ইহলোক হতে জীবনের শুরু, সুতরাং প্রাকৃত চেতনা যে ঐহিকের দাবিকে সবার উপরে স্থান দেবে, তার মধ্যে অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই। কিন্তু জীবন তো শুধু মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায় না, পৃথিবীর ধূসরতার মায়া কাটিয়ে আভাস্বর আলোর রাজ্যে পাখা মেলতেও সে চায়। শুধু প্রাকৃত-চেতনার মধ্যে কুণ্ডলিত হয়ে থাকলে তার চলে না, সে চায় বিশ্বচেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে আত্মচেতনার বিস্ফারণ। আবার তাকে ছাপিয়েও সে চায় অতিচেতনায় সত্তার নিমজ্জন। উত্তরায়ণের এই সংবেগ জীবনচেতনার অন্তর্গূঢ় ধর্ম। কিন্তু কুণ্ঠার সৃষ্টি হয়, এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে উঠতে গিয়ে নীচের ভূমিকে যখন সে অস্বীকার করে, অথবা দুরাগ্রহবশত ঊর্ধ্বভূমির প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে।

বস্তুত ইহ লোকান্তর আর লোকোত্তর তিনটিই এক অখণ্ড অস্তিত্বের তিনটি বিভাব মাত্র। তারা পরস্পরের আপূরক, প্রতিষেধক নয়। ব্যষ্টি, বিশ্ব আর বিশ্বোত্তর তিনটিকে এক মেনে পরিপূর্ণ আত্মস্ফুরণই হল আমাদের সত্যকার পুরুষার্থ। যেমন পৃথিবীর দাবি সত্য, তেমনি তাকে ছাপিয়ে চেতনার আরও যেসব বৃহত্তর লোক আছে, তাদের দাবিও সত্য। আবার, এসবই পড়বে শক্তির এলাকায়; সুতরাং শক্তির মূলে শিবত্বের যে অচল-প্রতিষ্ঠা, তার দাবিকেও মানতে হবে। এখান থেকে উপরদিকে যেমন উঠে যেতে হবে ঊর্ধ্বশক্তির আকর্ষণে, তেমনি আবার সে-ঊর্ধ্বশক্তিকে এখানে নামিয়ে আনবার সচেতন তপস্যাও করতে হবে। যে উঠে যায়, সে যে আরও ঐশ্বর্য নিয়ে নেমে আসে এবং আর দশজনকে উদ্‌বুদ্ধ করে—মহাযানীর এই ঔদার্য এবং বীর্যের পরিচয় তো আমাদের একেবারে অজানা নয়।

সুতরাং জীবনসম্পর্কে তাকেই সম্যক্-দর্শন বলব, যার মধ্যে ঐহিক পারত্রিক এবং লোকোত্তর তিনটি দর্শনেরই সমন্বয় ঘটেছে। লোকোত্তরকে করতে হবে সমস্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। কেননা, সান্তকে ঘিরে অনন্তের যে-পরিমণ্ডল, তার সম্পর্কে নিত্যচেতন না থাকতে পারলে শক্তির মুক্তি কখনও সম্ভব হয় না। সেই অখণ্ডে অবগাহন করেই নিতে হবে বিশ্বশক্তির বৈপুল্যের পরিচয় এবং ঐশ্বরযোগের সিদ্ধ প্রয়োগে এই মর্ত্যের কুণ্ডলীতে সেই শক্তির বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। বিশ্বোত্তর বিশ্ব এবং ব্যষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একমাত্র সম্যক্-দর্শনই এই মহাসিদ্ধির অনুকূল হতে পারে।

প্রাচীন ভারতে এমনিতর একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা হয়েছিল চতুর্বর্গ- এবং চতুরাশ্রম-বাদে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারটি হল মানুষের স্বাভাবিক পুরুষার্থ। অর্থ ও কামের অনুশীলন তার ঐহিকের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করবে, ধর্মের সাধনা তার পারত্রিক চেতনাকে পুষ্ট করবে এবং অবশেষে মোক্ষে শান্ত হবে তার লোকোত্তরের আকূতি। চিৎ-পরিণামের এই ক্রমকে মেনে দেখা দিল চতুরাশ্রমের কল্পনা—জীবনব্যাপী শিক্ষানবিশির চারটি পর্বে। ব্রহ্মচর্যে ও গার্হস্থ্যে শীল ও ধর্মের অনুশীলনে সংযমিত চিত্তের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তর্পণ, বানপ্রস্থে সংসার হতে সরে গিয়ে অধ্যাত্মজীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং সন্ন্যাসে জীবনাসক্তি বর্জন করে চিন্ময় স্বরূপে অবগাহন—এই হল জীবন-ব্যবস্থার আদর্শ। কোনও পুরুষার্থই হেয় নয়, কোনও আশ্রমই অশ্রদ্ধেয় নয়—গোড়াতে জীবন সম্পর্কে এই সুস্থ মনোভাব থাকলেও ক্রমে বৈরাগ্য-সাধনার মাত্রাছাড়া ঝোঁকে সমাজ-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেল, জীবনের অঙ্গনে দেখা দিল প্রবৃত্তিমুখী আর নিবৃত্তিমুখী আদর্শের তুমুল দ্বন্দ্ব। আজও তার জের চলছে, যদিও ইতিমধ্যে সংসারজীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের সুষম সমন্বয়ের ছন্দটি ফিরে পাবার একটা আকূতিও জেগেছে মানুষের মনে।

এক সর্বাবগাহী সম্যক্-দর্শনের ঔদার্যের মধ্যে বিশ্বোত্তরের সঙ্গে বিশ্বের, ব্রহ্মের স্বয়ম্ভূ-স্বভাবের সঙ্গে পরিভূ-প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য যদি ঘটাতে পারি, তাহলেই এই আকূতির পরিতর্পণের একটা পথ মিলবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিদ্যার পথে

এইটুকু তাহলে বোঝা গেল, এক অখণ্ড সর্বাবগাহী সম্যক্-বিজ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। আর সে-জ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষার্থের যে-ছবি ফোটে, তাতে ইহলোক লোকান্তর আর লোকোত্তর এই তিনেরই মর্মসত্যের যোজনায় এক সর্বতোভদ্র জীবনের অপরূপ বর্ণসৌষম্যের পরিচয় মেলে। এই জীবনই দিব্য জীবন, মর্ত্যের আধারে তাকে সিদ্ধ করাই আমাদের নিয়তি। এবার দেখা যাক, তত্ত্বের সম্যক্-বিজ্ঞান আর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সম্যক্-দৃষ্টি আমাদের সাধনায় কোন্ ছন্দের প্রবর্তনা আনে।

মাটির মানুষকে ফুটতে হবে চিন্ময় মানুষ হয়ে, মৃত্যুর সন্তানকে হতে হবে 'অমৃতস্য পুত্রঃ'—এই তার দিব্যনিয়তি। এই নিয়তি সিদ্ধ হবে বিদ্যার সাধনায়।

একই অখণ্ড বিদ্যা, কিন্তু তার তিনটি বিভাব—আত্মবিদ্যা বিশ্ববিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু বিদ্যা বলতে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য তথ্যের সঞ্চয় ও তত্ত্বের সমাহার বুঝলে চলবে না, বুঝতে হবে অপরোক্ষ অনুভব।

প্রাকৃত দৃষ্টিতে আমাদের প্রথম জ্ঞানের বিষয় হল দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশ। জগতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে সবার আগে। তবুও এই জগৎ-জ্ঞানের মূল প্রেরণা আসছে কিন্তু আত্মভাবনা হতে; আমি নিজে যা, সেই অনুযায়ী জগৎকে দেখি বা গড়ি। জগতের সঙ্গে নিত্যকার কারবারে আমার আত্মভাবের পুষ্টি, আমার আমিকে কেন্দ্র করে আমার জগৎ। সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে জগৎ-জ্ঞানের চাইতে আত্ম-জ্ঞানের গুরুত্ব বেশী। আমাকে যদি আমি না জানি না বুঝি, তাহলে আমার জগতে ছন্দ আনতে পারব না—এ-সত্য অনস্বীকার্য।

দেখছি, আত্মপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের বাইরের দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফিরে যায়। দুঃখের তাড়নাতে হ'ক বা জিজ্ঞাসার প্রেরণাতে হ'ক, প্রকৃতি-সচেতনতার গভীরেই আমাদের মধ্যে ফোটে আত্ম-সচেতনতা—বাইরের জগতের যত জটিলতা যত সমস্যা তাদের সমাধানের পথ হয় আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি ধ্রুববিন্দুকে আবিষ্কার ক'রে। এই ধ্রুববিন্দু হতে আমার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ, —যা আমার জগতের প্রশাস্তা। যার ব্যক্তিত্ব আছে, জগৎ তার বশ; যার নাই, সে জগতের ক্রীড়নক। আত্মবিদ্যার গুরুত্ব এইখানে।

আত্মবিদ্যার তাগিদে মানুষ অন্তর্মুখ হয়। সে-অন্তর্মুখীনতা একান্তভাবে প্রবল হলে বহির্জগৎ হতে নিজের মধ্যে গুটিয়ে সে তলিয়েও যেতে পারে। অনেকের কাছে আত্মবিদ্যার সাধনার চরম লক্ষ্য তা-ই। কিন্তু আমরা জানি, এ-দৃষ্টি একদেশী—পুরুষার্থের এ-আদর্শ সুস্থও নয়, স্বাভাবিকও নয়। চেতনার কেন্দ্রাভিসারী গতি শক্তির কেন্দ্রাপসারী বিচ্ছুরণের ভূমিকা মাত্র। আত্ম-বিকাশের জন্যই আত্মসঙ্কোচ প্রয়োজন, তা-ই জীবনধর্ম। আত্মা অন্নাদ, বিশ্ব তাঁর অন্ন—তাকে আত্মসাৎ করে চিন্ময় করে তোলাই তাঁর প্রাণের তপস্যা। আমাদের আত্মবিদ্যার সাধনাও যদি এই ছন্দের অনুগামী হয়, তাহলে বাইরে-ভিতরে সৌষম্য বজায় থাকে, জীবন অখণ্ড হয়।

একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন স্তূপীকৃত ইন্ধনকে অগ্নিময় করে তোলে, তেমনি জড়ের মধ্যে আবির্ভূত চিৎ-কণের তপঃশক্তি বিশ্বকে চিন্ময় করে তুলতে চাইছে—এই প্রেরণা সৃষ্টির মূলে, জীবনের প্রগতির মূলে। এ হল একাত্ম-তার সাধনা। স্থূলদৃষ্টিতে আগুন আর কাঠ আলাদা। কিন্তু কাঠের মধ্যেও আগুন আছে, এমন-কি তার সবখানি আগুন হয়ে উঠতে পারে—এই সম্ভাবনাই তার স্বরূপের সত্য। তখন আগুন আর কাঠ একাত্মক। তেমনি জীব আর জগৎও একাত্মক। জীবসত্ত্বকে সমষ্টিদৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারি, জগৎ জুড়ে তার এই তপস্যা চলছে—বিচিত্র উপায়ে বিশ্বের জড়ে সে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, তাকে চিন্ময় করে তুলছে। জড়ত্বের আড়ষ্টতাকে চিৎশক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে মুক্তি দেওয়া—এই হল বৈশ্বানরের অনির্বাণ তপস্যা। এ-সাধনা কালের অন্তর্গত, তাই আপাতদৃষ্টিতে তার সিদ্ধির তারতম্য দেখতে পাই। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখি কালোত্তর নিত্যসিদ্ধির চিদ্‌বিলাস। যা মন্থরগতিতে এখানে হচ্ছে, ওখানে তা হয়েই আছে। 'এখানে' 'ওখানে' বলাটাও ভুল, কেননা নিত্যসিদ্ধ আর আপাতসাধ্য দুটি পৃথক তত্ত্ব নয়। নিত্যসিদ্ধিরই আবেশ

বীজশক্তিরূপে সাধ্যের মধ্যে উন্মেষের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। নিত্যশুদ্ধ পূর্ণচৈতন্যই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, আর সাধকচৈতন্য জীব-জগৎ। তিনে কোনও ভেদ নাই। জীব আর জগতের ঈশ্বরাভিমুখী গতিই জীবন। আত্মবিদ্যা বিশ্ববিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যা—এই ত্রিবিধ বিদ্যার সাধনা তার অন্তর্গূঢ় মৌল প্রেরণা।

আত্মা বিশ্ব আর ব্রহ্ম—মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই তিনটি তত্ত্বকে ঘিরে। কিন্তু এরা যে এক অদ্বয়তত্ত্বের বিভঙ্গ, একথা সে সবসময় বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে যেমন পর্যায়ক্রমে তিনটিকে অস্বীকার করেছে, তেমনি আবার কখনও-কখনও তাদের একান্ত করেও তুলেছে। জড়বাদীর কাছে আত্মচৈতন্য অলীক, মায়াবাদীর কাছে জগৎ নাই, নিরীশ্বরবাদীর কাছে ঈশ্বর অসিদ্ধ। আবার তেমনি বিজ্ঞানবাদীর কাছে আত্মচৈতন্যই একমাত্র সত্য, প্রকৃতিবাদীর কাছে বিশ্বজগৎ শক্তির খেলা, নির্বিশেষব্রহ্মবাদীর কাছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। কিন্তু এধরনের নাস্তিবাদ বা একান্তবাদ কোনটাই সম্যক্-বিজ্ঞানের অনুকূল নয় এবং মানুষের মুক্তচিত্তের জিজ্ঞাসাও এতে পরিতৃপ্ত হয় না। দার্শনিকের কূটতর্ক যা-ই বলুক, সহজবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে আর জগৎকে না মেনে পারে না—না মানলে তার সংসার চলে না। আবার আমি আর জগৎ এ-দুটিকে ছাপিয়ে বিরাট আরেকটা-কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করেও মানুষ পারে না। দৃষ্টির পরিসর ও গভীরতার তারতম্যবশত এই বিরাটের যে-পরিচিতিই দিই না কেন, আমাদের ঈশ্বরভাবনার বীজ কিন্তু এইখানে। জগতের সবটুকু আমি দেখতে পাই না, আমারও আত্মপরিণামের চরম পর্ব আমার প্রত্যক্ষ নয়; অর্থাৎ আমার সান্ত আমি আর সান্ত জগৎকে ঘিরে একটা অনন্তের পরিমণ্ডল আছেই। এই আনন্ত্যের সংবেদনই ঈশ্বর-সত্তার প্রমাণ। আমাকে আর জগৎকে না মানলে যেমন সংসার চলে না, তেমনি যে-আকারেই হ'ক এই আনন্ত্যের পটভূমিকাকে স্বীকার না করলেও আমাদের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমার প্রাণের মধ্যে যে বৃহৎ হবার আকূতি রয়েছে তা-ই জানিয়ে দেয়, ওই আনন্ত্যের সঙ্গে আমার সত্তার একটা নাড়ীর যোগ আছে, ওই আমার পরমা নিয়তি। সংসারের ঝামেলা হতে যখন ছুটি চাই, তখন বিকল্পহীন প্রশান্তি-রূপে ওই আনন্ত্য আমার পরমমুক্তির ক্ষেত্র। আবার সংসারে থেকেই তাকে যখন বশ করতে চাই, তখনও তাহতে একটুখানি সরে গিয়ে ওই আনন্ত্যের

ধ্রুব প্রতিষ্ঠা হতেই আত্মশক্তির সহজ বিচ্ছুরণ ঘটাই। সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কখনও আমরা তাকে বশে আনতে পারি না, তার অন্ধ আবর্তে নিজেরা পাক খেয়ে মরি শুধু। গাড়ির চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সে চালক হতে পারে না। চালক চক্রাবর্তনের উর্ধ্বে—স্বয়ং নিস্পন্দ থেকেই স্পন্দের প্রবর্তক। বাইরের স্পন্দ অন্তরমুখে ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে অবশেষে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে নিস্পন্দ আত্মস্পন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। চাকার পরিধিতে একটি বিন্দুর যে-বেগ, কেন্দ্রাভিসারী হলে সে-বেগ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসবে, এবং শেষপর্যন্ত কেন্দ্রে এসে সে-বেগের পরিমাণ হবে শূন্য। সমগ্রদৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপার এই প্রচণ্ড বেগ এবং অপ্রমেয় স্তব্ধতা দুয়ের সমাহার। তার বেগও সত্য, স্তব্ধতাও সত্য। জড়দৃষ্টিতে বেগ আর স্তব্ধতা পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু চিদ্‌দৃষ্টিতে দুয়ের সহভাব (co-existence) অসম্ভব কিছুই নয়—বরং দেখি তারা অন্যোন্যাশ্রয়ী। নির্গুণে আর সগুণে, চৈতন্যে আর শক্তিতে, ব্রহ্মে আর জগতে তখন প্রাকৃত বুদ্ধির কল্পিত বিরোধের অবসান হয়। 'তিনিই সব হয়েছেন, কিন্তু হয়েও ফুরিয়ে যাননি—পূর্ণ হতে পূর্ণ উপচে পড়ে তবুও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকছে'—মরমীয়ার এই সহজ অনুভবে তখন বিশ্ব আর বিশ্বোত্তরের অন্যোন্যসম্বন্ধের স্বরূপ ধরা পড়ে। ব্রহ্মের এই অনির্বচনীয় জগদ্‌ভাবের নির্বচন হয় তখন আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে তুঙ্গতায় ও গভীরতায়, তার শক্তির নিত্য বিচ্ছুরণে। এমনি করে আত্মবিদ্যা বিশ্ববিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যার পরম সমন্বয়ে জীবনে বিদ্যার সাধনায় আসে সর্বগ্রাহী অখণ্ড পূর্ণতা।

কিন্তু এই সম্যক্-জ্ঞান মানুষের চেতনায় ফোটে পরিণামের অনেক ধাপ পার হয়ে। তার উদ্যোগপর্বে মানুষের সাধনার বিষয় হল ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা। এইজন্য প্রথম তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় নিজের অহংকে নিয়ে। যে-আত্মভাব একদিন ব্রহ্মাত্মভাবে এবং সর্বাত্মভাবে চেতনায় প্রজ্বল হয়ে উঠবে, তার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি দেখা দেয় মানুষের এই অহংএর উপাসনায়। অহংকে আশ্রয় করে সে প্রকৃতির অচেতন ও অবচেতন অন্ধশক্তির দাসত্ব হতে সবলে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। অহন্তার উন্মেষ তার পরিপূর্ণ আত্মোন্মেষের প্রথম পর্ব। সত্য বটে, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'—কিন্তু তাকে গলা টিপে মারলে তো চলবে না। তার মরণ হবে আলোর মরণ—সূর্যের আলোতে

নক্ষত্রের ঝিকিমিকি যেমন করে মরে, তেমনি মরণ। সে-মরণ সঙ্কোচ নয়, সহজ আনন্দময় বিস্ফারণ। তাতে আত্মপ্রকৃতির চিন্ময় আপ্যায়ন ঘটে বলে তা জীবনধর্মেরই অনুগামী।

আত্মপ্রসারণের প্রথম পর্বে অহন্তার আশ্রয় হয় যূথ-সংস্কার (herd-instinct), সমাজ-চেতনা বা গণ-চেতনা। এই গণচেতনার উৎস রয়েছে অধিচেতনার ভূমিতে, অচিতির 'পরে অন্তর্নিহিত বিশ্বচেতনার নিগূঢ় চাপে তার সৃষ্টি। বাইরের দৃষ্টিতে গণ-চেতনা আকারপ্রকারহীন হলেও, অধিচেতন দৃষ্টিতে তার ভাবময় বিপুল রূপায়ণ অত্যন্ত বাস্তব। প্রকাশ ও প্রগতির দিকে একটা নিঃশব্দ আকূতি সর্বদা সে বহন করে চলেছে, কিন্তু অবচেতনার আঁধার পথে তার চলাফেরা বলে দিনের আলোয় নিজের ভাবরূপকে স্পষ্ট করে তুলতে তার দরকার হয় ব্যক্তিচিত্তের প্রেষণা।

ব্যক্তিচিত্ত আর গণচিত্ত অন্যোন্যাশ্রয়ী। প্রথমটায় দেখি, ব্যক্তিচিত্তের আশ্রয় হল গণচিত্ত। মানুষ সামাজিক জীব, গণচিত্তের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সে জন্মায়, তার সক্রিয় প্রভাবে আত্মচেতনাকে সে বিকসিত করে। গণচিত্তের গর্ভাশয়ে সে যেন ভ্রূণের মত। কিন্তু এমনি করে গণ-চিত্তের একান্ত আশ্রিত হলেও ব্যক্তিচিত্তে এমন-একটা সময় আসে, যখন সে গণচিত্তের গতানুগতিকতাকে ছাড়িয়ে উঠতে চায়। সব ব্যক্তিই যে চায়, তা নয়। কিন্তু বিশ্বচেতনার নিগূঢ় প্রেরণায় কেউ-না-কেউ চায়। যে চায়, সে বিপ্লবী—গণচেতনায় অন্তর্নিহিত প্রগতির অস্ফুট আকূতিকে সে-ই রূপ দেয়। ব্যক্তির অন্তরে আগে বিপ্লবের আগুন না জলে উঠলে গণচেতনায় তার তাপ সঞ্চারিত হয় না। গণপতিহীন গণবিপ্লব একটা ফাঁকা কথা। আবার এইখানেই গণচিত্ত ব্যক্তিচিত্তের একান্ত আশ্রিত। গণপতিত্বেই ব্যক্তির সার্থকতা, 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' নিজেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তার অহন্তার শিবময় পরিতর্পণ। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এইখানেই—সম্মূঢ় গণচেতনার সে জ্যোতির্মুখ দিশারী। মহাপ্রকৃতি শুধু গণ-জননী নন, তিনি গণেশ-জননী—তাতেই তাঁর জননীত্বের চিদ্‌ঘন রূপায়ণ। গণবাহিনী যদি দেবসেনাও হয়, তবুও দেবসেনাপতি কুমারের নায়কত্ব অপরিহার্য। নইলে অসুরের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অভিযান চলে না। গণমহিমাকে ফাঁপিয়ে তুলতে গিয়ে আধুনিক বিপ্লববাদী এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সোজা সত্যটা অনেকসময় ভুলে যান।

বস্তুত গণচিত্তে আজও যা অস্ফুট, তাকে স্ফুটরূপে জাগিয়ে তোলা ব্যক্তিরই একক তপস্যার দায়। এইজন্য নিজেকে পেতে বারবার তাকে গুটিয়ে যেতে হয়েছে নিজের মধ্যে; 'চারিদিক হতে অমর জীবন বিন্দু বিন্দু করি আহরণ' আপনার মাঝে আপনাকে পূর্ণ দেখে তবে সে 'অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়' মন্ত্রে নতুন সৃষ্টির ব্যাহৃতি উচ্চারণের অধিকার পেয়েছে। বলিষ্ঠ প্রাণ মন ও চেতনা নিয়ে মহারথী সমাজপতির আবির্ভাব ঘটেছে যে-সমাজে, সেইখানেই মানুষের পক্ষে প্রগতির পথ হয়েছে নির্বাধ। গণপতির উদার ক্রান্তদর্শী আত্মসংবিতে দেখি বিশ্বাত্মভাবে ব্যক্তির অহন্তার সম্প্রসারণের প্রথম সূচনা।

তবুও বলব, ব্যক্তির অহংপ্রতিষ্ঠা কখনও আত্মজ্ঞান হতে পারে না। দেহের অহং প্রাণের অহং বা মনের অহংকে যতই ফাঁপিয়ে তুলি না কেন—এমন-কি এই ভিত্তিতে শোষণহীন গণতন্ত্রী সমাজও যদি গড়ে তুলি, তাহলেও প্রগতির শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি এমন কথা আমরা বলতে পারব না। 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ', 'ন বিত্তেনামৃতস্য আশা অস্তি' : ভোগৈশ্বর্যের বিপুল উপকরণ সঞ্চয় করে সবার মধ্যে সমানভাবে তা বেঁটে দিয়েও মানুষের অন্তরকে আমরা তৃপ্ত করতে পারব না। প্রকৃতির নিয়মেই এমন একদিন আসবে, যেদিন তার আনন্দ ইন্দ্রিয়নির্ভর না হয়ে হবে মনোনির্ভর, বুদ্ধিনির্ভর এবং অবশেষে আত্মনির্ভর। যেমন জ্ঞানে, তেমনি ভোগে—বিষয় আর বিষয়ীর তাদাত্ম্যবোধই হল বিষয়সংযোগের চরম নিয়তি। সব জানাতে আমি আমাকেই জানছি, সব সম্ভোগে আমি আমাকেই সম্ভোগ করছি—এই একরস আত্মার বোধ সমস্ত জ্ঞান ও ভোগের বীজ এবং পর্যবসান। তাই মানুষের বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তার পিছনে রয়েছে যে অন্তর্গূঢ় পৌরুষেয় সত্তার ব্যঞ্জনা, তার মহিমাকে আবিষ্কার করবার আহ্বান একদিন তার জীবনে আসেই। ইন্দ্রিয়ের বা মনের জগৎ তখন উড়ে যায় না, কিন্তু তাদের মর্মচর চিন্ময় অর্থটি চেতনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানুষের আত্ম-আবিষ্কারে এমনি করে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতের রহস্যও তার কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ে।

অবিদ্যার নাগপাশ খসিয়ে মানুষ যখন নিজেকে কালাতীত চিন্ময় শাশ্বত পরিতোব্যাপ্ত আত্মস্বরূপ বলে জানে, তখন এই আত্মবিদ্যা তাকে দেয় বিশ্ববিদ্যারও অধিকার। বিশ্ববিদ্যা শুধু জড় প্রাণ বা মনের বিজ্ঞান নয়, কেননা

বিশ্ব তো শুধু এই ক'টি উপাদানেই গড়া নয়। আমার মধ্যে যা আছে, তা-ই আছে বিশ্বেও—'যা আছে ভাণ্ডে, তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। আমার আধারের গভীরে দেহ-প্রাণ-মনেরও পরে যেমন আছে বিজ্ঞানঘন আনন্দ-চিন্ময় পৌরুষেয় সত্তার সত্য, তেমনি এই জড়বিশ্বের মৃন্ময় দেহেও আছেন এক অন্তর্যামী আনন্দ-চিন্ময় দেহী। আমার মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই রয়েছেন এই বিশ্বে—'সদাত্মা সর্বভূতাত্মা।' অহংএর কুণ্ডলীতে গুটিয়ে থাকি যতক্ষণ, ততক্ষণ সবার মধ্যে আমাকে খুঁজে পাই না। কিন্তু নিজের গভীরে ডুবে আমার আত্মস্বরূপকে যখন আবিষ্কার করি, তখন এক স্বচ্ছ নির্মোহ আত্মাববোধের আনন্দ অনির্বাণ বৈপুল্যে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তখন আমার আপন, সবই আমি। আরও উদারভাবে বলতে গেলে আমাতে-তোমাতে সব-কিছুই শুধু এক আত্মা, এক বিশ্বাত্মার হৃৎস্পন্দনেই ভূতাত্মা স্পন্দিত।

বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাতীতের এই হৃৎস্পন্দনের অস্পষ্ট অনুভব হতে ধর্ম-বোধের শুরু। তথাকথিত অসভ্যেরা বিশ্বকে প্রাণ-চিন্ময় দেখে, বিশ্বাস করে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে জড়ে জীবে দেবতা আছেন সব ঠাঁই। আমরা বুদ্ধিগর্বিত সভ্যেরা তা শুনে অন্ধ কুসংস্কার বলে নাক সিঁটকাই। কিন্তু একথা বুঝি না, আদিমানবের ওই প্রাণ-চিন্ময় বোধ আর পরমবিজ্ঞানীর সর্বব্রহ্মময় বোধ—দুয়ের মধ্যে আত্মার একই আকূতির পরিতর্পণ। শুধু একটিতে তার রূপ স্পষ্ট, আরেকটিতে অস্পষ্ট। আমাদের বুদ্ধিগর্বটা যৌবনের অহঙ্কারের মতই জীবনায়নের একটা মধ্যপর্ব মাত্র। তার সার্থক পরিণাম ঘটে, যখন প্রাজ্ঞদশায় আবার শৈশবের সারল্যে ফিরে যাই। অধ্যাত্মরাজ্যেও তাই। আমার মধ্যে দেবতাকে খুঁজতে গিয়ে বাইরে তাঁকে হারাই। কিন্তু আবার যখন আদিমানবের সরল হৃদয় দিয়ে বাইরেও তাঁকে পাই, তখনই তাঁকে পাওয়া ঐশ্বর্য আর মাধুর্যের যুগ্মবিলাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বস্তুত ব্রহ্মকে পাওয়া অন্তরের গভীর গহনে, আবার তাঁকে পাওয়া বাই-রের বিপুল বৈচিত্র্যে—এমনি করে আত্মবিদ্যা এবং বিশ্ববিদ্যাতে ব্রহ্মবিদ্যার সমাবেশে বিদ্যার যে-ত্রিবেণীসঙ্গম, তা-ই জীবের পরম পুরুষার্থসিদ্ধির মহা-তীর্থ। আমাকেও জানব, জগৎকেও জানব—কিন্তু জানব বৃহৎ করে। বৃহৎ করে জানবার জন্যই আগে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে হয়, তলিয়ে যেতে হয় প্রাকৃত বহিশ্চর সত্তার গভীরে। যখন আমার মধ্যে সত্য আমিকে

খুঁজে পাই, তখন দেখি বিশ্ব জুড়ে বিচিত্র পরিণামের পরম্পরায় সেই এক আমিরই স্ফুরণ। সে-আমি আর জীব নয়—শিব, অহং নয়—ব্রহ্ম। তাকে 'আমি' না বলে বলি আত্মা, বলি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ'। জীব জগৎ আর ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই—এই অদ্বৈতজ্ঞানই সম্যক্ বিজ্ঞান, বিদ্যার সাধনায় এই হল পরমা সিদ্ধি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

উত্তরায়ণের রীতি

বিশ্ব জুড়ে তাহলে চলছে একটা বিস্তার তপস্যা। জীবে-জীবে নিহিত যে-চিদ্‌বীজ, তা-ই অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হয়ে বনস্পতির মহিমায় নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে, এই হল জীবনের তাৎপর্য। সমস্ত জগদ্‌ব্যাপার অন্নময় অচিৎ হতে প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের খেলা, অর্থাৎ এখানে জড়কে আধার করে চিৎস্বরূপ পর্বে-পর্বে আপনাকে রূপায়িত করে চলেছেন। এই চিন্ময় রূপায়ণই আমাদের জীবনসত্য।

এমনিতর প্রকৃতি-পরিণামের মধ্যে রয়েছে একটা ত্রিপর্বা প্রগতির ছন্দ। প্রথমত জড়ের পরিণামের ফলে জীবাধারে দেখা দেয় নানা সূক্ষ্ম জটিলতা, যাতে চেতনার বিচিত্র উন্মেষকে স্বচ্ছন্দে সে বহন করতে পারে; তারপর একটা ঊর্ধ্বতর ভূমি লক্ষ্য করে চলে চেতনার আয়াসসাধ্য উদয়ন এবং অবশেষে ঊর্ধ্বভূমির আশ্রয় পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অবরভূমিকেও আত্মসাৎ করে তার রূপান্তর ঘটানো। উত্তরায়ণের এই তিনটি পর্বের সমান্তরালে দেখা দেয় পরিণামেরও তিনটি বৈশিষ্ট্য: প্রথমে অচিতির মধ্যে চলে প্রকৃতির আচ্ছন্ন সম্মূঢ় যান্ত্রিক পরিণাম, তারপর চিতিশক্তির ক্রমিক উন্মেষে অবিদ্যা হয় প্রকৃতিপরিণামের নিয়ামক, এবং অবশেষে বিদ্যাশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষে ঘটে আধারের চিন্ময়-পরিণাম। মোটের উপর, প্রথমত আধার তৈরি করা, তারপর সেই আধারে নিজেকে ফোটাবার জন্য একটা কৃচ্ছ্র সাধনা এবং অবশেষে ঊর্ধ্বশক্তির উন্মেষে অবাধে নিজেকে ফুটিয়ে চলা—এই হল প্রকৃতপরিণামের ধারা।

উত্তরায়ণের এই সামান্য রীতি ছাড়া আরেকটা রীতি হল ঊর্ধ্বশক্তি এবং অবরশক্তির অন্যোন্যসংক্রমণ। ঊর্ধ্বশক্তিকে ফুটতে হয় অবরশক্তির বাধা ঠেলে। পরিণামের মধ্যপর্বে তাই একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়; আর তখন ঊর্ধ্বশক্তি যেমন অবরশক্তিকে প্রভাবিত করে, অবরশক্তিও তেমনি ঊর্ধ্বশক্তিকে প্রভাবিত করতে ছাড়ে না। জড়ের মধ্যে চিৎ ফুটতে গিয়ে জড়কে যেমন

উজ্জ্বল করে তোলে, তেমনি জড়ের আচ্ছন্নভাবও তাকে খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এই অন্যোন্যসংক্রমণ পরিণামের মধ্যপর্বের একটা ব্যাপার। মৃন্ময়ী প্রকৃতি হবে চিন্ময়ী—এই হল বিশ্বব্যাপারের গোড়ার কথা। সুতরাং জড় চিৎপ্রকাশের আধার হলেও, জড় নয়—চৈতন্যই হল বিশ্বের মৌলশক্তি। জড়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে চৈতন্যকে প্রথমত খানিকটা জড়ধর্মাক্রান্ত হতে হলেও শেষপর্যন্ত জড়কে সম্পূর্ণই সে চিন্ময় করে তুলবে—এই হল প্রকৃতিপরিণামের দিব্য নিয়তি। কাঠে আগুন ঘুমিয়ে আছে। কাঠে-কাঠে ঘষা লেগেই হ'ক বা বাইরের আগুনের ছোঁয়া পেয়েই হ'ক, ঘুমন্ত আগুন যখন জেগে ওঠে, তখন প্রথমে খানিকটা ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, যাতে তাপ থাকলেও আলো নাই। কিন্তু শেষপর্যন্ত কাঠটা পুরাপুরি জ্বলে উঠলে তাপ আর আলো ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই থাকে না।

জড় হতে চেতনার এই উত্তরায়ণে স্বভাবতই বাইরের দৃষ্টিতে কতকগুলি পর্বভেদ দেখা দেয়। প্রকৃতিপরিণামের গোড়ার ভিত্তি হল জড়, তারপর দেখা দিল উদ্ভিদ, পশু, পশুপ্রায় মানুষ, পুরা মানুষ, অবশেষে চিন্ময়-সত্ত্বের (spiritual being) নানা পর্যায়। অবশ্য এই পর্বগুলি ছ'কে নিয়েছে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি—বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি আর ব্যবহার দিয়ে কতকগুলি জাতিরূপের কল্পনা ক'রে। তাই প্রশ্ন ওঠে, এই পর্বগুলির মধ্যে রূপায়ণের একটা অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি রয়েছে, না মাঝে-মাঝে ফাঁক দেখা দিয়ে একটা পর্বকে আরেকটা পর্ব থেকে আলাদা করে দিয়েছে? বৈজ্ঞানিক প্রশ্নটার মীমাংসা করতে চান বাইরে থেকে—আকৃতিপরিণামের একটা পরম্পরিত ইতিহাস গড়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে। তাই দুটি পর্বের মাঝে হারানো পর্বসন্ধি (missing link) খুঁজে বেড়ানো তাঁর একটা কাজ। কিন্তু চৈতন্যকে যদি বিশ্বের মূলতত্ত্ব বলে ধরি, তাহলে প্রশ্নটা বিচার করতে হবে বাহ্যিক আকৃতিপরিণামের দিক থেকে নয়, আন্তর চিৎপরিণামের দিক থেকে। তাহলে পর্বভেদ আর অনুবৃত্তি দুয়েরই রহস্য সহজে বোঝা যায়। বস্তুত প্রকৃতিপরিণামের মধ্যে পর্বভেদ আর অনুবৃত্তি দুটা ধারাই চলছে। তার মধ্যে পর্বভেদ দেখা দেয় বাইরের দৃষ্টিতে, আর অনুবৃত্তি আন্তর দৃষ্টিতে। পরিণামকে যখন বাইরে রেখে দেখি, তখন মনে হয় তা যেন দমকে-দমকে হচ্ছে। এ-দেখাটা আমাদের মনের ধরন, মন ভাগ-ভাগ করে না দেখলে কিছুই বুঝতে পারে না। আবার এমনতর ভাগ-ভাগ করে দেখার একটা

ব্যাবহারিক সার্থকতাও আছে। একটা নতুন জাতিরূপ সৃষ্ট হলে পর তার চারদিকে সীমার গণ্ডি দিতেই হয়। নইলে তার স্বকীয়তা বজায় থাকে না—যে নতুন পরিণাম সিদ্ধ হল, তার আবার পিছিয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। তাই এককে বিভক্তবৎ দেখা, বিভক্তবৎ ব্যবহার করার একটা প্রয়োজন আছে—যেমন আছে চিৎপরিণামের আদিপর্বে আমাদের অহন্তার পুষ্টির। প্রকৃতি যেন এক পায়ের পর এক পা ফেলে এগিয়ে চলছে—পিছনের পায়ের উপর নিশ্চিত নির্ভর পেয়ে তবে সে সামনের পা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে তার গতি দেখছি দমকে-দমকে ; অথচ সব মিলিয়ে গতিটা কিন্তু একটানা একটা প্রবাহ। পদক্ষেপ কোথায় দীর্ঘ-হ্রস্ব করতে হবে, তা নির্ভর করছে তার ভিতরের অখণ্ড ইচ্ছার প্রবাহের 'পরে। প্রকৃতিপরিণামের বেলায় পর্বভেদ আর অনুবৃত্তির যুগলছন্দেরও এই রীতি। পর্ব-পরম্পরার মধ্যে আমরা যে কার্য-কারণের শৃঙ্খল রচনা করছি, সেটা ব্যাবহারিক দৃষ্টির গরজে। আসলে অন্তরের চিৎশক্তির প্রেষণাতে একটা পর্বের পর একটা পর্ব ফুটছে এবং পরিণামের ঊর্ধ্বস্তরে পর্বে-পর্বে ব্যবধানটা গভীরতর হয়ে দেখা দিচ্ছে শুধু সংক্রমণ (transition) নয়, রূপান্তর (transformation)। বাইরের দৃষ্টিতে রূপান্তরকে মনে হয়, যেন পর্বচ্ছেদ। কিন্তু আন্তরদৃষ্টিতে তা চিৎশক্তির উল্লাস। ওতে চিৎপরিণামের বেগ বেড়েছে, কিন্তু বেড়েছে অবিচ্ছেদে। প্রদীপের সলতে উস্কে দিলে আলোর জোর হয় এবং দৃশ্যের নতুন-নতুন ঐশ্বর্য ফুটে ওঠে, কিন্তু আলোর মধ্যে প্রকাশের ধারাটা অব্যাহতই থাকে।

প্রকৃতিপরিণামের মধ্যে পর্বভেদের কারণ তাই পরিণামেরই অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রবর্তনাতে, বাহ্যিক আকৃতিপরিণামের ধারাতে নয়। সবটার মধ্যে চলছে চেতনার উত্তরায়ণের একটা অভিযান। তার মধ্যে চিৎশক্তি প্রথমে ধীরে-ধীরে বেগ সঞ্চয় করে চলে, তারপর হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নীচের ভূমিগুলিকে নিজের মধ্যে টেনে তুলে আত্মসাৎ করে। মোটামুটি এই হল উত্তরায়ণের রীতি।

এই রীতিতে প্রকৃতিপরিণামের প্রথম পর্বে জড়ের মধ্যে ফুটল প্রাণ, যার আদিরূপের আমরা সামান্যত নাম দিতে পারি উদ্ভিদ। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া পরিস্ফুট এবং বেশ জোরালো, কিন্তু মনের ক্রিয়া আচ্ছন্ন। যদি চেতনার নিরিখ দিয়ে বিচার করি, তাহলে বলতে পারি, উদ্ভিদে প্রাণশক্তি অবচেতন। তার নীচের ভূমিতে জড়ে এই শক্তি অন্তশ্চেতন এবং উপরের

ভূমি পশুতে সচেতন। এক্ষেত্রে চেতনার মৌল লক্ষণ হল বিষয়ের বোধ। এই বোধে সত্তা বিষয়ী আর বিষয়ে ভাগ হয়ে পড়ল। খুব কাছাকাছি একটা উপমা হল, আমাদের ঘুম থেকে যেমন জেগে ওঠা। ঘুমের মধ্যে বিষয়-বিষয়ী একাকার—অথচ আমরা অন্তশ্চেতন, যদিও বাইরের দৃষ্টিতে নিশ্চেতন। স্বপ্নে আমরা আচ্ছন্নচেতন বা অবচেতন, জাগ্রতে চেতন। প্রকৃতি পশুর মধ্যে যেন প্রথম জেগে উঠে দেখতে পেল বাইরের একটা জগৎ। চেতনার দ্রষ্টৃত্বের সঙ্গে-সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটল আর দুটি বৃত্তি, সচেতন কর্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্ব। জাগল ইচ্ছা, জাগল বুভুক্ষা, জাগল জিজ্ঞাসা। উপনিষদের ভাষায় বিশ্বসত্তা অন্ন আর অন্নাদে ভাগ হয়ে পড়ল : অন্ন জড়, অন্নাদ প্রাণচেতনা ; জড় প্রাণাগ্নির ইন্ধন। তারপর থেকে জিজ্ঞাসার প্রেরণায় চলল দৃশ্য জগতের আবিষ্করণ, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে বুভুক্ষার তাড়নায় তার আত্মীকরণ (assimilation)। বাইরের জগতের বৈচিত্র্যের আবিষ্কারে বহিশ্চেতনা যেমন সমৃদ্ধ হয়ে চলল, তেমনি অন্তশ্চেতনাও পুষ্ট হয়ে জাগাল আত্মসংবিৎ। পশু হতে জীবসত্ত্ব উন্নীত হল মানুষের পর্যায়ে। মানুষের মধ্যে অতীতের সব-কিছুর সমাহারের ভিত্তিতে দেখা দিল চিৎপরিণামের একটা নতুন পর্বের ইশারা।

পার্থিব প্রকৃতির রাজ্যে আপাতত মানুষের মধ্যে দেখছি চেতনার চরম উন্মেষ। বিষয় থেকে বিষয়ীকে বিবিক্ত করে নিয়ে সচেতনতার যে প্রথম প্রস্ফুরণ, মানুষের আত্মসচেতনতায় তার পরম উৎকর্ষ ঘটল সাক্ষিচেতনার মর্মভেদী দৃষ্টিতে—যা যুগপৎ নিখাত হল অন্তরের অন্তস্তলে, বিশ্বের মর্মগহনে এবং বিশ্বোত্তরের নিঃসীম দিগন্তে। কিন্তু এই উত্তুঙ্গ উদার ও গভীর দৃষ্টি মানুষের মধ্যে একদিনে ফোটেনি, তার জন্য মনশ্চেতনার বিভিন্নভূমি তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। মানুষ মুখ্যত মনোময়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আজও সে 'প্রাণশরীরনেতা মনোময়' পুরুষ নয়। প্রাকৃত মানুষ আজ যেখানে নিরাপদ প্রতিষ্ঠার আসন পেতেছে, তাকে বলতে পারি অন্ন-মনোময় ভূমি। মোটের উপর প্রাকৃত মানুষ জড়নির্ভর, জড়াসক্ত—অন্নময় স্থূল মস্তিষ্ক স্থূল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-মানসকে আশ্রয় করেই চলে তার চিন্তা এবং ব্যবহার। অথচ এই জড়াসক্ত মানুষেরও একটা প্রাণময় একটা মনোময় কোশ আছে—যদিও তারা নিতান্তই জড়াশ্রয়ী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের এই জড়াসক্তি প্রকৃতিপরিণামের একটা সপ্রয়োজন আদিপর্ব, কেননা জীবনের এই জড়ময়

ভিত্তির 'পরেই নির্ভর করছে প্রকৃতির উত্তরসাধনার নিরাপত্তা। তবুও বলব, জড় আদি হলেও সে-ই যে মানুষের ঊর্ধ্বপরিণামের নিয়ামক, একথা কিন্তু সত্য নয়। প্রাকৃত চেতনা জড়াশ্রয়ী হলেও জড়ত্বকে ছাড়িয়ে যাবার নিরন্তর তপস্যা তার ধর্ম। জড়ের মধ্যে চিদ্‌গুণের উত্তরোত্তর স্ফুরণই প্রকৃতি-পরিণামের তাৎপর্য এবং এই উৎকর্ষণের নিরিখে জড় ও চৈতন্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, একথা ভুললে চলবে না।

জড়াসক্ত মনকে ছাড়িয়ে স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিতের আরও গভীরে আছে প্রাণাধার প্রজ্ঞা। অধিচেতন ভূমিতে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছেন যে প্রাণ-পুরুষ, তিনিই তার ভর্তা। প্রাকৃত ভূমিতে প্রাণাত্মবাদী মানুষের আধার গড়ে ওঠে এই সূক্ষ্ম প্রাণলোকের শক্তিসন্নিপাতে। সে বিদ্রোহী, সীমার বাঁধন ছিঁড়ে নবীন দিগন্তের এষণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাশূন্যের বুকে—কল্পলোকের সে হয় নূতন পথিকৃৎ। এই প্রাণাশ্রয়ী মন চরিষ্ণু বলে প্রকৃতিপরিণামের সে একটা শক্তিশালী সাধন।

প্রাণময়-মনের উপরে অথচ তার চাইতে গভীর হয়ে প্রসারিত রয়েছে একটা শুদ্ধ ভাবনার স্তর—যাকে বলতে পারি যথার্থ মনোময় ভূমি। এই মনোভূমির শক্তিতে আবিষ্ট যারা, তারাই হয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, বাণীর সাধক, ভবিষ্যযুগের স্বপ্নপাগল। আজপর্যন্ত এই হল মনোময় জীবের প্রগতির সীমা। এরই মধ্যে যারা অন্তরাবৃত্ত এবং অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, তারা এই মনোভূমিরই ঊর্ধ্বে এবং গভীরে আবিষ্কার করে একটা শুদ্ধবুদ্ধির জগৎ, যেখান থেকে মন-প্রাণের সাক্ষী হয়ে প্রজ্ঞানের আলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার তারা পায়। বলতে গেলে জড়-নিরপেক্ষ যথার্থ অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ শুরু হয় এইখান থেকে।

এই শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত মনের পিছনে আছে আমাদের অধিচেতন মন—মনোভূমির সকল বস্তুই যার অপরোক্ষ-জ্ঞানের বিষয়। এই অধিচেতন ভূমিতে এলে প্রাকৃত জগতে দেহে বাস করার মত সচেতনভাবে মনে বাস করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। বলতে গেলে প্রকৃতির আরোহক্রমে এই আমাদের চরম স্থিতি; এরপর বাকী থাকে শুধু প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণাম।

আমাদের বহিশ্চর চেতনার ভূমিতেই প্রকৃতি মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় মানুষকে গড়ে এসেছে এতকাল। তারা অনেক তোলাপাড়া ঘটিয়েছে পার্থিব-জীবনে, মানুষকে পশুর পর্যায় থেকে টেনে তুলেছে মনুষ্যত্বের বর্তমান ভূমিতে।

তাদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিট্‌শে-কল্পিত অতিকায় মানবত্বে আমরা পৌঁছতে পারি বটে, কিন্তু তাতে মনুষ্যজীবের অতিস্ফীতিই ঘটবে শুধু—আমূল রূপান্তর দ্বারা তাকে দেবতা করে তোলা যাবে না। অথচ চিন্ময় মানবের সৃষ্টিই বলতে গেলে মনুষ্যসৃষ্টির চরম চমৎকার, তার আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে চলেছে প্রকৃতির নিগূঢ় তপস্যা। আমাদের এই প্রাকৃত আধারেই আছে এক অন্তর্গূঢ় জীবসত্ত্ব, যা যুগপৎ লোকোত্তরের দিকে এবং আমাদেরই অন্তর-গহনের দিকে নিজেকে উন্মীলিত করতে পারে। এই উভয়তোমুখী উন্মীলন হল প্রকৃতির নব-পরিণামের মর্মরহস্য।

চিন্ময় মানুষই জগতে বয়ে এনেছে এই নব-পরিণামের সূচনা। কিন্তু শক্তিপরিণামের অতীত ধারা হতে বর্তমান ধারা দুটি বিষয়ে পৃথক। প্রথমত, এর মূলে আছে মনুষ্যচিত্তের সচেতন প্রবর্তনা। যা-কিছু ঘটছে, মানুষের জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে তার ইচ্ছার স্বীকৃতি নিয়েই ঘটছে। দ্বিতীয়ত, এ-পরিণামের সাধনা শুধু বহিঃপ্রকৃতির সচেতন প্রগতিতে পর্যবসিত হয়নি। এর মধ্যে আছে যুগপৎ অন্তরের গভীরে ডোববার বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার এবং বিশ্বকে ছাপিয়ে যাবার একটা সংবর্তুল প্রয়াস। অর্থাৎ চিৎপরিণাম শুধু চেতনার সীমার প্রসারণ নয়, এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে উত্তরণের ফলে তার সম্যক্ রূপান্তর। কিন্তু একথাও সত্য, জড়ের মাধ্যাকর্ষণ এখনও বোঝা হয়ে চেপে আছে মানুষের চিত্তের 'পরে। সুতরাং সমগ্র মানবজাতি যে মনোময় জীব হতে চিন্ময় জীবে রূপান্তরিত হবে—তা সম্ভবও নয়, আবশ্যকও নয়। কিন্তু দেবজন্মের আদর্শকে সাধারণভাবে সবাই স্বীকার করবে এবং তার সাধনা ছড়িয়ে পড়বে জগৎময়, চিত্তের তীক্ষ্ণ এষণাকে মানুষ সচেতনভাবে সেইদিকেই নিয়োজিত করবে। সমষ্টিচেতনার এই প্রতিবোধ প্রকৃতির নব-পরিণামের প্রথম পর্ব।

চেতনার উত্তরায়ণের তাহলে এই রীতি: প্রথমে চাই প্রকৃতিপরিণামের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি, সেই ভিত্তি হতে আধারশক্তির উদয়ন এবং তার ফলে চেতনার রূপান্তর; তারপর রূপান্তরিত চেতনা তার স্বধামে প্রতিষ্ঠিত থেকেই নেমে আসবে অবরভূমিতে এবং তার রূপান্তর ঘটিয়ে সমস্ত আধারে আনবে একটা সম্যক্-সমাহরণের (integration) উজ্জ্বল সৌষম্য।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সপ্তধা অবিদ্যার নিরসন

প্রকৃতির এই-যে ঊর্ধ্বপরিণাম, যার ফলে বর্তমান মনোময় ভূমি হতে অতিমানস চিন্ময় ভূমিতে ঘটবে চেতনার উত্তরণ, সাধনার দৃষ্টিতে তার স্বরূপ হল আধারে অবিদ্যার আবরণকে বিদীর্ণ করে পরা বিদ্যার উন্মেষ ও উদয়ন। অবিদ্যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি—দেখেছি তার স্বরূপ কি, তার অধিকার কতটুকু, তার উদ্ভব কোথা হতে, তার ক্রিয়া-পরিণামই-বা কি। অবিদ্যার এই সামান্য পরিচয় হতে এবার আসতে হবে তার বিশেষ বিবৃতিতে, দেখতে হবে আমাদের চেতনায় সে আড়াল রচেছে কেমন করে।

আগেই বলেছি, অবিদ্যা বিদ্যার প্রতিষেধ নয়, তার সঙ্কোচ। এই সঙ্কোচের ফলে আমাদের অনুভব সঙ্কীর্ণ হয়েছে, আমরা ভূমার ঔদার্য হতে গুটিয়ে এসেছি অল্পের কুণ্ডলীতে। বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতির বিপুলতা প্রচ্ছন্ন থাকে, অবিদ্যার এই কুণ্ডলীতেও তেমনি বিদ্যার পূর্ণমহিমা সংবৃত্ত হয়ে আছে এবং ওই বিদ্যাশক্তির প্রেষণাতে অবিদ্যার মধ্যে চলছে আত্ম-বিস্ফারণের একটা তপস্যা। এই হল আমাদের জীবনায়নের লৌকিক দিক। এই তপস্যাকে সার্থক করতে হলে অবিদ্যার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আরেকদিক দিয়ে সচেতন হতে হবে—দেখতে হবে কি-কি সংস্কারের আবরণ আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন ও অশক্ত করে রেখেছে।

এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অবিদ্যার সাতটি প্রকার (mode) দেখতে পাই। তাদের নাম দিতে পারি : মূলা অবিদ্যা, সাংস্থানিক অবিদ্যা, চিত্তগত অবিদ্যা, কালগত অবিদ্যা, অহংগত অবিদ্যা, বিশ্বগত অবিদ্যা এবং ব্যাব-হারিক অবিদ্যা। এদের মধ্যে মূলা অবিদ্যা আর ব্যাবহারিক অবিদ্যা যেন দুটি বন্ধনীর মত। তাদের মধ্যে সম্পুটিত রয়েছে আর পাঁচটি অবিদ্যা। ব্রহ্মই আমাদের আত্মস্বরূপ, অথচ তাঁকে আমরা জানি না—এই হল অবিদ্যার

গোড়ার কথা বা মূলা অবিদ্যা। এই অবিদ্যার ফলেই আমাদের প্রাকৃত জীবনে এত বিপর্যয়। আমরা অসত্য প্রমাদ অধর্ম এবং অনর্থ দ্বারা লাঞ্ছিত, আমরা অতৃপ্ত কামনা শক্তির দৈন্য এবং মৃত্যুর বিভীষিকায় জর্জরিত, আমরা অহঙ্কৃত দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ প্রেমহীন ও নিরানন্দ। ব্রহ্মকে যদি আত্মস্বরূপ বলে জানি, তাহলে আমাদের এ-দুর্ভোগ দূর হয়, এই মর্ত্য-জীবনই অমৃতবর্ণ দিব্য-জীবন হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধসংস্কার দূর করতে না পারলে তো ব্রহ্মকে জানা সহজ হয় না। তার জন্য তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ দরকার। অবিদ্যার ঘোর যে কতদিক দিয়ে আমাদের ছেয়ে আছে, এই বিশ্লেষণের ফলে তা ধরা পড়ে।

এইবার একে-একে অবিদ্যার ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের পরিচয় নেওয়া যাক।

সবার আগে বলতে হয় সাংস্থানিক (constitutional) অবিদ্যার কথা, কেননা আমাদের প্রাকৃত জীবনদর্শনের গোড়ায় রয়েছে এই অবিদ্যার ঘোর। যেসব উপাদানের বিশেষ সংস্থানে (organisation) প্রাকৃত আত্মভাবের সৃষ্টি, এই অবিদ্যা তাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত করেছে। বর্তমানে আমরা আছি জড়ের ভূমিতে এবং আমাদের মধ্যে মানস-বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-মানসের ক্রিয়াই প্রবল। সাংস্থানিক অবিদ্যা এই গণ্ডির বাইরে আমাদের যেতে দেয় না। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে জড়ের জগৎকে যেমনটি দেখা যায়, জড়াশ্রয়ী বুদ্ধির কারবার তাকে নিয়ে। কিন্তু সত্তার পাদপীঠ হিসাবে জড়ের একটা সার্থকতা থাকলেও, তারই কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হল প্রগতির পথকে রুদ্ধ করা। সম্প্রতি জড়বাদের আশ্চর্য উন্নতি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও আমরা মানুষ হিসাবে কিন্তু খুব এগিয়ে যেতে পারিনি, বরং পিছিয়েই এসেছি বলতে হবে। আমাদের আরামের আয়োজন আছে অপর্যাপ্ত, কিন্তু শান্তি কোথাও নাই। ইন্দ্রিয়নির্ভর বুদ্ধি আমাদের প্রাণ ও মনের বিপুল প্রসার ঘটিয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-মানসের ঊর্ধ্বে নতুন কোনও ভূমির সন্ধান দিতে পারেনি। আমরা বুদ্ধিজীবী, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ নই; আমরা প্রজ্ঞাবাদী মাত্র, কিন্তু অন্তরাবৃত্তচক্ষু নই তত্ত্বদর্শী নই। তাই আমাদের মানস সমৃদ্ধির নেপথ্যে এখনও আদিম জান্তব প্রবৃত্তির হানাহানি। আমরা ভদ্রবেশী সভ্যতাভিমানী বর্বর।

মনোময়ী সিদ্ধি উপেক্ষার বস্তু নয়, সেও একটা আর্যসম্পদ। মানুষ মনোময় জীব, মানসিক উৎকর্ষসাধনের ভিতর দিয়ে তার প্রগতির পথ। তার বন্ধনমুক্ত মন যখন অবরভূমির অভিনিবেশ ছাপিয়ে একটা ভাবসংশুদ্ধি ও উর্ধ্বমুখীনতার প্রেরণায় ভাস্বর হয়ে ওঠে, তখন মানসবীর্যের প্রভাবে আধারের অন্নময় ও প্রাণময় ভাগেরও একটা রূপান্তর ঘটে। এমনতর একটা জীবনদর্শনই ছিল প্রাচীন গ্রীক মনস্বীদের আদর্শ। তার প্রভাব সমগ্র মানবজাতির 'পরে এবং বিশেষ করে ইওরোপের 'পরে নিতান্ত সামান্য নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত মর্মগ্রহণ ও সাধনার অভাবে গ্রীসের আধ্যাত্মিকতা পড়ে রইল ইওরোপের চিত্তপ্রাঙ্গণের বাইরে। তার কারণ, শুধু মনই তো আমাদের সত্তার সবখানি নয়। আমাদের মধ্যে আছে চিন্ময় সত্তা, আত্মপ্রকৃতির একটা চিন্ময় ভূমি। মনের সাধনাকে যদি তার অনুগত না করতে পারি, তাহলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অকল্পনীয় প্রসারেও জীবনে একটা আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। চিৎ আর জড় সেখানে দেখা দেয় অন্যোন্যবিরোধী দুটি তত্ত্বরূপে। চিৎশক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং জড়ের প্রতি মূঢ় আসক্তি মানস সিদ্ধিকে তখন বিরোচনের আসুরসম্পদের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। বর্তমান জগতে তার পরিচয় অহরহই পাচ্ছি। এইজন্য বিশ্বমানবের যথার্থ প্রগতি-সাধনার প্রথম অঙ্গ হল জড়প্রকৃতির কাছে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পণের দৈন্য হতে আত্মাকে মুক্ত করা। তখনই আমাদের চিত্ত হতে খসে পড়বে সাংস্থানিক অবিদ্যার বন্ধন। আমরা জানব, সম্প্রতি মন আমাদের মুখ্য সাধন এবং কায়প্রাণ গৌণ সাধন হলেও বস্তুত আমরা চিৎস্বরূপ। এই চিৎস্বরূপের বীর্যকে দেহে-প্রাণে-মনে সঞ্চারিত করে তাদের নিগূঢ় বিভূতিকে আধারে স্ফুরিত করাই আমাদের জীবনাদর্শ।

কিন্তু জড়াসক্তি হতে চিত্তকে মুক্ত করে সাংস্থানিক অবিদ্যার ঘোর কাটাতে হলে চিত্তগত (psychological) অবিদ্যাকে দূর করতে হবে। বহিশ্চর জাগ্রৎ-চেতনাই আমাদের সত্তার সবখানি, তার উপরে-নীচে আশে-পাশে আর কিছুই নাই—এই মনে করা হল চিত্তগত অবিদ্যার লক্ষণ। স্বীকার করি, জাগ্রৎ আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়ের দেখা জগৎটার চাইতে নিরেট আর-কিছুই হতে পারে না। তবুও ইন্দ্রিয়জগতের পিছনে একটা ভাবের জগৎকে স্বীকার না করেও তো আমরা পারি না। শুধু ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিয়ে

যে পড়ে আছে, সে পশু। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থের গভীরে ভাবের ব্যঞ্জনা যে ফুটিয়ে তুলতে পারছে, সে মনস্বী সে মানুষ। ভাবে চেতনার প্রসার ঘটে, অনুভবের বৈচিত্র্য একটা ছন্দোময় সৌষম্যে সংহত হয়, বস্তুর গভীরে আবিষ্কৃত হয় অর্থের একটা গূঢ়দীপ্তি, সত্তা নন্দিত হয় তার আস্বাদনে। কবি দার্শনিক বা মরমীয়ার তো কথাই নাই, প্রাকৃত মানুষের জাগ্রৎ-চেতনাতেও অল্পবিস্তর এই ভাবের আবেশ থাকেই, নইলে তার ব্যবহার অচল হয়ে পড়ত। ভাবের সংশুদ্ধি এবং উৎকর্ষের সাধনাই হল মনুষ্যত্বের সাধনা।

ভাব অন্তর্মুখ। যে ভাবুক, সে অন্তশ্চেতন। পশুর চাইতে মানুষের মধ্যে এই অন্তশ্চেতনা বেশী। অন্তশ্চেতনার দুটি প্রাকৃত-রূপ হল স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। অতি সাধারণ মানুষও এ-দুটির সম্বন্ধে বেশ সচেতন। স্বপ্ন আর সুষুপ্তি চেতনার যে-গভীরতার দিকে ইশারা করে, যৌগিক উপায়ে জাগ্রৎ-চেতনাকেও তার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে, একথার ইঙ্গিত আমরা আগেই করেছি। তখন এই ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগ্রৎ-চেতনারও গভীরে এবং তাকে ঘিরে তাকে ছাপিয়ে চেতনার আরও কতকগুলি পরিমণ্ডল আবিষ্কৃত হয়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে অবচেতনার আবিষ্কার মনোবিদ্যার জগতে একটা যুগান্তর এনেছে। যে জাগ্রৎ-চেতনার 'পরে আমাদের লৌকিক ব্যবহারের নির্ভর, যার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এতদিন আমাদের সংশয় ছিল না, আজ শুনি তার বেশির ভাগ কারবারই চলে অবচেতনা বা নিশ্চেতনার ইশারায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও এই অবচেতনার নিদ্মহলে ঢুকেছেন প্রাকৃত-বুদ্ধির দীপটি হাতে নিয়ে। তাতে তার অতিসামান্য পরিসরই আলোকিত হয়েছে। অন্তর্মুখ চেতনায় যোগজ প্রজ্ঞার দীপে অবচেতনারও গভীরে আবিষ্কৃত হয় অধিচেতনা পরিচেতনা ও অতিচেতনার বিপুল পরিমণ্ডল—যারা প্রাকৃত-চেতনার সমস্ত শক্তির উৎস, নানা অলৌকিক বিভূতির আশ্রয়। চেতনার এই পরিমণ্ডলগুলি আজগবী কিছুই নয়। আগেই বলেছি, প্রাকৃত-মানুষের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ভিতর দিয়েই তাদের মধ্যে পৌঁছবার রাস্তা আছে। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে যে ইন্দ্রিয়োত্তর অন্তর্মুখীনতার ইঙ্গিত আছে, তাকেই যদি আমরা কৌশলে জাগ্রতের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এবং জাগ্রতের স্পষ্টতাকেও তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে অন্দরে-সদরে আনাগোনার পথটা সহজ হয়ে যায়। এইজন্যই যোগীর জগৎ শুধু এই ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগ্রৎ-চেতনার জগৎ নয়—স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই তিনটি অপ্রাকৃত চেতনার ভূমি নিয়েও তাঁর কারবার। প্রাকৃত

আর অপ্রাকৃতের মাঝে সেতু হল ভাবের জগৎ—ব্যাবহারিক জগতের অন্তর্যামি-রূপে সাধারণ মানুষের কাছেও যা নিতান্ত দুর্লভ নয়। ভাবসংশুদ্ধি অন্তর্মুখীনতা ও নিত্যসমনস্কতা—এরাই হল অন্তর্জগতের দিশারী। এদেরই সহায়ে এই জাগ্রৎ-ভূমিতে থেকেই চিত্তগত অবিদ্যার সঙ্কোচকে পরাভূত করে সর্বগত চৈতন্যের মহাবৈপুল্যে অবগাহন করা সম্ভব হয়।

এমনি করে জড়াসক্তি যদি ছাড়তে পারি এবং নিত্যসমনস্কতার দ্বারা চেতনার যদি সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি, তাহলে অধিচেতনা আর অতিচেতনার দুয়ার দিয়ে এই আধারে নিগূঢ় অন্তঃপুরুষকেও আমরা জানতে পারব। এই অন্তঃপুরুষের অনুভবে আত্মসত্তার নিত্যস্থিতি যখন আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হয়, তখন আমাদের কালগত (temporal) অবিদ্যার বন্ধনও খসে পড়ে। এখন আমাদের আত্মসত্তার অনুভবের দুপাশে জন্ম আর মরণের দাঁড়ি টানা রয়েছে। এক অব্যক্ত হতে জন্মের দুয়ার দিয়ে আমরা এ-জগতে এসেছি, আবার মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে আরেক অব্যক্তের মধ্যে চলে যাব—দুয়ারের ওপারে কি আছে কিছুই জানি না। বাইরের জীবনটাকে আঁকড়ে আছি বলে তার উপর একটা মায়া পড়ে গেছে। তার বিলোপের কথা ভাবতে গেলে আমরা আঁৎকে উঠি, তাই আত্মার অমরত্বের কল্পনা দিয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করি। কিন্তু কেউ যদি বলে, বর্তমানের এই আধিব্যাধি-জর্জরিত আত্মসত্তার এমন-কোনও মর্যাদা নাই যে তাকে লোকান্তরে টিকিয়ে রাখতে হবে বা ইহলোকে বার-বার আবর্তিত করতে হবে, সুতরাং জন্ম দিয়ে যে-অস্তিত্বের শুরু হয়েছিল মৃত্যুতেই তার শেষ—তাহলে তার জবাব কিছুই নাই। বস্তুত আমাদের বহিশ্চর আত্মভাব নিত্যপরিণামী, তার নিত্যসত্তার কল্পনা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু অন্তরের গভীরে ডুবে চেতনার পরিপূর্ণ প্রসারণে যে-আত্মসত্তার সাক্ষাৎ পাই, তা শাশ্বত এবং এই পরিণম্যমান আত্মভাবের সে ভর্তা। বিভু আত্মাই যে নিত্য আত্মা, আর তার স্ফুরত্তা (dynamism) যে প্রাকৃত আত্মভাবের প্রয়োজক এবং নিয়ামক—এই অপরোক্ষ অনুভবে তখন আত্মার অমরত্ব লোকান্তর এবং জন্মান্তর সিদ্ধ হয়। এসম্বন্ধে পরের অধ্যায়গুলিতে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

নিত্য আত্মসত্তার সাক্ষাৎকারে কালগত অবিদ্যার বাঁধন খসে পড়লে সেই-

সঙ্গে অহংগত (egoistic) অবিদ্যাও দূর হয়ে যায়। আমাদের প্রাকৃত অহং যথার্থ আত্মভাবের একটা বিকৃতি মাত্র। চিৎপরিণামের প্রথম পর্বে তার একটা প্রয়োজন আছে, একথা আগেও বলেছি। নির্বিশেষ বিশ্বশক্তির আয়তনের মধ্যে সংহতির একটা কেন্দ্র না গড়লে শক্তির লীলাবৈচিত্র্য সক্রিয় হয় না। অহং প্রথমত সেই কাজটি করে। স্থূলে হ'ক, সূক্ষ্মে হ'ক, অহং রূপ গড়ে চলে। কিন্তু রূপের সার্থকতা ভাবের প্রকাশে। রূপ যেখানে সীমার চিহ্ন দিয়ে ভেদের সৃষ্টি করে, ভাব সেখানে ফোটায় অভেদের ব্যঞ্জনা। রূপের ভেদ একই ভাবের বৈচিত্র্যপ্রকাশের সাধন—এই হল বিশ্বরূপের মর্মকথা। রূপ বাইরে, ভাব অন্তরের গভীরে। ভাবে অবগাঢ় চেতনা দেখে, এক কাণ্ড হতে বহু শাখার বিস্তার, শাখায়-শাখায় একই চিন্ময় প্রাণরসের সঞ্চরণ। অহং তখন আত্মা, বস্তুত 'অহং বহু স্যাম্'—এই মন্ত্রে অনুরণিত হয়ে চলেছে এক অদ্বৈত আত্ম-ভাবনার আকৃতি।

এই বোধে বিশ্বগত (cosmic) অবিদ্যার প্রলয়ে বিশ্বচেতনার উন্মেষ ঘটে। আমি আর বিশ্ব তখন একাত্মক। পরাক্-দৃষ্টিতে (objectively) রূপে আমি একক; আবার প্রত্যক্-দৃষ্টিতে (subjectively) ভাবে আমি এক। ঐক্যের এই দুটি মেরুর মাঝে বিশ্বের বৈচিত্র্য বা বহুত্ব। অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত চিত্ত বহির্মুখ বলে খণ্ডরূপকে আঁকড়ে ধরে—একের অনুভব ওইখানে তার কাছে সুস্পষ্ট। ভাবের একত্ব তার কাছে আবছা, বিশ্বের বহুত্ব সংঘাতের হেতু। কিন্তু চিত্তের অন্তর্মুখীনতার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবের ঐক্য অনুভূতিতে যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রূপভেদের সংঘাতও ততই মিলিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে আত্মার ব্রহ্মসাযুজ্যে সব-কিছু পর্যবসিত হয় পরম ঐক্যে। একের অনুত্তর অনির্বচনীয়তা তখন যেমন বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বরূপে, তেমনি আবার সংহত ও সান্দ্র হয় চিদ্ঘন জীববিন্দুতে। বিশ্বোত্তর ব্রহ্ম, বিশ্বাত্মক ব্রহ্ম আর জীবঘন ব্রহ্ম তিনের সামরস্যের অনুভবে মূলা (original) অবিদ্যার আবরণও খসে যায়।

এমনি করে আত্মবিদ্যার অন্তরঙ্গ সকল সাধন পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণসিদ্ধ হলে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের বীর্য ব্যবহারেও স্ফুরিত হয়। তখন ব্যাবহারিক (practical) অবিদ্যার সঙ্কোচ এবং দৈন্যও আর থাকে না। অবিদ্যার জীবন তখন রূপান্তরিত হয় ঋত-চিন্ময় পুরুষের দিব্য জীবনে, আধারের মনোময় ছন্দ পরিণত হয় অতিমানস চিন্ময় ছন্দে।

তাহলে, অবিদ্যা-নিরসনের সাধনার মূল কথা হল, বোধিদীপ্ত ভাবনার দ্বারা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের কতগুলি অভ্যস্ত সংস্কারের মূলোৎপাটন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ের জগৎকে যে আমরা একমাত্র সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছি, সবার আগে এ-দুরাগ্রহ ছাড়তে হবে। তারপর এই জগৎকে আশ্রয় করে রয়েছে যে জাগ্রৎ-চেতনা, তারও বাইরে ও গভীরে চেতনাকে প্রসারিত করতে শিখতে হবে। তার জন্য মননকে বস্তুনির্ভর না করে করতে হবে ভাবনির্ভর। চেতনা তখন স্বভাবতই অন্তর্মুখ হবে এবং ভাবের ইশারাকে অনুসরণ করে পৌঁছবে আত্মসত্তার নিত্যভূমিতে। সেখানে গেলে অহংএর গণ্ডি ভেঙে আত্মসত্তা প্রসারিত হবে বিশ্বসত্তায়। এই জাগ্রতের অনুভব তখন যুগপৎ উচ্ছ্রিত হবে বিশ্বোত্তীর্ণের তুঙ্গতায়, নিখাত হবে নিত্য-জীবত্বের গভীরে, পরিব্যাপ্ত হবে বিশ্বাত্মভাবের বৈচিত্র্যে।

এই অদ্বয় অনুভবই অবিদ্যানির্মুক্ত বিদ্যার অনুভব।

বিংশ অধ্যায়

জন্মান্তর-তত্ত্ব

কালগত অবিদ্যার বাঁধন খসে পড়লে আমাদের মধ্যে অমরত্বের বোধ জাগে, একথা আগে বলেছি। এ-অমরত্ব কার? দেহের যে নয়, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। দেহের যেমন জন্ম আছে, তেমনি মরণও আছে। বলা হয়, অমরত্ব আত্মার—যিনি দেহের অন্তর্যামী হয়েও তার অতীত। দেহ মরলে পরেও দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব থাকে। কোথায় থাকে? ইহলোকে নয়, লোকান্তরে।

অমরত্বের ভাবনাকে আশ্রয় করে তাহলে দুটি সিদ্ধান্ত দেখা দিচ্ছে—জীবের অনাদি-অনন্ত অস্তিত্ব, আর তার লোকান্তর-স্থিতি। এবার এই সিদ্ধান্ত দুটি যাচাই করে নেবার সময় এসেছে, তা না হলে জীবের চিন্ময় অধ্যাত্ম-পরিণামের রীতিটি ঠিক বোঝা যাবে না।

মানুষ মরতে চায় না। জীবনটা আঁকড়ে থাকবার এই প্রবৃত্তি সব জীবের মধ্যেই আছে—আত্মরক্ষার একটা সহজ সংস্কাররূপে। তাহলেও এক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে মানুষের তফাত এই, মৃত্যুসম্পর্কে পশুর কোনও সুস্পষ্ট প্রাক্তন কল্পনা নাই, কিন্তু মানুষের আছে। আত্মসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ সত্তার অস্তি-নাস্তি দুটা দিকই দেখতে পায় এবং প্রথমত অস্তির ভাবনাকে প্রলম্বিত করে নাস্তিত্বকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। তারপর নাস্তির মাঝথেকেই অস্তির প্রচ্ছুরণের (projection) ভাবনা করে এবং অবশেষে অস্তি-নাস্তি দুয়ের ওপারে চলে যায়। অবশ্য অধ্যাত্মচেতনার এটি একটি পরম অবস্থা।

প্রাকৃতমন অতদূর ভাবতে পারে না। সে তার মৃত্যুর পরেও এই প্রাকৃত জীবনের একটা জের টেনে চলতে চায়। মরে গিয়েও সে ফুরিয়ে যাবে না, এখানে তার যে-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হল না, পরে আর-কোথাও তা চরিতার্থ হবে—এমন-একটা আশা সে রাখে। কিন্তু কোথায় হবে? এক হিন্দু এবং বৌদ্ধ ছাড়া আর-সব ধর্মের লোকের বিশ্বাস, ইহজন্মের জের চলবে

লোকান্তরে। কেবল হিন্দু আর বৌদ্ধরাই বলে, জের চলবে শুধু লোকান্তরে নয়, ইহলোকেও ; অর্থাৎ যে-জীব মরে লোকান্তরে গেছে, সে আবার ওখান থেকে এখানে ফিরে আসবে, আবার তার জন্ম হবে। পৃথিবীতে এই তার প্রথম জন্ম বা শেষ জন্ম নয়—বহুবার সে এখানে জন্মেছে, আরও বহুবার জন্মাবে। তার এই জন্ম-জন্মান্তরে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কর্ম দিয়ে। একদিন কর্ম ফুরিয়ে যাবে, তখন সে আর এ-জগতে ফিরে আসবে না। যে-ব্রহ্মচৈতন্য থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল, তাতেই আবার সে লীন হয়ে যাবে। 'জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।'

এই জন্মান্তরবাদ আর্যভাবনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেমিটিক এক-জন্মবাদের চাইতে এর যৌক্তিকতা বেশী, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহলেও জন্মান্তর-রহস্য এবং তার আনুষঙ্গিক কর্মবাদকে আবার নতুনভাবে যাচাই করে দেখবার প্রয়োজন আছে, কেননা প্রাকৃত ভাবনার আওতায় পড়ে এ-দুটি সিদ্ধান্তের তত্ত্বরূপের অনেক বিকার ঘটেছে। তাদের সংস্কার হওয়া দরকার।

একেবারে গোড়া ঘেঁষেই প্রসঙ্গটা শুরু করা যাক। প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) প্রথমেই বলবেন, আত্মার অমরত্ব-কল্পনা একটা আশার মরীচিকা। জীবজন্ম প্রাকৃত ঘটনা-পরম্পরারই একটা পর্ব যখন, তখন হেতু-রূপে তার একটা আদি এবং পরিণামরূপে তার একটা অন্ত যে আছে, যুক্তির দিক থেকে তা স্বীকার করতে বাধা নাই। কিন্তু এই হেতু-পরিণামের ধারাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা ভুল। পিতামাতার বীজ থেকে সন্তানের জন্ম হচ্ছে, সে-সন্তান পুষ্ট হয়ে আবার ছেলে-মেয়ের মধ্যে নিজের বীজসত্তাকে রেখে যাচ্ছে। এমনি করে প্রাণশক্তির একটা অবিচ্ছেদ ধারা, ধরা যাক ক্রমিক উৎকর্ষের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে মৌল শক্তির ধারা যে অবিচ্ছেদ, তা স্বীকার করতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু পর্বে-পর্বে যে-ব্যক্তিসত্ত্ব সে-ধারার বাহন হল, তার অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি স্বীকার করবার দরকার কি ? সুতরাং অমরত্ব যদি কারও থাকে, তাহলে সে আছে শুধু জাতির, ব্যক্তির নয়—সমষ্টির, ব্যষ্টির নয়। পিতৃপুরুষ থেকে উত্তরাধিকাররূপে আমি যা পেয়েছি, তার উৎকর্ষসাধনার পর সন্তানে তা সঞ্চারিত করে ফুরিয়ে গেলাম—আমার দায় চুকে গেল। এমনি করে ব্যক্তির অবচ্ছিন্ন উদয়-বিলয়ের ভিতর দিয়েই জাতির অনবচ্ছিন্ন প্রগতি সিদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং অমরত্বের দাবি যদি কেউ করতে পারে তো সে জাতি—ব্যক্তি নয়।

এইধরনের চিন্তা উপনিষদেও পাওয়া যায়—অবশ্য অস্তিত্ব-রহস্যের প্রাথমিক পাঠরূপে, চরম সিদ্ধান্তরূপে নয়। প্রাণলীলার নীচের ভূমিতে 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' বলে একটি তৃতীয় স্থানের কথা উপনিষদও বলেছেন, যেখানে শুধু জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন ছাড়া আর-কিছুই লক্ষ্য হয় না। যমের কাছে যাওয়ার মুখে নচিকেতার চোখের সামনেও ঠিক এই ছবিটিই ভেসে উঠেছিল—শস্য যেমন জন্মাচ্ছে পাকছে ঝরে পড়ছে আবার জন্মাচ্ছে, তেমনি সর্বত্র মর্ত্যলীলার একটা আবর্তনই চলছে। কিন্তু নচিকেতার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল এই প্রাকৃত আবর্তনেরও ওপারে—সাম্পরায়ের মহারহস্যের দিকে।

বস্তুত প্রশ্নটার মীমাংসা নির্ভর করছে ব্যক্তিসত্ত্বের মূল্যের 'পরে। প্রত্যক্ষবাদী তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেননি। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে মোটেই আমল না দিয়ে তাকে তিনি জাতীয় প্রকৃতির অবশ সাধনরূপে কল্পনা করেছেন। অথচ জাতীয় সত্তার যদি কোনও বাস্তবরূপ থাকে তো তা ব্যক্তির চেতনাতেই ফোটে। জাতির অস্পষ্ট ভাবনাকে ব্যক্তিই নিজের অনুভবে সুস্পষ্ট করে তোলে, জাতির ভবিষ্য প্রগতির স্বপ্নও সে-ই দেখে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় সত্তার ভাবময় রূপটিকে সে-ই আত্মসত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে এক বলে অনুভব করে, সম্ভাবিত জাতীয় ভাব বাস্তবতার মূল্য পায় তারই বেদনায়।

সমষ্টির ভাবনায় ব্যষ্টিচেতনার এই-যে বিস্ফারণ, বলতে গেলে এইখান থেকে আধ্যাত্মিকতার শুরু। আর এ-ব্যাপারের মূলে রয়েছে প্রাণের বৃহৎ হওয়ার আকূতি। এ যেন বীজের বনস্পতি হওয়ার তপস্যা। ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে যে-অহং কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল, প্রাণের তাগিদে সে ক্রমে ছাড়া পেল পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে—ছাড়া পেল বিশ্বের সর্বভূতে, বিশ্বোত্তরের উত্তুঙ্গ বৈপুল্যে। এমনি করে বৃহৎ হওয়াই হল আত্ম-আবিষ্কারের সাধনা, তা-ই সর্বধর্মের বীজ। পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনায় আমাদের প্রচোদিত করে যে-ধর্মবুদ্ধি, তার প্রেরণা আসে এই বৃহতের ভাবনা হতে। এ-ভাবনা যখন আপন উল্লাসে স্ব-তন্ত্র এবং বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে দেখা দেয়, তখন আমরা সত্তার যে নির্বিশেষ মহিমা প্রত্যক্ষ করি, তা-ই অধ্যাত্মবাদীর ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবান। এই প্রত্যক্ষেই ব্যক্তিত্বের চরম সার্থকতা।

এই প্রত্যক্ষের সঙ্গে আত্মসচেতনতার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমাদের চেতনা যে শুধু বাইরটা দেখে তা নয়, অন্তরের দিকেও সে তাকায়। বাইরের দেখাটা যত গুছিয়ে আসে, অন্তরের অনুভবও ততই দানা বাঁধতে

থাকে। এমনি করে ব্যক্তিসত্ত্বকে কেন্দ্র করে উদ্‌বুদ্ধ চেতনায় একটা ঋত-চ্ছন্দোময় প্রত্যক্-দৃষ্টির জগৎ গড়ে ওঠে। অনন্ত ব্যক্তির অনন্ত জগৎ এক অখণ্ড বৃহৎ চৈতন্যের অনন্ত বিভূতির বিস্তার। মূলের অখণ্ড চৈতন্য যেমন সত্য, তেমনি তার এই বিভূতিও সত্য। দার্শনিক পরিভাষায় ব্রহ্ম জগৎ ও জীব তিনই সত্য। কিন্তু একথা সব দর্শন স্বীকার করে না।

সান্তের একটা অনন্ত মূল সবাই মানে, কারণ এটা বুদ্ধির একটা স্বাভাবিক প্রত্যয়। কিন্তু এই মূল শক্তি না চৈতন্য না শূন্য, তা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রত্যক্ষবাদী বলবেন, বিশ্বের মূলে এক দুর্জ্ঞেয় অনির্বচনীয় অনন্ত বা শাশ্বত শক্তি আছে; কিন্তু তার বিভূতি সান্ত এবং অশাশ্বত। অর্থাৎ বিশ্বশক্তি শাশ্বত, কিন্তু জীবশক্তি অশাশ্বত। চিদ্‌বাদীরও এই মত; কেবল জীবশক্তিতে চিতের খেলা দেখা যায় বলে তার উৎসকে তিনি বলেন চিৎশক্তি। শূন্যবাদী বলেন, জীবচৈতন্য রূপের জগৎ থেকে অরূপের জগতে অভিযান চালিয়ে শেষপর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলে, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে অবশেষে আর-কিছুই থাকে না। সুতরাং বিশ্বমূল শূন্যমাত্র।

প্রত্যক্ষবাদী শাশ্বত বিশ্বশক্তি মানছেন, কিন্তু শাশ্বত বিশ্বচৈতন্য মানছেন না। তাঁর দৃষ্টিতে চৈতন্য শক্তির একটা উপসৃষ্টি মাত্র। সুতরাং মৃত্যুর পরও জীবচৈতন্যের অনুবৃত্তি তিনি স্বীকার করেন না। তাই তাঁর মতে পরলোক ও জন্মান্তরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃত-কর্মের জের টানবার জন্য ব্যক্তিসত্ত্বের স্থায়িত্ব কল্পনারও কোনও দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন না। ওগুলি দেহধর্ম, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ওগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়।

কিন্তু ব্যক্তিসত্ত্বের প্রত্যয় যদি ব্যাপক এবং গভীর হয়, তাহলে আত্মো-ন্মেষের একটি পর্বে এসে চৈতন্যকে অনুভব হয় বিশ্বমূল বলে। ঠিক এই অনুভবটি সবার হয় না, তথাকথিত অনেক আস্তিকের বেলাতেও এটা একটা শোনা কথা মাত্র। আত্মপ্রত্যয় অগভীর বলে পরলোক ও জন্মান্তর সম্পর্কে তারাই নানা অযৌক্তিক কল্পনা-জল্পনার সৃষ্টি করে, যথাস্থানে আমরা তার সমালোচনা করব।

অন্তর্মুখ হয়ে সত্তার গভীরে ডুবে একটা শাশ্বত আত্মপ্রত্যয়কে যাঁরা অনু-ভব করেছেন, আত্মার অমরত্বের কথা তাঁরাই বলছেন। কিন্তু অমরত্বের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁদের দর্শনে যেসব উপসিদ্ধান্ত দেখা দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে

মিল নাই। মোটামুটি উপসিদ্ধান্তগুলিকে সেমিটিক এবং আর্য দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সেমিটিক ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত উপসিদ্ধান্তে আত্মা অমর হলেও পৃথিবীতে তার এই একবারমাত্র আসা, মৃত্যুর পর লোকান্তর-স্থিতি সম্ভব হলেও তার জন্মান্তর হয় না। কর্মফল এঁরাও স্বীকার করেন, তবে তার হিসাব কষেন ঈশ্বরের দণ্ড-পুরস্কারের নীতি দিয়ে। কিন্তু তাতে আকস্মিক জীবজন্মের হেতু কিংবা ঈশ্বরবিধানের সঙ্গে জীবের আপন কর্মদায়ের সম্পর্কটা পরিষ্কার হয় না।

আর্যভাবনায় আত্মার অমরত্বের সঙ্গে-সঙ্গে জন্মান্তরও স্বীকার করা হয়েছে, তার কর্মবাদের সিদ্ধান্তও বেশ যুক্তিযুক্ত। তার মতে জীবজন্ম আকস্মিক নয়, তার একটা পূর্ব-ইতিহাস আছে এবং উত্তরপরিণামও আছে। অবিদ্যার বন্ধন দিয়ে জীবজন্মের শুরু এবং বিদ্যার উন্মেষে আত্মমুক্তির ফলে তার সমাপন। অবিদ্যার আদি নাই, কিন্তু অবসান আছে। অবসান পরমতত্ত্বের উপলব্ধিতে। সে-তত্ত্ব বেদান্তের মতে সদ্‌ব্রহ্ম, বৌদ্ধমতে অসৎ বা শূন্য। যেপর্যন্ত এই পরম তত্ত্বে জীব না পৌঁছতে পারছে, সেপর্যন্ত এই পৃথিবীতে তাকে বার-বার আসতে হয়। এ-আসা নিয়ন্ত্রিত হয় তার কর্মের দ্বারা। জড়জগতের আইনের মতই অন্তর্জগতে কর্মের আইনের মধ্যে ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নাই। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে জীবের খানিকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। আগুনে হাত দিলে জড়ের নিয়মে হাত পুড়তে থাকবে এবং চেতনার নিয়মে জ্বালারও অনুভব হবে—এ-বিধানের নড়চড় নাই। কিন্তু আমি আগুনে হাত দেব কি না, সেটা আমার ইচ্ছা। তবে আমি ইচ্ছা না করলেও অনেকসময় আগুনে হাত পড়ে যায়। বিশ্বের বিধান এবং আমার ইচ্ছার মধ্যে তখন বিরোধ দেখা দেয়। জীবনের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা এই, বিশ্বের অন্ধবিধানের কাছে আমার ইচ্ছা বারবার হার মানে। ইচ্ছার এই পরাভব দুঃখের কারণ। অনেকে বলেন, এই দুঃখের পরিমাণটাই জগতে বেশী। বাসনার তর্পণ আর কতটুকু হয়, হলেও সে-তৃপ্তির মেয়াদই-বা কতটুকু? বস্তুত জগৎটা দুঃখময়। অথচ বাসনার প্ররোচনায় এই দুঃখের মধ্যে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি—এই আমাদের মোহ। উটের মত কাঁটাগাছ চিব'তে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে, তবুও তার লোভ আমরা ছাড়তে পারি না। অনেক দুঃখে এটা বুঝতে পারি যখন, তখন বাহির থেকে অন্তরের দিকে মুখ ফেরাই। তখন দেখি, অন্তরে ডুবলেই সুখ-দুঃখের দোলা হতে নিষ্কৃতি। এ-ডোবাটা ক্রমে একটা নেশার মত পেয়ে বসে।

তখন জগৎ হতে মুখ ফিরিয়ে অন্তরের পথ ধরে চলতে থাকি। পাই একটা সুগভীর অবিচল শান্তি, নিস্তরঙ্গ চেতনার এক আশ্চর্য স্বচ্ছতা, অনিবাধ অস্তিত্বের এক অন্তর্গূঢ় আনন্দ-সংবেদন, এক অপরূপ নির্ণাম নিষ্কিঞ্চনতায় সত্তার পরিনির্বাণ। এই হল পরমতত্ত্ব, এইখানে পৌছনই আমাদের পুরুষার্থ। এখানে জগৎ নাই, তার ঝামেলাও নাই। পথের কাঁটা মাড়িয়ে সংসারের দীর্ঘ অরণ্য পেরিয়ে আসছি এইখানে পৌছবার জন্য। এতকাল ধরে পথের মাঝে-মাঝে জন্ম-জন্মান্তরের আবর্ত রচনা করে এসেছি, এবার এলাম অনাবৃত্তির পরমধামে। আর আমায় সংসারে ফিরে যেতে হবে না।

এই মতবাদে জীবের উত্তরায়ণের একটা ধারাবাহিক ছক পাওয়া যায়। নিজের চেষ্টায় অধ্যাত্মচেতনার এক উত্তুঙ্গ শিখরে তাকে পৌছতে হবে, তার জন্য একটা জন্মই তার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না—এই সঙ্গত যুক্তির দাবি এ-সিদ্ধান্তের মূলে প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ সিদ্ধির গুরুত্বের সঙ্গে সাধনকালের মেয়াদের একটা অনুপাত আমরা এখানে পাই। কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা জিনিসের নৈশ্চিত্য পাওয়া দরকার—সে হচ্ছে ব্যক্তিত্বের শাশ্বতত্ব। অবিদ্যার গহন হতে বিদ্যার আলোয় যে উত্তীর্ণ হচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তর অতি-বাহনের মধ্যে তার সত্তার আর শক্তিপরিণামের ধারাবাহিকতার একটা নৈশ্চিত্য থাকা চাই। কিন্তু বৌদ্ধমতে এবং আধুনিক বেদান্তমতে পরমার্থতত্ত্বের সঙ্গে প্রাতিভাসিক জগতের বিরোধ আছে। উভয় মতেই জগৎ একটা বিভ্রম; সুতরাং তার অন্তর্গত জীবের জীবত্বও বিভ্রম। এক্ষেত্রে জীব শাশ্বত নয়, অতএব অমরত্বও তার নয়। তার মধ্যে যে নির্বিশেষ চৈতন্য অধিষ্ঠিত রয়েছে, অমরত্ব তারই। অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যই অমৃত, কিন্তু সংসারী (moving from birth to birth) জীব অমৃত নয়। বস্তুত এই জীবসত্ত্বের কোনও তাত্ত্বিকতা নাই।

আপাতদৃষ্টিতে এ-সিদ্ধান্তের মধ্যে অযৌক্তিকতা বিশেষ-কিছু নাই। কিন্তু যে-অভ্যুপগমের (postulate) উপর এর ভিত্তি, তার মধ্যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অমৃতত্ব একটা অধ্যাত্ম-অনুভবের অবস্থা। এ-অনুভব পেতে গেলে অনেক মৃত্যু পেরিয়ে সংসারের উজানে যেতে হয় সত্য। তাবলে শেষপর্যন্ত সংসারের সঙ্গে চরম বিচ্ছেদই যে তার পরম অর্থ, তা কিন্তু সত্য নয়। ব্রহ্ম জগৎকে পেরিয়ে গেছেন, কিন্তু তবুও ব্রহ্ম জগৎ ছাড়া নন। এ-জগৎ তাঁর সম্ভূতি এবং সেই সম্ভূতির আনন্দেও তিনি অমৃত হয়ে আছেন।

জীব যদি স্বরূপে এবং শক্তিতে ব্রহ্মেরই বিভূতি হয়, তাহলে উজান বেয়ে মৃত্যুতরণ অমৃতত্বের অনুভবের সঙ্গে ভাটার স্রোতে সম্ভূতির অমৃতত্বও সে অনুভব করবে। কালের বিচারে কালাতীত শাশ্বত যেমন সত্তার একটা দিক, তেমনি কালগত শাশ্বতত্বও সত্তার আরেকটা দিক। একদিকে সত্তা শিবস্বরূপ, আরেকদিকে শক্তিময়। বস্তুত শিবেরই শক্তি, দুয়ের মাঝে বিরোধকল্পনা দ্বৈতবুদ্ধির বিভ্রম মাত্র।

সম্ভূতির অমৃতত্ব যদি স্বীকার করি, তাহলে জগতের সত্যতার সঙ্গে-সঙ্গে জীবসত্ত্বের তাত্ত্বিকতাও সম্ভাবিত হয়। তখন সংসারী জীবের মধ্যেও কালগত শাশ্বতত্বকে অবলম্বন করে অমৃতত্বের আরেকটা ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। বস্তুত এ-অমৃতত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্ম-চৈতন্যের বা কূটস্থ-চৈতন্যের অমৃতত্ব নয়—সংসরণশীল জীব-চৈতন্যেরই অমৃতত্ব। এই জীব-চৈতন্যকে আমরা অন্যত্র বলেছি চৈত্য-পুরুষ। ইনি প্রাকৃত জীব এবং কূটস্থ চৈতন্যের মধ্যে অমৃতের সেতু। জীবত্বের যে-অংশ অপরা প্রকৃতির কবলিত, তা অবশ্যই মৃত্যুর অধীন; কিন্তু যে-অংশে সে পরা-প্রকৃতি, সে-অংশ অমৃত। অথচ তা নির্বিশেষ স্থাণুস্বরূপ নয়,-অমৃতের কলায়-কলায় নিত্য উন্মিষন্ত। যা-কিছু কালগত তা-ই নশ্বর, এবং যা কালাতীত তা-ই শাশ্বত—এ-সিদ্ধান্ত সমীচীন নয়। কালাতীত শাশ্বতেরও একটা নিত্য সম্ভূতি আছে। তা-ই হল সত্তার চিৎশক্তিময় ভাবরূপ। এই ভাব স্ফুরন্ত (dynamic) অমৃত হয়েই মৃত্যুশাসিত বস্তুর আবর্তনে আত্মপ্রকাশ করে। জীবের চৈত্যসত্তা এই অমৃত ভাবোল্লাসের বাহন।

প্রাচীন ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের সম্ভূতি সত্য, সুতরাং জগৎ ও জীবও সত্য। কিন্তু তাহলেও জীবের তাত্ত্বিকতা সেখানে কালাবচ্ছিন্ন (temporal)। অবিদ্যা এবং বাসনা জীবের জন্মের হেতু। ব্রহ্মের চিৎসমুদ্রে জীব জাগছে বুদ্‌বুদের মত; অবিদ্যার নিবৃত্তিতে এবং বাসনার বিলয়ে সে-বুদ্‌বুদ আবার ব্রহ্মেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে যে এমনি করে বুদ্‌বুদ জাগছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে, এটা সমুদ্রের সিসৃক্ষার উল্লাস। সমুদ্র সিসৃক্ষা এবং বুদ্‌বুদের উদয়-বিলয় সবই সত্য হতে পারে; কিন্তু তাতেও একটি বুদ্‌বুদই যে বার-বার জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে এ-কল্পনার কোনও প্রয়োজন হয় না—যতক্ষণ জীবের অন্তর্গূঢ় সত্তাকে ব্রহ্মের আত্মরূপায়ণের একটা অপরিহার্য নিত্য ভঙ্গিমা বলে স্বীকার না করি। তাই ঔপনিষদ-সিদ্ধান্তে জগৎ ও জীবের

সত্যতা স্বীকৃত হলেও জন্মান্তরবাদকে সেখানে অপরিহার্য বলবার কোনও হেতু পাওয়া যায় না।

পূর্ণাদ্বৈতবাদে চৈত্যসত্তার স্বীকৃতিতে এই ন্যূনতার পূরণ হয়। প্রাকৃত মর্ত্য জীবসত্ত্ব আর জীবের কূটস্থ অমর্ত্য সত্তা—এই দুয়ের মাঝে চরিষ্ণু অথচ শাশ্বত শুদ্ধ জীবসত্ত্বকে মানলে পরেই জন্মান্তরবাদের একটা গভীর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কর্ম এবং বাসনাক্ষয়ের জন্য জীব বারবার জন্মগ্রহণ করছে—এই প্রচলিত সিদ্ধান্ত হতে বিশ্বব্যাপারের কোনও অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য কিংবা কেন জীব তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে না। সংসার কতকগুলি জটিল ব্যাপারের লক্ষ্যহীন আবর্তন মাত্র, এবং জীব অকস্মাৎ এই আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে আর এর বাইরে যাবার চেষ্টা করছে—সংসারের এমন ছবিতে তার প্রবর্তক ব্রহ্মসঙ্কল্পের প্রতি সুবিচার করা হয় না। মনে হয়, সমস্তটা ব্যাপার যেন কারও অর্থহীন পাগলামি বা খোশখেয়াল মাত্র। কিন্তু জড়ের মধ্যে ব্রহ্মের আত্মনিগূহন এবং তাহতে বিচিত্র রূপায়ণের আনন্দে ও বীর্যে তাঁর আত্মোন্মীলন, এই যদি বিশ্বলীলার তাৎপর্য হয়, তাহলে সমস্তটা ব্যাপার অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। কর্মক্ষয়, বাসনার বিলয় বা অবিদ্যার নিরসন—যাকেই জীবনায়নের মূল তাগিদ বলে ব্যাখ্যা করি না কেন, তা যদি এই আত্মোন্মীলনের অঙ্গীভূত হয়, তবেই তার সার্থকতা। কিন্তু তখন আর এগুলি শুধু নেতিবাচক ভাবনায় পর্যবসিত থাকে না। বন্ধনমুক্তির প্রয়াসের সহায়রূপে এদের সার্থকতা মেনে নিয়েও, আত্মোল্লাসের একটা বৃহৎ সম্ভাবনা চেতনার দিগন্তে তখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কর্ম বাসনা এবং অবিদ্যার মর্মে তখন দিব্য শক্তি সঙ্কল্প ও বিদ্যার স্ফুরত্তার পরিচয় পাই। শুধু আত্মবিলয়কে তখন জীবনের লক্ষ্য বলে জানি না—জানি আত্মোন্মেষই তার পরম তাৎপর্য।

অরূপ রূপী না হলে এই উন্মেষ সম্ভব হয় না। তা-ই অশরীরী জীবের শরীরগ্রহণ, পুরুষের প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হওয়া। কিন্তু বস্তুত প্রকৃতি পুরুষের আবরণ নয়, আত্মশক্তির উন্মেষের সাধন। অতএব পৌরুষেয় বোধের স্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিও তার অনুগামী হয়ে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এই দিব্য রূপায়ণের ব্যাপারই জন্মান্তরের প্রবর্তক। প্রকৃতির এই রূপান্তরকে যদি জীবনায়নের নিয়ামক বলে স্বীকার না করি, তাহলে 'মরলেই সব ফুরিয়ে যায়'—বাস্তববাদীর এই সিদ্ধান্ত চিদ্‌বাদীর বেলাতেও কেন খাটবে না তার

কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না। জীবসত্ত্বের তাত্ত্বিকতা যদি না মানি, তাহলে মৃত্যুর পর জীবত্বের বুদ্‌বুদ অচিৎ প্রাণসমুদ্রেই মিলিয়ে যাক, আর চিন্ময় ব্রহ্ম-সমুদ্রেই মিলিয়ে যাক—দুয়ের মাঝে কোনও তফাত হয় না। চিদ্‌বাদীর বেলাতেও স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, তাঁরও 'পিণ্ডপাতেন যা মুক্তিঃ, সা মুক্তিঃ'; মৃত্যু আর মুক্তি তাঁর বেলাতেও সমার্থক, লোকান্তরস্থিতি বা জন্মান্তর কোনটাই সেক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। বস্তুত জীবসত্ত্বের তাত্ত্বিকতা বা চৈত্যসত্তার কালগত অমৃতত্বই জন্মান্তরবাদের সত্যকার দার্শনিক ভিত্তি হতে পারে। অবিদ্যা-মূল বাসনাতেই জীবের বারবার জন্ম হচ্ছে দুঃখভোগের জন্য—এ হল মোক্ষ-বাদী দার্শনিকের জগৎ সম্বন্ধে একটা স্থূল এবং উপরভাসা বিচার মাত্র। সত্য বলতে জীবের বাসনা নয়—ঈশ্বরের সঙ্কল্পই সৃষ্টির মত জন্মান্তরেরও প্রয়োজক। অবিদ্যা তার অবান্তর সাধন হলেও মূলে আছে বিদ্যাশক্তিরই উল্লাস।

একবিংশ অধ্যায়

লোক-সংস্থান

মরলেই যদি সব ফুরিয়ে না যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মরলে পর জীব কোথায় যায়? ধর্মশাস্ত্রের নানা সিদ্ধান্ত শুনে প্রাকৃতমনে লোকান্তরের একটা সংস্কার জন্মে এবং ইহলোকের মতই পরলোকেরও সে একটা ছবি আঁকে। স্বর্গ-নরকের কলাও কল্পনা সব দেশেই আছে, কঠোর যুক্তিবাদী সেগুলিকে প্রাকৃত চিত্তের অলীক বিজৃম্ভণ বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু লোকান্তরের বর্ণচিত্রকে উড়িয়ে দিলেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কেননা প্রশ্নটা আত্মার অমরত্ববাদের সঙ্গে জড়িত।

লৌকিক প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে যে আত্মার অমরত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না, তা আমরা জানি। প্রত্যক্ষবাদের সবচাইতে বড় সাধন হচ্ছে যুক্তি। যুক্তির গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার, যুক্তি একটা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নয়, তত্ত্বসিদ্ধির সাধন মাত্র। সব যুক্তির শেষ নির্ভর হল প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষাশ্রিত ভাবনা। এই প্রত্যক্ষভাবনার ইতর-বিশেষ হলেও সবক্ষেত্রে কিন্তু যুক্তির চেহারাটা এক—যদিও গোড়ার ভাবনার ইতরবিশেষে সিদ্ধান্তেরও ইতরবিশেষ হয়। একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন, অসভ্যের আর সুসভ্যের যুক্তির আকৃতি-প্রকৃতিতে কোনও তফাত নাই, তফাত রয়েছে জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণায় অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ-ভাবনায়। কথাটা খুবই সত্য।

যদি মনে করি, আমার সত্তা একান্তভাবে জড়দেহের 'পরেই নির্ভর করছে, তাহলে আত্মার অমরত্বকে কোনও যুক্তিতেই সিদ্ধ করতে পারব না। আমার প্রত্যক্ষ-ভাবনা এখানে ইন্দ্রিয়াশ্রিত, যুক্তিও তা-ই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বাইরে সে পা বাড়াতে নারাজ। অধিকাংশ মানুষেরই প্রত্যক্ষ-ভাবনার ওই সীমা। তবুও যে মানুষ সাধারণভাবে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে, এটা একটা মূঢ় এবং অর্জিত সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। হয়তো এই সংস্কারপ্রবণতার মূলে প্রাণ ও চেতনার স্বাভাবিক একটা প্রেরণা আছে। কেননা, মানবসমাজের অতি আদিম অবস্থাতেও দেখা যায়, পরলোকে বিশ্বাস লোকোত্তর শক্তিতে

বিশ্বাসের মতই মানুষের মজ্জাগত। উদ্ভিদের মূঢ়ত্ব ছাড়িয়ে চেতনা যখন পশুত্বের স্তরে এল, একটা ঊর্ধ্বশক্তির অস্পষ্ট ভাবনা দেখা দিল তখন হতেই—প্রথমত মাতৃসত্তার চেতনা থেকে। কিন্তু আত্মচেতনার অভাবে মরণোত্তর অবস্থার সম্পর্কে কোনও ভাবনা তখনও দেখা দেয়নি। এটি দেখা দিয়েছে মানুষের মধ্যে। বলা যেতে পারে, চেতনার অন্তরাবৃত্তি (inwardisation) এবং আত্মসচেতনতার প্রতি প্রবণতা হতেই এ-ভাবনার উদ্ভব।

যুক্তি-বুদ্ধি মানুষের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুক্তি জানাকে ভিত্তি ক'রে অজানার দিকে তার সীমা প্রসারিত করে, এই তার ধর্ম। কিন্তু কোনও নিগূঢ় সংস্কারবশত চেতনা যদি তার বর্তমান ভূমি পেরিয়ে ঊর্ধ্বতর ভূমিতে উঠতে না চায়, তাহলে যুক্তির প্রবৃত্তি হয় শুধু একই ভূমিতে থেকে জানার সীমাকে প্রসারিত করা এবং অভিনিবেশের ফলে অন্যান্য ভূমির প্রতি উদাসীন এমন-কি বিরূপ হওয়া। আধুনিক জড়বাদের মধ্যে এইধরনের একটা মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatic attitude) আছে। জড়ের ভূমিতে যুক্তির প্রয়োগে জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আশ্চর্য সিদ্ধি দেখা দিয়েছে এবং তার মোহ চেতনার অন্যান্য ভূমির প্রতি একটা অন্ধতা এনেছে। এখানে যুক্তির মূলে কাজ করছে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-ভাবনার সংস্কার। উপনিষদের রূপক ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, জড়বিজ্ঞান হল বিরোচন (glittering)—প্রজাপতির অনুশাসনের উপরভাসা অর্থটাই সে আঁকড়ে ধরল, তার গভীরে আর ডুবতে চাইল না।

কিন্তু ইন্দ্রিয়মানস ছাড়া চেতনার আরও স্তর আছে। একেবারে যে মনের আড়াল হয়ে আছে, তাও নয়। এই মনের 'পরেই মানসোত্তরের নানা সঙ্কেত এসে পড়ে—নানাধরনের প্রাতিভসংবিতের আকারে। এগুলির ইশারা ধরে কেউ যদি অন্তররাজ্যে অভিযান চালায়, চেতনার নতুন-নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয় না। কিন্তু পথটা অন্তরাবৃত্তির, প্রত্যাহারের (withdrawal)। জাগ্রৎ-চেতনা নিরুদ্ধ হলে স্বপ্ন ফোটে, সম্মোহিত চেতনায় অতীন্দ্রিয় অনুভবের শক্তি ফোটে, একান্ত-ভাবনায় বস্তুর গূঢ়-স্বরূপ ফোটে। প্রাকৃত ভূমির এইসব অসাধারণ প্রত্যক্ষের মূলে একই আইন কাজ করছে, সেটা আন্তরবিজ্ঞানের আইন। এই বিজ্ঞানের অনুশীলন থেকে যোগের উদ্ভব, যা অধ্যাত্মসাধনার সার্বভৌম ভিত্তি। কিন্তু যোগ-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রতি সবার হয় না—তার জন্য চেতনার পরিপাকের

একটা অপেক্ষা আছে। অন্তর্মুখীনতা চিত্তের সাবালক হওয়ার নিশানা। অমৃতত্বের পিপাসা এবং প্রাপ্তি এই পরিণত চিত্তেরই পুরুষার্থ—অন্ধবিশ্বাসীরও নয়, অবিশ্বাসীরও নয়।

দার্শনিক যাকে বুদ্ধি বলেন, প্রাকৃত চেতনাতেও যা সামান্যভাবনার (universalisation) আকারে প্রকাশ পায়, সেই অতীন্দ্রিয় সংবিতের ভূমিতে চেতনা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনন্তত্বের এবং অমরত্বের একটা প্রত্যক্-বৃত্ত অপরোক্ষ বোধ জন্মে।

বুদ্ধির দৌলতে সান্তের পিছনে অনন্তের সামান্য-কল্পনা প্রাকৃতমনও করে, বিশ্বের মূল খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকও একটা অনন্ত শক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু এই অনন্তত্বকে আত্মচৈতন্যের বেলায় খাটাতে গিয়ে স্বভাবতই প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বিধা বোধ করে। কেননা, বাইরের জগতে সে দেখছে অশাশ্বত ক্ষণিকের মেলা, অন্তর্জগতেও তো দেখছে তা-ই। চিত্তবৃত্তি উঠছে পড়ছে, তার মধ্যে স্থায়িত্ব কোথায়? একটা অহংএর সূত্রে বিচ্ছিন্ন বৃত্তিগুলি গাঁথা বটে, কিন্তু সে-অহংকে ধরতে গেলে একটা ক্ষণিক বৃত্তি ছাড়া তো আর-কিছুই মেলে না। সুতরাং শাশ্বত আমি বলে কিছুই নাই। যদি থাকে, তার কোনও নিরূপিত লক্ষণ হতে পারে না। তার অস্তিত্ব একটা সর্বাধার নাস্তিত্ব মাত্র। প্রাকৃতমনের সংস্কার আঁকড়ে থেকে অন্তরমুখে অনন্তত্বের ভাবনা যদি করি, তাহলে এইধরনের শূন্যবাদে পৌঁছন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই শূন্যবাদ এখানে শুধু উজানপথের খবর দিচ্ছে। সর্বশূন্যতায় স্থিতির একটা ইতিবাচক ধর্ম আছে, সেটি হল সত্তার প্রশান্তবাহিতা। এই প্রশান্তবাহিতা সহজ হলে এরই ভূমিকায় দেখা দেয় চিৎশক্তির বীচিভঙ্গ। প্রশান্তবাহিতা যদি সহজভাবে জাগ্রতের ভূমিতেও নেমে আসে, তাহলে যে বিকল্পহীন অস্তিত্বের প্রত্যয় তার উপাদান, তার সংবেগ বৃত্তিতেও সঞ্চারিত হয়। যাকে আগে দেখেছিলাম ক্ষণভঙ্গী চিত্তবৃত্তিরূপে, তাকে তখন অনুভব করি নিত্যস্পন্দিত চিদ্‌বৃত্তিরূপে। যেন একটি আলোর রেখা কাঁপছে: যদি বাইর থেকে দেখি, কম্পনের দুটি কূট বিচ্ছিন্ন মনে হবে; কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে অনুভব করব, দুটি কূট একই শক্তির বাঁকের দুটি প্রত্যন্তবিন্দু মাত্র। অন্তর্দৃষ্টিতে শুদ্ধ অহংএর এই চেহারা: স্বরূপত সে অবিভক্ত নিত্য-সম্বন্ধ মাত্র, কিন্তু বিভূতিতে সে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, আবার এ-দুয়ের উর্ধ্বে তার অস্পন্দ স্থিতিও আছে।

বিজ্ঞানীর এই অন্তর্মুখ অনুভবই হল আত্মার অমরত্বের ভিত্তি। মনোগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে একে প্রমাণ করা যায় না, যে প্রত্যক্ষ অনুভবে এর প্রামাণ্য তার দিকে একটা ইশারা মাত্র করা চলে। মরলে পরেও আমি থাকব কি না, তা এই জীবনের অনুভবকেই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর করে মরণের উপান্তে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে বোঝা যায়। জীবন আর মরণের মাঝে শেষপর্যন্ত দুর্লক্ষ্য একটা আলোর আড়াল মাত্র থাকে, আর সেই আড়ালের ওপার থেকে এক মহামরণের জ্যোতিঃ-প্রপাত এসে জীবনকে বুকে তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দেয়, সে অমৃত কেন। উপনিষদে তাই দেখি, বৈবস্বত মৃত্যুই কুমার নচিকেতার অমৃতপিপাসার তর্পক।

প্রাকৃত বুদ্ধিকে এ-বিষয়ে একটা সঙ্কেত দেওয়া যেতে পারে। জাগ্রতের অহং সুষুপ্তিতে তলিয়ে যায়, আবার সুষুপ্তি থেকে সে বেরিয়ে আসে। এই সুষুপ্তির অহংকে যদি মানুষ বিবিক্ত করে দেখতে পারে অর্থাৎ যদি সে জেগে ঘুম'তে পারে, তাহলে প্রাকৃত জাগ্রতের সংস্কার হতে মুক্ত আত্মভাবের আরেকটা রূপ তার দৃষ্টির সামনে ভাসবে। ঘুম থেকে জেগে ওঠা আর মৃত্যুর পর ইহ-লোকে বা লোকান্তরে জন্ম নেওয়া—দুটা ঠিক এক না হলেও এক পর্যায়ের ব্যাপার। মরণোত্তর অবস্থাকে পুরাপুরি জাগ্রৎ-চেতনার গ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু সুষুপ্তিকে পারা যায়। যা জাগ্রতের গ্রাহ্য তা-ই প্রামাণিক, প্রত্যক্ষ-বাদীর এই দর্শনের সূত্র মেনে নিয়েই তাঁকে বলা যেতে পারে নিজের সুষুপ্তিকে জাগ্রতের গ্রাহ্য করতে। আত্মসত্তার গূঢ়তম প্রত্যক্ষ এবং তার শাশ্বতত্বের প্রত্যয় তখনই সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষবাদী যদি এ-পরীক্ষা করতে নারাজ হন, তাহলে মরলেই সব ফুরিয়ে যায় বলে গোঁড়ামি করবার অধিকারও তাঁর থাকে না। যোগের অনেক গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে স্বপ্নবিজ্ঞান আর সুষুপ্তি-বিজ্ঞানের অনুশীলন হতে। এ-দুটিকে আয়ত্ত না করলে অস্তিত্বের সকল রহস্য এবং চেতনার সকল ভূমি সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞান হয় না। নিজেরই চেতনার একটা বিরাট অংশকে না জেনে কিংবা জানবার চেষ্টামাত্র না করে চেতনার ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞতার ভান করা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয়।

আত্মার অমরত্ব একটা আন্তর-প্রত্যক্ষের বিষয়। এই প্রত্যয়ের উপরেই লোকান্তরের সত্তার ভিত্তি। সেমিটিক এবং আর্য দুটি ভাবনাতেই অমরত্ব স্বীকৃত বলে লোকান্তরও স্বীকৃত। দুয়ের মাঝে তফাত শুধু একজন্মবাদে

আর জন্মান্তরবাদে। যে-প্রত্যক্ষের উপর শাশ্বত আত্মবাদের স্থাপনা, সেই প্রত্যক্ষই লোকান্তরেরও প্রমাপক। অর্থাৎ ইহজগৎ ছাড়া আরও জগৎ যে আছে, তা শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হবে প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারাই। অবশ্য এ-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ নয়, অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-ভাবনার সঙ্গে অতীন্দ্রিয়-ভাবনা মিশে আছে, প্রাকৃত চেতনায় আমরা দুটাকে পৃথক করতে পারি না। প্রত্যাহার ও একতান ভাবনার দ্বারা অতীন্দ্রিয়-বোধকে জাগানো যেতে পারে, তবে তার সঙ্গে-সঙ্গে দেহচেতনার সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানও জানা চাই। এটা আজগবী কল্পনা নয়, রীতিমত অনুশীলনের ব্যাপার। স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে যে এই জড়ের জগতেরই সব-কিছু জানা যায় না, বৈজ্ঞানিকও একথা স্বীকার করেন। অপ্‌টিক্সের আইন মেনে নিয়েই অণুবীক্ষণযন্ত্র তৈরি করে দৃষ্টিশক্তিকে তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ করতে পারেন। তখন একবিন্দু জলের মধ্যে একটা অকল্পিত নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যায় না। ইন্দ্রিয়ের শক্তির উৎকর্ষ এখানে ঘটানো হচ্ছে জড়শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু জড়কে যেমন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, তেমনি ইন্দ্রিয়ভাবনাকেও তো নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। কেননা, জ্ঞানের এক প্রান্তে বিষয় এবং আরেক প্রান্তে বিষয়ীর যোগাযোগে যখন জ্ঞান সিদ্ধ হচ্ছে, তখন উভয়ের শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ সম্ভব—একথা তো অযৌক্তিক নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেছিলেন, 'মানাধীনা মেয়শুদ্ধিঃ' অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিকে শুদ্ধ করলে প্রমেয়ের তত্ত্বও আবিষ্কৃত হয়। এই সূত্রটির 'পরেই সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভিত্তি। জড়বিজ্ঞানের মতই তারও একটা অবিসংবাদিত প্রামাণ্য আছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কারবার চিত্তের অন্তরাবৃত্তি নিয়ে—ওই হল তার মুখ্য সাধন। অন্তরাবৃত্তির ব্যাপার প্রাকৃত চেতনাতেও আছে। তার একটা ধারার সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত, তাকে বলি 'কল্পনা'। কল্পনা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে বলে তাকে আমরা প্রত্যক্ষের চাইতে খাটো করে দেখি। প্রত্যক্ষবাদী বলবেন, তোমার লোকান্তরও একটা কল্পনা। খুশি-বিশ্বাসীদের বেলায় কথাটা যে সত্য, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু অন্তর্জগৎটা তো শুধু কল্পনা দিয়ে তৈরী নয়। তার মধ্যে আরেকটা বৃত্তি কাজ করছে, যাকে বলতে পারি 'ভাবনা'। কল্পনা বাইরের বস্তুকে অন্তরে এনে হাজির করে, ভাবনা তার অর্থ আবিষ্কার করে। এই অর্থ সবসময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

নয়। গীতার ভাষায় বলা যেতে পারে, তার একটা ঝোঁক রয়েছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ের' দিকে। প্রত্যেকের কল্পনার সঙ্গে ভাবনা সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে। তাকে নিষ্কাশিত করতে পারলে অধ্যাত্ম অণুবীক্ষণের কাছে আরেকটা জগৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। এইটিই যোগী এবং মরমীদের অতীন্দ্রিয় জগৎ।

এই আবিষ্ক্রিয়ার সূত্র কিন্তু আমাদের আটপৌরে প্রত্যক্ষের মধ্যেই রয়েছে। তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের আলোচনার বেলায় দেখেছিলাম, বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে সন্নিকর্ষ যতই নিবিড় হতে থাকে, ভেদদর্শন ততই অভেদদর্শনের দিকে এগিয়ে চলে, অবশেষে সব জানাই রূপান্তরিত হয় 'হয়ে জানা'য়। অন্তর্মুখ ভাবনার এইটি হল সদর রাস্তা—এই রাস্তা ধরে সে অতীন্দ্রিয় ভাবের রাজ্যে পৌঁছয়। অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজে হয় না। বাইরের দিক থেকে চিত্তের মোড় অন্তরের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে সব সময় সব অবস্থাতে 'আপনাতে আপনি থাকবার' অভ্যাসটা হল এ-সাধনার প্রথম সোপান। অন্ধকার ঘরে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর অন্ধকার তরল হয়ে ঘরের ভিতরের ছবিটা যেমন ধীরে-ধীরে চোখের সামনে ফুটে ওঠে, অন্তরের নিত্য বাসিন্দা হলেও তা-ই হয়। এইসঙ্গে আরেকটি জিনিষের দরকার, নিজেকে সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেওয়া। বিষয়ের ধাক্কায় চিত্ত বাইরের দিকে ছুটে যায়, তাইতে বিষয়ের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হয়—এটা চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু বিষয়কে ছুঁয়েই চিত্ত যদি প্রতিমুহূর্তে কেবল অন্তরে তলিয়ে গিয়ে শূন্য হয়ে যায়, তাহলে তা-ই হবে অতীন্দ্রিয়-সাধনার সোপান। যোগীদের ভাষায়, আত্মস্থিতি আর স্বরূপ-শূন্যতা হল অতীন্দ্রিয় ভাবনার দ্বার।

এই ভাবনায় প্রথম যা আবিষ্কৃত হয়, তা আত্মচৈতন্যেরই কতকগুলি গভীর স্তর। আর এই আত্ম-আবিষ্কার হতে আবিষ্কৃত হয় লোকান্তর। তাই লোকান্তর-প্রত্যক্ষের দুটি ধারা—একটি প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective), আরেকটি পরাক্-বৃত্ত (objective)। প্রত্যক্-বৃত্ত প্রত্যক্ষে নিজের মধ্যেই অতীন্দ্রিয় জগতের চিন্ময় উপাদানগুলির দেখা পাওয়া যায়—বিশুদ্ধ জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ, চিৎ ও সত্তার ভাবঘন স্বগত প্রত্যয়রূপে। তারপর এই প্রত্যয়ের পরিপাকে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মচৈতন্যকে কেন্দ্র করে পরাক্-দৃষ্টিতে অনুভূত হয় লোকান্তরের পরম্পরা। প্রাকৃত ভূমিতেও আত্ম-চৈতন্যের মধ্যবিন্দু হতে বিচ্ছুরিত হয় লোকচৈতন্যের পরিমণ্ডল। আমার আমিকে কেন্দ্র করেই আমার জগতের বিস্তার। আমি শুধু আমার মধ্যে

গুটিয়ে থাকি না, স্বরূপ-বিসৃষ্টির উল্লাসে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ি। চিৎশক্তির এই ব্যাপ্তিধর্মই লোকসৃষ্টির কারণ। চিৎ যদি একটা একরস তত্ত্ব হত শুধু, তাহলে সৃষ্টিও হত না, লোকও দেখা দিত না। কিন্তু চিতের মধ্যে আছে একটা স্বগত-পরিণামের লীলা, আত্মবিভাবনার (self-modification) একটা স্ফুরত্তা। এক আমার মধ্যেই সংহত হয়ে আছে অনেকগুলি 'আমি'—চিৎপরিণামের নানা স্তর আশ্রয় ক'রে। এই বিভিন্ন 'আমি'-গুলির স্বতন্ত্র স্ফূর্তির জন্য দরকার হয় লোকের। লোক-ভাবনা দাঁড়িয়ে আছে তিনটি নিমিত্তের উপর—দেশ কাল আর সম্বন্ধ। বহুর প্রত্যেককে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেবার জন্য দরকার হয় দেশের, প্রত্যেককে আত্মপরিণামের অবকাশ দেবার জন্য দরকার হয় কালের, আর পরিণামের ক্রিয়া অগ্রসর হয় অন্যোন্যসম্বন্ধকে আশ্রয় করে। এমনি করে জগৎ গড়ে উঠছে—কি আমার অন্তরে, কি আমার বাইরে। ইহলোকের বিন্যাস যে-ধারায়, লোকান্তরের বিন্যাসও সেই ধারায়। দুয়ের মাঝে তফাত শুধু উপাদানগত বিভিন্নতায়। আর সে-বিভিন্নতাও দেখা দেয় একই অদ্বয়তত্ত্বের ক্রমসূক্ষ্ম পরিণামে।

উপনিষদে একটা কথা আছে, 'ওখানে যা আছে তা এখানে আছে, এখানে যা আছে তা আছে ওখানেও।' বিভিন্ন লোকের মাঝে এই সম্পর্ক, তারা ওতপ্রোত। প্রথমেই মানতে হবে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই সব নয়, এমন-কি আমাদের আটপৌরে চেতনার বেলাতেও নয়। এই প্রত্যক্ষ জগৎটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা অপ্রত্যক্ষের জগৎ—তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে পাই না, পাই বোধে। স্বভাবতই বোধটা নিজের বেলায় স্পষ্ট হলেও পরের বেলায় আবছা। আমার বস্তুজগৎ আমার ইন্দ্রিয়ের গোচর, কিন্তু আমার ভাবজগৎ আমার কাছে অতীন্দ্রিয় অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য। আর পরের ভাবজগৎ আমার কাছে অনুমানের বস্তু। তবুও দেখি, যেখানে ভাবের সাম্য, সেখানে পরচিত্তেরও খানিকটা প্রত্যক্ষবোধ হতে পারে। একে সূত্র ধরে যদি চিত্তের অন্তরাবৃত্তির দ্বারা ভাবের অনুশীলন করা যায়, তাহলে আমার চিত্তের মত অপরের চিত্তও আমার প্রত্যক্ষ হতে পারে। এই বোধিজ প্রত্যক্ষই লোকান্তর-বিজ্ঞানের করণ (instrument)। যেমন সুষুপ্তির বিবিক্ত প্রত্যক্ষ হতে শাশ্বত আত্মসত্তার বিজ্ঞান সম্ভব হয়, তেমনি পরের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে পরের মন জানতে পারলে লোকান্তর-বিজ্ঞানের পথও খুলে যায়। তারও গোড়ার কথা হল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বস্তুর প্রত্যয় যেমন দানা বেঁধেছে, তেমনি

অন্তর্জগতে ভাবগুলিকেও দানা বাঁধতে দেওয়া—যাতে তারা রূপসৃষ্টিতে সমর্থ হয়। প্রাকৃত কবিচিত্ত এটা খানিকটা পারে। যোগীর অপ্রাকৃত চিত্ত এই রীতিতে বিশ্বযোগে যুক্ত হয়ে হয় লোকবিৎ এবং লোককৃৎ। অবশ্য এটা অনেক দূরের কথা। কিন্তু সেই সুদূরের পথ যে আমাদের প্রাকৃত চিত্তের আঙিনা হতেই শুরু হয়েছে—এইটা বোঝাবার জন্যই এত কথা বলা।

সংশয়ী তবুও বলবেন, এমনও তো হতে পারে, লোকসংস্থান মনের একটা কল্পনা, কিংবা এগুলি সত্য হলেও এই মনই উজানপথে এদের সৃষ্টি করে চলেছে। প্রাকৃতমনের আঁকা স্বর্গ-নরকের ছবি যে অনেকখানিই কল্পনা, তা আগেও বলেছি। প্রাকৃতমন ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না, লোকান্তরের কল্পনায় তাকে প্রসারিত করে মাত্র। কিন্তু যে-ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হতে কল্পনার সৃষ্টি, তারও একটা গভীরের দিক আছে। স্মৃতিনির্ভর কল্পনা কিন্তু তার আশ্রয় নয়। একটা ফুল দেখে ভাল লাগল। স্বভাবতই এই ভাল-লাগাটা জিইয়ে রাখবার ইচ্ছা আমার হবে। সাধারণত দু'উপায়ে এই রসাস্বাদকে প্রলম্বিত করতে পারি—বারবার ফুলটাকে দেখে, কিংবা তার স্মৃতিকে লালন করে। দুটি ব্যাপারই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপেক্ষা রাখছে এবং তাদের ক্রিয়া হচ্ছে চিত্তের উপরের স্তরে মাত্র। অনেক অনুকূল বোধ আমরা এইভাবে জিইয়ে রাখি। এটা হল পুনরাবৃত্তির পথ। কিন্তু এতে বোধের স্থায়িত্ব এবং গভীরতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আবর্তনের বেগটা কিছুকাল পরে হয়তো মন্দা হয়ে পড়ে, বোধও ক্রমে মিলিয়ে যায়; কিংবা অন্তরে বোধের একটা অস্পষ্ট সংস্কার মাত্র থাকে, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে খানিকটা ধূমল অতৃপ্তি। কিন্তু এমনও হতে পারে, ভাল-লাগাটা অন্তরের গভীরে একটা-কিছুকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, শুরু হল চিত্তের অন্তর্মুখ পরিণাম—দার্শনিক যাকে বলেন 'সাত্ত্বিক বিকার'। তখন অন্তরের অনুভব আর কল্পনাশ্রয়ী নয়, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া উপর-ভাসা অর্থের গভীরে সে আরেকটা অর্থকে আবিষ্কার করেছে। এই অর্থের ইঙ্গিত বস্তুর শাশ্বত স্বরূপের দিকে, যা শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় চিদ্‌বিলাসের অনুভূতিতে। অধ্যাত্মযোগীর লোকপ্রত্যক্ষ চিত্তের অন্তরাবৃত্তিকে আশ্রয় করে এমনিতর একটা অতীন্দ্রিয় আবিষ্ক্রিয়া—কল্পনা মাত্র নয়।

তারপর মনই লোকপরম্পরা সৃষ্টি করছে একথা সত্য হত, যদি জানতাম সৃষ্টির মূলে আছে জড়শক্তির প্রবর্তনা। তাহলে বলতে পারতাম, জড় হতে যেমন

প্রাণের উন্মেষ এবং প্রাণ হতে মনের উন্মেষ হয়েছে, তেমনি এই মনেরই ক্রিয়ায় মানসোত্তর লোক গড়ে উঠছে। বাইরের দিক থেকে দেখলে এমনটা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, কেননা সাধারণত অপরা প্রকৃতির ক্রিয়াই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হল পরিণামের ধারা নিয়ে নয়, তার মূলে কার প্রবর্তনা তা-ই নিয়ে। জড় কেন জড়ই থাকল না, প্রাণ হতে চাইল কেন—তার রকমারি জবাব হতে পারে। কেউ বলবেন, জড় প্রাণ হয়েছে যদৃচ্ছার (chance) বশে, কেউ বলবেন নিয়তির (necessity) বশে; কেউ বলবেন, হওয়া তার স্বভাব তাই হয়েছে, কিংবা কালক্রমে হয়েছে। এ-জবাবগুলির কোনটাই কিন্তু প্রশ্নের গোড়ার দিকে ঘেঁষছে না, প্রবৃত্তির (function) নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েও প্রবর্তকের (agent) কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা কথা মানতে হবে, প্রাণ জড়ের চাইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। শুধু প্রবৃত্তির দিক থেকে দেখতে গেলে, এখানে নিকৃষ্ট তত্ত্ব হতে উৎকৃষ্ট তত্ত্বের আবির্ভাব হচ্ছে, সুতরাং নিকৃষ্ট তত্ত্ব প্রাগ্‌ভাবী (pre-existent) এবং উৎকৃষ্ট তত্ত্ব পরভাবী। কিন্তু নিকৃষ্ট তত্ত্বের প্রাগ্‌ভাব প্রবৃত্তির বিচারে একটা অবিসংবাদী তথ্য হলেও এ তার কৌলীন্য বাড়ায় না। নিকৃষ্টের মধ্যে উৎকর্ষের প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করছে যে-শক্তি এবং কালক্রমে তার প্রশান্তাও হচ্ছে, সত্যকার মর্যাদা কিন্তু সেই শক্তির। প্রবৃত্তির বিচারে সে পরভাবী, তবুও প্রবর্তকত্বের বিচারে সে প্রাগ্‌ভাবী। তার প্রাগ্‌ভাব ব্যক্ত নয়, অব্যক্ত—এই কথা স্বীকার করলে দুটি তত্ত্বেরই মর্যাদা থাকে এবং আবির্ভাবের তত্ত্বও প্রাঞ্জল হয়। চিৎ যদি পরমতত্ত্ব হয়, তাহলে জড়ের মধ্যে প্রবর্তক শক্তিরূপে নিগূঢ় থেকে তাকে আশ্রয় করে সে উন্মেষিত হচ্ছে—এই দৃষ্টিই সমীচীন। চিৎকে পরমতত্ত্ব বলছি এইজন্য যে, আমার সার্থক অস্তিত্বের পক্ষে সে অপরিহার্য। আমার চেতনা যেমন নিজেকে জানছে, তেমনি জড়ত্বকেও জানছে; জড়ত্ব অন্ধ বলে কিছুই জানছে না। তবে সঙ্গে-সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, চেতনা যে শুধু উদাসীন দ্রষ্টৃত্ব তা নয়, তাতে রয়েছে স্ফুরত্তা (dynamism) এবং সম্ভূতির (becoming) প্রবেগ।

অন্তর্দৃষ্টিতে চেতনা অন্তর্গূঢ় প্রাক্তন তত্ত্ব, তার স্ফুরত্তাতেই লোকসংস্থানের বিসৃষ্টি হচ্ছে। এই স্ফুরত্তাতে সঙ্কোচ এবং প্রসার দুটি ধর্মই আছে। চেতনার আত্মনিগূহনে জড়ের সৃষ্টি, আবার আত্মপ্রসারণের প্রবেগে জড়ের চেতনায়

ফিরে যাওয়া—এই দুটি নিয়েই বিশ্বলীলা। অখণ্ড-দৃষ্টিতে দুটি ব্যাপারই চিদ্‌বৃত্তি। অর্থাৎ জড়ের চিদভিমুখী গতি যেমন সচেতন, চেতনার জড়াভিমুখী গতিও তা-ই। আবার দুটি ব্যাপারের মাঝে পৌর্বাপর্য নাই, আছে যৌগপদ্য—শক্তির বীজভাব এবং বিস্তার দুটি একসঙ্গেই ঘটছে। এমন-কি প্রাকৃত চিত্ত-বৃত্তিতেও দেখছি, গুটিয়ে যাওয়া এবং ছড়িয়ে পড়া যে একসঙ্গে চলছে, আত্ম-সচেতনতার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে তা অনায়াসেই ধরা পড়ে।

চিৎকে বিশ্বমূল মানলে লোকসংস্থানকে আর মনের সৃষ্টি বলতে পারি না। বলতে হয়, ওটি প্রাকৃসিদ্ধ তত্ত্ব, মন তার আবিষ্কারক মাত্র। অবশ্য মন বলতে ইন্দ্রিয়নির্ভর মনকে লক্ষ্য করছি না, লক্ষ্য করছি অধিচেতন মনকে।

লোকসংস্থানের একটা প্রাচীন ছক হল সপ্তব্যাহৃতিতে উল্লিখিত সপ্তলোক, উপনিষদে যাদের বলা হয়েছে 'আপঃ'। আমাদের সত্তার সপ্ততন্ত্রের সঙ্গে এই সপ্তলোকের একটা সমান্তরতা আছে, কেননা আগেই বলেছি আত্মচেতনা আর লোকচেতনা একই চিৎশক্তির প্রত্যক্ এবং পরাক্ বিভঙ্গ মাত্র। লোক-দৃষ্টিতে যা সত্য তপঃ জন মহঃ স্বঃ ভুবঃ এবং ভূ, অধ্যাত্ম অনুভবে তাই সৎ চিৎ আনন্দ বিজ্ঞান মন প্রাণ এবং দৈহ্যচেতনা। সবই এক অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ—জীবের আকারে এবং জগতের আকারে। জীবে-জীবে জগতে-জগতে এবং জীবে-জগতে একটা অঙ্গাঙ্গিভাব আছে, কেননা সবাই তারা এক বিরাটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এর মধ্যে ঊর্ধ্বতত্ত্ব অবরতত্ত্বের নিয়ন্তা এবং অবরতত্ত্ব তার আত্মরূপায়ণের আশ্রয়। ঊর্ধ্বলোকের শক্তি অবরলোকে আবিষ্ট হয়ে তার রূপান্তর ঘটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলছে—যেমন ঘটছে দেখছি জীবদেহে। পিণ্ডে যা ঘটছে, ব্রহ্মাণ্ডেও তা-ই ঘটছে।

প্রাকৃত মানুষে মনশ্চেতনা পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে, চেতনার আর চারটি স্তরের ক্রিয়া তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্নকে প্রকট করবার সাধনাই জীবনা-য়ন। তার জন্যই আধারশক্তির অব্যক্ত পরিবেশের কল্পনা আসে। চেতনার স্তরগুলিকে বিশুদ্ধ শক্তিরূপে যদি দেখি, তাহলেই লোকভাবনার সূত্র খুঁজে পাই। তোমার-আমার দৈহশক্তির প্রকাশ ও প্রবৃত্তির মূলে যে অন্নময় শক্তির (spiritual-physical energy) বিরাট উৎস, তা-ই ভূ-লোক। জড়ের জগৎ এবং জড়াশ্রিত জীবন তার বিভূতি। আমাদের পৃথিবী তারই অন্তর্গত। পৃথিবীতে যে তিনটি লোকের ক্রিয়া আপাতত স্ফুরিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটা ব্যামিশ্রভাব আছে, একটা সংঘর্ষ আছে—যেমন আছে

আমাদের দেহে প্রাণে মনে। শক্তির যেমন অবিচ্ছন্দ আছে, তেমনি মিত্র-চ্ছন্দও থাকতে পারে। তাকে আশ্রয় করেই চিৎশক্তির শুদ্ধভূমির পরম্পরা। তা-ই সপ্তলোক বা 'আপঃ'। এইসব বিবৃতির মধ্যে অযৌক্তিক কিছুই নাই, প্রাকৃত চেতনার প্রকৃতি এবং প্রয়াস হতেই এগুলি স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। অনুমানকে প্রত্যক্ষে পরিণত করা সাধনার দায়।

চেতনা যখন মনের ভূমি ছাড়িয়ে বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, আত্মার অমরত্ব এবং লোকান্তরের তাত্ত্বিকতা তখনই প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে। এই প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করে জীবের সংসারগতির একটা ছক আঁকা যায়। আর্য জন্মান্তরভাবনাকে স্বীকার করে এখন আমরা তা-ই করব।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জন্মান্তর ও লোকান্তর

দুটি কথা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম : (১) মানুষ মরলেই সব ফুরিয়ে যায় না—কূটস্থ-চৈতন্যরূপে সে অমর তো বটেই, তার শাশ্বত চৈত্যসত্ত্বও কালগত অমৃতত্বের সম্ভোক্তা ; (২) এই জড়ের জগৎই বিশ্বসত্তার সবখানি নয়, এর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে এবং একে ছাপিয়ে আরও-সব লোক আছে। আত্মার অমরত্বের প্রমাণ মেলে মানসোত্তর বিজ্ঞানভূমিতে চেতনা উত্তীর্ণ হলে পর ; আর লোকসংস্থানের অনুভব আমরা পেতে পারি অধিচেতনভূমিতে অবগাহন করে।

দুটি প্রত্যক্ষই অতীন্দ্রিয়, অথচ ইন্দ্রিয়সংবিতের ধারার মধ্যেই তাদের ইশারা আছে। অতীন্দ্রিয় অনুভব বাদ দিয়েও মানুষের জীবন দিব্যি চলে যেতে পারে, যেমন মানুষকে বাদ দিয়েও পশুর জীবন চলে যায়। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বোধ ইন্দ্রিয়জগতের অর্থকে আরও গভীর করে—এটি চিৎপ্রবৃত্তির (functioning of consciousness) একটি মৌলিক বিধান। প্রাকৃত জগতেও কবি শিল্পী এবং দার্শনিক অতীন্দ্রিয়বোধের কারবারী, এমন-কি বৈজ্ঞানিককেও শেষপর্যন্ত এই দলেই ভিড়তে হয়। বিজ্ঞানী এবং মর-মীয়াকে বলতে পারি অতীন্দ্রিয়বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। বিশেষজ্ঞের গবেষণা সর্বত্র সাধারণের ভাবনার মানকে উন্নত করবে, এটাই প্রত্যাশিত। তাছাড়া মানুষের চেতনার স্বাভাবিক গতি অতীন্দ্রিয়ের দিকে। অন্তরে এবং বাইরে অনুভবের (experience) ঐশ্বর্য তার বলতে গেলে অসীম। অনুভবের বৈচিত্র্যকে সংহত করতে গিয়ে যে-বোধের আশ্রয় তাকে নিতে হয়, তা অতীন্দ্রিয় এবং ব্যাপ্তিধর্মা। ব্যাপ্তির বোধে চেতনার স্ফূর্তি হয়, আমার সঙ্কুচিত জগতের বিস্ফারণে আমি আমাকে যেন আরও বৃহৎ এবং নিবিড় করে পাই। চেতনার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অধ্যাত্মবোধের বিশিষ্ট লক্ষণ। আত্মা, ব্রহ্ম, অমৃতত্ব, চেতনার উর্ধ্বভূমি, লোকান্তর ইত্যাদির অনুভব তার স্বাভাবিক পরিণাম।

এই অপ্রাকৃত অনুভবকেও মানুষের সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। নইলে একদিকে যেমন জীবনায়নের বহু জটিল সমস্যার সমাধান হবে না, তেমনি আরেকদিকে চিত্তের প্রগতি শুধু একটা ভূমিতেই আবর্তিত হয়ে চলবে, চেতনার গোত্রান্তর বা রূপান্তর সিদ্ধ হবে না।

জীবসত্ত্ব শাশ্বত এবং তার পরিণামের অনুবৃত্তি লোক হতে লোকান্তরে ব্যাপ্ত—এই কথা ধরে নিয়ে এখন আমাদের আলোচনা অগ্রসর হ'ক।

জীবসত্ত্বের পরিণাম সাধিত হয় জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে— এই আর্যভাবনাকে আমরা যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছি। জন্মান্তরবাদের একটা রকমফের আছে, যাকে বলা হয় দেহান্তর-সংক্রমণবাদ (Theory of Transmigration)। গ্রীক মরমীয়া পিথাগোরাসের নামে এটি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ছিল। এই মতবাদের প্রাচীন প্রামাণিক রূপ যা-ই থাকুক, এর লোকাতত রূপটি কিন্তু যৌক্তিক বলে মনে হয় না। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মানুষের আত্মা আরেকটা দেহ আশ্রয় করে—হয়তো শিয়াল বা কুকুর বা শূকরের দেহ—এ-কল্পনা নিতান্ত খামখেয়ালী ঠেকে। প্রথমত, জীবসত্ত্ব মনুষ্যত্বের স্তরে পৌঁছলে তার চেতনায় এমন-একটা বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, যা তাকে ইতরজীব থেকে একেবারে আলাদা থাকের করে তোলে। এ-অবস্থায় আবার তার ইতরজীবের পর্যায়ে নেমে আসা স্বাভাবিক নয়। 'কোনও-একটা পাশববৃত্তির চরিতার্থতার জন্য আবার সে পশু হয়ে জন্মায়'—একথা বলা যেতে পারে বটে। কিন্তু এ-যুক্তি খুব জোরালো নয়। একেবারে নির্ভেজ পশুত্ব মানুষের মধ্যেও বিরল। খুব ভাল মানুষ আর খুব খারাপ মানুষ দুইই সংখ্যায় কম—ভালও নয় মন্দও নয় এমন মাঝারি মানুষের সংখ্যাই বেশী। তাদের মধ্যে কোনও-একটা পাশববৃত্তির বাড়াবাড়ি থাকলেও, মৃত্যুর পর তাদের পশু হয়েই জন্মাতে হবে—একথা বলা সঙ্গত হয় না। তাহলে মানতে হয়, মানুষের প্রকৃতির গতি কেবল নিম্নগামী। তখন বিশ্বপ্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের কথাটা ফাঁকা হয়ে পড়ে। সুতরাং জীবসত্ত্ব পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হলে তার সম্মুখে ঊর্ধ্বপরিণামের দুয়ার খুলে যায়, পাশবভাবের খাদ মেশানো থাকলেও তার স্বাভাবিক গতি হয় বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার দিকে—এই ভাবনাই যুক্তিযুক্ত। ক্বচিৎ কোথাও পিথাগোরীয় দেহান্তর-সংক্রমণবাদ সত্য

হলেও হতে পারে, কেননা প্রকৃতির মধ্যে কার্য-কারণের সম্বন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল। কিন্তু তাহলেও সমষ্টি প্রকৃতিপরিণামের রীতির দিকে তাকিয়ে এ-বাদকে সর্বজনীন বলে মেনে নেওয়া চলে না।

মানুষ মৃত্যুর পর আবার মানুষ হয়েই জন্মায়, এটা স্বাভাবিক ধরে নিয়েও প্রশ্ন হতে পারে: এই জন্মান্তর কি অব্যবহিত, না মৃত্যু আর জন্মান্তরের মাঝে একটা অবকাশ আছে? জন্মান্তর স্বীকার করেও যদি লোকান্তর না স্বীকার করি, তাহলে বলতে হবে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই জীবের জন্মান্তর ঘটে। কেননা তার সমস্তটা জীবন যখন পার্থিব-পরিণামের সঙ্গে গাঁথা এবং পার্থিবলোক ছাড়া অন্য লোক যখন নাই, তখন তার মৃত্যু এবং জন্মান্তর পার্থিব ক্রিয়া-পরিণামের (process) পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির ধর্মে এবং বিধানে এ-মতেরও সমর্থন নাই। প্রথমত, চিৎই বিশ্বমূল সুতরাং লোকান্তর পার্থিব কল্পনার উপসৃষ্টি নয়, তার একটা তাত্ত্বিকতা এবং প্রাকৃসত্তা আছে—একথা আমরা আগেই বলেছি। চিতের প্রাকৃসত্তার অনুভব চিৎ-পরিণামের একটা বিশেষ পর্বেই সম্ভব। ব্যাপারটা তখন এসে পড়ে আন্তর-প্রত্যক্ষের আমলে, যার যোগ্যতা ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের নাও থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনন্ত-অব্যক্ত সান্ত-ব্যক্তের আধার; বিশ্রাম ও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য এই মূলাধারে বারবার ফিরে যাওয়া শক্তিপরিণামের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। শক্তি-ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় দমকে-দমকে—এটা সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক সত্য। এই অনুসারে, দুটি জাগ্রৎ-ভূমির মাঝে স্বপ্ন-সুষুপ্তির অবকাশের মত দুটি জন্মের মাঝে একটা অন্তরাভব (internatal) স্থিতির অবকাশ থাকাটাও স্বাভাবিক। এই অবকাশযাপনের জন্যই লোকান্তরের প্রয়োজন।

মানুষের প্রকৃতি ঊর্ধ্বপরিণামিনী, একথা মেনে অবকাশযাপনের দুটি কারণ দেখানো যেতে পারে। প্রথমত, মানুষের মধ্যে যে-ঊর্ধ্বশক্তির বীজ নিহিত রয়েছে, তার স্ফুরত্তার অনুভবের জন্য তাকে অবকাশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এটিও প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান। প্রাকৃত ভূমিতেও দেখি, একটা বড়-কিছু ফোটবার জন্য ভিতরে যখন আকুলি-বিকুলি দেখা দেয়, তখন দরকার হয় অন্তর্মুখীনতার বিশ্রান্তির তন্ময়তার। এই সময়টি চিদুন্মেষের আরেকটি পর্বের প্রস্তুতিতে ব্যয়িত হয়—এই হল অবকাশসৃষ্টির আরেক কারণ। তাই জীবের আন্তর-প্রকৃতি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অব্যক্তে অবগাহন করে এবং তার গভীর হতে জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চয় ক'রে পরবর্তী ভূমিকার জন্য তৈরী হয়।

সব মিলিয়ে এখানে দেখতে পাই দুটা ব্যাপার—একটা গভীরে ডোবা, আরেকটা সেই গভীরে একটা উর্ধ্বশক্তির সংস্পর্শ পাওয়া।

বলা বাহুল্য, এও চিৎপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম। এর নিদর্শন প্রাকৃত চেতনাতেও আছে। মনঃসংযোগ ছাড়া আমরা কোনও-কিছুর তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি না। এর মূলে রয়েছে চিত্তবৃত্তির পরাবর্তন (regression)। পরাবর্তন অবশ্য অব্যক্তের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু বোধ যদি তখন জাগ্রত থাকে, তাহলে তার ফলে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য আলোর রেখা ফুটে ওঠে। যোগচেতনার সমাধি আর প্রাকৃত চেতনার সুষুপ্তির মাঝে তফাত হচ্ছে এই সুস্পষ্ট বোধের ভাবে এবং অভাবে। নিত্যজাগ্রত বোধে পরাবৃত্তির বেগ এবং চিৎসত্ত্বের স্ফুরণের মাঝে একটা সমানুপাত অনুভব করা যায়। চেতনা যত গভীরে ডোবে, ভিতরের আলো ততই প্রভাস্বর হয়ে ওঠে। অবশেষে সত্তার মর্মগহনে জড় আর চিৎ অন্যোন্যসঙ্গমে সংহত হয়, দুয়ের মাঝে তখন আর ভেদ থাকে না। এ-অবস্থাকে বলা যেতে পারে পুরুষ-প্রকৃতির অপ্রাকৃত নিত্যসামরস্য। চিৎপ্রবৃত্তির প্রবর্তনা আসে এইখান থেকে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ একটা মহাশূন্য, কিন্তু এ-ই আবার সমস্ত শক্তি-পরিণামের আধার উৎস এবং নিয়ন্তা। বলেছি, শক্তির প্রকাশ হয় দমকে-দমকে; দুটি দমকের মাঝে এই শূন্যতার অবকাশ থাকে। এটি আচ্ছন্ন দৃষ্টির কাছে তমোময় অব্যক্ত, কিন্তু জাগ্রত-বোধে জ্যোতির্ময় অব্যক্ত। জন্ম হতে জন্মান্তরও শক্তিপরিণামের দুটি পর্ব এবং তাদের মাঝে স্বাভাবিক রীতিতেই এই অব্যক্তের অবকাশ দেখা দেয়। এর মধ্যে কতখানি আলো আর কতখানি ছায়া থাকবে, তা নির্ভর করে জীবসত্ত্বের মধ্যে অন্তরাবৃত্ত জাগ্রত-বোধের পুঁজি কতখানি তার 'পরে।

বাইরে যেমন দেখতে পাচ্ছি দিন আর রাতের কিংবা উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের আবর্তন, প্রাকৃত চেতনার জাগ্রৎ আর সুষুপ্তির আবর্তন, তেমনি মহাজীবনের অয়নেও আছে ইহলোক আর লোকান্তরের আবর্তন। এমনি করে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির যুগল ছন্দে শক্তিপরিণামের লীলা চলছে সর্বত্র। এ যেন মহাপ্রকৃতির হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ-প্রসারের ছন্দ। এই ছন্দের অনুবর্তন করতে গিয়ে জীবসত্ত্বের অখণ্ড জীবনায়নের একটা পর্ব কাটে ইহলোকে, আরেকটা পর্ব লোকান্তরে—আবার ইহলোকে, আবার লোকান্তরে। এ-আবর্তনের লক্ষ্য হচ্ছে চৈত্যসত্ত্বের পুষ্টি। দেহ নশ্বর, কিন্তু চৈত্যসত্ত্ব অবিনশ্বর।

একটা জীবনের পরিসরে দেহের জন্ম-বৃদ্ধি জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ; জরা-মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার একটা প্রয়াসও মানুষের চেতনায় ফুটতে দেখছি। এই প্রয়াসের সঙ্গে মানুষের চিৎপরিণামের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। চিৎসূর্য মাথার উপরে এসে আবার ঢলে পড়বে, এটা সে চায় না। জরা-মৃত্যুকে স্বীকার করার অর্থই হল জড়ের কাছে চেতনার পরাভবকে মেনে নেওয়া। মানুষের অন্তরাত্মা এ-ভাবনার বিদ্রোহী, সে অজর অমৃতত্বের পিপাসী। অথচ দেহের জরা-মৃত্যুকে আজও সে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। কিন্তু তার আশা আছে, জড়ত্বের মর্মে অন্ধতামিস্রের যে-কুণ্ডলী, তাকে যদি সে ভাঙ্‌তে পারে—তাহলে জড়ও সম্পূর্ণ চিদ্ধর্মী হবে, 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' হবে। কিন্তু তার জন্য চিৎশক্তির পুষ্টি চাই। জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে সেই পুষ্টির সাধনা চলছে। দেহ বারবার জরা-মৃত্যুর কবলিত হচ্ছে, তবুও তার এই অবক্ষয় অগ্রাহ্য করে চিৎসত্ত্ব কিন্তু অজরই থেকে যাচ্ছে। প্রাকৃত ভূমিতেও দেখতে পাই, দেহ জরাগ্রস্ত হলে যে প্রাণ-মনও জরাগ্রস্ত হবে, এমন-কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। অনেক মনস্বীর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণ-মনের তারুণ্য এবং ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন-কি যাঁরা অন্তর্মুখ এবং আত্ম-সচেতন, তাঁরা দেহের মৃত্যুকে ঠেকাতে না পারলেও অবশভাবে তার কবলিত হননি—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। অবশে জন্ম এবং অবশে মরণ, এই হল প্রাকৃত জীবনের রীতি। কিন্তু অবশে জন্ম হলেও স্ববশে মরণ, একে বলতে পারি জড়ের উপর চেতনার প্রথম বিজয়।

এইথেকে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়। প্রথমত, জরা-মৃত্যু জড়ের ধর্ম হলেও চেতনার ধর্ম নয়। দ্বিতীয়ত, তা-ই যদি হয়, তাহলে চেতনার অজর অমৃত ধর্ম জড়ে সংক্রামিত করা যাবে না কেন ? অর্থাৎ জড়কেও মার্জিত এবং প্রসন্ন করে অখণ্ড চিৎপ্রকাশের যোগ্য বাহন করা যাবে না কেন ? স্বীকার করি বা না করি, মানুষের সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার মূলে রয়েছে এই প্রয়াস। একে সার্থক করতে গেলে ধরতে হয় অন্তরাবৃত্তির পথ, চেতনার পরাবর্তনের পথ। ফলে আসে অপ্রাকৃত আত্মসচেতনতা। প্রাকৃত অনুভবে জড়কে মনে হয় নিরেট, আর আত্মচেতনাকে ঠেকে যেন ধোঁয়াটে। বস্তুর ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ আমার কাছে যতখানি বাস্তব, সংহত আত্মপ্রত্যক্ষ ততখানি নয়—যদিও আমা-কেই আমার সবচাইতে নিশ্চিত এবং অন্তরঙ্গভাবে জানবার কথা। কিন্তু আত্মপ্রত্যক্ষও নিবিড় হবে, এটা চিৎপরিণামের একটা আইন। একদিন

ধূমল আত্মচেতনা জ্যোতির্ঘন হবে, মরমীয়ার ভাষায় অনুভবের মূলে আবিষ্কৃত হবে একটা 'চিদ্‌ঘন' সত্তা। যে-ঘনত্বকে এখন জানি জড়ের ধর্ম বলে, তা ফুটবে বোধে, চেতনায়—এই হল অধ্যাত্মসিদ্ধির চরম।

এই চিদ্‌ঘনতার আকর্ষণ অন্তরাবৃত্ত চেতনাকে নিয়ে চলে অপরা প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের উজানে। এতে অনেকসময় তীব্রসংবেগের ফলে নীচের সঙ্গে উপরের যোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তাতে অমৃতত্বের অনুভবকে মনে হয় লোকোত্তর। ঊর্ধ্বলোকের অনুভবকে অবরলোকে নামিয়ে এনে ধরে রাখা সবসময় সহজ হয় না। তাই দেখি, নানাধরনের নেতিবাদ আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু অনুভবমাত্রই জীবনধর্মী; সুতরাং লোকোত্তর অনুভবের ইতির দিকও আছে—যার একটা প্রকাশ দেখি জীবন্মুক্তির সিদ্ধিতে। জীবন্মুক্তির সার্থকতা শুধু প্রারব্ধক্ষয়ে নয়—বস্তুত প্রকৃতির রূপান্তরসাধনায়, অর্থাৎ জড়কেও চিন্ময় করে তোলবার তপস্যায়। জীবন্মুক্তের মধ্যে যখন এই চেতনা জাগে, তখন তাঁর কাছে অমৃতত্বের আরেকটা অর্থ ভেসে ওঠে। অপরা প্রকৃতির উজান ঠেলে কূটস্থ আত্মায় অবগাহন করে অমৃতত্বের অনুভব—জীবের এই এক পুরুষার্থ তো আছেই, তাছাড়া আছে আত্মস্বরূপের অমৃতত্বকে পরা প্রকৃতিতে সিদ্ধ করে অপরা প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটানো। অমৃতত্বের তখন দেখা দেবে তিনটি বিভাব: প্রথমত কূটস্থ (essential) অমৃতত্ব, যার বিশিষ্ট পরিচয় নির্বাণমুক্তিতে; দ্বিতীয়ত চৈত্য (psychic) অমৃতত্ব, যা রয়েছে জীবের সংসারগতির মূলে; এবং সবশেষে দৈহ্য (physical) অমৃতত্ব, যা প্রকৃতিপরিণামের সুদূরতম লক্ষ্য।

এর মধ্যে কূটস্থ অমৃতত্বকে সব ধর্মে স্বীকার করা হয়েছে এবং একেই বলা হয়েছে পরমপুরুষার্থ। এর দুটি রূপ আছে—একটি জ্ঞানাশ্রয়ী, আরেকটি ভাবাশ্রয়ী। জ্ঞানের অমৃতত্ব নির্বিশেষ—পরমসত্তায় চিৎসত্ত্বের নির্বাপণ, নুনের পুতুলের সমুদ্রে গলে যাওয়া। কিন্তু ভাবের অমৃতত্বে নুনের পুতুল গলে যায় না, পাথর হয়ে যায়। অনেকে বলেন, এই দুটি সিদ্ধিকে লক্ষ্য করেই জীবের বারবার যাওয়া-আসা এবং তার মূলে রয়েছে তার চৈত্য অমৃতত্ব। কিন্তু দুটি মতেই পরমসিদ্ধি ইহলোকে নয়, লোকোত্তরে। জীব বারবার পৃথিবীতে আসে শুধু কর্মক্ষয় করবার জন্য; তাই জ্ঞান বা ভাব যা-ই সে আশ্রয় করুক না কেন, একবার লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সে এই পৃথিবীতে আসবে না।

এই প্রকল্পে (hypothesis) জীবের কর্মের একটা ঊর্ধ্বপরিণাম স্বীকার করা হলেও, পৃথিবীর শক্তিপরিণামকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে যান্ত্রিক আবর্তনের রূপ। ভবসংসার চাকার মত ঘুরছে, জীব তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এবং একসময় তাথেকে ছিটকে পড়ছে—এই হল এখানে বিশ্বলীলার ছবি। কিন্তু এতে ব্যষ্টি আর সমষ্টির মাঝে সাধর্ম্যের যোগ থাকছে না—এ-প্রকল্পের মারাত্মক ত্রুটি এই। যে-শক্তি জীবকে উত্তরায়ণের পথিক করেছে, সেই শক্তি বিশ্বকে করে রেখেছে একটা আবর্তনের যন্ত্র মাত্র—এতে কিন্তু বিশ্বব্যাপারের মর্মপরিচয় মেলে না। ব্রহ্ম যদি চিন্ময় হন, তাহলে তাঁর অংশ এবং বিসৃষ্টি যে জীব ও জগৎ তারাও চিন্ময় হবে এবং চিৎপরিণাম দুয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হবে—এই ভাবনাই যুক্তিযুক্ত।

জীবের চিৎপরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে জগতের চিৎপরিণামের সম্ভাব্যতাকেও যদি স্বীকার করে নিই, তাহলে চৈত্য অমৃতত্বের আরেকটা রূপ ফুটবে। কূটস্থ অমৃতত্ব সিদ্ধ করবার জন্য শক্তিপরিণামের যে দীর্ঘ কালব্যাপ্তি (duration) প্রয়োজন, তার অনুরোধে আমরা চৈত্য অমৃতত্বের সম্ভাবনা মেনে নিয়েছি ; অর্থাৎ 'অনেক জন্মের অন্তে জ্ঞানবান তাঁকে পেয়ে কৃতার্থ হবেন,' এইজন্যই বলছি জীবসত্ত্ব অমৃত। তাঁকে পেয়ে জীব তাঁতে লীন হয়ে যাবে—এই হল একটা পরমা গতি; অথবা তাঁর হয়ে তাঁর মধ্যে থাকবে—এই হল আরেকটা পরমা গতি। কিন্তু এর কোনটাতে তার এখানে ফিরে আসবার কথা নাই। অর্থাৎ চৈত্য অমৃতত্বের মূলে এখানে আমরা পাচ্ছি শুধু উত্তরণের প্রেরণা, অবতরণের তাগিদ নয়।

অথচ চিৎশক্তির অবতরণের কথাও অধ্যাত্মশাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র অনুভব থেকে গড়ে ওঠে। সাধক ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করেন শক্তিপাত বা প্রসাদ ; আবার সমষ্টির প্রয়োজনে যুগে-যুগে ঈশ্বরের অবতার হয়—একথাও স্বীকার করেন। অবতারবাদের ইশারা ধরে আরেকটু এগিয়ে গেলে আমরা পাই আধিকারিক-পুরুষবাদ। দেখছি, মুক্তপুরুষ নির্বাণ বা প্রেম-সেবোত্তরা গতি প্রত্যাখ্যান করে বলছেন, আমি আবার আসব, আমার কাজ শেষ হয়নি।

আধিকারিক পুরুষের এই ভাবনায় চৈত্য অমৃতত্বের আরেকটা দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে—উত্তরণের পরেও অবতরণের দিক। মোক্ষসাধনার সংস্কার প্রবল বলে আমরা সাধারণত এই অবতরণের তাৎপর্য মনে করি জগৎ-উদ্ধারের

অর্থাৎ আত্মমুক্তির পরেও বিশ্বমুক্তির তপস্যা। আগে পুরুষের মুক্তি, তারপর প্রকৃতির রূপান্তর—ব্যষ্টিজীবনে এই যদি হয় অধ্যাত্মসাধনার ক্রম, তাহলে সমষ্টিগতভাবেও এমনতর একটা ক্রম দেখা দেবে। সুতরাং অবতার বা আধিকারিক পুরুষ 'জগদুদ্দিধীর্ষুঃ' বা বিশ্বমুক্তির প্রয়োজক মাত্র, এই লোকাতত কল্পনা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু দৃষ্টি আরও গভীর হলে বুঝি, এখানেও মুক্তি রূপান্তরেরই ভূমিকা। সম্যক্-সম্বুদ্ধ নির্বাণের কূল হতে ফিরে এলেন বিশ্বজগৎকে সেইখানে নিয়ে যাবার জন্য—বোধিসত্ত্ববাদের এই ভাবনা বিশ্ব-যোগের উদ্যোগপর্ব মাত্র। তথাগত বারবার আসছেন এবং আসবেনও, চিৎকে জড়ের বন্ধন হতে মুক্ত করবার জন্যই নয়, জড়কে চিন্ময় করবার জন্যও।

এই দৃষ্টি পূর্ণযোগীর। এ-দৃষ্টিতে জন্মান্তর শুধু উত্তরণের পথে মুক্তির সাধন নয়, অবতরণের পথে রূপান্তরেরও সাধন। অবশ্য ঐশ্বর-যোগে মুক্তি আর রূপান্তর দুটি আলাদা পর্ব নয়, ঈশ্বরের বিশ্বচেতনায় দুইয়ের সংবেগ ওত-প্রোত হয়ে কাজ করছে। দৃষ্টির পূর্ণতার অভাবে সাধক দুটিকে আলাদা-আলাদা করে দেখতে পারেন, এমন-কি মুক্তির ঝোঁকে রূপান্তরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বর্জনবুদ্ধিও তাঁর আসতে পারে। তাঁর কাছে জন্ম দুঃখহেতু, অতএব জন্ম-নিরোধ বা অনাবৃত্তি একমাত্র পুরুষার্থ। মুমুক্ষুর এ-ভাবনা যে ভুল, তা নয়। কিন্তু এ হল বিশ্বযোগের আধখানা মাত্র। 'যেমন ভাব, তেমন লাভ।' বিনাশের দ্বারা মৃত্যুতরণ—এ হল অমৃতত্বের একদিক। কিন্তু সম্ভূতির দ্বারা তার সম্ভোগ, এই হল তার আরেকদিক। দুটিকে একসঙ্গে স্বীকার করে নিলে পর উজান-ভাটায় চৈত্য অমৃতত্বের পরিক্রমা পূর্ণ হয়। প্রবর্তসাধকের কাছেও জন্ম নেওয়াটা তখন দুঃখহেতু বা বিভীষিকা বলে ঠেকে না। চৈত্যসত্ত্বের পরিপূর্ণ স্ফুরণে অবশ জন্ম-মরণ ক্রমে সচেতন ও স্ববশ ব্যাপারে পরিণত হয়, আর চিন্ময়-পরিণামের দিগন্তে দেখা দেয় দৈহ্য অমৃতত্বের সম্ভাবনা।

এমনি করে ত্রিবিধ অমৃতত্বের পটভূমিকায় রেখে দেখলে জন্মান্তরের তত্ত্ব এবং তাৎপর্য পুরাপুরি বোঝা যায়। জীবের জন্মান্তর একটা বিশ্ববিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, বিশ্বের শক্তিপরিণামের তা অঙ্গ। চিৎশক্তির উন্মেষ এই পরিণামের লক্ষ্য। তার কাজ হচ্ছে দুটি ধারায়—উত্তরশক্তির আবেশে আর অবরশক্তির আকুতিতে। বৈদিক ঋষির ভাষায় এ যেন অগ্নি-সোমের লীলা; আগুনের শিখা উপরে উঠছে আর সোমের ধারা নীচে ঝরছে। এরই মাঝে-মাঝে আবার অব্যক্তের অবকাশ; চিৎশক্তি তার মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে

আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। শক্তিপরিণামের এই রীতিগুলি প্রাকৃত অনুভবেরও অগোচর নয়। সর্বত্র চিৎপ্রবৃত্তির এক ধারা। জীবনের প্রাত্যহিক আবর্তনে যা ঘটছে, জন্ম-জন্মান্তরেও তা-ই ঘটছে—শুধু এর ভিতর দিয়ে মন্থরে কাজ করে চলেছে উত্তরায়ণের একটা প্রবেগ। তার প্রশাসনে প্রাকৃত জীবনের বিচিত্র অনুভবে জীবের অন্তর্গূঢ় চৈত্যসত্ত্বের পুষ্টি হচ্ছে, তারপর আসছে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অব্যক্তের অবকাশ। দিনের পরে আসছে রাত, রাতের গভীরে ফুটছে ঊর্ধ্বলোকের স্বপ্ন। অলীক স্বপ্ন নয়: যা সম্ভাবিত, বিদ্যুতের ঝলকে তারই প্রকাশ—যেমন ফোটে এখানকার যোগ-নিদ্রায়। সবাই এক স্বপ্ন দেখে না, যার চৈত্যসত্ত্ব যেমন পরিণত সে তেমনি দেখে—পার্থিবলোকের কাছাকাছি নানা ছবি কিংবা আরও দূরের নানা মহা-ভূমির ভাবদ্যুতি। দেখে আবার সে এই পৃথিবীতে ফিরে আসে—শুধু পুণ্যক্ষয়ের ফলে নয়, ওটা হল দুঃখবাদের অনুসিদ্ধান্ত (corollary) ; ফিরে আসে বিশ্বযোগের নিমিত্তরূপে এখানে তার দায় আছে বলে, উত্তরলোকের স্বপ্নকে অবরলোকে রূপ দেবে বলে। এমনি করে বারবার তার যাওয়া-আসা। এ শুধু একই পথে যন্ত্রারূঢ়ের আবর্তন নয়। এর মধ্যে আছে চিৎপরিণামের নিগূঢ় একটা প্রবেগ, সবার সঙ্গে সবাইকে নিয়ে উত্তরায়ণের পথে নিঃশব্দ অভিযান। এর মধ্যে যদি কেউ বলে, 'না, আমি আর জাগতে চাই না, ওই স্বপ্নের পথ ধরে মহাশূন্যে আমি মিলিয়ে যাব', অধ্যক্ষ মুচকি হেসে তাকে ছুটি দিয়ে দেবেন। তার এই আত্মবিলোপ বিশ্বনিয়মের একটা ব্যতিক্রম মাত্র। হাজার-হাজার বছর ধরে এই ব্যতিক্রমকে আমরা নিয়ম বলে ভেবে এসেছি, তাতেই-বা ক্ষতি কি। এরও মূলে আছে চিৎশক্তির অভিনিবেশ, আতিশয্যের প্রতি মনুষ্যসুলভ ঝোঁক। কিন্তু উদারদৃষ্টিতে দেখতে গেলে তাও বৃহতের ঋতচ্ছন্দের অনুকূল। নক্ষত্রের নির্বাণ প্রভাস্বর আদিত্যের উদয়নের ভূমিকা মাত্র।

এইবার জন্মের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ বিচারে আসা যাক। জন্মান্তরবাদ আর কর্মবাদ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এসম্পর্কে দার্শনিক আর লোকাতত দুরকমের সিদ্ধান্ত আছে। দার্শনিক বলেন, জীবের জন্মান্তর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কর্মের দ্বারা। কর্মের তিনটি বিপাক বা পরিণাম—জাতি আয়ু এবং ভোগ।

জীবের কর্মের ফলে স্থির হয়, কোথায় সে জন্মাবে বা দেহধারণ করবে, সে-দেহ তার কতদিন থাকবে, এবং দেহকে আশ্রয় করে কি ভোগ তার হবে। এই ভোগের প্রসঙ্গে সাধারণ লোকের মনে কতকগুলি ধারণা আছে, যুক্তিতে যাদের সমর্থন মেলে না। এখন তাদের কথাই তুলছি।

কর্মবাদের মূল ভিত্তি হল কার্য-কারণবাদ। কারণ আর কার্যের মাঝে একটা অব্যভিচারী নিত্যসম্বন্ধ আছে—এই হল নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত। এই-থেকে পাচ্ছি বিশ্বব্যাপারে নানা নিয়মতন্ত্র। জড়ের বেলায় নিয়মগুলির কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে যা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়, অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয় যে তা বৃহত্তর কোনও নিয়মের অন্তর্গত। প্রাণ এবং মনের ক্ষেত্রেও এমনতর কতকগুলি নিয়মের শাসন আছে, যদিও জড়ের মত যান্ত্রিক অনতিবর্তনীয়তা সেখানে নাই। বাইরের শক্তির অভিঘাতে জড়ের গতি বা প্রকৃতির কি পরিবর্তন হবে, বৈজ্ঞানিক তা গুনে বলে দিতে পারেন। কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রে জীবের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন এমন নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা চলে না—যদিও মোটামুটি তার ধারাটা আন্দাজ করা যায়। জড়ের শক্তি ছাড়াও জীবের মধ্যে আরেকটা শক্তি কাজ করছে—সে হল চিৎশক্তি। তার চালচলন একটু স্বতন্ত্র। তিনটি ব্যাপারে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়—সংবিতে ভোগে এবং ইচ্ছায়। এর মধ্যে সংবিতের ক্রিয়া স্ব-নিষ্ঠ এবং উদাসীন। কিন্তু ভোগ এবং ইচ্ছার ক্রিয়ায় বাইরের সঙ্গে একটা যোগা-যোগ এবং তোলাপাড়ার ব্যাপার আছে। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে।

ধরা যাক, ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ছে। একটা ঢিল এসে আমার ঘরের কাচের শাসিতে লেগে সেটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল; আরেকটা ঢিল আমার কপালে লেগে কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। এখানে কাচের শাসি এবং আমার দেহ দুটাকে যদি জড়পিণ্ড বলে গণ্য করি, তাহলে দুয়ের মাঝে প্রতিক্রিয়ার বিচারে ইতরবিশেষ করবার কিছু প্রয়োজন হবে না, কাচের এবং দেহের প্রতিরোধশক্তি দিয়েই অভিঘাতের পরিমাণ করা যাবে। কিন্তু ঢিলটা কপালে লেগে শুধু রক্ত ঝরায়নি, আমার মধ্যে আরেকটা ক্রিয়ার ধারা সৃষ্টি করেছে যাকে জড়ের আইন দিয়ে মাপা যায় না। প্রথমত অভিঘাত সম্বন্ধে আমার মধ্যে একটা বোধ জন্মেছে—এটা হল সংবিতের ক্রিয়া; তারপর সে-বোধ বেদনার অনুভবে রঞ্জিত হয়েছে—এটা হল ভোগের ক্রিয়া; তারপর অভি-

ঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আমি যদি হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরি কি ছেলেদের তাড়া করি, তাহলে সেটা হবে ইচ্ছার ক্রিয়া। কপালে ঢিল লাগা থেকে ছেলেদের তাড়া করা পর্যন্ত আমাকে আশ্রয় করে সমস্তটা ব্যাপার কর্মের অন্তর্গত। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্র এখানে দুটি ভাগে বিভক্ত—একটা জড়ের ক্ষেত্র, আরেকটা চেতনার ক্ষেত্র। চেতনার ক্ষেত্রে কর্মের যে-ব্যাপ্রিয়া (functioning), তার মধ্যে সাধারণত ভোগের ক্রিয়াকে আমরা মুখ্য বলে ধরি। এর মধ্যে যেটুকু উদাসীন সংবিতের ক্রিয়া ব্যাপারটার আগাগোড়া অনুস্যূত হয়ে রয়েছে, তাকে বড়-একটা আমল দিই না। বেদনার (feeling) দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ইচ্ছার ক্রিয়াকে বাইরের দিকে প্রবর্তিত করি—এটা আমাদের একটা অভ্যাস।

অভ্যস্ত বেদনার প্রকৃতি ও পরিণাম দিয়ে আমরা সাধারণত জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতার হিসাব করি। দর্শনে অনুকূল বেদনাকে বলে সুখ, প্রতিকূল বেদনাকে বলে দুঃখ। এই সুখ-দুঃখের সঙ্গে প্রাকৃত চেতনার তীব্রতার একটা অনুপাত আছে ; তাই তারই পরিমাণ দিয়ে আমরা জীবনের দাম কষি। স্বভাবতই সুখ আমাদের কাছে উপাদেয়, দুঃখ হেয়। তবুও অনেকসময় আমরা সুখ চাইলেও পাই না, আবার না চাইতেই দুঃখের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ে। এই বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃষ্টের চাইতে অদৃষ্টের উপর আমরা জোর দিই বেশী। অদৃষ্ট আমাদের শাস্তা। আমরা বিশ্বাস করি, তার শাসন ন্যায়ের শাসন। যেমন কাজ করব তেমনি ফল পাব, এ-প্রত্যাশা ন্যায়সঙ্গত। পুণ্যের ফল সুখ, আর পাপের ফল দুঃখ—আমাদের সহজবুদ্ধি এই বলে। কিন্তু সে সুখ-দুঃখ অন্তরাশ্রয়ী না বহিরাশ্রয়ী, তা তলিয়ে বুঝতে চায় না। কাজেই প্রাণবাসনার আশ্রিত বেদনাবোধের সঙ্গে পাপ-পুণ্যকে সে জড়িয়ে ফেলে। তাই সে সিদ্ধান্ত করে, আমাদের যত-কিছু লৌকিক সুখ তা পুণ্যের ফল, তেমনি যত-কিছু লৌকিক দুঃখ তা পাপের ফল। পাপ-পুণ্য যেখানে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে মনে করি তা অদৃষ্ট বা জন্মান্তরীণ।

ছোটখাটো ব্যাপারে এ-নিয়ম আমরা তত খাটাই না। কিন্তু কর্মফলের বিচার করতে গিয়ে কার্য-কারণের গুরুতর অসঙ্গতি যেখানে দেখতে পাই, সেখানেই এই নিয়ম দিয়ে অসঙ্গতির ব্যাখ্যা খুঁজি। ঢিল লেগে কপালটা কেটে গেল, এটা সামান্য ঘটনা। এর ব্যাখ্যার জন্য পাপ-পুণ্যের তলব আমরা

সাধারণত করি না। কিন্তু কপাল না কেটে চোখটা যদি নষ্ট হয়ে যেত, তাহলেই ভাবতে বসতাম, কোন্ পাপের ফলে অদৃষ্টের এই শাস্তি। প্রাকৃতমন হয়তো এক্ষেত্রে এমনও কল্পনা করত, আর-জন্মে আমার ঢিল লেগে একটা কুকুরের চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল, তাই এ-জন্মে এই চোখটা গেল!

কর্মবাদের এমনতর ব্যাখ্যার প্রধান ত্রুটি এই, এতে বিশ্বব্যাপার একটা যান্ত্রিক বিধানে পরিণত হয়। যন্ত্রাচার জড়ের ধর্ম। কিন্তু আমার কর্ম শুধু জড়কে নিয়ে নয়, চৈতন্যকেও নিয়ে। চৈতন্য ঠিক যন্ত্রধর্মী নয়, যেমন করেই হ'ক তার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যের নিশানা পাওয়া যায়। জড়ের জগতে আমরা দেখি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাম্য—ব্যাপারটা পরিমাণগত (quantitative)। এই পরিমাণগত সাম্যের নিয়মকে চৈতন্যের বেলাতেও আরোপ করে আমরা উপরি-উক্ত অদৃষ্ট ন্যায়ের বিধান কল্পনা করি। কিন্তু চৈতন্যের সংস্পর্শে এসে জড়ক্রিয়ার পরিমাণগত ধর্ম রূপান্তরিত হয় গুণগত (qualitative) ধর্মে এবং সঙ্গে-সঙ্গে আসে উৎকর্ষের বিচার ইষ্টার্থের বোধ। এর মধ্যে আছে ঊর্ধ্বায়নের একটা প্রবেগ, যাকে জড়ের আইনের সঙ্গে মেলানো যায় না। প্রতিরোধে শক্তির বেগ স্তিমিত না হয়ে যদি আরও প্রবল হয় এবং তাতে গুণগত উৎকর্ষ দেখা দেয়, তাহলে ব্যাপারটা হবে জড়ক্রিয়ার বিপরীত। অথচ এইটি চৈতন্যের বিশিষ্ট ক্রিয়া, যার পরিচয় আমরা পাই প্রাকৃত চিত্তের তিতিক্ষায়, যোগিচিত্তের প্রত্যাহারে। প্রতিকূল বেদনার প্রবলতায় চিত্ত স্তিমিত আচ্ছন্ন এবং অবশেষে অসাড় হয়ে পড়ল—এখানে দেখি চিৎশক্তির ক্রিয়া জড়ক্রিয়ার অনুরূপ। কিন্তু আঘাতে চিত্ত যদি আরও সজাগ হয়ে ওঠে, তখন সে কিন্তু চলে জড়ধর্মের বিপরীতে।

এই সূত্র ধরে যদি কর্মফলের বিচার করি, তাহলে তার মধ্যে দেখতে পাই তিনটা ভাগ। প্রথম ভাগে পড়ে জড়রাজ্যের যান্ত্রিক ব্যাপার: ঢিল লেগে শাসি ভাঙ্ল আর কপাল ভাঙ্ল, দুয়ের মাঝে ভৌতিক ঘটনা হিসাবে তফাত কিছুই নাই। কিন্তু কর্মপরিণামের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় বোধে, বর্তমান প্রসঙ্গে সেটাই হল আসল কথা। এই বোধের একটা অংশ—বেদনাবোধ এবং তার প্রতিক্রিয়া—অনেকটা অভ্যাসগত এবং যান্ত্রিক। এই হল কর্মপরিণামের দ্বিতীয় ভাগ। এখানেও কার্য-কারণসম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা জড়ের আইন খাটাই। জড়ের জগতে যেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাঝে পরিমাণ-গত একটা সাম্য আছে, এখানেও তেমনি একটা-কিছু আছে—এই আমাদের

ধারণা। জড়প্রকৃতিতে যেমন আছে সাম্যের বিধান, চিৎপ্রকৃতিতেও তেমনি আছে ন্যায়ের বিধান—চোখের বদলে চোখ নিয়ে এক অদৃষ্টশক্তি যেখানে নিক্তির ওজনে কর্মফল বেঁটে দিচ্ছে। পুণ্য-পাপের সঙ্গে স্বর্গ-নরক আর সুখ-দুঃখের যে হৈতুক (causal) সম্পর্ক, তা এই ন্যায়ের বিধানের অনুগত।

কর্মবাদের এই প্রাকৃত কল্পনার আরও-একটা মারাত্মক ত্রুটি, এতে পুরুষের নিগূঢ় ঈক্ষা (vision and will) ও স্বাতন্ত্র্যের কোনও ইঙ্গিত নাই। সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, কর্ম প্রকৃতিতন্ত্রিত হলেও আসলে পুরুষই তার প্রযোজক (initiative agent)। প্রত্যেক জীবে এই পুরুষ অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত। তত্ত্বত প্রকৃতি তাঁরই আত্মপ্রকৃতি এবং তাঁর কর্ম দিব্য কর্ম। জীবের প্রাকৃত কর্মের গভীরে রয়েছে এই দিব্য কর্মের প্রেষণা। সে-কর্মের লক্ষ্য জড়ের মধ্যে চিৎশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষ। তার সার্থক সূচনা দেখা দেয় জীবের মধ্যে আত্মচেতনার বিকাশে। আত্মচেতনা অন্তরাবৃত্ত অথচ স্ফুরন্ত (dynamic)। তার স্ফুরত্তা আগুনের মত আত্মশক্তির সকল বাধা নির্জিত এবং আত্মসাৎ ক'রে নিজের মহিমাকে প্রকটিত এবং প্রতিষ্ঠিত করে। এইখানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিধান আর জড়ধর্মের অনুগামী হয় না। বাইরের বাধা অন্তশ্চেতনাকে তখন আরও উৎশিখ করে তোলে এবং চিৎশক্তির উপচীয়মান প্রবেগ (acceleration) জড়ের মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে আপনিই আপনার পথ রচনা করে চলে। কর্মপরিণামের এই হল তৃতীয় ভাগ। একে স্বীকার করলে কর্মবাদ সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার সম্পূর্ণ এবং সুসঙ্গত হয়।

মোটামুটি বলা যেতে পারে, জীবের বেলায় প্রত্যেক ক্রিয়া তিনটি করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে : একটি জড়ের ভূমিতে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, আরেকটি অপ্রবুদ্ধ প্রাণচেতনার ভূমিতে অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া যার মধ্যে বোধ থাকলেও তার ব্যাপ্রিয়া হয় যন্ত্রবৎ ; তারও পরে প্রবুদ্ধ অন্তশ্চেতনার ক্রিয়া। লোকাতত কর্মবাদ এই তৃতীয়টিকে আমল দেয় না বলে তার দর্শনে নানা অস্পষ্টতা এবং অসঙ্গতি দেখা দেয়। ঢিল লাগার উদাহরণটা নিয়েই বলতে পারি, ওতে আমার একটা চোখ যদি যায়, তাহলে ব্যাবহারিক জগতে আমার যে-ক্ষতি, তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে আমরা যেসব প্রকল্পের আশ্রয় নিই তাদের প্রমাণ করা শক্ত। সূক্ষ্মজগতের ন্যায়ের বিধান সম্পর্কে কেউ ওয়াকিফহাল নই, অথচ তা নিয়ে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে আমাদের বাধে না। কিন্তু একটা

চোখ যাওয়ার ক্ষতিকেও যদি বীরের মত বুক পেতে নিতে পারি, তাহলে যে অপরাজিতা চিৎশক্তির পরিচয় আমি দেব, তাতে কর্মপরিণামের ধারাটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। বলতে পারি, এই পরিবর্তনই আমার অন্তর্যামীর উদ্দিষ্ট। সুখে বিহ্বল হই কিংবা দুঃখে মুষড়ে পড়ি, এর কোনটাই তিনি চান না। আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তিনি চান চিদ্‌বীর্যের প্রকাশ। সমস্ত কর্মপরিণামের এই হল মুখ্য তাৎপর্য, প্রাকৃত সুখ-দুখের নিরিখে তার হিসাব কষাটা অবান্তর। 'সবই কর্মের ফল' একথা মানতে আপত্তি নাই, যদি ফলটা বাইরে না দেখে দেখি অন্তরে—যেখানে আমি স্বরাট্, আমার প্রবুদ্ধ চৈত্যসত্তা যেখানে সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিঘাতে জীবনবীণায় এক অনির্বাণ দীপকরাগের আলাপ করে চলেছে। তখনই কর্মকে অনুভব করি পুরুষের স্ব-তন্ত্র ইচ্ছার প্রকাশ-রূপে, অবশ নিয়মতন্ত্ররূপেই নয়।

চিৎশক্তির স্ফুরণ সমস্ত কর্মের লক্ষ্য—কর্মবাদ সম্পর্কে এই দৃষ্টি তাহলে সমীচীন। এই দৃষ্টি নিয়ে যদি বলি পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ, তাহলেও কথাটা অসঙ্গত হয় না; কিন্তু সুখ ও দুঃখের তাৎপর্য তখন বদলে যায়। সুখ বলতে তখন আর বস্তুনির্ভর ইন্দ্রিয়সুখ বুঝি না, বুঝি আত্মার প্রসন্নতা; তেমনি দুঃখও তখন আর বাইরের দুঃখ নয়, অন্তরের অরতি (discontent)। এই অরতির বোধ মূঢ় চেতনায় জাগে না, জাগে মানুষের চিত্ত সাবালক হলে। তাই বিবেকী বলেন, বর্ণরতিপ্রমোদ যে সত্যি আমাদের কাম্য হতে পারে না, আপাতসুখকর হলেও ও যে সত্যি দুঃখের কারণ, অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত চিত্ত কিন্তু তা বুঝতে পারে না। বস্তুত সুখ-দুঃখের যেমন একটা লৌকিক নিরিখ আছে, তেমনি অলৌকিক নিরিখও আছে। কর্মবাদের মূল তাৎপর্য বুঝে সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করতে হবে সেই অলৌকিক মান দিয়ে। পাপ-পুণ্যের সঙ্গে স্থূল সুখ-দুঃখের মোটামুটি একটা যোগাযোগ প্রকৃতিলীলার কোনও-একটা স্তরে থাকতেও পারে। কিন্তু তাবলে দণ্ড-পুরস্কারের বিধানই প্রকৃতিলীলার মর্মকথা নয়, তার আসল তাৎপর্য জীবের চৈত্যসত্ত্বের স্ফুরণে। জীবাত্মা জন্মান্তর স্বীকার করে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই নয়; জন্মান্তর তার অধ্যাত্মপ্রগতি-সাধনারও উপায়, তার সুখ-দুঃখ সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সমস্তই আত্মোন্মীলনের সাধনার অঙ্গ।

জন্মান্তরসম্পর্কে প্রাকৃত চিত্তের আরেকটা অপসিদ্ধান্ত আছে অহংকে আশ্রয় ক'রে। এই বর্তমানের অহংকে আমরা আমাদের স্বরূপ এবং সর্বস্ব বলে মনে করি। লোকান্তরে বা জন্মান্তরে হুবহু এই অহংএর আবর্তন ঘটে, এমনতর একটা সংস্কার আমাদের আছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এ-ধারণা ভুল। আমার চিৎসত্তা যদি প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিণাম হত, তাহলে আমার অহংএর চেহারা একই থেকে যেত; কেননা যন্ত্রাচারের মধ্যে প্রগতির কোনও নিশানা থাকে না, থাকে শুধু গতানুগতিকতা। কিন্তু বস্তুত অহং আমার আত্মোন্মীলনের একটা সাধনা এবং বর্তমানের জন্ম ও পরিবেশের প্রয়োজনে সৃষ্ট চিৎশক্তির একটা বিশেষ বিভূতি। জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে যেমন স্থূল দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি সূক্ষ্ম দেহেরও হচ্ছে। দেহের চাইতে প্রাণ ও মনের পরিবর্তন মন্থর, কিন্তু তাবলে তারা অপরিবর্তনীয় নয়। আমার অহংও তাদের আশ্রিত, সুতরাং প্রতি জন্মে তারও পরিবর্তন হচ্ছে। অতৃপ্ত বাসনার প্ররোচনায় আমরা আমাদের অহংটা আঁকড়ে থাকতে চাই—এবারে যা পেলাম না, আরেকবার এসে তা-ই পাব বলে হুবহু এই আমিটাকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনতে চাই। কিন্তু এ আমাদের একটা ছেলেমানুষী আবদার মাত্র। আমাদের সত্তার গভীরে যে-বাসনা, তার মূলে কাজ করছে চৈত্যসত্ত্বের প্রেরণা। আত্মোন্মীলন হল তার লক্ষ্য। বহিশ্চর প্রাণের বাসনা তার একটা অশাশ্বত বিক্ষেপ মাত্র। এই সাময়িক বিক্ষেপের প্ররোচনায় গড়া অহংও আত্মসত্তার একটা উপরভাসা প্রতিক্ষেপ শুধু। সুতরাং আত্মপ্রকৃতির পরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে তারও পরিণাম ঘটে। তাই জন্ম-জন্মান্তরে একই অহং বারবার ফিরে আসে না কিংবা লৌকিক সম্বন্ধের একই ছকের আবৃত্তি চলে না—যদিও এক শাশ্বত চৈত্যসত্ত্বের যে পুনরাবর্তন ঘটে, একথা কিন্তু সত্য।

জন্মান্তরের প্রসঙ্গে জাতিস্মরতার কথা ওঠে। যাঁরা জন্মান্তর মানেন না, তাঁরা আপত্তি তোলেন: পূর্বজন্ম যদি সত্য হবে, তাহলে এ-জন্মে তার কথা স্মরণে থাকে না কেন? জবাবে বলা যায়, এ-জন্মেই কি সব কথা কারও স্মরণে থাকে? অতিশৈশবের কথা কি আমরা মনে করে রাখি? তাছাড়া ঘটনার স্মৃতিই তো একমাত্র স্মৃতি নয়। চিত্তের স্মৃতি যেমন আছে, তেমনি আমাদের আছে চৈত্যসত্ত্বেরও স্মৃতি। চিত্তের স্মৃতি একটা জন্মের অহং নিয়ে একটা জীবনকালের বেষ্টনীর মধ্যে কাজ করছে—তাও তার আদি আর

অন্ত দুইই ঝাপসা। কিন্তু চৈত্যস্মৃতির কারবার হল জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে—আত্মস্মৃতির ধ্রুববিন্দু হল তার প্রবর্তক। অন্তর্মুখ চিত্ত যখন বুদ্ধির উজানে বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার অহংগত (egoistic অবিদ্যার বাঁধন খসে পড়ে, তখন এই চৈত্যস্মৃতি জাগতে পারে এবং জাগেও। এই স্মৃতিই জন্মান্তরের একটা সাক্ষাৎ প্রমাণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তার কারবার মুখ্যত ভাবধারা নিয়ে, ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নয়। প্রাকৃত স্মৃতি বহির্মুখ চিত্তের ধর্ম বলে ঘটনার উজ্জীবন তার প্রধান ব্যাপার। কিন্তু তারও মধ্যে দেখি বাছাই-ছাঁটাই চলছে, নির্বিচারে সব ঘটনা স্মৃতির পরদায় ভেসে উঠছে না—এমন-কি উজ্জীবিত ঘটনার সব খুঁটিনাটিও না। স্মৃতি অহং-পুষ্টির সাধন বলে এখানেও সে মূলত ভাবাশ্রয়ী। চৈত্যস্মৃতিতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে, যদিও তার কাছে ভাব মুখ্য এবং ঘটনা গৌণ। উপনিষদে চৈত্যসত্ত্বকে ভূত-ভব্যের ঈশান বলা হয়েছে। এই উক্তিটির তাৎপর্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, চৈত্যস্মৃতিতে ঘটনার চাইতে ভাব বড় কেন। চৈত্যসত্ত্ব ঈশান(Master) বলে ভাব ঘটনার প্রয়োজক, চৈত্যপুরুষ প্রাকৃত কর্মের স্ব-তন্ত্র কর্তা এবং তাঁর স্বাতন্ত্র্যে চিৎপুরুষের সত্যসঙ্কল্পের স্ফুরণ। চৈত্যস্মৃতি চিৎপুরুষের ধ্রুবস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। তাই স্মৃতি এবং কল্পনার ভেদ সেখানে নাই, অতীত ও ভবিষ্যৎ সেখানে এক নিত্যকর্মের বিন্দুতে সংহত—এও তার বৈশিষ্ট্য।

এই স্মৃতি আমাদের সত্তার গভীরে নিত্যজাগ্রত হয়ে আছে, আর তার নির্বাচনী শক্তির প্রভাবে প্রাকৃত চিত্তের চারদিকে একটা সীমার বেষ্টনী দেখা দিয়েছে। তাইতে অতীত আর ভবিষ্যৎ দুইই রয়েছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। এই অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে অতীত আমাদের কাছে আসছে সংস্কাররূপে এবং ভবিষ্যৎ আসছে প্রাতিভসংবিতের উদ্দীপনারূপে। মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণের মত বিশ্বশক্তির অভিঘাত থেকে প্রাকৃত সত্তাকে নিরাপদে রেখে পুষ্ট করাই হল এখানে মহাপ্রকৃতির উদ্দেশ্য। তাই অতীতজন্মের ঘটনার স্মৃতি দিয়ে প্রাকৃত চিত্তকে তিনি ভারাক্রান্ত করছেন না, অথচ ভাবের যোগান দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে অনুবৃত্তি রেখে চলেছেন। যবনিকার আড়ালে কি আছে, প্রাকৃত চিত্ত তা জানতে পারে না, জানবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু তাবলে যোগিচিত্তের কাছে অদৃষ্ট একেবারে অদৃষ্ট নয়।

চৈত্যস্মৃতি যেমন সাক্ষাৎভাবে জন্মান্তরের প্রমাপক, তেমনি তাথেকে আমাদের অমরত্বের বোধও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অহংগত অবিদ্যার সঙ্গে-সঙ্গে কালগত অবিদ্যার বাঁধনও যদি খসে পড়ে, তাহলে বুঝতে পারি আমরা অমর কেন। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে; কিন্তু আমরা তো শুধু দেহ নই। দেহকে আশ্রয় করে আমাদের মধ্যে ঘটছে আত্মার প্রকাশ। এই আত্মার পরিচয় শুধু প্রাণবৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তির চাঞ্চল্যে নয়, তাদেরও ঊর্ধ্বে 'সত্বের' বা 'বিজ্ঞানের' স্থিরদীপ্তিতে। আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের বোধ এবং সংস্কার পাকা না হলে মানুষ সাবালক হয় না এবং আত্মা ঈশ্বর ও অমরত্ব সম্পর্কে তার ভাবনার কোনও নিশ্চিত ভিত্তি গড়ে ওঠে না। বিশ্বচেতনা এবং ব্যক্তিচেতনার মাঝে যে-অন্যোন্যসম্বন্ধ, বিজ্ঞানে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা'—এই হয় বিজ্ঞানীর অকুণ্ঠ প্রত্যয়। যে-আত্মভাবের সূত্রে বিশ্ব আর আমি বাঁধা পড়ি, তা যুগপৎ সামান্য এবং বিশেষের আশ্রয়। সাধারণত বিশ্বভাবনায় আমরা পাই সামান্যের জ্ঞান আর আত্মভাবনায় পাই বিশেষের জ্ঞান। প্রাকৃত চিত্তে সামান্যে আর বিশেষে একটা বিরোধ আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কাছে বিশেষ মূর্ত (concrete), সামান্য অমূর্ত (abstract)। ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং ভাব অত্যন্ত কাছাকাছি থেকেও প্রাকৃত চিত্তে কখনও মিলে যেতে পারে না। ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং তার আশ্রিত বিশেষের প্রত্যয় চিত্তের উজানে সামান্যভাবনার অস্পষ্টতায় হারিয়ে যায়—এই আমরা অনুভব করি; অমূর্ত ভাবের মূর্ত হওয়ার ধারা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল নই। মরমীয়ারা তার কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁদের অনুভবও অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্-বৃত্তের (subjective) কোঠাতেই থেকে যায়। অথচ প্রশ্ন জাগে, মূর্তের অমূর্তে মিলিয়ে যাওয়া যদি সত্য হয়, তাহলে তারই পরিপূরক হিসাবে অমূর্তের মূর্ত হওয়ার ধারাও সত্য হবে না কেন? অধ্যাত্মবাদীদের যাঁরা অবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা এইদিকের কথাটা ভেবেছেন—যদিও অবতার সম্পর্কে লৌকিক বুদ্ধির ধারণা অত্যন্ত ঘোলাটে। বিশেষের সামান্যে লয় যদি হয় উত্তার (যার আরেক নাম মোক্ষ), তাহলে সামান্যের বিশেষে মূর্ত হওয়া হবে অবতার। বিশ্বপ্রকৃতির গতির ছন্দে এই দুয়েরই দোলা আছে—পর্যায়ক্রমে নয়, যুগপৎ। এর অনুভব হয় বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান মনোজগতের অনেক দ্বৈতসম্পর্কের নিরসন করে—একত্ব-বহুত্ব, সগুণ-নির্গুণ, সামান্য-বিশেষ, সম্ভূতি-অসম্ভূতি, উত্তার-অবতার ইত্যাদি বিরোধের সমাধান করে এক অখণ্ড প্রত্যয়ের বর্তুলতায়। এই প্রত্যয়ে

সামান্যাকারা বিশ্বশক্তি এবং বিশেষাকারা জীবশক্তির মাঝে চিন্ময় আনন্ত্যের ভূমিতে সমন্বয় সম্ভব হয়। আত্মার অমরত্বকে তখন শুধু নির্বিশেষ পৌরুষেয় স্থিতি বলে জানি না, তাকে প্রাকৃত চিন্ময় রূপান্তরের প্রবর্তক বলেও অনুভব করি। বিশ্বাকারা সামান্যবৃত্তি হয় এই অনুভবের ক্ষেত্র। অক্ষরের কালাতীত অমরত্বের মাঝে রয়েছে যে চৈত্যসত্ত্বের শাশ্বত অমরত্বের বিভূতি, তখন দেখি রূপান্তরের চরমপর্বে দৈহ্য অমরত্বের দিকে তার ইশারা। অনেক দূরের স্বপ্ন, কিন্তু তাবলে অযৌক্তিক বা অসম্ভবও নয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মানুষ ও প্রকৃতিপরিণাম

তাহলে জীবচেতনার ক্রমিক উন্মেষই হল জন্মান্তরবাদের গোড়ার কথা চেতনার দিক থেকে এই ক্রমিক উন্মেষকে বলতে পারি প্রকৃতির ঊর্ধ্ব-পরিণাম বা চিন্ময়-পরিণাম।

প্রকৃতিপরিণাম (Evolution in Nature) বর্তমান যুগের একটি সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। ছোট্ট একটি বীজ হতে ক্রমে বিকশিত হয় বিরাট এক বনস্পতি,এককোষ ভ্রূণ হতে পূর্ণাবয়ব একটি জাতক—এই হল আকৃতির (form) দিক দিয়ে পরিণামের ধারা। জীববিদ্‌ বলেন, অণুপ্রমাণ হতে পূর্ণাবয়বে পৌঁছতে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তার অতীত জাতি-পরিণামের সমগ্র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মাতৃগর্ভে মানবশিশু কোটি-কোটি বছরের পরিণামের ধারা নাকি ন'মাসের মধ্যেই অতিবাহন করে। পরিণামের প্রবেগ এতেই শেষ হয় না। অলক্ষ্যে আকৃতিপরিণাম ঘটতে-ঘটতে দশ লক্ষ বৎসরে একটা নতুন প্রজাতির (species) উদ্ভব হওয়া সম্ভব, এই হল বৈজ্ঞানিকের অনুমান।

আবার বাইরের এই আকৃতিপরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটা পরিণাম চলতে থাকে—চেতনার বা অন্তঃপ্রকৃতির। জীবজগতে এই পরিণামের ধারা সুস্পষ্ট। মোটের উপর চিন্ময়-পরিণামের তিনটি ধাপ আমরা দেখতে পাই—উদ্ভিদের মোহাচ্ছন্ন চেতনায়, পশুর অস্পষ্ট চেতনায় এবং মানুষের বিস্পষ্ট চেতনায়। চেতনার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে আকৃতিপরিণামের বেগ হয় অন্তর্মুখ, জীবদেহের নাড়ীতন্ত্রে (nervous system) বিশেষত মস্তিষ্ককোষের সংস্থানে দেখা দেয় নানা জটিলতা। এই জটিলতা চরমে পৌঁছেছে মানুষের মধ্যে। তাইতে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব—নিছক জান্তব ব্যবহারের দিক দিয়ে নয়, বুদ্ধির দিক দিয়ে। আবার মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধির উন্মেষের যতি পড়েছে, একথা বলা চলে না। বরং মনে হয়, বর্তমান যুগ তার বৌদ্ধিক জীবনের উষাকাল মাত্র।

এই হতে পরিণামবাদের একটা রূপরেখা আঁকা যেতে পারে। পরিণামবাদ প্রথমে ছিল জীববিদ্যার একটা তত্ত্ব। কিন্তু ক্রমে তার গণ্ডির প্রসার ঘটেছে নীচে-উপরে দুই দিকেই। জড় প্রাণ আর মন—এই নিয়ে আমাদের প্রাকৃত জগৎ। এই তিনটি জগতেই পরিণামের লীলা অব্যাহতভাবে চলছে; সুতরাং সাংখ্যের ভাষায় স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, প্রকৃতি নিত্য-পরিণামিনী। কিন্তু আধারভেদে পরিণামের বেগের তারতম্য আছে। জড়ে পরিণামশক্তির ক্রিয়া মন্থর, প্রাণে ক্ষিপ্র, চেতনায় ক্ষিপ্রতর। অর্থাৎ মাধ্যমের ক্রমসূক্ষ্মতার সঙ্গে-সঙ্গে পরিণামের বেগে দেখা দেয় একটা ত্বরণ (acceleration)। এই পৃথিবীর পরিণামের ইতিহাসই গোড়া হতে আলোচনা করলে দেখতে পাব, এর মধ্যে জড়পরিণামের ঊষর যুগের তুলনায় প্রাণের উন্মেষ সেদিনকার কথা, আর বুদ্ধির উন্মেষ বলতে গেলে ঘটেছে কয়েক মুহূর্ত আগে যেন।

আধারভেদে পরিণামের ক্রিয়ায় যেমন বেগের তারতম্য ঘটে, তেমনি ঘটে ব্যাপ্তিরও তারতম্য। আবার এই পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর সমগ্র আয়তনের একটা বিপুল ভাগ জড়পরিণামের অধীন। তার আট হাজার মাইল ব্যাসের কয়েক ফুট আস্তরণ মাত্র জীবজন্মের উপযোগী (সমুদ্রকে হিসাবের মধ্যে ধরলে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় কয়েক হাজার ফুট)। সুতরাং পৃথিবীর জড়পিণ্ডের আয়তনের তুলনায় তার জীবপিণ্ডের আয়তন অতি সামান্য। সেই জীবপিণ্ডের যতটুকু দিয়ে বুদ্ধিযুক্ত মানুষের দেহপিণ্ড তৈরী হচ্ছে, তার আয়তন কত কম। এই বুদ্ধিপিণ্ডের আয়তন কতখানি বাড়ানো নিরাপদ, তা নিয়ে এখনই অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে বিতর্ক এবং দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।

অথচ এই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিপিণ্ড চিন্ময়-পরিণামের ক্ষিপ্রসংবেগে আজ পৃথিবীর ঈশ্বর। এথেকে এই কথাই স্পষ্ট হয়, পরিণামশক্তির উৎকর্ষণের পরিমাপ কাল বা দেশের ব্যাপ্তি দিয়ে হয় না। দেশ এবং কালের অনেকখানি জুড়ে আছে জড়; কিন্তু এই ব্যাপ্তিই তার উৎকর্ষের প্রমাপক নয়। এককণা চৈতন্য যদি জড়ের বিপুল আয়তনকে পরিচালিত করতে পারে, তাহলে উৎকর্ষের দাবি খাটে তারই। অর্থাৎ উৎকর্ষের বিচার হয় পরিমাণ দিয়ে নয়, গুণ দিয়ে। এই কথাটি তলিয়ে বুঝলে আধুনিক দর্শনে ভাববাদ এবং জড়বাদের অনেক বিরোধের মীমাংসা হয়।

প্রকৃতিপরিণামের রীতি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই। অনন্ত দেশে এবং কালে ছড়িয়ে আছে যে-জড়শক্তি, তাকে সংহত করে গুণগত উৎকর্ষ ঘটানো তার লক্ষ্য। চৈতন্যের সম্পর্ক ছাড়া গুণগত উৎকর্ষের কথাটা ফাঁকা; কেননা যেখানে চৈতন্য নাই, সেখানে গুণের কথাও ওঠে না। জীবের চেতনাই প্রকৃতিতে গুণের আবিষ্কার করছে, তাকে আত্মপুষ্টির অনুকূলে ব্যবহার করছে। সুতরাং প্রকৃতিপরিণামের একটা নিগূঢ় লক্ষ্য হচ্ছে জীবসৃষ্টি। নইলে তার গুণ বা বিভূতি প্রকাশ পাবে কার কাছে, কার ভোগে তারা লাগবে?

পৃথিবীতে প্রকৃতিপরিণামের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হল মানুষ। তার মধ্যে প্রকৃতির জড়পরিণাম প্রাণপরিণাম এবং মনঃপরিণামের একটা সমাহার দেখতে পাই, যা নানাদিক দিয়ে অর্থপূর্ণ। মানুষের দেহ বাহ্যদৃষ্টিতে একটা জড়পিণ্ড, অথচ তা প্রাণধর্মী এবং মনোধর্মী। ব্যাপারটাকে বলা যেতে পারে জড়ের গুণগত উৎকর্ষণ। এই উৎকর্ষণ একদিনে হয়নি, কোটি-কোটি বছরের অতিমন্থর প্রকৃতিপরিণামের ফলে আজ এই দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন যোগীরা বলতেন, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই ভাণ্ডে। কথাটা একদিক দিয়ে সত্য। প্রাণপরিণামের সমস্ত পর্বগুলিই খুঁজলে পরে মানুষের দেহে পাওয়া যাবে। মানুষের দেহ বস্তুতই ব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংস্করণ। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিপরিণামের ইতিহাস এই দেহপিণ্ডে অনুস্যূত হয়ে চলেছে এবং এখনও তার শেষ পর্বে পৌঁছয়নি।

প্রাণপরিণামের একটা বৈশিষ্ট্য হল পরিবেশের সঙ্গে প্রাণের নিরন্তর সংগ্রাম। উপনিষদের ভাষায়, প্রাণ অন্নাদ হয়ে অনবরত জড় বা জীবরূপী অন্নকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে। এমনি করে একেকটা জাতিরূপে (typal form) নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যও ঘটছে। সামঞ্জস্য যতদিন ব্যাহত না হচ্ছে, ততদিন একটা জাতিরূপের আয়ু। এটা হল প্রাণপরিণামের স্থিতির দিক। এখানে ব্যক্তির বিনাশ হচ্ছে, কিন্তু বংশানুক্রমের সহায়ে জাতি টিকে থাকছে। আবার বংশানুক্রমের ক্রিয়া কেবল অতীতের হুবহু অনুকৃতি নয়, একটা নিগূঢ় ইচ্ছার প্রবেগে তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে গুণগত একটুখানি ইতর-বিশেষ। তার ফলে উদ্ভূত হচ্ছে নতুন প্রজাতি (species)। অথচ যে-কাণ্ড হতে তার উদ্ভব, তা কিন্তু অনেকসময় তেমনি টিকে থাকছে। যে উদ্ভিদ-আকৃতিতে প্রাণের প্রথম সুস্পষ্ট রূপায়ণ, তা আজও লোপ পায়নি, পাবেও

না। এমনি করে এক মূল কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে চলেছে প্রাণের বিচিত্র অভিযান। পৃথিবীর সমগ্র প্রাণপরিণামের দিকে তাকালে মনে হয়, এ যেন ধাপে-ধাপে একটা সুদূর লক্ষ্যের দিকে উঠে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ধাপ একহিসাবে স্থিতিধর্মী। কিন্তু তারই গভীরে রয়েছে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার একটা আকূতি। অতীতকে একেবারে লুপ্ত করে সবাই যে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তা নয়। অধিকাংশ ব্যক্তিই হয়তো তার নিজের ধাপে স্থাণু থেকে অতীতের পুনরাবর্তন করে চলেছে। কিন্তু কয়েকটি ব্যক্তি গভীরের প্রেরণায় ধরছে নতুনতর রূপায়ণের পথ এবং পুরানো ধাপের 'পরে সৃষ্টি করছে নতুন প্রজাতির আরেকটা ধাপ। এক পায়ে ভর দিয়ে আরেক পা বাড়ানোর মত স্থিতি আর গতির ছন্দে চলেছে অন্নাদ প্রাণের বিজয়-অভিযান।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রাণপরিণাম যতই ধাপে-ধাপে অগ্রসর হচ্ছে, ততই তার ক্রিয়া হচ্ছে অন্তর্মুখ, অন্তরের পরিণামের দিকে তার ঝোঁক বাড়ছে। মানুষের কথাই ধরা যাক্‌। প্রাণক্রিয়ার দিক দিয়ে অনেক ব্যাপারে সে আজও আদিম প্রাণীর পর্যায়েই আছে ; আবার কোনও-কোনও ব্যাপারে সে মেরুদণ্ডীদের, কোনও-কোনও ব্যাপারে স্তন্য-পায়ীদের সগোত্র। এমনি করে নিছক জৈবব্যাপারে তার আকৃতি পরি-বেশের সঙ্গে রফা করে যে একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে, তার আর বিশেষ অদল-বদল হয়তো হবে না। কিন্তু চেতনার আরও উন্মেষ ঘটাবার জন্য তার নাড়ী-জালের সূক্ষ্ম পরিণাম এখনও চলছে এবং আরও চলবে। এই আন্তরপরিণামের একটা প্রতিক্রিয়া বাইরের আকৃতিতে দেখা দেয়, কিন্তু তার বেগ হয় মন্থর। তাই বাইরের কাঠামোর বিশেষ বদল না হলেও মানুষ ভিতরের দিক দিয়ে পরিণামের ধারায় অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে। কৌশলে নাড়ীতন্ত্রের ক্রিয়াকে আরও সূক্ষ্ম এবং বীর্যশালী করা এদেশের সব যোগপন্থার উদ্দেশ্য। আপাতত এ-সাধনায় আন্তরপরিণামের দিকেই মানুষের ঝোঁক পড়েছে বেশী। সেটা অস্বাভাবিকও নয়, কেননা উর্ধ্বশক্তির স্বরূপ এবং ক্রিয়া না জানলে তাকে নীচের আধারে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রকৃতিপরিণামের সাধনায় সম্যক্‌সিদ্ধি আসবে তখনই, যখন আন্তরপরিণাম আর বাহ্যপরিণামের প্রবেগের মাঝে বর্তমান অনুপাত-বৈষম্য আর থাকবে না, অর্থাৎ জীবনের দিব্য রূপায়ণ শুধু একটা ব্যক্তিগত মানস ব্যাপার না থেকে সমষ্টিগত জৈব এবং দৈহ্য ব্যাপারেও পরিণত হবে।

আকৃতিপরিণামের চাইতে তাহলে আন্তর- বা চিন্ময়-পরিণামেরই গুরুত্ব বেশী, কেননা আধারে গুণগত উৎকর্ষ ঘটানো হল প্রকৃতির উদ্দেশ্য। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, আন্তরপরিণামের মধ্যে ক্ষিপ্রতা থাকলেও তার বহির্ব্যাপ্তি নাই। একই ছাঁচের গড়পড়তা মানুষ জন্মায় কোটিতে-কোটিতে, কিন্তু গড়ের হিসাবের বাইরে গুণগত উৎকর্ষ নিয়ে মানুষ জন্মায় 'কোটিকে গোটিক'। অর্থাৎ প্রকৃতির কাছে আন্তরপরিণামের সাধন হল ব্যক্তি, সমূহ নয়। এমন-কি আকৃতিপরিণামের বেলাতেও দশলক্ষ বৎসরে যদি একটা নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্ভাবিত হয়, তাও হবে গোড়াতে ব্যক্তিরই কোনও বৈশিষ্ট্যকে ধীরে-ধীরে প্রগুণিত করে। আন্তরপরিণামের বেলায় ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের অন্তরেই এই ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে দানা বাঁধে এবং তা-ই হয় প্রকৃতির আন্তরপরিণামের সাধন। ব্যক্তিত্ববোধের বিশেষ পুষ্টিতে জাগে আত্মার অমরত্বের বোধ এবং তা-ই জন্মান্তরের প্রমাপক—একথা আগেই বলেছি। ব্যক্তির জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির ক্রমিক উন্মেষ এবং তার প্রভাবে সমূহচেতনার মানের (standard) উন্নয়ন—এই হল চিন্ময়-পরিণামের মূল রীতি। এমনি করে পরম একের উদয়নের (ascent) সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বহুধা-পরিণামিনী আত্মপ্রকৃতির চিন্ময়-রূপান্তর ঘটছে—দর্শনের বিচারে বিশ্বব্যাপারের এই তাৎপর্য।

আজকাল পরিণামবাদ একটা লোকাতত সিদ্ধান্ত হলেও তার বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে দর্শন আর বিজ্ঞান দুয়ের তরফ থেকে। দার্শনিকের আপত্তির কথাই আগে তোলা যাক।

দার্শনিক চিন্তার চরম শিখরে আমরা পাই চিদদ্বৈতবাদ। নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ তার একটা রকমফের। এই মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—অধিষ্ঠান-ব্রহ্মে জগৎ একটা অলীক আরোপ মাত্র। পরিণামবাদ জগতের সত্যতা স্বীকার করে, তার শক্তিপরিণামের একটা তাৎপর্য আবিষ্কার করে। কিন্তু নির্বাণরসিকের কাছে এই তাৎপর্য-অনুসন্ধানের কোনও মূল্য নাই। জগতের মধ্যে যে-বিভূতির প্রকাশ, জাগতিক দৃষ্টিতে তার যত উৎকর্ষই থাকুক, ব্রহ্মদর্শী বিবেকীর কাছে তা হেয়। বিভূতি মায়িক, আমরা যেতে চাই মায়ার উর্ধ্বে। বিভূতিবিস্তরের যে-কোনও পর্ব হতে মায়ার আবরণ ভেঙে আমরা ব্রহ্মচৈতন্যে

উত্তীর্ণ হতে পারি, তা-ই আমাদের পুরুষার্থ। বিভূতিবিস্তরের মধ্যে গুণের উৎকর্ষ অনুসারে একটা পরম্পরা থাকতে পারে। কিন্তু এই পরম্পরার মধ্যে পরিণামের বেগ আছে, একথা মানবার কি প্রয়োজন? বিশ্বব্যাপারে কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব থাকে-থাকে সাজানো আছে, এই বললেই তো যথেষ্ট। এর মধ্যে আমি যে-থাকেই থাকি না কেন, আমাকে পৌছতে হবে নির্বিশেষ চৈতন্যের শিখরে। সেটা আমার বাঁধন কেটে দিয়েই আমি পারি, তার জন্যে ধাপে-ধাপে উঠে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। মানুষের পরে যদি দেবতা থাকেন, ঈশ্বর থাকেন—থাকুন। তাঁরা আছেন মায়ার এলাকায়; আমি তাঁদের কাছে বাঁধা পড়তে চাই না। সুতরাং আমার অধ্যাত্মসিদ্ধির পক্ষে পরিণামবাদ তো অপেক্ষিত নয়।

ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কোনও সম্পর্ক যদি স্বীকার করতেই হয়, তাহলেও তা একটা নিরঙ্কুশ আনন্দ-আস্বাদনের সম্পর্ক মাত্র। বিশ্ব তাঁর আনন্দের উচ্ছলন। সব-কিছুতে তাঁর সমান আনন্দ, আপ্তকাম পুরুষের পরিপূর্ণ নির্বিশেষ আনন্দ। ব্রাহ্মী স্থিতিতে নিষণ্ণ আমারও মধ্যে সে-আনন্দ উছলে ওঠে—দেখি সবই তাঁর লীলা। লীলার কোনও তাৎপর্য থাকবার তো প্রয়োজন নাই। লীলা লীলাই, তার কোনও 'কেন' নাই। লীলা অকারণ অবারণ অন্তহীন উল্লাস মাত্র।

এই গেল লোকোত্তর অনুভবের কথা। লৌকিক অনুভবের ক্ষেত্রে দেখি, আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির মধ্যে ধারাবাহিক পরিণামের একটা বেগ থাকলেও তার সীমা মানুষের মনোভূমি পর্যন্তই। জন্মান্তরবাদকে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েও পরিণামের বেগকে মনের ওপারে প্রসারিত করা যায় না। প্রকৃতিপরিণামের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে জন্মান্তর একটা আবর্তন মাত্র। মনের এলাকা ছাড়িয়ে যদি কিছু থাকে, তা পার্থিব প্রকৃতির ওপারে—এপারে নয়।

পরিণামবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিকের আপত্তিগুলি মোটামুটি এই। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলে রাখি, এদেশের অধ্যাত্মশাস্ত্রে—উপনিষদে পুরাণে তন্ত্রে—পরিণাম-বাদের ইঙ্গিত অনেকজায়গাতেই পাওয়া যায়, যদিও সেখানেও তাকে আমরা লোকোত্তর তত্ত্বকে কুক্ষিগত করতে দেখি না।

নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদে শক্তিকে বলা হয়েছে মায়া। মায়াবাদ দিয়ে জগৎ-তত্ত্বের মীমাংসা হয়েছে প্রাকৃতমনের দিক থেকে। সেখানে সত্তা-অসত্তার প্রশ্নই মুখ্য, পরিণামের কথাটা অবান্তর। মায়াবাদের স্বাভাবিক পর্যবসান

তাই বিবর্তবাদে। 'নেতি-নেতি' করে মন যখন তুরীয়ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, তখন তার কাছে জগৎ থাকে না। আবার সে-ভূমি থেকে নেমে এলে জগৎ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বস্তুত জগৎ আছে কি নাই, এই হল মায়াবাদীর প্রশ্ন। প্রশ্নের মীমাংসা করে প্রাকৃতমনের সংস্কার। কখনও সে বলে জগৎ নাই, কখনও বলে জগৎ আছে কি নাই কিছুই বলা চলে না। জগতের সত্তা নিয়ে মনের এই বিকল্পের মধ্যে পরিণামের প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে না। জগতের মধ্যে শক্তির পরিণাম ঘটছে কি ঘটছে না, তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নাই। আমার লক্ষ্য হল জগৎ-চক্রের বাইরে যাওয়া।

মুক্তিসাধকের কাছে অবশ্য মায়াবাদের একটা অনতিবর্তনীয় সার্থকতা আছে। কিন্তু মুক্তিতেই জীবন ফুরিয়ে না যেতেও পারে। জগতের ওপারে গিয়ে ওখানকার আলো নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসাও চলে। লোকোত্তরের বোধকে জাগ্রত রেখেই লৌকিক বোধ দিয়ে জগৎকে জানা অসম্ভব নয়। তখন ইন্দ্রিয় দিয়েই জগৎকে অনুভব করি—কিন্তু তার মধ্যে থাকে অতীন্দ্রিয়ের আবেশ। ব্রহ্মবোধ দিয়ে জারিত ক'রে এই অতীন্দ্রিয়বোধ জগদ্‌বোধকে আরও গভীর করে। তখন আর একথা বলি না যে ব্রহ্ম আছেন বলে জগৎ নাই; বলি, তিনিই জগৎ হয়েছেন। জগৎ আর তখন অনির্বচনীয় মায়ার খেলা নয়, তাঁর লীলা। এই দৃষ্টিই জগৎসম্পর্কে পরিণামদৃষ্টি, বিবর্তদৃষ্টির মতই যা চিদদ্বৈতবাদের একটি প্রবল পক্ষ। বস্তুত বিবর্তবাদে আর পরিণাম-বাদে কোনও অনুত্তরণীয় বিরোধ নাই। মন 'নেতি নেতি' বলে যখন জগতের উজানে চলে, তখন সে সৃষ্টি করে বিবর্তবাদ; আবার যখন সে বোধির আলো হয়ে ফিরে আসে, তখন সৃষ্টি করে পরিণামবাদ।

পরিণামবাদের প্রথম অভিব্যক্তি লীলাবাদে, যদিও তাতে পরিণামবাদের তাৎপর্য পুরাপুরি ধরা পড়ে না। লীলাবাদী জগৎকে সত্য বলেন, কিন্তু জগদ্‌ব্যাপারের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার প্রতি তাঁর কোনও আগ্রহ নাই। পরিণামের বস্তুত দুটি ধারা—ব্রহ্ম জগৎভাবনার দিকে যেমন নেমে আসছেন, তেমনি জগৎও ব্রহ্মভাবনার দিকে উজিয়ে চলেছে। এর মধ্যে লীলাবাদী লোকোত্তর ভূমিতে থেকে অবতরণের উল্লাসটাই দেখছেন। তাও দেখছেন সমগ্রদৃষ্টিতে, হেতুপরম্পরার কোনও বিচার না করে। বিবর্তবাদী উজানপথে চলতে গিয়ে প্রকৃতিপরিণামের ধাপগুলি পরপর পার হয়ে যান বটে, কিন্তু বর্জনবুদ্ধি প্রবল বলে এগুলির মধ্যে ক্রমিক উন্মেষের কোনও ধারা আবিষ্কার

করবার আগ্রহ তাঁর থাকে না। ফলে মায়াবাদ বা লীলাবাদ কোনটাতেই আমরা জগদ্‌ব্যাপারের কোনও বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা পাই না ; পরমার্থের সঙ্গে সমগ্রভাবে জগতের কি সম্পর্ক, দুটি বিপরীত দিক হতে তার একটা সামান্য বিবৃতি পাই মাত্র। উভয়ের বিবৃতিতেই লৌকিক এবং লোকোত্তরের মাঝে একটা বিচ্ছেদ আছে, এই হল তাদের মারাত্মক ত্রুটি।

লক্ষ্যাভিসারী পরিণামবাদকে (theory of teleological evolution) বলতে পারি লীলাবাদের পরের ধাপ এবং তার পরিপূরক। লীলাবাদে জগতের স্বীকৃতি আছে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা নাই। জগৎ-রহস্য একহিসাবে তারও কাছে অনির্বচনীয়। কিন্তু অনির্বচনীয়কে নির্বচনীয় করাই বুদ্ধির কাজ। জগৎ আছে, তাকে উদাসীনভাবে আমরা দেখে যাচ্ছি—বোধের এই একটি প্রকার হতে পারে। আবার জগৎকে দেখে অহেতুক আনন্দে হৃদয় ভরে উঠছে, একটা আত্মীয়তাবোধ জন্মাচ্ছে তার প্রতি—এও বোধের আরেকটা প্রকার। আনন্দ আরও গভীর এবং অফুরন্ত হয়, যদি জগদ্‌ব্যাপারের একটা হেতু একটা অর্থ আবিষ্কার করতে পারি। তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বোধ ক্রমেই নিবিড়তর হয়—তাই শেষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আগের দুটির বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। মায়াবাদীর উদাসীন দৃষ্টিতে স্ফুরণ হয় বিবেকজ্ঞানের—নির্বিশেষ আনন্ত্যের চিন্ময় আবেশে অন্তর হয় শুধু প্রশান্ত। তারই ভূমিকায় ফোটে লীলাবাদীর আনন্দদৃষ্টি, অনুভবের মধ্যে খুলে যায় রসের ফোয়ারা। একটি মুক্তির আরাম, আরেকটি ভুক্তির উল্লাস। আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে অনুভব করি শক্তির সংবেগ। সে-শক্তি মূঢ় নয়, চিন্ময়। সুতরাং তার ক্রিয়ার একটা তাৎপর্য আছে, যেমন আছে আমার ইচ্ছাশক্তির। জগৎকে যখন আনন্দদৃষ্টিতেই শুধু দেখি না, কিন্তু তার বলক্রিয়ার মধ্যে দেখতে পাই একটা লক্ষ্যাভিসারী প্রবেগ, তখন বিশ্বলীলায় যোগ দিই আমার নবোদ্‌-বোধিত শক্তি নিয়ে। অখণ্ড আত্মোপলব্ধিতে আমি শুধু ব্রহ্মের নির্বিকার প্রশান্তির এবং প্রশান্ত আনন্দের শরিক নই, তাঁর আনন্দময় ইচ্ছাশক্তিরও বাহন। মুক্তি ভুক্তি এবং শক্তি, কৈবল্য আনন্দ এবং ইচ্ছা—তিনের মাঝে কোনও বিরোধ নাই। মায়াবাদীর বিবেকদৃষ্টি আর লীলাবাদীর আনন্দদৃষ্টির স্বাভাবিক পর্যবসান হতে পারে পরিণামবাদীর শক্তিদৃষ্টিতে। তিনি তখন বিশ্বের মূলে অর্থের আবিষ্কার দ্বারা সিদ্ধির অনুকূলে শক্তিকে প্রয়োগ করে ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পকে জয়যুক্ত করেন।

আপ্তকামের কোনও স্পৃহা নাই, কিংবা লীলার কোনও অর্থ নাই—এ-দুটি উক্তিই একদেশ-দর্শনের ফল, সম্যক্-দর্শনের নয়। অভাববোধ হতে অচরিতার্থ কামনা হতে তবে শক্তির স্ফুরণ হবে, এটা হল অবিদ্যাভূমির কথা। বিদ্যার ভূমিতে দেখি, 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে'—পূর্ণ হতেই পূর্ণ উপচে পড়ে, সংবৃত্ত (involved) শক্তি বিবৃত্ত (evolved) হয় স্বভাবের আনন্দ-আন্দোলনে। যেমন হয় কবির মধ্যে—আত্মসংহত চেতনার নিবিড় উল্লাস কাব্যে উপচে পড়ে। বৈদিক ঋষি তাই সৃষ্টিকে বলেন দেবতার অজর অমর কাব্য, তাঁর সিসৃক্ষার প্রবেগকে বলেন কবি-ক্রতু। কাব্যের মধ্যে ছন্দ আছে, অর্থের দ্যোতনা আছে। বিশ্বের লীলাতেও আছে ঋতের ছন্দ, আছে শাশ্বত অর্থের বিধান। আপ্তকাম পুরুষের প্রপঞ্চোপশম স্তব্ধতা আর তাঁর উচ্ছল লীলায়নের নিরঙ্কুশতা—দুয়ের মধ্যেই পাই তাঁর শক্তির পরিচয়। একটিতে শক্তির নিমেষ, আরেকটিতে উন্মেষ। উন্মেষ নিরঙ্কুশ হলেই যে তাকে ছন্দোহীন এবং অর্থহীন হতে হবে, সমস্তটা দুনিয়া হবে নিতান্তই একটা ছেলেখেলা—এ-কল্পনা বাস্তবিক বালোচিত। অর্থের সঙ্গে উপশম বা লীলার কোনও বিরোধ হতে পারে না—বিশেষত অর্থ যেখানে ব্রহ্মের নিজেকে অচিতিতে নিগূহিত করে আবার পূর্ণচিতিতে ফিরে পাওয়া। 'ব্রহ্ম এই সব-কিছু হয়েছেন'—এই তটস্থদর্শনে পাই তাঁর আত্মনিগূহনের পরিচয়। কিন্তু এ হল হওয়ার একটা দিক—শক্তির নিমেষণে (involution) পূর্ণচৈতন্যের জড়ে সংহত হওয়ার দিক, যোগী নিরোধসমাধিতে যার অনুভব পান। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই দেখছি, জড় হতে উদ্ভিন্ন হচ্ছে প্রাণ-চৈতন্য। এই হল শক্তির উন্মেষ, ব্রহ্মের হওয়ার আরেকটা দিক। আমাদের চেতনায় কিন্তু হওয়ার এই প্রবেগটাই প্রবল। শক্তির উন্মেষে চেতনার বিস্ফারণে আমরা বৃহৎ হতে চাইছি, ব্রহ্ম হতে চাইছি। অবিদ্যার ভূমিতে এই চাওয়া অস্পষ্ট বলে তার মধ্যে অভাবের বেদনা আছে। কিন্তু বিদ্যার ভূমিতে এই চাওয়া রূপান্তরিত হয় মহাভাবের উল্লাসে। এও লীলা, নিত্যেরই লীলা—কিন্তু এক পরম অর্থের ব্যঞ্জনায় প্রগাঢ়। জ্ঞানীর মুক্তিযোগ এবং রসিকের ভুক্তিযোগের পরে এইখানে শুরু হয় যোগীর শক্তিযোগের সাধনা। পরিণামবাদের চরম তাৎপর্য এই শক্তিসিদ্ধিতে। প্রকৃতির পারার্থ্যের নিগূঢ় অর্থও তা-ই।

দার্শনিকের কথা গেল, তারপর বৈজ্ঞানিকের কথা। বৈজ্ঞানিকমহলে পরিণামবাদ আজকাল একটা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। পরিণামবাদে বৈজ্ঞানিকের আপত্তি নাই, তবে লক্ষ্যাভিসারী পরিণামবাদ মানতে তিনি প্রস্তুত নন। পরিণাম ঘটছে, তা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার ফলে যে আকৃতির উদ্ভব হচ্ছে, তা আকস্মিক। তাছাড়া এই পরিণামের যে সুদূরগামী কোনও লক্ষ্য আছে, জোর করে তা বলতে পারি না। লক্ষ্যের দিকে চলে বুদ্ধি। কিন্তু বুদ্ধি তো জগৎপরিণামের গোড়ায় নাই, আছে তার শেষের দিকে। বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে মানুষের মধ্যে। জগদ্ব্যাপারের খামখেয়ালির মধ্যে সে-ই খানিকটা নিয়ম আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বুদ্ধির আয়ু আর কতটুকু? সমস্তটা জগৎ জড়ের শাসন মেনে চলছে। জড়ের শক্তিও চলছে সাম্যের দিকে—যার অর্থ প্রলয়। আকস্মিক কোনও কারণে যদি পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায়, তাহলেও শক্তিসাম্যের (entropy) আইন অনুসারে একদিন তার সকল গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। তখন কোথায় থাকবে প্রাণ, কোথায় থাকবে চৈতন্য? এদিকে শক্তিনিত্যতাবাদ (theory of conservation of energy) মানতে হয় বলে এমন নতুন শক্তির আবির্ভাবও কল্পনা করতে পারি না, যা সাম্যের মধ্যে বিক্ষোভ আনবে। সুতরাং আদিতে আর অন্তে দুই অব্যক্তের মাঝে এই-যে অভিব্যক্তির লীলা, এ নিতান্তই দুদণ্ডের উদ্দেশ্যহীন একটা খেলা। মানুষের জীবন, তার বুদ্ধির চমৎকার, তার আদর্শের স্বপ্ন—সব মরসুমী ফুলের বাহার মাত্র। জড় হতে প্রাণ মন বুদ্ধির উন্মেষ ঘটেছে নিতান্তই যদৃচ্ছাক্রমে (by chance), প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে। দূরদর্শী কোনও বুদ্ধির প্রণোদনায় এটি ঘটেছে, তার কোথাও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং জগদ্ব্যাপারের একটা পর্বে পরিণামবাদ সত্য হলেও লক্ষ্যাভিসারী পরিণামবাদের কোনও প্রামাণিকতা নাই।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল জড়বাদ। আমরা আগেই দেখেছি, জড়বাদ দিয়ে প্রাণচৈতন্যের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা যায় না, করতে গেলেই যদৃচ্ছাবাদের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যা ঘটে, তারও সম্ভাব্যতার (probability) একটা গাণিতিক নিয়ম আছে। একটা নির্দিষ্ট অনুপাত ছাড়িয়ে গেলে তার সম্ভাব্যতাকে আর যদৃচ্ছা বা আকস্মিকতার কোঠায় ফেলা যায় না, তার পিছনে একটা নিয়ামক তত্ত্বের অস্তিত্ব মানতেই হয়। সম্প্রতি দেখা গেছে, জড়ের যদৃচ্ছা-সন্নিবেশ হতে প্রাণের উদ্ভবের জন্য যে-সময়ের দরকার, তার

চাইতে অনেক কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। কোনও নিয়ামক শক্তির ব্যাপার পিছনে না থাকলে এ-কালসংক্ষেপ সম্ভব হত না। বাধ্য হয়ে তখন জগতের সমষ্টিপরিণামের পিছনে একটা নিগূঢ় বুদ্ধির প্রেরণা স্বীকার করতে হয়, যে-বুদ্ধি জড়ের ক্রিয়াকে একটা সার্থক পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে। অবশ্যই এ-বুদ্ধিকে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কেননা, মানুষের বুদ্ধি কাজ করে সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের সীমার মধ্যে, আর এ-বুদ্ধির কাজ অসীমকে নিয়ে। তাই তার অনেক ব্যাপার মানুষের বুদ্ধি বেড়ে পায় না বলে তাদের আকস্মিকতা বা লীলার পর্যায়ে ফেলে। কিন্তু অসীমের ব্যাপারকে আকস্মিক না বলে স্ব-তন্ত্র বললেই তার প্রতি সুবিচার করা হয়। যাকে আমরা আকস্মিক বলি, প্রকারান্তরে স্বীকার করি, তা আমাদের বুদ্ধির নাগালের বাইরে। তার মূলে যে-শক্তির প্রবর্তনা, তাকে জড় বা অচেতন বললে আমাদের হেতুপ্রশ্নের আপাততর্পণ হয় মাত্র, কিন্তু আসলে তার মধ্যে একটা ফাঁকি থেকে যায়। যখন গণিতের নিয়মে জড়-ক্রিয়ার মূলে একটা নিয়ামক শক্তির সন্ধান পাচ্ছি, তখন বিশ্বব্যাপারের ব্যাখ্যায় আকস্মিকতার জায়গায় স্বাতন্ত্র্যকেই বহাল করা উচিত। বাইরে থেকে দেখতে গেলে গোড়ার দিকে আকস্মিকতায় আর স্বাতন্ত্র্যে কোনও তফাত নাই—এক দৃষ্টিভঙ্গির বদল ছাড়া। সম্ভাব্যতার অগণিত বৈচিত্র্যকে উভয়ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হচ্ছে। কেবল আকস্মিকতাবাদে ঘটনা অনিয়মিত আর স্বাতন্ত্র্যবাদে নিয়মিত—যদিও সে-নিয়ম সীমিত বুদ্ধির নিয়ম নয়। আধুনিক অনিশ্চয়তাবাদের (theory of indeterminacy) মধ্যে এইধরনের স্বাতন্ত্র্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অনন্ত সম্ভাব্যতা আর নিয়ামক শক্তির অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য—এই দুটি তত্ত্বকে স্বীকার করে প্রকৃতিপরিণামের এই ছক পেতে পারি। জড় হতে পরিণামের শুরু। সেখানে শক্তির যে-ক্রিয়া চলছে, একটা প্রাচীন সংজ্ঞা ব্যবহার করে তাকে বলতে পারি নির্ঋতি (chaos)—যা অন্তহীন সম্ভাবনার একটা উচ্ছৃতি। এই নির্ঋতির মধ্যে ঋতের একটা বিশিষ্ট ছন্দ দেখা দেয় প্রাণের আবির্ভাবে, দেখা দেয় লক্ষ্যাভিসারী একটা সংহতি (organisation)। এই বিশিষ্ট ঋতায়ন হতে স্বাতন্ত্র্যের অনুভব ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। প্রাণ এগিয়ে চলে এবং পিছনে রেখে যায় ভোগায়তনের (experiencing forms) বৈচিত্র্য। প্রাণের এই অগ্রাভিযানের সঙ্গে-সঙ্গে গুণগত উৎকর্ষ

বাড়ে, কিন্তু আকৃতির সংখ্যা কমতে থাকে। সুতরাং উৎকর্ষের বিচারে প্রকৃতিপরিণামের ছকটা হয় পিরামিডের মত। একটা প্রাচীন উপমা হল ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থের—যেন একটা অশ্বত্থগাছকে উলটে রাখা হয়েছে। বহু চলেছে একের দিকে, তার এই ছবি। বহুর ব্যাপ্তি বাইরের আকাশে, সেখানে মূর্তির অসংখ্যত্ব; কিন্তু একের ব্যাপ্তি অন্তরের আকাশে বা চিদাকাশে, সেখানে অনন্তগুণের সমাহার। আকৃতির দিক দিয়ে এই ব্যাপ্তিকে বলতে পারি শক্তির ব্যাপ্তি, বীজভাবের ব্যাপ্তি। ভূতে-ভূতে চিদ্-বীজ নিহিত রয়েছে এবং আকৃতি-অনুযায়ী গুণের স্ফুরণ হচ্ছে, পরিণামের উপরের ধাপে ক্রমেই তার উৎকর্ষ বাড়ছে।

এই শেষের সিদ্ধান্তগুলি পড়ে দর্শনের এলাকায়। কিন্তু বিজ্ঞান আর দর্শনে তো বিরোধ নাই। জড় প্রাণ আর চৈতন্য—এই নিয়ে জীবন। তার রহস্য বুঝতে গেলে যেমন বিজ্ঞানের দরকার, তেমনি দরকার দর্শনের। বিজ্ঞান বলে কাঠামোর কথা, নিছক শক্তিপরিণামের কথা। সেই কাঠামোতে প্রাণসঞ্চার করে দর্শন, বলে তাৎপর্যের কথা। জড় আর চৈতন্যে যে আপাত-বিরোধ, তার মীমাংসা দর্শনই করতে পারে—অবশ্য বৈজ্ঞানিকভাবনার সম্প্রসারণ দ্বারাই। সম্যক্-দর্শনে আর বিজ্ঞান-দর্শনে তাই বিরোধ থাকতে পারে না।

আরেকটা কথা উঠেছিল শক্তিসাম্যের প্রসঙ্গে: অব্যক্তে প্রলয় যদি সকল গতির নিয়তি হয়, তাহলে অভিব্যক্তির মূল্য কতটুকু? এ-প্রশ্নের দুটি জবাব হতে পারে। প্রথমত, সম্প্রতি শক্তিনিত্যতাবাদের অভেদ্য দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। মহাশূন্য হতে নতুন শক্তির উন্মেষ হয় না, একথা আর বলা চলে না। তা-ই যদি হয়, তাহলে সৃষ্টিযন্ত্রের একদিকে যেমন কুণ্ডলী-মোচন হচ্ছে, আরেকদিকে তেমনি কুণ্ডলনও চলছে। সুতরাং প্রলয়ের কথা ভেবে আতঙ্কিত হবার কারণ নাই। দ্বিতীয়ত, যদি আকস্মিক কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, যে-শক্তির বেগে এখানে জড়ের মধ্যে চিতের উন্মেষ শুরু হয়েছিল, আর কোথাও-না-কোথাও বা কোনও কালে যে তার জের চলবে না, তা বলতে পারি না। সুতরাং চিন্ময়-পরিণামের পথ তো খোলাই রইল। পৃথিবীর স্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েও বলা যেতে পারে, তার পূর্ব পর্যন্ত চিন্ময়-পরিণামের দিকে এগিয়ে যাবার সে যথেষ্ট সময় পাবে এবং তার জড়ীয় আধারশক্তির রূপান্তরবশত আপাতদৃষ্টিতে যা প্রলয় তা

বিজ্ঞানঘন-চেতনার বিস্ফোরণের নিমিত্তও হতে পারে—যেমন নাকি হয় যোগীর মৃত্যুতে।

তবে অতিসুদূর ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে বা না পারে, তা নিয়ে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জল্পনার দ্বারা চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিশেষ-কিছু লাভ আছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতিপরিণামের আসন্ন সম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি রেখে তার সার্থকতার বিচার করা চলে। এ-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরও আপত্তি পরিণামের সত্যতা নিয়ে ততটা নয়, যতটা তার ধারা নিয়ে। প্রকৃতির জাতিরূপের (type) একটা পরম্পরা আছে দেখা যায়। কিন্তু এ-পরম্পরা যে ক্রমিক পরিণামের ফল, তা কি করে বলি? জীবজগতে পরিণামের বাহন হতে পারে বংশানুক্রম (heredity)। কিন্তু তার ঝোঁক আমরা দেখি একটা জাতিরূপকে টিকিয়ে রাখবার দিকে। সুতরাং নতুন প্রজাতির উদ্ভবকে বলতে হয় আকস্মিক। নতুন আর পুরাতনের মধ্যে অব্যাহত যোগসূত্র আবিষ্কার করা তো আমাদের এখনও সম্ভব হয় নি। তাছাড়া মানুষের আন্তর পরিণামের যদি বিচার করি, সে কি আগের চাইতে খুব বেশী এগিয়ে গেছে বলতে পারব? বরং সে যে দিন-দিন অধোগতির পথে চলেছে, তা-ই কি সত্য নয়? সত্যযুগ আমরা পিছনে ফেলে এসেছি, সামনে রয়েছে ভরা কলির অমানিশা। অতিমানবতা যদি আমাদের নিয়তি হত, তাহলে কোথাও-না কোথাও তার বীজ থাকত। কিন্তু সে-বীজ তো কোথাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

অবশ্য এসব আপত্তি খুব গুরুতর নয়, কেননা এদের অনেকটাই নির্ভর করছে জগৎসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির 'পরে। খণ্ডদর্শন প্রাকৃতমনের স্বভাব, স্পষ্ট করে দেখবার জন্য সব-কিছুকে সে ভেঙে-ভেঙে দেখে। জড়কে বুঝতে বা ব্যবহার করতে এই বিভজ্য-দর্শিতার একটা উপযোগিতা আছে। কিন্তু শুধু জড়ের দর্শনে জগতের সম্যক্-দর্শন হয় না, তার সঙ্গে মানতে হয় শক্তিকেও। শক্তির দর্শন মূলত অখণ্ডের দর্শন, তাকে দেখি প্রবাহের আকারে। প্রবাহে তরঙ্গভঙ্গ থাকতে পারে। চূড়ার দিকে তাকালে তরঙ্গগুলি আলাদা-আলাদা। কিন্তু গোড়ার দিকে তাকালে তারা একটানা। মন যখন শক্তির প্রবাহকে দেখে, তখন চূড়ার দিকটাও দেখে, গোড়ার দিকটাও দেখে। অর্থাৎ অখণ্ডকে ভিত্তি করে সে খণ্ডকে দেখে, যদিও তার ঝোঁক বাইরের দিকে থাকে বলে অখণ্ডের বোধ হয় অস্পষ্ট। তারপর, শক্তিপ্রবাহের মধ্যে যে ওঠা-নামা,

তার সঙ্গে প্রাকৃত চেতনায় তার প্রতিফলনের একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে। শক্তির তীব্রতা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় না পৌঁছলে তা চেতনার গোচর হয় না; আবার আরেকটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তা চেতনার এলাকার বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ দুটি অব্যক্তের মাঝখানে শক্তির অভিব্যক্তির একটা মধ্যপর্বই প্রাকৃত চেতনার গোচরে আসে। আবার চেতনার ধৃতিশক্তি দুর্বল বলে তার মধ্যেও একটা ওঠা-নামা চলতে থাকে। ফলে তত্ত্বত যা অনন্ত, তা খণ্ডে-খণ্ডে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভূত হয়। বিচ্ছেদের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে স্মৃতি। এই উচ্চাবচ এবং খণ্ডিত দর্শন জড়ের পরিণাম এবং বহুত্ব-দর্শনেরই উপযোগী। যদি চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত এবং একাগ্র করা যায়, তাহলেও শক্তির অখণ্ড প্রবাহের দর্শন সম্ভব। দার্শনিকের ভাষায়, আরম্ভবাদীর দৃষ্টি তখন পরিণত হয় পরিণামবাদীর দৃষ্টিতে। তখন দেখি, একইসঙ্গে শক্তি চলেছে দমকে-দমকে, আবার একটানা প্রবাহেও। তার স্বরূপ একাধারে বৈন্দব (punctual) এবং রৈখিক (linear)। এইটি বুঝতে পারলে প্রাণলীলার ক্ষেত্রে জাতিরূপের আপাত-বিচ্ছিন্ন পরম্পরার মাঝে আন্তর যোগসূত্রটি ধরা যায়।

তারপর, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সাধারণত নিবদ্ধ থাকে আকৃতিপরিণামের দিকে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আকৃতিপরিণামের চাইতে চিন্ময়-পরিণামের গুরুত্ব বেশী। আকৃতি চিৎশক্তির বাহন। শক্তির উৎকর্ষ ঘটে ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। আবার উৎকর্ষের ধারক হয় বিশেষ করে আকৃতির আন্তর পরিণাম। ঊর্ধ্বপরিণামের এই সূত্রগুলি মনে রাখলে চিৎশক্তির প্রগতির ধারা বুঝতে কষ্ট হয় না।

মোটের উপর শক্তির প্রগতি হয় কম্বুরেখায়। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার সে পিছনে হটে, কিন্তু ঠিক আদিবিন্দুতে ফিরে না এসে চলে যায় এক ধাপ উপরে। আবার সেখান থেকে তার শুরু হয় এগিয়ে চলা। উপমা দেওয়া যেতে পারে উত্তরায়ণের। তার মধ্যে দিন-রাতের আবর্তন আছে, কিন্তু তবুও মোটের উপর দিনের আলো তখন বেড়েই চলে। কোনও-একটা যুগ বা কোনও-একটা জাতি আপাতত পিছিয়ে পড়লেও সমগ্র-দৃষ্টিতে সমষ্টি মানবজাতির প্রগতি তাতে ব্যাহত হয় না। পিছিয়ে-পড়াটা অনেকসময় হয় শক্তিসঞ্চয়ের সাধন। শক্তি কিছুক্ষণ থমকে থেকে আবার নতুন উদ্যমে নিজেকে বিচ্ছুরিত করে। কোনও জাতির প্রগতি রুদ্ধ হয়ে

গেলেও তার উত্তরাধিকার নিয়ে আর-কোনও জাতি আবার প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। অনেক মৃত্যু অতিক্রম করে অমৃতের পথে অগ্রাভিযান বিশ্ব-প্রাণের ধর্ম।...আবার কোনও জাতি বাস্তবিকই বিধি-বৃত, বিশ্বের কোনও বীজভাবের সে ধারক। সে-বীজ যতদিন না বনস্পতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, ততদিন হাজার বিপর্যয়ের মধ্যে সে টিকে থাকবে—এই তার নিয়তি। ভারত-বর্ষের বেলাতেই দেখছি, জাতীয় জীবনের অশেষ বৈকল্যের মধ্যেও তার প্রাণ-সত্তা একটির পর একটি মহামানব সৃষ্টি করে চলেছে, যাঁরা সত্যি জগদ্‌গুরু। এখানে আপাতদৃষ্টিতে জাতি পিছিয়ে থাকলেও তার অন্তর্গূঢ় আকূতির বিস্ফোরণ ঘটছে ব্যক্তিকে আশ্রয় করে—এরণ্ডের বনে হঠাৎ দেখা দিচ্ছে মহাদ্রুম। এই প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসের তাৎপর্য কি, তা সহজেই অনুমেয়। বাহ্য পরিণামের চাইতে আন্তরপরিণাম যে বড় এবং প্রগতির বিচার যে করতে হবে এই সূত্র ধরে—এটা তার একটা প্রমাণ।

অতীতকে বড় করে দেখা প্রাকৃতমনের স্বভাব+ কিন্তু একহিসাবে ওটা তার জরাগ্রস্ততার পরিচয়। অতীত বর্তমানের জনক, তার মহিমা অনস্বীকার্য। কিন্তু জনক যদি কেবল পঙ্গু জাতককেই জন্ম দিয়ে যায়, তাতে তার গৌরব বাড়ে না কিংবা জাতির প্রগতি সিদ্ধ হয় না। জনক হতে জাতকের ক্রমিক উৎকর্ষ ঘটবে, এই হল প্রাণপরিণামের রীতি। এ-রীতি চিন্ময়-পরিণামের বেলাতেও খাটবে। কিন্তু চিন্ময়-পরিণাম ভাবাশ্রয়ী বলে তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। ভাবের সম্পূর্ণতা অন্তরগ্রাহ্য, তা চেতনার যে-কোনও ভূমিতে ঘটতে পারে। তাকে রূপে পরিণামিত করতে হলে বাইরের নিমিত্তের অপেক্ষা করতে হয়, অপেক্ষা করতে হয় কালপরিণামের। প্রজ্ঞা-সিদ্ধির দিক দিয়ে জনক ও জাতক দুইই পূর্ণ হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতিসিদ্ধির দিক দিয়ে দুয়ে তারতম্য থাকতে পারে। সেখানে জনক স্বভাবতই আশা করেন, জাতকে তাঁর স্বপ্ন পূর্ণতর রূপ ধরবে। সত্যকার অধ্যাত্মপ্রগতির এই ধারা—তা আবর্তন নয়, অগ্রাভিযান।

প্রকৃতিপরিণামের একটা বিশিষ্ট পর্বে দেখা দিয়েছে মননধর্মী মানুষ। আত্মসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে স্ফুরিত হয়েছে মানসোত্তর বিজ্ঞানের ধর্ম। বলতে গেলে এইখানেই তার মধ্যে অতিমানবতার বীজসত্তা আবির্ভূত হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, মহাভবিষ্যের চকিত আভাস বার-বার ঝিলিক দিয়ে উঠছে লোকোত্তর মহামানবের মধ্যে। মনে হয়,

উত্তরশক্তি বারবার চাইছে মাটির আধারে নেমে আসতে, আধারের প্রস্তুতি কুণ্ঠিত বলে বারবার সে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তার হানায়-হানায় মাটির বুকে জাগছে অভীপ্সার আগুন, দ্যুলোক আর ভূলোক ক্রমেই আসন্নতর হচ্ছে। ভাব আর রূপের, পুরুষ আর প্রকৃতির এই সাযুজ্যের আকৃতিই চিন্ময়-পরিণামের মর্মচর রহস্য, তা-ই বিশ্বব্যাপারেরও নিগূঢ় তাৎপর্য। সে-তাৎপর্য সার্থক হতে চলেছে মানুষের স্বোত্তরণের (self-exceeding) প্রবেগকে আশ্রয় করে—প্রকৃতিপরিণামের মূলে রয়েছে এই লোকোত্তর প্রবর্তনা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

চিন্ময় মানবের বিবর্তন

যদি বাইরের দিক থেকে দেখি, তাহলে পাই প্রকৃতিপরিণামের এই ধারা: পরিণামের আদিপর্বে এক অন্ধ জড়শক্তির অমেয় উচ্ছ্বাস, তারপর তার মধ্যে প্রাণচেতনার স্ফুরণে আত্মরূপায়ণের বিচিত্র উল্লাস, তারও পরে প্রাণের মধ্যে মনশ্চেতনার অঙ্কুরণ। দেখি জড়—প্রাণ—মন, এর মধ্যে প্রকৃতিপরিণামের একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে।

বাহ্যদৃষ্টিতে জড়কে বলতে পারি আদিজননী—প্রাণ ও মনের প্রসূতি। প্রকৃতিপরিণামের বিশেষ পর্বে জড়াণুর বিশেষ বিন্যাসে প্রাণ ও চেতনার আবির্ভাব। জড়বাদীর তরফ থেকে প্রকৃতিপরিণামের এই বিবৃতিতে আপত্তি করবার কিছুই নাই। এতে মানবমনের একটি জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে, কি করে (how) এমন হল? কিন্তু কেন (why) হল, এ-জিজ্ঞাসার জবাব তবু বাকী থেকে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান 'কেন'র জবাব দেওয়াকে মনে করে নিষ্প্রয়োজন। দার্শনিক কিন্তু প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। সত্যজিজ্ঞাসার বনিয়াদ রচনা করে বিজ্ঞান, কি করে কি হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং ধারাবাহিক বিবৃতি দিয়ে। তারপর ঘটনার সমগ্র পরিচয় থেকে একটা অর্থের আবিষ্কার করে দর্শন। অর্থের চেতনা প্রথমেই আসে না—আসে চিত্তের পরিণতির ফলে। তাই বিজ্ঞান দিয়ে যে-জিজ্ঞাসার শুরু, তার স্বাভাবিক পরিণাম ঘটে দর্শনে। দর্শনে-বিজ্ঞানে বিরোধটা বলতে গেলে বিগত যুগের কথা।

আপাত-দৃষ্টিতে নিরর্থক জড়স্পন্দ হতে সার্থক চিৎস্পন্দের উন্মেষ—এই হল প্রকৃতিপরিণামের ধারা। অর্থের আবিষ্কার করে সবার আগে মানুষ তার নিজের জীবনে। প্রাচীনেরা তাকে বলতেন পুরুষার্থ। প্রাকৃত জীবনের পুরুষার্থ হল অর্থ আর কাম—বিত্ত বা উপকরণ সংগ্রহ এবং তার সম্ভোগ। এর মূলে রয়েছে বুভুক্ষু প্রাণের তাগিদ। বুভুক্ষার ফলে প্রথম জাগে সংঘর্ষ, পরকে মেরে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চলে পরস্পর হানাহানি। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও তার মধ্যে অনেকক্ষেত্রে দেখা দেয় যৌথসংস্কার (herd-instinct)—মানুষের মধ্যে

যা পরিণত হয়েছে সমাজচেতনায়। সমাজচেতনার মূলে আছে সংঘর্ষের নয়—সংহতির প্রেরণা। আত্মম্ভরিতায় সংহতি জাগে না—জাগে আত্মত্যাগে। আমি তখন শুধু আমার পেট ভরাবার কথাই ভাবি না—ভাবি কি করে তোমারও পেট ভরবে। এই আত্মত্যাগের প্রাচীন একটা সংজ্ঞা হল যজ্ঞ। মীমাংসকের মতে যজ্ঞের লক্ষণ হল দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ। সে-দেবতা যদি মানুষই হয়, তাতেই-বা কি। আসলে দেবতা হলেন ক্ষেম বা কল্যাণ—বলতে গেলে আমার আত্মচেতনার প্রসারে তাঁর উপলব্ধি। আমি যখন ক্ষুদ্র এবং স্বার্থপর তখন আমি পশু, প্রাণের বুভুক্ষা ছাড়া আর-কিছু আমি বুঝি না। কিন্তু সেই আমিই পরার্থপরায়ণ হলে বৃহৎ হই। তখন আমি দেবতা, সমষ্টির কল্যাণে আত্মদান তখন আমার স্বভাব। এই আত্মদানই দেবযজ্ঞ, তা-ই ধর্ম। ধর্মের শাসনে অর্থ-কামের মূঢ় এষণা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ধর্ম আদিম পুরুষার্থ। ধর্ম যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গের ভাবনাতেই সমাজচেতনার সার্থক পরিপুষ্টি।

ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গকে প্রাচীনেরা বলতেন প্রাকৃত পুরুষার্থ। ত্রিবর্গের সাধনা নিশ্চয় ক্ষেমঙ্কর, তা আমাদের এনে দেয় অভ্যুদয়। কিন্তু তাছাড়া একটি অপ্রাকৃত পুরুষার্থকেও তাঁরা স্বীকার করতেন, তাকে বলতেন নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। তাঁদের মতে তা-ই পরম পুরুষার্থ। মোক্ষের সম্পর্কে দার্শনিক নানা কূটবিচারের মধ্যে না গিয়ে তার একটা কার্যকরী বৌদ্ধিক লক্ষণ দিতে পারি: রাগ-দ্বেষ-মোহহীন চেতনাই মোক্ষের স্বরূপ। মুক্তচিত্ত সমস্ত অবস্থাতেই, এমন-কি কুরুক্ষেত্রের মধ্যেও প্রশান্ত প্রসন্ন উদার এবং উজ্জ্বল।

স্পষ্টই দেখা যায়, চিত্তবিমুক্তির প্রেরণা আসতে পারে ব্যাবহারিক জগতে ধর্মের বা আত্মত্যাগের সাধনা হতে। যতক্ষণ শুধু নিজেকে নিয়ে আছি, ততক্ষণ আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব, ততক্ষণই মূঢ়তা। নিজেকে দিতে পারলেই চিত্তে শান্তি দীপ্তি ও প্রসন্নতার দুয়ার খুলে যায়। ধর্মের সাধনা স্বভাবের নিয়মেই আমাদের চেতনাকে বৃহৎ করে নিয়ে যায় মুক্তচিত্ততার দিকে। বৃহতের ভাবনাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে পাওয়াই মোক্ষ।

মোক্ষের একটা লোকোত্তর রূপ আছে, যা ফোটে মৃত্যুর পটভূমিকায়। কিন্তু তার একটা লোকগত রূপও আছে, যা জীবনের সমস্ত ব্যবহারের ভিতর দিয়ে ফুটতে পারে। গীতায় তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবন আর মৃত্যু দুই নিয়ে অস্তিত্বের সমগ্রতা। মোক্ষ উভয়গামী,

তা একাধারে ব্রাহ্মী স্থিতি এবং ব্রহ্মনির্বাণ দুইই। নির্বাণ তার পটভূমিকা; কিন্তু আকাশের বুকে সবিতার দীপ্তির মত ক্ষেমঙ্কর প্রাণধর্মেও তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হতে পারে। এইটি সিদ্ধ হয় চিন্ময় মানবের মধ্যে। তাঁর ক্রমিক উন্মেষই প্রকৃতিপরিণামের লক্ষ্য।

প্রকৃতিপরিণামের গোড়ায় যেখানে জড়শক্তির উত্তাল বিক্ষোভ, সেখানে আমরা আপাতদৃষ্টিতে কোনও লক্ষ্য দেখতে পাই না। তবু দেখি সেখানে ছন্দ আছে, নিয়ম আছে, ঋতের শাসন আছে। আছে বলেই জড়বিজ্ঞান সম্ভবপর হয়েছে; আবার বিজ্ঞানের সূত্র ধরে জড়শক্তির প্রশাসনও সম্ভবপর হয়েছে। এসব ব্যাপারই পড়ে 'কি ক'রে'র এলাকায়। কিন্তু যে-প্রশাস্তা, তাকেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'কেন' তুমি এমন করছ? অর্থাৎ 'কেন'র প্রশ্নটা আসে তখনই, যখন জড়ের প্রশাসনভার নেয় চৈতন্য।

চৈতন্যের আদিম অস্ফুট প্রকাশ দেখি প্রাণে। সেখান থেকে জড়ের নিয়মের মধ্যে ফুটছে আরেকধরনের নিয়মের খেলা, যার মধ্যে 'কি ক'রে'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'কেন'। আদিমতম প্রাণীরও ব্যবহারের বিবৃতি আমরা দিতে পারি দুদিক থেকে। পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়ায় তার ব্যবহারে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি দিয়ে আমরা তার জীবনের যান্ত্রিক দিকের একটা বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারি। এতে তার ব্যবহারসম্পর্কে 'কেমন ক'রে'র জবাব মিলবে। কিন্তু 'কেন' তার ব্যবহার এমন হয়, সে-প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে কেবল তার নিজের কাছে, অর্থাৎ তার অনুভবের (experience) কাছে। কোনও জীবের সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান গড়ে ওঠে তার ব্যবহার এবং অনুভব দুয়ের বিবৃতি মিলিয়ে।

আদিজীবে এই অনুভবের একটা আদিম অথচ সর্বসাধারণ রূপ দেখতে পাই, যার নাম দিতে পারি জিজীবিষা বা বেঁচে থাকবার ইচ্ছা (will to live)। তার মধ্যেই তার ব্যবহারসম্পর্কে 'কেন'র জবাব পাওয়া যায়। জীবের ব্যবহার এমন কেন?—না সে বেঁচে থাকতে চায় বলে। তার জিজীবিষার রস আছে, অনুভবের একটা স্বকীয়তা আছে। এমনও বলা যেতে পারে, এই জিজীবিষা থেকেই তার ব্যবহারের স্ফূর্তি। কিন্তু বাঁচা তার সহজ এবং অব্যাহত হয় না বলে বেঁচে থাকবার একটা তির্যক্ পন্থা সে অবলম্বন করে প্রজননের (procreation) দ্বারা। ব্যক্তির জিজীবিষা তার নিজের বেলায় পরাভূত হয়, কিন্তু তার অনুবৃত্তি চলে সন্ততিতে।

জিজীবিষা আর প্রজনন, প্রাণের এই দুটি মৌলিক বৃত্তি। তাইতে অগণিত প্রজাতিতে বিভক্ত প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে। এই বৈচিত্র্য প্রকৃতি-পরিণামের আরেকটা বৈশিষ্ট্য। জড় বা প্রাণ উভয়েরই সংস্থানে আছে বিপুল বৈচিত্র্য। অতিপরমাণুর স্বরূপের আদিম সারল্য পরমাণু অণু ও বস্তু-পুঞ্জের বৈচিত্র্যে রূপায়িত হচ্ছে। প্রাণের বেলাতেও দেখি তা-ই। জড় এবং প্রাণ প্রত্যেককে নিজের ভূমিতে রেখে, কেন এই বৈচিত্র্য প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু জড় থেকে প্রাণের উন্মেষের দিকে চেয়ে দুয়ের সম্পর্ক বিচার করি যদি, তাহলে 'কেন' এই প্রশ্ন করা চলে। জড়-সংস্থানের কতকগুলি বৈচিত্র্য যখন প্রাণের উন্মেষের উপযোগী হয়ে দেখা দিল, তখন ব্যাপারটার একটা 'অর্থ' পাওয়া গেল, 'কেন' এই প্রশ্ন করবার একটা সুযোগ মিলল। অবশ্য এ-অর্থ জড়ের এলাকার সবখানি জুড়ে দেখা দেয় না, অর্থাৎ সব জড়সংস্থানই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এ-কল্পনা করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আগেও বলেছি, জড়ের অনেকখানি নিষ্প্রাণ থেকে যাবে। তবুও তার একাংশে যে প্রাণ অঙ্কুরিত হল, এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কেননা এর মধ্যে প্রকৃতিপরিণামের একটা অর্থের ইশারা পাওয়া গেল।

অর্থের চেতনা ক্রমে স্পষ্ট হতে শুরু করল পর্বে-পর্বে প্রাণের উন্মেষের সঙ্গে। অগণিত জীবের জীবনের অর্থ তাদের নিজের কাছে স্পষ্ট, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু সমষ্টির জীবনের অর্থ খুঁটিয়ে আবিষ্কার করা সর্বজ্ঞ না হলে সম্ভবপর নয়। তবে প্রাণোন্মেষের পর্বগুলির মধ্যে অন্যোন্যসম্পর্কের মোটামুটি একটা আদরা আমরা পেতে পারি। অজৈব (inorganic) জড় জৈবপদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে উদ্ভিজ্জ (সংজ্ঞাটি একখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে) প্রাণের মাধ্যমে। সে-প্রাণে মনশ্চেতনা আচ্ছন্ন। পশুতে—বিশেষ করে মেরুদণ্ডী পশুতে—এসে আচ্ছন্ন মন হল অনতিস্পষ্ট, মানুষে এসে হল স্পষ্ট। মনের স্পষ্টতার পরিচয় পাই বুদ্ধিতে। বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সংবিৎ থেকে চেতনাকে সে উত্তীর্ণ করেছে সামান্যভাবনায়। পশুর মধ্যে এই সামান্যভাবনা এত অস্পষ্ট যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মানুষের মধ্যে সামান্যভাবনা থেকে আসছে আরোহ আর অবরোহ (induction and deduction) এই দুটি ক্রম অনুযায়ী যুক্তি, আসছে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই স্পষ্ট করে ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করবার ক্ষমতা। যুক্তি পারিপার্শ্বিকের অর্থকে চেতনায় স্পষ্ট করে তুলছে, কল্পনা

তা একাধারে ব্রাহ্মী স্থিতি এবং ব্রহ্মনির্বাণ দুইই। নির্বাণ তার পটভূমিকা; কিন্তু আকাশের বুকে সবিতার দীপ্তির মত ক্ষেমঙ্কর প্রাণধর্মেও তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হতে পারে। এইটি সিদ্ধ হয় চিন্ময় মানবের মধ্যে। তাঁর ক্রমিক উন্মেষই প্রকৃতিপরিণামের লক্ষ্য।

প্রকৃতিপরিণামের গোড়ায় যেখানে জড়শক্তির উত্তাল বিক্ষোভ, সেখানে আমরা আপাতদৃষ্টিতে কোনও লক্ষ্য দেখতে পাই না। তবু দেখি সেখানে ছন্দ আছে, নিয়ম আছে, ঋতের শাসন আছে। আছে বলেই জড়বিজ্ঞান সম্ভবপর হয়েছে; আবার বিজ্ঞানের সূত্র ধরে জড়শক্তির প্রশাসনও সম্ভবপর হয়েছে। এসব ব্যাপারই পড়ে 'কি ক'রে'র এলাকায়। কিন্তু যে-প্রশাস্তা, তাকেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'কেন' তুমি এমন করছ? অর্থাৎ 'কেন'র প্রশ্নটা আসে তখনই, যখন জড়ের প্রশাসনভার নেয় চৈতন্য।

চৈতন্যের আদিম অস্ফুট প্রকাশ দেখি প্রাণে। সেখান থেকে জড়ের নিয়মের মধ্যে ফুটছে আরেকধরনের নিয়মের খেলা, যার মধ্যে 'কি ক'রে'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'কেন'। আদিমতম প্রাণীরও ব্যবহারের বিবৃতি আমরা দিতে পারি দুদিক থেকে। পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়ায় তার ব্যবহারে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি দিয়ে আমরা তার জীবনের যান্ত্রিক দিকের একটা বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারি। এতে তার ব্যবহারসম্পর্কে 'কেমন ক'রে'র জবাব মিলবে। কিন্তু 'কেন' তার ব্যবহার এমন হয়, সে-প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে কেবল তার নিজের কাছে, অর্থাৎ তার অনুভবের (experience) কাছে। কোনও জীবের সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান গড়ে ওঠে তার ব্যবহার এবং অনুভব দুয়ের বিবৃতি মিলিয়ে।

আদিজীবে এই অনুভবের একটা আদিম অথচ সর্বসাধারণ রূপ দেখতে পাই, যার নাম দিতে পারি জিজীবিষা বা বেঁচে থাকবার ইচ্ছা (will to live)। তার মধ্যেই তার ব্যবহারসম্পর্কে 'কেন'র জবাব পাওয়া যায়। জীবের ব্যবহার এমন কেন?—না সে বেঁচে থাকতে চায় বলে। তার জিজীবিষার রস আছে, অনুভবের একটা স্বকীয়তা আছে। এমনও বলা যেতে পারে, এই জিজীবিষা থেকেই তার ব্যবহারের স্ফূর্তি। কিন্তু বাঁচা তার সহজ এবং অব্যাহত হয় না বলে বেঁচে থাকবার একটা তির্যক্ পন্থা সে অবলম্বন করে প্রজননের (procreation) দ্বারা। ব্যক্তির জিজীবিষা তার নিজের বেলায় পরাভূত হয়, কিন্তু তার অনুবৃত্তি চলে সন্ততিতে।

জিজীবিষা আর প্রজনন, প্রাণের এই ছুটি মৌলিক বৃত্তি। তাইতে অগণিত প্রজাতিতে বিভক্ত প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে। এই বৈচিত্র্য প্রকৃতি-পরিণামের আরেকটা বৈশিষ্ট্য। জড় বা প্রাণ উভয়েরই সংস্থানে আছে বিপুল বৈচিত্র্য। অতিপরমাণুর স্বরূপের আদিম সারল্য পরমাণু অণু ও বস্তু-পুঞ্জের বৈচিত্র্যে রূপায়িত হচ্ছে। প্রাণের বেলাতেও দেখি তা-ই। জড় এবং প্রাণ প্রত্যেককে নিজের ভূমিতে রেখে, কেন এই বৈচিত্র্য প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু জড় থেকে প্রাণের উন্মেষের দিকে চেয়ে ছুয়ের সম্পর্ক বিচার করি যদি, তাহলে 'কেন' এই প্রশ্ন করা চলে। জড়-সংস্থানের কতকগুলি বৈচিত্র্য যখন প্রাণের উন্মেষের উপযোগী হয়ে দেখা দিল, তখন ব্যাপারটার একটা 'অর্থ' পাওয়া গেল, 'কেন' এই প্রশ্ন করবার একটা সুযোগ মিলল। অবশ্য এ-অর্থ জড়ের এলাকার সবখানি জুড়ে দেখা দেয় না, অর্থাৎ সব জড়সংস্থানই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এ-কল্পনা করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আগেও বলেছি, জড়ের অনেকখানি নিষ্প্রাণ থেকে যাবে। তবুও তার একাংশে যে প্রাণ অঙ্কুরিত হল, এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কেননা এর মধ্যে প্রকৃতিপরিণামের একটা অর্থের ইশারা পাওয়া গেল।

অর্থের চেতনা ক্রমে স্পষ্ট হতে শুরু করল পর্বে-পর্বে প্রাণের উন্মেষের সঙ্গে। অগণিত জীবের জীবনের অর্থ তাদের নিজের কাছে স্পষ্ট, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু সমষ্টির জীবনের অর্থ খুঁটিয়ে আবিষ্কার করা সর্বজ্ঞ না হলে সম্ভবপর নয়। তবে প্রাণোন্মেষের পর্বগুলির মধ্যে অন্যোন্যসম্পর্কের মোটামুটি একটা আদরা আমরা পেতে পারি। অজৈব (inorganic) জড় জৈবপদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে উদ্ভিজ্জ (সংজ্ঞাটি একখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে) প্রাণের মাধ্যমে। সে-প্রাণে মনশ্চেতনা আচ্ছন্ন। পশুতে—বিশেষ করে মেরুদণ্ডী পশুতে—এসে আচ্ছন্ন মন হল অনতিস্পষ্ট, মানুষে এসে হল স্পষ্ট। মনের স্পষ্টতার পরিচয় পাই বুদ্ধিতে। বুদ্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সংবিৎ থেকে চেতনাকে সে উত্তীর্ণ করেছে সামান্যভাবনায়। পশুর মধ্যে এই সামান্যভাবনা এত অস্পষ্ট যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মানুষের মধ্যে সামান্যভাবনা থেকে আসছে আরোহ আর অবরোহ (induction and deduction) এই ছুটি ক্রম অনুযায়ী যুক্তি, আসছে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই স্পষ্ট করে ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করবার ক্ষমতা। যুক্তি পারিপার্শ্বিকের অর্থকে চেতনায় স্পষ্ট করে তুলছে, কল্পনা

উত্তেজিত করছে পারিপার্শ্বিককে বদলে দেবার শক্তি। এমনি করে বিজ্ঞান আর সিসৃক্ষার দৌলতে বস্তুজগতের সমান্তরালে সৃষ্ট হচ্ছে একটা ভাবের জগৎ। জীবনে চেতনার শক্তি তাইতে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছে।

ভাবনা (ideation) পশুর মধ্যেও আছে, কিন্তু তা অস্পষ্ট। তাকে বস্তুর মত সে ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। পারে বলেই বস্তুর পর্যবেক্ষণের মত ভাবের পর্যবেক্ষণও তার সম্ভব হয়। তা-থেকেই দেখা দেয় চেতনার অন্তরাবৃত্তি (introversion)। ফলে জীব হয় আত্মসচেতন। আত্মসচেতনতা বিশেষ করে মানুষের ধর্ম, তার বুদ্ধির চরম পরিণাম।

জড় হতে ক্রমে প্রাণ মন বুদ্ধি ও আত্মসচেতনতার উন্মেষ—এই হল প্রকৃতিপরিণামের ধারা। উন্মেষের বৈশিষ্ট্য হল ভেদভাবনা (differentiation) অথবা বিবেক (discrimination)। উন্মেষের প্রত্যেকটি পর্বে মৌলিক উপাদান হতে আগন্তুক ধর্ম দেখা দিয়েছে অভেদের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি ক'রে বা বিবিক্ত হয়ে। এই বিবেক আগন্তুক ধর্মকে দিয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা নিয়ন্ত্রণের শক্তি। প্রাণ জড়কে নিয়ন্ত্রিত করছে, মন প্রাণকে, বুদ্ধি মনকে, আত্মচেতনা বুদ্ধিকে। সর্বত্র সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত করছে, একথা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু একটা বিশিষ্ট অধিকারের মধ্যে পরতত্ত্ব যে অবরতত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছে অনবরত, একথা অস্বীকার করা যায় না।

বুদ্ধিযুক্ত মানুষের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণচেষ্টা চরমে উঠেছে। তার ফলে আমরা পেয়েছি বিজ্ঞান। বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম নয়, চেতনারই ধর্ম। তাও উদ্ভিজ্জ চেতনা বা পাশব চেতনার ধর্ম নয়, বুদ্ধিযুক্ত চেতনার ধর্ম। জড় সবার মূলে, একথা কে না বলবে? কিন্তু তাবলে জড় সবার শেষ নয়। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক জড়কে বিশ্বমূল বলেও তার সাযুজ্য নিশ্চয়ই চান না। তিনি জড় হতে চান না—চান জড়কে বশে আনতে, জড়ের বশীকারদ্বারা চেতনারই তর্পণ করতে। সুতরাং বর্তমানের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কালিকপরিণামের অতীতের দিকে যদি তাকাই, তাহলে বলব জড় আদি। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলব, চেতনার উন্মেষ ও উৎকর্ষণ তার অন্ত। এই পৃথিবীতে চেতনার উৎকর্ষণের একটা সীমা থাকতে পারে, জোয়ারের পর ভাটা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও অন্তত মধ্যপথে প্রকৃতিপরিণামের গতি যে উৎকর্ষণের দিকে,

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এই উৎকর্ষণের যে একটা নিরবচ্ছিন্ন রূপ থাকা অযৌক্তিক নয়, এ-আলোচনা পূর্বের অধ্যায়ে করেছি।

উৎকর্ষ স্বীকার করছি যেখানে, সেখানেই উঠছে লক্ষ্যের কথা, অর্থের কথা। গাছ বাড়ে, ফুল দল মেলে, জীব ছোট থেকে বড় হয়, অপূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়। জগৎ জুড়ে এই পূর্ণতার সাধনা চলছে। বাইরের দৃষ্টিতে, জড়ের রূপায়ণ ও প্রাণ-পরিণামের ক্ষেত্রে এই পূর্ণতার সাধনায় দেখি একটা আবর্ত-গতি। ফুল ফুটে আবার ঝরে পড়ে, দেহে যৌবনের পরে আসে জরা। জড় ও প্রাণের বৈকল্য পাশবচেতনাকে স্তিমিত করে, কিন্তু মানুষের মন-শ্চেতনাকে না করতেও পারে। অর্থাৎ মনশ্চেতনায় এসে দেখছি, জড়ের মধ্যে স্বাভাবিক অবসাদের যে-নিয়ম, তার উজানে আরেকটা শক্তি ক্রিয়া করছে। দেহের জরা-মৃত্যুকে বিলম্বিত করব, ভোগশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখব, বুদ্ধির দীপ্তিকে রাখব অম্লান—এ-সাধনা জড়বাদীও করেন। অর্থাৎ জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁরও ভাবনার মূলসুর। এই অর্থে তিনিও ভাববাদী। সাধনায় সিদ্ধি আনতে জড়কে তিনি ব্যবহারে লাগান, কিন্তু লাগান বুদ্ধির সহায়ে। আর জড়শক্তি যখন সর্বাভিভাবী হয়ে প্রাণকে কবলিত করতে চায়, তখন অন্তশ্চেতনাকে উদ্দীপ্ত রাখবার অধিকার তাঁরও আছে। জড়ের কাছে আত্মসমর্পণকে নিশ্চয় তিনি পৌরুষ মনে করেন না। বাস্তবিক প্রাণের অবসাদ ও মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও যে-মানুষ চেতনার শিখাকে অনির্বাণ রাখবার চেষ্টা করে, সে-ই সত্য-কার মানুষ। সে পুরুষ, সে ভাববাদী। জড়বাদীর কাছেও নিশ্চয় এ-পৌরুষ কাম্য, সুতরাং বস্তুত তিনিও ভাববাদী। জড়কে তিনি মর্যাদা দেন সাধনরূপে, কিন্তু তাঁরও সাধ্য হল চেতনার উৎকর্ষ।

এমনি করে সমগ্রদৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে পারি, প্রকৃতিপরিণামের ধারা চলেছে জড়শক্তি হতে চিৎশক্তির দিকে। প্রাকৃত অনুভবে কালের বিচারে জড় প্রাগ্‌ভাবী, চিৎ পরভাবী। কিন্তু লক্ষ্যের বিচারে জড় গৌণ (তাবলে হেয় নয়), চিৎ মুখ্য। লক্ষ্যের চেতনা দেখা দেয় জীবের জীবনে। তার ব্যষ্টিরূপ খুবই স্পষ্ট, প্রত্যেক জীবের জিজীবিষাতে তার আদিম প্রকাশ। লক্ষ্যের সমষ্টিরূপের একটা আভাস পাই, যদি পরিণতির উৎকর্ষ অনুসারে জীবজাতির পরম্পরার একটা ছক আঁকি। এই পরম্পরার চরম পর্বে পাই বুদ্ধিযুক্ত মানুষকে। সুতরাং যদি বলি, জড়ের বিপুল উপাদান হতে অনেক বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রকৃতি মনুষ্যদেহের আধারে বুদ্ধির সৃষ্টি ক'রে

তার পরিণামক্রিয়ার অন্তর্গূঢ় লক্ষ্যের পরিচয় দিচ্ছে, তাহলে কথাটাতে জড়বাদীরও আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

অখণ্ডদৃষ্টিতে দেখতে গেলে জড়বাদ আর ভাববাদ অন্যোন্যসাপেক্ষ। শুধু জড়ই আছে চিৎ নাই একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি শুধু চিৎই আছে জড় নাই একথাও বলা চলে না। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, জড় বিগ্রহ—কিন্তু চিৎ তার অধিষ্ঠাতা। জড় উপাদান, চিৎ নিমিত্ত। উপাদান এবং নিমিত্ত একই তত্ত্বের দুটি ভঙ্গি। এদেশের দর্শন জড়কে নিরেট স্থূলরূপেই দেখেনি, তার ক্রমসূক্ষ্ম উৎকর্ষের কথাও ভেবেছে। ভূত, ভূতসূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়, মন, অহন্তা, বুদ্ধি—এমনি করে প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের কল্পনা সাংখ্যের। সাম্প্রদায়িক মতে এদের প্রত্যেকটি জড়ক্রিয়ার পরিণাম। কিন্তু জড়ের অতিরিক্ত আরেকটি তত্ত্বকে সাংখ্য স্বীকার করেছে—চৈতন্য। চৈতন্যের অনস্বীকার্য অস্তিত্ব আছে বলেই তা করেছে।

চার্বাকের মত যদি বলি, চৈতন্য ভূতগুণ, কিংবা নৈয়ায়িকের মত তাকে আগন্তুক ধর্ম বলি, তাতেও তার উৎকর্ষ খর্ব হয় না। ঋগ্‌বেদের ঋষি বলেছিলেন, 'হিরণ্যগর্ভ সবার আগে ছিলেন, তিনি জাত হওয়া মাত্র হলেন ভূতপতি।' চৈতন্যের বেলাতেও একথা বলা চলে। জড় হতে উৎপন্ন হয়ে চৈতন্য হয় জড়ের ঈশ্বর প্রশাস্তা এবং নিয়ন্তা—একথা জড়বাদীও স্বীকার করবেন। ব্যাপারটাকে বলা যেতে পারে—জড়ের আত্মসচেতনতা, মৃন্ময়ের চিন্ময় হওয়া। কিছু আজগবী ব্যাপারও নয়, কেননা চোখের সামনে এটা ঘটছে দেখছি।

চৈতন্য একটা উৎকৃষ্ট তত্ত্ব, একথাও মানতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু জড়বাদীর আপত্তি হবে তাকে প্রাগ্‌ভাবী বলতে। হিরণ্যগর্ভ জাত হয়েই ভূতপতি হলেন একথা তিনি মানবেন, কিন্তু তিনি সবার আগে ছিলেন এইটুকু মানতে চাইবেন না। ভাববাদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর বিরোধ। তারপর মনুষ্যসুলভ মতুয়ার বুদ্ধির বশে চৈতন্যের প্রাগ্‌ভাবকে অস্বীকার করতে গিয়ে তার উৎকর্ষকেও তিনি অস্বীকার করে বসবেন।

কিন্তু জড়ের প্রাগ্‌ভাব আর চৈতন্যের প্রাগ্‌ভাবকে একই বিচারপদ্ধতির আমলে আনা যায় না, কেননা 'প্রাগ্‌ভাব' সংজ্ঞাটি উভয় ক্ষেত্রে একই তাৎপর্য বহন করে না। জড় প্রাগ্‌ভাবী এই অর্থে যে, শক্তিপরিণামের সে আদিম আশ্রয়। প্রাগ্‌ভাব এখানে একটি কালিক সংজ্ঞা এবং শুধু গতিপরম্পরার ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শক্তিপরিণামের সঙ্গে যদি বিচিত্রগুণের প্রকাশ

হয় (এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, গুণের সার্থকতা চেতনার কাছেই, আর তার একটা অর্থক্রিয়াকারিতা বা pragmatic value আছে) এবং সেই গুণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ক্রমিক উৎকর্ষের ব্যাপার দেখা দেয়, তাহলে সে-উৎকর্ষের স্বরূপসত্তাকেও প্রাগ্‌ভাবী বলতে পারি। কিন্তু তা কালিক অর্থে নয়, নির্বিশেষ (absolute) অর্থে। একের প্রাগ্‌ভাব কালিক, অন্যের প্রাগ্‌ভাব শাশ্বত।

বস্তুত এই প্রাগ্‌ভাব একটা কালাতীত বোধ। যদি কালিক ভাবনা দিয়ে তাকে বুঝতে চাই, তাহলে বলতে পারি, তার মধ্যে আছে নিত্য-বর্তমানতার ব্যঞ্জনা। এইদিক দিয়ে তার যোগ রয়েছে বৌদ্ধিক সামান্যভাবনার সঙ্গে। প্রত্যেক বিশেষকে সামান্যের ভিত্তিতে দেখা মনুষ্যবুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম, এছাড়া যৌক্তিক চিন্তাই তার পক্ষে অসম্ভব। বহিরাবৃত্ত চেতনা এই সামান্যকে মনে করতে পারে বিশেষ সমাহারের ফলে কল্পিত একটা আচ্ছিন্ন প্রত্যয় (abstraction)। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত চেতনায় সামান্যের একটা স্বারসিক সত্তার অনুভব জাগে, যাতে তাকে ভিত্তি করে বিশেষের মনন সহজ হয়।

সামান্যের স্বারসিক সত্তার একটা পরিচয় পাই আদর্শের কল্পনায়। আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ জগৎ—এদের কোনটাই আজও পুরাপুরি বাস্তব নয়। এদের প্রত্যেকের মধ্যে যে গুণগত উৎকর্ষের ভাবনা আছে, তা মানুষের বুদ্ধিতে যতই স্পষ্ট রূপ ধারণ করে, ততই কর্মশক্তির মধ্যে আনে উদ্দীপনা, যা এখনও ঘটেনি তাকে ঘটাবার জন্য মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। আজপর্যন্ত পৃথিবীতে যত আদর্শপ্রণোদিত বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে একটা ভাবকে রূপ দেবার তাগিদ। ভাব যত দানা বেঁধেছে, বিপ্লবও তত জোরালো হয়েছে। মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ভাল হতে চেয়েছে, বৃহৎ হতে চেয়েছে, চেয়েছে বাঁধন ছিঁড়তে। তার বিপ্লব অতর্কিত ভূমিকম্পের মত আসেনি, এসেছে কারও-না-কারও সুচিন্তিত ভাবনার বিস্ফোরণে। ব্যক্তির আদর্শভাবনার তীব্রসংবেগ সঞ্চারিত হয়েছে জাতির মধ্যে, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি আচ্ছন্ন চেতনার ঘোর কাটিয়ে নিজের মধ্যে দেখতে পেয়েছে আদর্শের মূর্তবিগ্রহ নায়কের ছবি। তাইতে তার প্রাণে এসেছে উদ্দীপনা, হৃদয়ে সৌভ্রাত্র এবং প্রেম। এসমস্তই ভাবনার ফল এবং সে-ভাবনার গতি সর্বত্র সামান্যের দিকে, একটা শাশ্বত অর্থের দিকে। বস্তুত সব বিপ্লবীই ভাববাদী।

অখণ্ডদর্শনে ভাব আর বস্তু স্বতোবিরুদ্ধ নয়, অন্যোন্যাশ্রিত। ভাব বস্তুর অর্থ, বস্তু ভাবের রূপায়ণ। চিৎ জড়ের অন্তর্যামী, জড় চিৎশক্তির প্রকাশের আশ্রয়। দুয়ের মাঝে এই সামরস্যের ভাবনা যেখানে বিফল হয়, সেখানেই অনর্থ দেখা দেয়। জড়বাদীর 'নাস্তি' আর ভাববাদীর 'নেতি'—দুইই এক-দেশদর্শী। একজন বড় করছেন সাধনকে, আরেকজন সাধ্যকে। কিন্তু সাধ্য আর সাধনকে কি পৃথক করা চলে?

আপত্তি উঠতে পারে ভাবের অতিভাবী (transcendent) সত্তা নিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ। ভাব বস্তুকে ছাড়িয়ে যায়, জড়কে ছাড়িয়ে যায় চিৎ। এমনি করে ছাড়িয়ে না গেলে উৎকর্ষের ভাবনা বা উপাদানের প্রশাসন কোনটাই সম্ভব হতে পারে না। এটি বিশেষ করে ফোটে আত্ম-চৈতন্যের বেলায়। চেতনা পশুরও আছে, উদ্ভিদেরও অন্তঃসংজ্ঞা আছে। কিন্তু তা বিবিক্ত নয়। তাই তাদের ব্যবহার যান্ত্রিক। মানুষের মধ্যে দেখা দিল আত্মসচেতনতা। একই চেতনাতে দেখা দিল তিনটা পর্ব—জৈব ব্যাপারে যান্ত্রিক চেতনা, বৌদ্ধিক ব্যাপারে নিয়ামক চেতনা, তাছাড়াও তটস্থ সাক্ষি-চেতনা। নিয়ামক চেতনা বস্তুত স্ব-তন্ত্র কি না, এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। একপক্ষ বলেন, মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সমস্তটা জগৎ একটা বিরাট যন্ত্র, সুতরাং মানুষের ইচ্ছাও যন্ত্র-তন্ত্রিত। আরেকপক্ষ বলেন, মানুষের স্বাতন্ত্র্যের বোধ আছে; এই বোধের যদি কোনও ভিত্তি না থাকবে, তাহলে এ এল কোথা থেকে?

এ-বিতর্কের সবচাইতে সুষ্ঠু মীমাংসা বোধ হয় সাংখ্যবাদীই করেছেন। সাংখ্যমতে শক্তিপরিণামের চরম উৎকর্ষ বুদ্ধিতে, সে-বুদ্ধিও জড়। কিন্তু জড়ত্ব বলতে বুঝি দৃশ্যত্ব। অর্থাৎ বুদ্ধিরও বোধ সম্ভব, এই অর্থে তা জড়। সে-বোদ্ধা দ্রষ্টা, জগদ্‌ব্যাপারের সাক্ষী বিবিক্ত পুরুষ। এই সাক্ষীর মধ্যে পাই স্বাতন্ত্র্যের প্রত্যক্-বৃত্ত অনুভব। অনুভবের একটা স্বারসিক সত্তা আছে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

সাক্ষিত্বের অনুভবের অর্থক্রিয়াকারিতা আছে—ব্যতিরেকমুখে তার পরিচয় পাই তিতিক্ষাতে। সাধারণ জীবনেও তিতিক্ষা একটা স্বাতন্ত্র্যের বোধ জাগায়। দুঃখের আঘাতে যে মুষড়ে পড়ল না, আরও যে সজাগ হয়ে উঠল, আত্মচৈতন্যের একটা নূতনরূপ সে আবিষ্কার করল, আবিষ্কার করল তার মধ্যে ঐশ্বর্যের (mastery) বোধ। সেইসঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে

কতকগুলি কল্যাণগুণেরও আবির্ভাব হল। এটা সাক্ষিত্বের অন্বয়মুখী অর্থ-ক্রিয়াকারিতা। চৈতন্য অতিভাবী এই দুই অর্থে—তিতিক্ষায় এবং তারই অনুষঙ্গে কল্যাণগুণের স্ফুরণে।

এইসঙ্গে আরেকটি ব্যাপার ঘটে—চেতনার বিস্ফোরণ। বিশ্বযন্ত্রকে তখন আর আমার বাইরে বলে অনুভব হয় না। সুতরাং সে-যন্ত্রের যে নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া (নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যন্ত্র হয় না, বিজ্ঞানও দাঁড়াতে পারে না), তা তখন হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য তখন আর বলাৎকার বোঝায় না, বোঝায় স্বরূপশক্তির উল্লাস। এ-অনুভব তো অবাস্তব নয়। স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসেই সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হয়। মানুষের বাঁধন খুলে যাক, সে স্রষ্টা হ'ক—এ-আকূতি সর্বজনীন। ভাববাদী এবং জড়বাদীতে এখানে তফাত নাই।

সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যকে যদি সর্বজনীন ধর্ম বলে স্বীকার করি, তাহলে জড়বাদের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলেও জড়ের মূঢ়তা এবং যান্ত্রিকতাকে ছাপিয়ে উঠি। তাতে যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করা হয় না, কেননা যন্ত্র যন্ত্রীরই সপ্রয়োজন সৃষ্টি। যন্ত্রী নাই, শুধু যন্ত্র আছে—চৈতন্যের উন্মেষের পর আর একথা বলা চলে না। যন্ত্র নিখুঁত হয়, যখন তার মধ্যে ইচ্ছার অঙ্ক হয় শূন্য ; কিন্তু সেই ইচ্ছা ফুটে ওঠে যন্ত্রীর মধ্যে। বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কযন্ত্রের উদ্ভাবনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কিন্তু তাতে উদ্ভাবকের চেতনা আনন্দ সঙ্কল্প পরিকল্পনা এগুলি বাতিল হয়ে যায়নি। প্রমাণিত হয়েছে, বুদ্ধির ক্রিয়াও জড়ক্রিয়া। কপিল হেসে বলবেন, 'বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার ; কিন্তু হে বুদ্ধিমান, তবুও তুমি আছ, আমি আছি।'

আবারও বলি, মতুয়ার বুদ্ধির বশে জড়বাদ আর ভাববাদ নিয়ে হানাহানিটা একদেশদর্শিতার পরিচয়। সাদা চোখেই দেখতে পাচ্ছি, জড় হতে চিতের উন্মেষ হচ্ছে, কিন্তু উন্মেষের পরে চিৎ নিচ্ছে জড়ের শাসনভার। সে-শাসন কিন্তু শোষণ নয়, জড়ের উৎকর্ষণ। এই উৎকর্ষণের প্রবৃত্তি চিতের স্বাভাবিক ধর্ম। জড়কে আশ্রয় করে তার এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ঘটছে, তাই জড় হেয় নয়। কিন্তু তাহলেও সে যা আছে তা-ই থাক, এ কেউ চায় না—চায় তার রূপান্তর। রূপান্তরই তাহলে উপাদেয়। রূপান্তরের একটা অস্পষ্ট প্রবেগ জড়ের মধ্যে আছে, তা সুস্পষ্ট হয়েছে বিবিক্ত চেতনায়। বিশুদ্ধ জড়ত্বের চাইতে বিবিক্ত চেতনা তার পরতর তত্ত্ব। লৌকিক পুরাণে বলে, মহাশক্তি মহেশ্বরকে প্রসব করে তারপর তাঁকে পতিত্বে বরণ করলেন।

জড়শক্তি আর চিৎশক্তিরও সম্বন্ধটা এইধরনের। দুয়ের আপাতবিরোধ গোড়ার দিকে, অপরিণত বুদ্ধির কাছে—পূর্ণপ্রজ্ঞের কাছে নয়। উপাদান হিসাবে জড়কে বিশ্বমূল বলতে পারি, এই হল দর্শনের একদিক। কিন্তু নিমিত্ত হিসাবে আবার চিৎকেই বলব বিশ্বমূল, এই হল দর্শনের আরেকদিক। উপাদান আর নিমিত্ত একই তত্ত্বের দুটি ভঙ্গি। কিন্তু একথা চেতনার উৎকর্ষের দিকে খানিকটা এগিয়ে না গেলে কিংবা মুক্তচেতনার স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন না করলে বোঝা যায় না। জড়বাদী আর চিদ্‌বাদী দুয়েরই গোঁড়ামি এক্ষেত্রে একটা মস্ত বাধা।

প্রকৃতিপরিণামের স্বরূপ ও রীতি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা গেল, কেননা সাম্প্রতিক দর্শনে এ নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরিণামের ধারা চলেছে জড় হতে চিতের উন্মেষ ও উৎকর্ষণের দিকে, এই অবিসংবাদিত সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে এবার আমরা চিন্ময়পরিণামের ধারাকে অনুসরণ করব।

মানুষ বিশেষ করে মনোময় জীব। তার মধ্যে মনের উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে বুদ্ধি এবং আত্মসচেতনতা এই দুটি বৃত্তির উন্মেষে। বুদ্ধি তাকে দিয়েছে সামান্যের সুস্পষ্ট বোধ, যাতে সে ভাবকে বস্তুর মত ব্যবহার করতে শিখেছে এবং যুক্তির সহায়ে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমাকে দিন-দিন প্রসারিত করে চলেছে। এমনি করে সে বহির্জগতের জ্ঞান অর্জন করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার কৌশলও কতকটা আয়ত্ত করেছে। সেইসঙ্গে আত্মসচেতনতা তাকে দিয়েছে অন্তর্জগতের জ্ঞান, যাহতে ব্যাবহারিক মনোবিদ্যার সৃষ্টি। মনোবিদ্যার যেমন একটা লৌকিক দিক আছে, তেমনি লোকোত্তর একটা দিকও আছে। তারও বয়স লৌকিক মনোবিদ্যারই মত প্রাচীন। এই অলৌকিক মনোবিদ্যার একটা সাধারণ নাম দিতে পারি অধ্যাত্মবিদ্যা। মনোময় মানুষের পরে চিন্ময় মানুষের আবিষ্কার এই বিদ্যার মুখ্য কৃতিত্ব। এ-আবিষ্কারের একটা ইতিহাস আছে, এখন তারই আলোচনা করব।

অতি প্রাচীন কাল হতে অধ্যাত্মবিদ্যার তিনটি বিভঙ্গ দেখা দিয়েছে—ধর্মসাধনা, রহস্যবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিচার। তার মধ্যে প্রথম দুটির ভিত্তি হল একধরনের অলৌকিক অনুভব। সেই অনুভবকে লৌকিক অনুভবের

সঙ্গে মিলিয়ে প্রাকৃত-বুদ্ধিগ্রাহ্য করবার চেষ্টায় তৃতীয়টির উদ্ভব। আমরা একথাও জানি, রহস্যবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিচারের মূলে মানবমনের যে-জিজ্ঞাসা ছিল, আধুনিক যুগে তার বৌদ্ধিক পরিণাম হল বিজ্ঞান এবং দর্শন। পাশ্চাত্যদেশে এ-দুটির প্রভাব প্রবল হওয়াতে ধর্ম সম্প্রতি অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবিদ্যার তিনটি বিভঙ্গেরই সুসমঞ্জস অনুশীলনের প্রচেষ্টা বরাবর ছিল বলে কালক্রমে একটা পূর্ণাঙ্গ যোগপদ্ধতি এবং চিন্ময় মানুষের বিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট ধারা দেখা দিয়েছে। একথা ক্রমে পরিস্ফুট হবে।

ধর্মবোধ মানবমনের একটি আদিম বৃত্তি। এর উদ্ভব সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত, তাদের উল্লেখ এবং বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। আদিম ধর্মবোধের মধ্যে অমার্জিত এবং বাঁকাচোরা অনেক-কিছুই থাকতে পারে। তার কারণ হল প্রকাশের কুণ্ঠা। প্রকৃতিপরিণামের সর্বত্র আদিপর্বে নানা বিকৃতি দেখা দেয়। কিন্তু তার মধ্যেও ভবিষ্য উৎকর্ষের একটা আভাস থাকে, যার বীজশক্তি কালক্রমে সম্ভাবিত পরিণামকে সিদ্ধ করে। ধর্মবোধের সঙ্গে অবান্তর যত মনোবৃত্তিই জড়িয়ে থাকুক না কেন, তার বীজশক্তি নিহিত রয়েছে মহিমবোধে (sense of the sublime)। মহিমবোধ চেতনাকে যেমন অভিভূত তেমনি উদ্দীপিতও করতে পারে—তার আলম্বন পরাক্-বৃত্ত (objective) হতে পারে, প্রত্যক্-বৃত্তও (subjective) হতে পারে। পরাক্-বৃত্ত উদ্দীপনা ক্রমে প্রত্যক্-বৃত্ত হচ্ছে, এই হল ধর্মবোধের স্বভাবসিদ্ধ পরিণামের ধারা। এদেশের বৈদিক ধর্মের ইতিহাসে এই ধারার যে সুদীর্ঘ ক্রমবদ্ধ বিবৃতি পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর আর-কোথাও মেলে না। এই ক্রমবিকাশের আদর্শে ধর্মবোধের উন্মেষকে বিচার করলে নৃবিদ্যার অনেক সিদ্ধান্তে আরও যৌক্তিকতা এবং শৃঙ্খলা দেখা দিত।

একটা অনন্ত দুর্জ্ঞেয় শক্তির অনুভবে চেতনার অভিভব, এটিকে বলা চলে আদিম ধর্মবোধের লক্ষণ। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এই শক্তিকে প্রসন্ন করবার আকাঙ্ক্ষায় তখন নানা 'ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের' সৃষ্টি হতে থাকে, যার মধ্যে অজ্ঞতা এবং মূঢ়তার প্রভাব কিছু কম থাকে না। কিন্তু আত্মসচেতনতার মতই মহিমবোধও মনের চেতনার একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এবং দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত। তাতেই মহিমবোধ কখনও আত্মচৈতন্যে প্রতিফলিত হয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করে। তখন অন্তরের দিক দিয়ে অনুভূত হয় দেবশক্তির সঙ্গে একটা সাযুজ্য এবং মূঢ়তার ঘোর কাটিয়ে বুদ্ধিও তার সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। স্বভাবতই তখন বাহ্যিক ক্রিয়াবাহুল্যের দিকে আর মানুষের তত ঝোঁক থাকে না। বাহ্যক্রিয়ার স্থান তখন অধিকার করে আন্তরক্রিয়া বা যোগ। ক্রিয়াকাণ্ড থাকলেও তা প্রতীকধর্মী (symbolic) হয়ে দাঁড়ায়—অতি প্রাচীনকাল হতেই এদেশে যেমন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যোগপন্থায় অন্তশ্চেতনার অনুশীলনের ফলে ধার্মিকদের মধ্যে দেখা দেন মরমী বা সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা সর্বত্রই সমষ্টির অধ্যাত্মপ্রগতির অগ্রদূত বা দিশারী। প্রত্যেক ধর্মের একটা সামাজিক রূপ আছে যা গতানুগতিক এবং চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন করে থাকে—শুধু বাইরের ব্যাপারেই নয়, আন্তর ব্যাপারেও। উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ প্রথম পায় এই সামাজিক ধর্মের দীক্ষা। কিন্তু যদি কখনও তার আধ্যাত্মিক দ্বিজত্বলাভের সৌভাগ্য হয়, তাহলে অন্তরের তাগিদে গতানুগতিকতার গণ্ডি সে পেরিয়ে যায় এবং শক্তি থাকলে অতীতের সংস্কারান্ধতাকে কখনও-কখনও প্রবলভাবে আঘাত করে। তাতে গণচিত্তের জড়তার ঘোর কেটে সমষ্টির অধ্যাত্মপ্রগতি আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। ধর্মবোধের পরিণামও এমনি করে প্রাণপরিণামের সাধারণ ধারাকে অনুসরণ করে চলে। তার স্বাভাবিক গতি হয় চেতনার অভিভব হতে উদ্দীপনা, পরাক্-বৃত্তি হতে প্রত্যক্-বৃত্তি, বাহ্য-ক্রিয়া হতে আন্তর-যোগ এবং বশ্যতা হতে সাযুজ্যের দিকে। এই প্রগতির প্রেতি (impulsion) আসে একটা মহিমবোধের ক্রমিক বিস্ফোরণে, যার চরম পরিণামকে এদেশে ঘোষণা করা হয়েছিল 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' উপনিষদের এই মন্ত্রে।

ধর্মসাধনার আরেকটা দিক প্রকাশ পেয়েছে রহস্যবিদ্যার (occultism) অনুশীলনে। অনন্তশক্তির দুর্জ্ঞেয়তা এবং অভিভবের দরুন এই বিদ্যার শৈশবে দেখা দেয় নানারকম তুক-তাকের ব্যাপার। ক্রিয়াবাহুল্যের মতই তার মধ্যে অনেকখানি অজ্ঞান এবং অযৌক্তিকতার খাদ মেশানো থাকলেও তার মূলে আছে মানুষের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি—তার ইচ্ছার অপ্রতিহতির আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতিকে তার ইচ্ছার অধীনে আনবার সাধনা মানুষ চিরকালই করে এসেছে এবং এখনও করছে। এক্ষেত্রে রহস্যবিদ্যা আর জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে একটা ধারাবাহিকতা আছে। রহস্যবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক আজগবী

বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু রহস্যবিদ্যার মৌলিক প্রেরণাকে ধীরভাবে বিচার করলে তার দাবিকে এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। জড় দিয়ে জড়কে বশে আনবার সাধনায় বৈজ্ঞানিক অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব যে প্রাচীন রহস্যবিজ্ঞানীর চাইতে অনেক বেশী তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এতেই প্রকৃতির সব রহস্যের আবিষ্কার কিংবা তার সব শক্তির উপযোগ এখনও সম্ভব হয়নি। সুতরাং রহস্যবিদ্যার এলাকায় নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ এখনও আছে মানতে হবে।

প্রাচীন রহস্যবিদ্যার একটা মৌলিক সমস্যা হল, শুধু মনের শক্তিতে জড় প্রাণ ও মনের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় কিনা। আমার ইচ্ছা আমার দেহ-প্রাণ-মনের উপর খানিকটা খাটে, এটা সাধারণভাবেই দেখতে পাই। দেহ-প্রাণ-মনের প্রাকৃত ক্রিয়া যে মনঃশক্তির কতখানি বশীভূত হতে পারে, তার পরিচয় এদেশের যোগীরা দিয়েছেন। ধর্মসাধনার মত রহস্যবিদ্যাও এক্ষেত্রে বাইর থেকে অন্তরের দিকে মোড় ফিরেছে, বাহ্যক্রিয়া রূপান্তরিত হয়েছে অধ্যাত্মযোগে। এইখান থেকে রহস্যবিদ্যা বিজ্ঞানের মতই বৌদ্ধিক বিচারের এলাকায় এসে পড়েছে বলে তার যৌক্তিকতার পরীক্ষার দাবিকে আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

আমার মনঃশক্তি যেমন আমার দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, তেমনি অপরের দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়াকেও কি পারে ? তাও যে পারে, তার প্রমাণ খুব দুর্লভ নয়। এক্ষেত্রে সম্মোহনশক্তির কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এর অধিকার যে কতখানি বিস্তৃত, তা ভেবে দেখবার মত। পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে অধ্যাত্মক্ষেত্রে প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে সর্বত্র দুর্বলকে নিয়ন্ত্রিত করছে, এ তো দেখতেই পাচ্ছি। বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রভাব যে কতখানি কার্যকরী হতে পারে, তার পরিচয় মেলে মনোবিকলন (psycho-analysis) এবং চিকিৎসাবিদ্যায়। সম্প্রতি প্রাকৃত মনোবিদ্যাতেও E.-S. P. এবং P.-K. Effectএর আবিষ্কারে তার সীমানা আরও প্রসারিত হয়েছে, ইন্দ্রিয়সংযোগ ছাড়াও যে জড়ের অনুভব এবং সঞ্চালন অসম্ভব নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। এসমস্তই মনঃশক্তির উপযোগের আরেকটা রীতি এবং ক্ষেত্রের প্রতি ইশারা করছে। তাকে অবহেলা করা নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় হবে না।

মনঃশক্তির আবিষ্কারকে যে অনেকদূর প্রসারিত করা চলে, রহস্যবিজ্ঞানীর এ-অভ্যুপগমের মূলে দার্শনিক যুক্তি আছে। এদেশের যোগবিজ্ঞানে তা নিয়ে

অনেক আলোচনাও হয়েছে, তার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। মোটের উপর বলা চলে, যে-কোনও দ্রব্যের মধ্যে শক্তির যেটুকু ব্যক্ত হয়েছে, তার পিছনে আছে একটা সম্ভাব্য অব্যক্তের ভূমিকা। তাহতে আনকোরা নতুনের অভিব্যক্তি অসম্ভব কিছুই নয়—যদি তার কৌশল আয়ত্ত করা যায়। প্রত্যেক জাতিরূপকে আমরা কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তির আধাররূপে সক্রিয় দেখি। এ যেন আল বেঁধে খেতের মধ্যে খানিকটা জল ধরে রাখার মত। কিন্তু আল ভেঙে দিলে বাইরের জল ভিতরে ঢুকে জাতিরূপের অন্যথা-পরিণাম (transformation) ঘটাতেও পারে। প্রকৃতির বিভিন্ন পর্বকে আমরা পায়রা-খুপী মনে করি ব্যাবহারিক প্রয়োজনে—স্থূলত তা কতকটা সত্যও বটে। কিন্তু প্রকৃতি যত সূক্ষ্মতার দিকে এগিয়ে চলে, শক্তির অন্যোন্যসংক্রমণ ততই নির্বাধ হয়। জড়, প্রাণ, মন একই প্রকৃতির ক্রমসূক্ষ্ম পর্ব। সূক্ষ্মতার গতি এখানে চিৎপ্রকাশের দিকে। চিৎ যে নিয়ামকশক্তি, তা আমরা আগেই দেখেছি। চিৎশক্তি জাগ্রত হয়ে প্রাকৃতশক্তি হতে যদি আলাদা হয়ে যায়, তাহলে সে তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই উপায়েই মানুষের বুদ্ধি জড়ের এবং প্রাণ-মনের উপর খানিকটা কর্তৃত্ব করছে।

প্রাণ-মনের উপরে কর্তৃত্ব অনেকটা নিরঙ্কুশ হতে পারে ব্যক্তির নিজের বেলায়, যদি সে চিৎশক্তিকে প্রাকৃতশক্তি হতে বিবিক্ত করতে পারে। এইটাই যোগের আবিষ্কার। বিবিক্ত চিৎশক্তি আধারের অনেক অবরুদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিতে পারে, এই সম্ভাবনাই বিভূতিবিদ্যার মূলে। বিবিক্ত চিৎশক্তিতে একটা বিস্ফোরণের ক্রিয়াও ঘটে, তাকেই আগে বলেছি মহিমবোধ। এই বোধে আধারে-আধারে যে ভেদের প্রাচীর, তা ভেঙে পড়ে। তখন উদ্‌বুদ্ধ আধারের জ্ঞান ও ক্রিয়া অপর আধারেও সংক্রামিত হতে পারে। অন্তত 'সংক্রামিত হ'ক' এমন-একটা প্রবল ইচ্ছার বিকিরণ উদ্‌বুদ্ধ আধারে হয়ই। তাতে সাড়াও যে বাইরে জাগে না, তাই-বা কি করে বলি? জগতে ভাবের বিপ্লব এসেছে এমনি করেই। ভাবসিদ্ধ কোনও আধারে একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে। গণচিত্ত যদি তৈরী থেকেছে তো রাতারাতি দুনিয়া পালটে গেছে। তা না হলে তার ক্রিয়া হয়েছে মন্থর। তখন আবার কোথাও তরঙ্গ উঠেছে। এমনি করে পথিকৃৎরা বারবার এসেছেন, যতদিন না উপরের চাপে নীচের গভীরে সাড়া জেগেছে।

এমনিতর ভাবসংক্রমণও রহস্যবিদ্যার অন্তর্গত, বরং বিভূতিযোগের

এই হল উত্তম রহস্য। এখানে কারবার অধিচেতনাকে নিয়ে। সম্যক্-সম্বুদ্ধের সিদ্ধচেতনা চায় সমষ্টিচেতনার মুক্তি। শুধু কি তা-ই? আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সে চায়, মুক্তির সে-ঐশ্বর্য ঘটাক আধারেরও রূপান্তর—এখানে-ওখানে একটি-দুটি আধারের নয়, সমগ্র আধারতত্ত্বেরই রূপান্তর। রূপান্তরের প্রবর্তনা জাগুক পার্থিব প্রাণের মূলে, জাগুক তারও আধার পার্থিব জড়ের মূলে। জড় প্রাণ আর চেতনার মাঝে সব আড়াল ভেঙে যাক। গাছে ফুল ফুটেছে, আকাশে রং ধরেছে, অথচ মাধুরীর চেতনা রইল কবির চোখে। কিন্তু তা কেন? মৃন্ময়ী কি চিন্ময়ী হয়ে নিজের মাধুরীর পরিচয় নিজেই নেবে না? পুরুষ আর প্রকৃতি দুইই কি নিখিলসত্তার অণুতে-অণুতে সামরস্যের নিটোল আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠবে না?

রহস্যবিজ্ঞানীর এই হল পরম আকূতি। এই মহাসিদ্ধির কাছে আর-সব সিদ্ধি তুচ্ছ। কিন্তু আত্মোন্মীলনের পথে ধাপে-ধাপে এগিয়ে না গেলে এর যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। অবিশ্বাসী প্রাকৃত-চিত্ত যেমন একে আজগবী বলে উড়িয়ে দেবে, খুশি-বিশ্বাসীও তেমনি এ নিয়ে রচবে আকাশ-কুসুম। মহাসিদ্ধিকে রূপ দেবার দায় একমাত্র সম্যক্-সম্বুদ্ধের। রূপকৃৎ চিৎশক্তি শুধু চেতনার উপরেই কাজ করে না, জড়ের উপরেও করতে পারে! কিভাবে, তার যুক্তি আছে। তার একটুখানি আভাস আগে দিয়েছি, কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

আরেকটা কথা। জড়বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধিরই প্রয়োজক হল আমাদের স্বভাবগত অবিদ্যা। অবিদ্যার বাধাকে স্থূল উপায়ে কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টায় আমরা জীবনকে দিনের পর দিন জটিল করে তুলছি। যতদিন এই অবিদ্যার ঘোর না কাটবে, ততদিন জড়সিদ্ধির উপযোগিতাও থাকবে। কিন্তু রহস্য-বিজ্ঞানী চাইছেন, বিশ্বের চেতনা হতে অবিদ্যার নাগপাশ শিথিল করতে। শক্তিসংক্রমণের ফলে এ যদি সম্ভব হয়, মানুষের চেতনায় যদি রূপান্তর আসে (বলা বাহুল্য, এটা জড়বিজ্ঞানীরও কাম্য—কেননা উৎকর্ষের সাধক আমরা সবাই), তাহলে জড়সিদ্ধির অনেক-কিছুই অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি বিলুপ্ত হলে রাষ্ট্রতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকবে না, এ-স্বপ্ন অনেকেই দেখেন। তেমনি বলা যেতে পারে, মানুষের বুদ্ধি যদি স্বচ্ছ হয় তো মনের অনেক জটিলতা এবং বাক্যের অনেক আড়ম্বর আপনাথেকেই কমে যাবে এবং তাদের জিইয়ে রাখবার জন্য বর্তমান জগতে যে বিপুল প্রচেষ্টা চলছে তারও অবসান ঘটবে।

এমনি করে অন্তরাবৃত্তির ফলে আধুনিক সমাজের বহু বাহুল্য এবং কৌটিল্য (যা নিয়ে আমরা অনেকসময় বোকার মত বড়াই করি) অনায়াসে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হবে। সেই মুক্ত পরিবেশ হবে রহস্যবিজ্ঞানীর যথার্থ ল্যাবরেটরী। জড়সিদ্ধি তখনও থাকবে, কিন্তু ভারমুক্ত হয়ে তা হবে অধ্যাত্মসিদ্ধির অনুবর্তী। জড় প্রাণ ও মন এই তিন ক্ষেত্রেই চিৎশক্তির সাধনা হবে সুসমঞ্জস ও নিরঙ্কুশ।

তারপর অধ্যাত্মবিদ্যার তৃতীয় অঙ্গ—দর্শন। দর্শন বুদ্ধির সৃষ্টি। বুদ্ধির সাধারণ অবলম্বন হল ইন্দ্রিয়নির্ভর মন। কিন্তু তার মধ্যে যে সামান্যভাবনার বৃত্তি আছে, তা-ই হল তার বৈশিষ্ট্য। এই সামান্যভাবনার সহায়ে অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও বোধ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব। ন্যায়ের আরোহ এবং অবরোহ অনুমানে আমরা তার পরিচয় পাই। অনুমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি। তবে অনুমান চরম প্রমাণ নয়। চরম প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ। অনুমান যদি প্রত্যক্ষাশ্রিত অথবা প্রত্যক্ষপর্যবসান হয়, তাহলেই তার সার্থকতা। অনুমানকে প্রত্যক্ষ দিয়ে তন্ত্রিত করা কিংবা বিশেষের প্রত্যক্ষ হতে সামান্যের অনুমানের দিকে এগিয়ে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো বুদ্ধির কাজ। এমনি করে বুদ্ধি জ্ঞানের একটা সার্বভৌম তন্ত্র (universal system) তৈরি করতে পারে। এই তন্ত্রই হল দর্শন।

দর্শন প্রত্যক্ষাশ্রিত হওয়া চাই। কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষই শুধু প্রত্যক্ষ নয়, তাছাড়া আন্তর প্রত্যক্ষও আছে। অনেক দার্শনিক মনকে বলেন অন্তরিন্দ্রিয়। তাহলে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরকে জানা আর অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে ভিতরকে জানা, দুইই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এলাকায় পড়ে। এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান—জড়বিজ্ঞান হতে মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত সবরকমের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানের সমাহার করে সৃষ্ট হচ্ছে দর্শন। স্পষ্টতই এ-দর্শন ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষবাদের (positivism) আশ্রিত।

কিন্তু ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ কি প্রত্যক্ষের শেষ সীমা? বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ দিয়ে জানা শেষ হয়ে যায় না, অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের কাছে খুলে যায় আরেকটা বিরাট জগৎ। সেখানেও জানার শেষ হয় না। অন্তর্জগতের জ্ঞান প্রাকৃত

এবং অপ্রাকৃত দুই উপায়েই হতে পারে। প্রাকৃত উপায় হল মন দিয়ে জানা—প্রত্যক্ষভাবে নিজের অন্তরকে এবং পরোক্ষভাবে বা অনুমানের দ্বারা অপরের অন্তরকে। এদেশের মনোবিজ্ঞানীরা একটা অদ্ভুত কথা বললেন, মন দিয়ে জানার ব্যাপারটা যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে আরেকধরনের জানা সম্ভব হয়—যা অতীন্দ্রিয় এবং অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের তাঁরা নাম দিলেন প্রাতিভসংবিৎ। যে উপায়ে বা প্রমাণের সহায়ে এ-জ্ঞান হয়, তার নাম দিলেন প্রজ্ঞা বা বোধি।

এই বোধিই হল অধ্যাত্মবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মদর্শনের উপজীব্য। বোধির দর্শন আর বুদ্ধির দর্শন দুয়ে মিলে দর্শনের পূর্ণতা।

বোধির দর্শন অতীন্দ্রিয়ের কারবারী। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বলতে এখানে আজগবী কিছু বোঝায় না। অতীন্দ্রিয়তা বস্তুত ইন্দ্রিয়ের অতিরেক, তার বীজ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই আছে। বহিরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি পরাক্ (objective), তাতে আসে বিষয়-সচেতনতা। কিন্তু চেতনার বৃত্তি পরাক্ এবং প্রত্যক্ (subjective) দুদিকেই কাজ করে। তাই বিষয়-সচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট হলেও আত্ম-সচেতনতা কিছু-না-কিছু দেখা দেয়ই। আত্ম-সচেতনতার প্রথম উন্মেষ হয় আচ্ছন্ন, জৈব মানসবোধের সঙ্গে জড়ানো। এই অবিবিক্ত বোধ বিবিক্ত হবার সুযোগ পায় মানুষের মধ্যে। তার গোড়ায় থাকে একটা সচেতন উৎকর্ষণের প্রেরণা। মানুষ ছোট আমির উপরে দেখতে পায় একটা বৃহৎ আমিকে। দেখাটা স্পষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ের পরাক্-বৃত্তিকে প্রত্যাহৃত করলে। তখন আত্মশক্তির একটা প্রশান্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন এবং মহিমময় বোধে বোধির সুস্পষ্ট উন্মেষ হয়। ইন্দ্রিয়বোধের উজানে এই বোধি প্রথম দেখা দেয় বিদ্যুৎ-চমকের মত। অভ্যাসে চঞ্চল বিদ্যুৎ স্থির হয়, হয় ইন্দ্রিয়ের পরাক্-বৃত্তিরও প্রবর্তক। তাইতে সম্ভব হয় গীতোক্ত যোগস্থের কর্ম। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে-কোনও মানুষের কর্মপ্রবৃত্তির মূলে এই ভাবটি আছে—অস্পষ্ট হয়ে, ব্যামিশ্র হয়ে। অন্তরাবৃত্তির ফলে যত তার ব্যামিশ্রভাব কেটে যায়, ততই আত্মসমাহিতি এবং আত্মবিকিরণ দুইই তার পক্ষে সহজ হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দুটি ব্যাপারই শুদ্ধবোধের ক্রিয়া এবং স্বরূপত তা অতীন্দ্রিয়।

অতীন্দ্রিয় আত্মবোধই হল দর্শনের মূল। অন্তত এদেশে দর্শনের ইতিহাস তা-ই। উপনিষদে গীতায় এবং অবশেষে যোগদর্শনে তার একটা ধারাবাহিক

বিবৃতি পাই। পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম দর্শন আর বিজ্ঞানের মাঝে একদিন খুবই রেষারেষি চলেছিল, কিন্তু আজকাল তার ঝাঁঝ একটু কম। ধর্মবিশ্বাসের অনুকূলে দার্শনিক যুক্তি আবিষ্কার করা এবং দার্শনিক যুক্তিকে বস্তুনিষ্ঠ করা, এই হল ওদেশে তত্ত্বজিজ্ঞাসার ঐতিহাসিক ক্রম। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতা সেখানে চিত্তের পরাক্-বৃত্তিকে বিশেষ করে আশ্রয় করেছে বলে অধ্যাত্মজগতে আর বাস্তবজগতে একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে। এদেশের তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা এ-ভুলটি করেননি। গোড়া থেকেই তাঁদের দৃষ্টি নিহিত হয়েছে আত্মবোধের 'পরে, ধর্মবোধকে তাঁরা দিয়েছেন প্রত্যক্-বৃত্তির মূল্য। তাইতে অধ্যাত্মবিদ্যা আর মনোবিজ্ঞান বরাবরই এদেশে পাশাপাশি চলেছে, যার ফলে মানসোত্তর একটা বিজ্ঞান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এ-প্রয়াস এখনও থেমে যায়নি, আমরা পূর্ণযোগে দেখি তারই একটি সমৃদ্ধতর অনুবৃত্তি। এ-দর্শনে আধ্যাত্মিক বস্তুনিষ্ঠা এবং আধিভৌতিক বস্তুনিষ্ঠা দুইই মর্যাদা পেয়েছে এবং দুয়ের সমাহারে একটি পূর্ণাঙ্গ তন্ত্র গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সম্যক্-দর্শনই হল দর্শনানুশীলনের সার্থক পরিণাম। তার সাধন হল সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির ঔদার্য। জীবনের সমস্ত তত্ত্বকে সে-বুদ্ধি অপক্ষপাতে স্বীকার করবে, আধ্যাত্মিক দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার কি একদেশ-দর্শিতার বশবর্তী হয়ে অখণ্ড সত্যকে সে খণ্ডিত করবে না। তার বস্তুনিষ্ঠা অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ দুয়ের ব্যাপারকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার আমলে আনবে এবং প্রাণের মূলে নিহিত স্বোত্তরণের আকূতিকে করবে স্বনিরূপিত বস্তুতন্ত্রের নিয়ামক। তাহলেই তার দর্শন ভবিষ্যতের দিগন্তে দেখতে পাবে এক নতুন অভ্যুদয়ের ছটা, যা মানুষের জীবনকে একটা বৃহৎ সৌষম্যের ভাবনায় উদ্দীপ্ত করবে।

মোটের উপর কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই। মানুষকে বৃহৎ হতে হবে, এ-আকূতি তার প্রাণের মূলে। তার এই বৃহত্ত্ব সিদ্ধ হয় চেতনার এবং শক্তির উৎকর্ষণে। সিদ্ধির উপায় লৌকিক এবং লোকোত্তর দুইই হতে পারে। অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনা হল সিদ্ধির লোকোত্তর উপায়। যা লোকোত্তর, তা লৌকিকেরই অতিরেক—ব্যতিরেক নয়। সুতরাং অধ্যাত্মসাধনা জীবনসাধনারই অনুবৃত্তি। তার তিনটি প্রস্থান—ধর্মসাধনা রহস্যবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিচার। ধর্মসাধনা চেতনাকে উজ্জ্বল করে, আনে স্বরূপের বৃহত্ত্বের পরিচয়। রহস্য-বিদ্যার অনুশীলনে মেলে শক্তির পরিচয়। চেতনার বৈপুল্য এবং শক্তিযোগ

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যোগীর ভাষায় কৈবল্যের পাশেই বিভূতি। চিৎ এবং শক্তির সাধনাকে লোকাতত দৃঢ়মূল এবং উৎসর্পী করে প্রথমে দার্শনিক বুদ্ধি এবং ক্রমে তার পরিপাকে প্রজ্ঞা বা বোধি। এমনি করে ধর্মসাধনা রহস্যবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিচারের সুসমঞ্জস অনুশীলনে মানুষ লৌকিক হতে উত্তীর্ণ হয় লোকোত্তরে, মনোময় হতে হয় চিন্ময়। চিন্ময় মানুষ মনোময় মানুষের অতিরেক। চিৎশক্তির প্রতিষ্ঠায় দেহ-প্রাণ-মনের নির্বাপণ না ঘটে ঘটতে পারে উদ্দীপন। পূর্ণযোগের তা-ই সাধ্য।

চিন্ময় মানুষের আবির্ভাবই তাহলে প্রকৃতিপরিণামের লক্ষ্য। এখন এই আবির্ভাবের রীতি নিয়ে সাধারণভাবে একটু আলোচনা করা যাক।

প্রাকৃত মানুষের মধ্যে মনের উৎকর্ষ দেখা দিল বুদ্ধিতে। বুদ্ধি সৃষ্টি করল বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য এবং দর্শন, ভোগের বিচিত্র উপকরণ জুটিয়ে জীবনকে করল সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধি পরাক্-বৃত্ত চেতনার কাজ, তার মূলে আছে বিশ্বকে জানবার এবং সম্ভোগ করবার প্রেরণা। কিন্তু চেতনার পরাক্-বৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যক্-বৃত্তিও আছে। চেতনা বাইরের জগৎ থেকে যা আহরণ করে, তা দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করে, আবার অন্তরের প্রেরণায়ও বাইরে অনেক-কিছু সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা চলে প্রাণনের রীতির অনুরূপ। এমনতর আত্মপুষ্টির লক্ষ্য হল আত্মসচেতনতা। আত্মসচেতনতা সূচিত করে চেতনার পরাক্-বৃত্তির উপর প্রত্যক্-বৃত্তির প্রাধান্য। চেতনা তখন আত্মরত এবং অন্তর্মুখ হয়। এই হতে আধ্যাত্মিকতার শুরু। বুদ্ধির ওপারে বোধি তার মুখ্য সাধন।

আত্মসচেতনতা যখন চেতনার পরাক্-বৃত্তি হতে বিবিক্ত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, তখন তাকে আমরা বলি সাক্ষি-চৈতন্য। পরিপূর্ণ বিবেক হতে আসে বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্ব বা স্বরূপে অবস্থান। তার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে চেতনার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েও যেতে পারে। কিন্তু এটি একটিমাত্র কল্প। বিকল্পে সাক্ষিচৈতন্যের মধ্যে প্রশাসনেরও একটা বেগ জাগতে পারে। এই প্রশাসনের সামর্থ্য আসে দ্রষ্টৃত্বের গভীরে নিহিত পরা প্রকৃতির স্বত-উৎসারিত স্ফুরত্তা (dynamism) হতে। এইথেকে শুরু হয় রূপান্তরের ধারা। দিব্য-পুরুষ এবং দিব্য-প্রকৃতির সহযোগে এইটি নিষ্পন্ন হয়। পুরুষ সেখানে

স্বরাট এবং প্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্ব। স্বারাজ্যের নিগূঢ় আবেশে আধারের সর্বত্র শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষ হল রূপান্তরের রহস্য। তার কথা আমাদের পরে সবিস্তারে বলতে হবে, তাই এখানে শুধু তার ইঙ্গিত করে গেলাম।

ঠিক প্রাণের রীতিতেই অন্তর্নিহিত চিদ্‌বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিণত হয় বনস্পতিতে, এই হল অধ্যাত্মসিদ্ধির মর্মকথা। বিশ্বাস মতবাদ আচার অনুষ্ঠান—এসমস্তই অধ্যাত্মসাধনার বহিরঙ্গ। তাদের লক্ষ্য হল চিৎশক্তির উন্মেষ। এই উন্মেষের পর্বে-পর্বে দেখা দেয় উত্তম-পুরুষের মেলা, আমরা যাঁদের বলি যোগী ঋষি সন্ত বা মরমী। বিচিত্র তাঁদের সাধনা এবং সিদ্ধি। তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন সেই মুক্তপুরুষ, যাঁর পূর্ণজাগ্রত আত্মবোধ বিশ্বো-ত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিশ্বচেতনায় বিস্তারিত, জীবন এবং কর্মকে প্রত্যাখ্যান না করে বিশ্বের আত্মোন্মীলনের আকূতির সঙ্গে যিনি যুক্ত করেছেন তাঁর চিন্ময় সঙ্কল্পকে। তাঁর আবির্ভাবই প্রকৃতির দীর্ঘযুগব্যাপী তপস্যার লক্ষ্য।

অধ্যাত্মসাধনার বিরুদ্ধে জড়াসক্ত প্রাকৃত চিত্তের কতকগুলি নালিশ আছে। জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে নালিশের স্বর ক্রমে চড়া হয়েছে—বিশেষত ওদেশে। এদেশেও শিক্ষিতসমাজে তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে। অধ্যাত্মবিদ্যার বনিয়াদ ওদেশে কোনকালেই খুব পাকা ছিল না, তাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু এদেশে অধ্যাত্মবিদ্যার প্রাকৃত রূপের পাশেই দেখতে পাই তার সংস্কৃত রূপ—যার কাঠামো রচিত হয়েছে মনোবিজ্ঞান ও দার্শনিক যুক্তির 'পরে। তাই বিদেশের অন্ধ অনুকরণে এদেশেও যখন তথাকথিত বিদগ্ধের মুখে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে নানা রকমারি বুলি শুনি, তখন একটু আশ্চর্য লাগে বই কি। সমস্ত নালিশের খুঁটিয়ে বিচার করা এখানে সম্ভব নয়, তাই শুধু কয়েকটা গোড়ার কথা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

ধর্মের বিরুদ্ধে একটা নালিশ এই, ধর্ম সত্যপ্রতিষ্ঠার দাবি করে লোকোত্তর অনুভবের প্রামাণ্যে, সে-দাবিতে অনেকখানি জবরদস্তি আর বাড়াবাড়ি আছে। ...একটা-কিছুতে মেতে উঠে কাণ্ডজ্ঞান হারানো প্রাকৃত চিত্তের স্বভাব, তা স্বীকার করতে বাধা নাই। কিন্তু মত্ততার ফেনাটুকু বাদ দিয়ে সার যদি কিছু থাকে, বিচার করতে হবে তা-ই নিয়ে। লৌকিক অনুভবের উৎকর্ষণ

যে লোকোত্তরের ইশারা স্বাভাবিকভাবেই নিয়ে আসে, একথা আগেও বলেছি। লোকোত্তর অতীন্দ্রিয় হয়েও যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, তাতে পৌঁছবার পথ যদি মনোবিজ্ঞানসম্মত হয় এবং তার সিদ্ধি যদি লৌকিক জীবনকেও সমৃদ্ধ করে, তাহলে লোকোত্তর বলেই তা বর্জনীয় হতে পারে না। বাড়াবাড়ি এবং জবরদস্তিকে কখনই সমর্থন করা চলে না। কিন্তু তাবলে খোসা ফেলতে গিয়ে শাঁসটুকুও ফেলে দেওয়া তো সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

বস্তুতন্ত্রী চিত্তের আরেকটা প্রশ্ন, আধ্যাত্মিকতার সাধনায় জীবনসমস্যার কি কোনও সমাধান হয়েছে?···অধ্যায়ের গোড়াতেই পুরুষার্থসম্পর্কিত আলোচনায় এ-প্রশ্নের একটা জবাব মিলবে। সত্য বলতে, জীবনের মৌলিক সমস্যা হল আত্মপুষ্টি। আত্মপুষ্টির প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত হতে পারে, পরাক্-বৃত্ত হতে পারে। এই তার আদিম রূপ। বাইরের উপকরণ আত্মসাৎ করে আমার অহংকে আমি পুষ্ট করছি, এই দিয়ে জীবনের শুরু। কিন্তু চেতনার উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রবৃত্তি হয় প্রত্যক্-বৃত্ত। তখন আত্মপুষ্টির উপাদান আমি খুঁজে পাই আমার মধ্যেই, 'বিষয়ারাম' হতে আমি হই 'আত্মারাম'। এই অন্তরাবৃত্তির একটা স্বাভাবিক পরিণাম হল অহংএর শোধন এবং প্রসার। স্বার্থ তখন রূপান্তরিত হয় পরার্থে, প্রাণের বুভুক্ষা হৃদয়ের প্রেমে, ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধির কামনা সমষ্টির কল্যাণভাবনায়। জীবনসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন আনাই অধ্যাত্মসাধনার প্রথম লক্ষ্য। এতে ঋদ্ধির সাধনা বাতিল হয়ে যায় না, কিন্তু অভ্যুদয়ের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয় নিঃশ্রেয়সের ভাবনা। অধ্যাত্মসাধনার প্রথমস্তরে খানিকটা ইহবিমুখীনতা আসে এবং সমাজে তা কখনও-কখনও সংক্রামক হয়ে দেখাও দেয়। যে-কোনও সাধনায় এমনিতর সাময়িক ঐকান্তিকতা (exclusiveness) চিত্তের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু মানুষের অন্তরের সত্যকার ঝোঁক সমগ্রতার দিকে। তাই দুদিন পরেই ঐকান্তিকতা আবার ফিরে আসে একটা উদারতর সৌষম্যের মধ্যে। ইহবিমুখীনতা আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ-লক্ষণ নয়। জীবনকে বর্জন নয়, তাকে দিব্য করে তোলাই তার সত্যকার লক্ষ্য। তার সাধনা একার জন্য নয়, সবার জন্য। জীবনের সমস্যার মীমাংসা সে করতে চায় শুধু বুদ্ধির সহায়ে নয়, বোধিরও সহায়ে। তাতে সমাজের লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

আরেকটা আপত্তি, অধ্যাত্ম-অনুভব তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তি-চেতনার সংস্কার ছাড়িয়েও তা সত্য কিনা তা প্রমাণ করবার উপায় নাই।···

কিন্তু সত্য বলতে অনুভবমাত্রই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ানুভবও তা-ই। আমার অনুভব আমার কাছেই স্বতঃপ্রমাণ, অপরের কাছে তার প্রমাণ দিতে হলে পরোক্ষ উপায়েই দিতে হয়। সে পরোক্ষ উপায় হল ভাষা এবং আচরণ। ভাবের উদ্দীপনা ওজস্বী ভাষায় স্ফুরিত হয়, রূপ নেয় আচরণে। এমনি করে একের তাপ অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, একের প্রত্যক্ষ অপরেরও প্রত্যক্ষ হয়। আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, তুমিও যদি তা প্রত্যক্ষ কর, তাহলেই তোমার-আমার আচরণে একটা সৌষম্য দেখা দেবে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে একেবারে মুছে না ফেলে সমষ্টির মধ্যে এমনিতর সৌষম্য আনাই সমাজ-সচেতনতার সত্যকার লক্ষ্য। অধ্যাত্মসাধনারও লক্ষ্য তা-ই। অধ্যাত্ম-অনুভব বৃহৎ অনুভব। সে কখনও ব্যক্তির হৃদয়ে বন্দী হয়ে থাকে না, সবিতার মত আত্মবিকিরণ তার স্বভাব। সে-বিকিরণ নিষ্ফলও হয় না, যদিও ক্ষেত্রের প্রস্তুতির অভাবে তার পরিণাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে সময় নিতে পারে। তা নিক। চিন্ময় মানুষের আবির্ভাব যদি প্রকৃতিপরিণামের নিগূঢ় লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে-লক্ষ্যের দিকে যেতে-যেতে স্বভাবের নিয়মেই তার বেগে একটা ত্বরণ দেখা দেবে, কালের ব্যবধান ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। এ-প্রত্যয় সিদ্ধচেতনায় ভব্য (potential) নয়, ভূত (actual)। এই ভূতার্থের বিস্পষ্টিই তাঁর জীবনের দায়। আগুন হয়ে সবাইকে তিনি চান আগুন করতে, নিজের অনুভবকে সবার করতে। কাজ সহজ নয়, কিন্তু তাঁর তপস্যারও তো বিরাম নাই।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ত্রিপর্বা রূপান্তর

প্রকৃতিতে পরিণামের ধারা উজিয়ে চলেছে জড় হতে চিতের দিকে, চিন্ময় মানুষের আবির্ভাব তার লক্ষ্য। এই চিন্ময় মানুষের স্বরূপ কি? তিনি যে মুক্তপুরুষ, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুক্তিই কি আমাদের চরম পুরুষার্থ?

মায়াবাদী বলবেন, তা-ই। লীলাবাদী বলবেন, না, আমি মুক্তি চাই না, চাই প্রেম; আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। চরম লক্ষ্যসম্বন্ধে এমনতর মতভেদ থাকলেও গোড়ার একটা কথায় মায়াবাদী আর লীলাবাদীর মিল আছে—জগৎটাকে তাঁরা দুজনেই বলছেন হেয়। আর যেন সংসারে ফিরে না আসতে হয়, এ-আকূতি সব সাধকেরই। সবারই মতে অধ্যাত্মসাধনার চরম সার্থকতা জীবনের এপারে নয়, ওপারে।

এর ফলে এদেশে চিন্তাশীলদের মধ্যে জীবনের প্রতি দেখা দিয়েছে একটা বিরূপতা অথবা ঔদাসীন্য। তার প্রভাব সাধকসমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধক সংসার করছে, কিন্তু একটা অপরাধবোধ নিয়ে—যেন কাজটা তার ঠিক হচ্ছে না। বৈরাগ্য এবং নৈষ্কর্ম্যের আদর্শ তার চোখের সামনে জলজল করছে, জীবন থেকে ছুটি নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই তার মধ্যে উদ্দাম।

অথচ এমনও দেখা যায়, আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি হয়তো এসে গেল জীবন থাকতেই। তখন সমস্যা, জীবনের বাকিটুকু নিয়ে কি করা যায়। শাস্ত্র সান্ত্বনা দেয় প্রারব্ধক্ষয়ের কথা তুলে।

কিন্তু প্রারব্ধ কেবল প্রাকৃত কর্মের প্রবর্তক হয় যদি, তাহলে অপ্রাকৃতের অভীপ্সা সাধকের মধ্যে জাগে কোথা থেকে? আর প্রারব্ধ যদি প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত দুরকম কর্মেরই প্রবর্তক হয়, তাহলে অপ্রাকৃত কর্মের শেষ পরিণাম যে কেবল পরিনির্বাণে, একথাই-বা বলি কি করে? কর্মের প্রেরণা যদি শুধু অবিদ্যা থেকে আসে, তাহলে বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যার নাশ এবং কর্মের ক্ষয় দুইই সম্ভাবিত হয়। কিন্তু বিদ্যাও তো কর্মের প্রেরণা যোগাতে পারে। কর্ম কি শুধু বহিরঙ্গ মায়াশক্তিরই খেলা, অন্তরঙ্গ চিৎশক্তির কিছু নয়?

তাহলে ঈশ্বরের দিব্যকর্ম কি করে সম্ভব? বেদের ঋষি জগৎকে দেখিয়ে বললেন, চেয়ে দেখ এই দেবতার কাব্য—এর না আছে জরা, না আছে মরণ। উপনিষদের ঋষি দিকে-দিকে দেখলেন ব্রহ্মের আনন্দরূপের বিভাতি। এই যে অমৃত আর আনন্দের উচ্ছলন (বেদান্তী যাকে বলবেন প্রপঞ্চের উল্লাস), তাও কি সত্তার শক্তি-স্পন্দ নয়, অতএব কর্ম নয়?

অবশ্য এ তোমার-আমার মত অবিদ্যাগ্রস্ত ক্ষুদ্রের কর্ম নয়। এ বৃহতের পুরাণী প্রজ্ঞার কর্ম। এই প্রজ্ঞাই মূল। তোমার-আমার অবিদ্যা তার উপক্ষেপ মাত্র। সূর্যের তাপে মেঘের সৃষ্টি হয়ে আবার সেই তাপেই যেমন গলে যায়, আমাদের অবিদ্যাও তেমনি ওই বিদ্যা হতে জেগে বিদ্যাতেই লয় হয়ে যায়। সে-বিদ্যা ক্ষুদ্র অহংএর নিবর্তিকা, কিন্তু এক শাশ্বত ভূমানন্দময় অহংএর প্রবর্তিকা। আমার প্রারব্ধের ক্ষয়ে আমারই বিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত কর্ম-স্পন্দের না হয় লয় হল মহাপরিনির্বাণে, কিন্তু বিরাটের প্রারব্ধের কি তাতে ক্ষয় হয়? মহাপ্রলয়েও কি তা হতে পারে? প্রপঞ্চের উল্লাস এবং উপশম আমার কাছে দুটি পর্যায়, কিন্তু ভূমার কাছেও কি তা-ই? উপশমকে অটুট রেখেই উল্লাসের উচ্ছলন, এও সম্ভব। বৈদিক ঋষি তাই বললেন, তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে, একপাদ হয়েছে এই জগৎ। কিন্তু তাবলে এই একপাদ ওই ত্রিপাদ হতে আলাদা নয়। 'অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ'—অমৃতের মধ্যেই মৃত্যুর লীলা, মৃত্যু অমৃতদ্বারা অনুবিদ্ধ।

প্রাকৃত চেতনাতেও দেখি, উপশমে-উল্লাসে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। উপশমে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই উল্লাসের সার্থকতা। তা-ই যোগস্থের কর্ম। তা বন্ধন নয়, আত্মবিসৃষ্টি। অবিদ্যার ঘোরে কর্ম করি যখন, তখনই তা বন্ধন। কাজ তখন হয় গতানুগতিকতার অনুবর্তনে, যন্ত্রের মত। চেতনা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই কর্মই উপশান্ত থেকে যদি করা যায়, তা অন্তরে ফোটায় বাইরে ছড়ায় বিদ্যার আলো। তখন অবিদ্বানের হাতে হাত মিলিয়ে বিদ্বানের কর্ম নিষ্প্রাণকে করে সঞ্জীবিত, মূঢ়তাকে প্রদ্যোতিত, নিরর্থককে অর্থযুক্ত। তা উপশমেরই উল্লাস।

এমনি করে বিদ্যা কর্মকে রূপান্তরিত করে যজ্ঞে। যজ্ঞের দুটি ধারা। একটি মানুষের যজ্ঞ, উৎসর্গের ভাবনায় তা উজিয়ে চলেছে দেবতার দিকে; আরেকটি দেবতার যজ্ঞ, বিসৃষ্টির আনন্দে নেমে আসছে মানুষের মধ্যে। আমি যে অধূমক চিত্তের রিক্ততা দিই দেবতাকে, তা তিনি দিব্য ঋদ্ধির অজস্রতায়

পূর্ণ করে তোলেন। এদেশের নিরোধবাদী দার্শনিকেরাও এই আর্যসত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বৈরাগ্যের ভূমিকায় ঐশ্বর্যকে কৈবল্যের ভূমিকায় বিভূতিকে স্থাপন করতে তাঁরা দ্বিধা করেননি।

স্থূলদৃষ্টিতে বিসৃষ্টির মধ্যে আমরা অবসাদনের দিকটাই শুধু দেখি। কল্পনা করি : চৈতন্য মন ও প্রাণের ভিতর দিয়ে জড়ের দিকে নেমে আসছে, সুতরাং আবার তাকে নিজের মধ্যে ফিরে যেতে হলে জড় প্রাণ ও মনকে ছেড়ে-ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু এই অবসাদনের সমান্তরালেই যে একটা নিগূহনের ক্রিয়া চলছে, আমরা সেটা খেয়ালে আনি না। পরমাণুর মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির ঘনতম সংহননের মত জড়ের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তির সংহততম সমাবেশ। এই শক্তিকে আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি, কিংবা তাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মুক্তিও দিতে পারি। যে-কোনও উজান-বওয়ার সাধনাতে নীচের শক্তি খানিকটা ছাড়া পায়ই। কিন্তু আমরা সেটাকে তত আমল দিই না। তাড়াতাড়ি তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার দিকেই আমাদের ঝোঁক হয় বেশী। ভয় হয়, পাছে প্রপঞ্চের ধাঁধায় পড়ি। যাঁরা নিরোধের সাধনা করেন, অনেকসময় আধার-শক্তিকে বিশ্লেষণ করে ধাপে-ধাপে এগিয়ে যান বলে তাঁদের মধ্যে শক্তি কতকটা ছাড়া পায়। কিন্তু দৃষ্টির সমগ্রতার অভাবে এবং উপশমের প্রতি আগ্রহবশত তাঁরাও সুসমঞ্জস শক্তিস্ফুরণের দিকে তত নজর দেন না। এইজন্যই সিদ্ধির যে-আদর্শ আমাদের দেশে লোকাতত হয়ে আছে, তাতে আকাশব্যাপী আলোর উচ্ছলতাকে যতখানি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, জীবনের পুষ্প-পল্লবে তার বর্ণৈশ্বর্যের প্রস্ফুরণকে ততখানি মর্যাদা দেওয়া হয়নি। আমরা নিঃশ্রেয়সকে উপাদেয় মনে করেছি, কিন্তু অভ্যুদয়কে মনে করেছি হেয়। এদেশের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরাও যে দুয়ের সমবায়কেই ধর্ম বলেছেন, সেকথা ভুলে গেছি।

অধ্যাত্মসিদ্ধির একটা পূর্ণায়ত আদর্শ গড়ে তুলতে হলে এই ভুল ভাঙতে হবে। নিঃশ্রেয়সের সঙ্গে অভ্যুদয়ের, কৈবল্যের সঙ্গে বিভূতির, বৈরাগ্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, মরণের সঙ্গে জীবনের সৌষম্য ঘটাতে হবে। এককথায় শিব-শক্তির সামরস্যে ফোটাতে হবে সত্তার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা। প্রকৃতি-পরিণামের তা-ই লক্ষ্য। নির্গুণ পুরুষ আর গুণময়ী প্রকৃতির মাঝে আছে পরমা প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্বময় ভূমি। এদেশের দর্শন যে তাকে স্বীকার করেনি, তা নয়। তাহলে জীবন্মুক্ত আধিকারিক-পুরুষ বা অবতার-পুরুষের কথা আমরা শুনতে পেতাম না। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি দিয়ে অপরা প্রকৃতিকে

জারিত করা এবং তার অবরুদ্ধ শক্তির কুণ্ডলীমোচন করা—এ-সাধনা আমরা সচেতন হয়ে, ব্যাপক এবং বিধিবদ্ধ ভাবে করিনি। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে এই এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। এতে অতীতের সমাহার আছে, কিন্তু তার আবৃত্তি নাই। আছে অনুবৃত্তি, উত্তরায়ণের পথে আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

চিন্ময় মানব অপরা প্রকৃতির কুণ্ঠা এবং বৈকল্য হতে মুক্ত, পুরুষের লোকোত্তর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরমা প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্ব বীর্যে সমাপন্ন। এই বীর্য যেমন স্ফুরিত হবে জ্ঞানের উত্তুঙ্গতায় এবং সর্বাত্মভাবের পরিব্যাপ্তিতে, তেমনি চিৎশক্তির অধৃষ্যতায়। নিবৃত্তির সাধনায় অপরা প্রকৃতির আড়ষ্ট আবেষ্টন হতে মুক্ত হয়ে শক্তি উজান বইবে, কিন্তু সে-শক্তিই আবার দিব্যপ্রবৃত্তির বাহন হয়ে নেমে আসবে অপরা প্রকৃতির গহনে এবং বজ্রের আঘাতে তার কুণ্ডলনে ঘটাবে আণবিক বিস্ফোরণ। আবার সর্বাত্মভাবের প্রেরণায় এই বিস্ফোরণের সাধনা ক্রমে হবে আরও গভীর এবং সর্বগত, অতিচিতির পরঃ-কৃষ্ণতা আর অচিতির অন্ধতামিস্র দুটি বিদ্যুৎ-মেরুর মত মুখামুখি হয়ে জাগাবে একটা চিন্ময় সংক্ষোভ। এই সংক্ষোভ হবে প্রকৃতির রূপান্তরের প্রবর্তক।

রূপান্তর প্রকৃতিপরিণামের একটি নিগূঢ় লক্ষ্য। অচিতিতে নিগূহিত চিৎশক্তির স্ফুরণে তার যে-উৎকর্ষণ এবং তাকে আধার করে যে চিদ্‌গুণের প্রবৃত্তি, তা-ই হল রূপান্তরের গোড়ার কথা। প্রাকৃত বুদ্ধি চিৎ আর অচিতে দেখে বিপরীত ধর্মের সমাবেশ। ভাবে, তাদের মধ্যে কোনরকম রফা সম্ভবপর নয়। তাই সে কল্পনা করে, অচিৎ হতে চিতে উত্তীর্ণ হতে হলে অচিৎকে সম্পূর্ণ ছেড়ে যেতে হবে। দর্শনে নেতিবাদের মূলে রয়েছে এই ভাবনা। কিন্তু এ যে একদেশদর্শী, তা আমরা আগেই দেখেছি। বস্তুত চিৎ আর জড় বিবিক্ত এবং অন্যোন্যবিরুদ্ধ নয়। অধ্যাত্মসাধনায় পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক একসময় অপরিহার্য হলেও তা-ই সাধনার চরম কথা নয়। বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ প্রকৃতি হতে পুরুষকে আচ্ছিন্ন করে দেখে, কিন্তু এই দেখার মূলে থাকে শক্তির একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার। সেই সূক্ষ্ম ব্যাপ্রিয়াতে অপরা প্রকৃতির বৃত্তির নিরোধের সঙ্গে-সঙ্গে ঘটে পরা প্রকৃতির বৃত্তির উন্মেষ। এই পরা প্রকৃতি পুরুষেরই আত্মপ্রকৃতি। তাঁর স্বরূপাবস্থানের সঙ্গে তার কোনও বিরোধ হতে

পারে না। স্বরূপাবস্থানে পুরুষের মধ্যে শক্তির যে-নিমেষ (withdrawal), তা-ই যুগপৎ উন্মেষেরও (expression) নিমিত্ত। এই উন্মেষের প্রথম পর্বে পাই শুদ্ধসত্ত্ব, যাকে আমরা নির্গুণ আর সগুণের মাঝে সেতুরূপে বর্ণনা করেছি। নীচের দিক থেকে দেখতে গেলে শুদ্ধসত্ত্বকে মনে হবে লোকোত্তর (transcendent), কিন্তু উপরের দিক থেকে দেখলে তাকে জানব লোকাত্মক (immanent)। এই লোকাত্মকের বীর্যকে তুলনা করা যেতে পারে তাপশক্তির সঙ্গে। তাপ সংক্রামক। তার আবেশ নিস্তাপকেও প্রতপ্ত করে তুলতে পারে—আধারকে বিনাশ না করে। তাপ প্রচণ্ড হলে ফোটে আলো। তখন দাহকশক্তিরও আবির্ভাব হয়। তার বেগকে পুরাপুরি ধারণা করতে না পারলে তাপ আর আলো বিকিরণ করে আধার ছাই হয়ে যায়। কিন্তু ধারণাশক্তি প্রবল হলে আধার অক্ষত থেকেই প্রজ্বল হয়ে উঠতে পারে—বিদ্যুৎ-দীপের তন্তুর মত। এমনি করে ঊর্ধ্বশক্তির আবেশের ফলে আধারের গূঢ়জ্যোতির উন্মেষ এবং প্রজ্বলন, এই হল রূপান্তরের মূল রীতি।

অপরা প্রকৃতির ধারাকে উজিয়ে যেতে হবে স্বরূপাবস্থানের দিকে, কিন্তু রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে। পূর্ণযোগের তা-ই আদর্শ।

রূপান্তরের সাধনায় তিনটি পর্ব আছে। প্রথম চৈত্য (psychic) রূপান্তর, তারপর চিন্ময় (spiritual) রূপান্তর, সবার শেষে অতিমানস (supramental) রূপান্তর। চৈত্য রূপান্তর দিয়েই সাধনার শুরু। তার স্বরূপ ও সাধনরীতি বোঝবার জন্য মানুষের প্রকৃতির একেবারে গোড়া থেকে বিশ্লেষণ শুরু করা যাক।

দেহ প্রাণ এবং মন এই তিন নিয়ে প্রাকৃত মানুষের জীবন। আত্মচৈতন্য এ-তিনেরই অধিষ্ঠান, কিন্তু সে রয়েছে পিছনে আড়াল হয়ে। মনের ওপারে বিজ্ঞান, সেইখানেই আত্মচৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ। বিজ্ঞানের আলো যখন ফুটতে থাকে, তখনই প্রাকৃত মানুষের দ্বিজত্ব লাভ হয়, সে হয় সাধক।

দেহ প্রাণ ও মনের ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুসারে প্রাকৃত মানুষকে তিন থাকে ভাগ করা যায়—দেহাত্মবাদী প্রাণাত্মবাদী আর মন-আত্মবাদী। দেহাত্মবাদী দেহসুখের বাইরে বিশেষ-কিছুই বোঝে না, তার প্রাণ আর মন ওরই কাঙালী।

মানুষের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশী। প্রাণাত্মবাদী তাদের ঊর্ধ্বে। দেহাত্মবাদীর মত সে মাটির বুক আঁকড়ে থাকতে চায় না, তার মধ্যে স্থিতির চাইতে গতির প্রেরণা প্রবল। দুর্দম মনোবেগ, যুযুৎসা, প্রমত্ততা, অহমিকার উত্তালতা—এইগুলি হল প্রাণাত্মবাদীর লক্ষণ। তারও উপরে হল মন-আত্মবাদী। দেহ আর প্রাণের মূঢ় এবং উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সে চায় ভাবনার শাসনে আনতে, তাকে প্রদীপ্ত এবং সুষম করতে। স্বভাবতই সে মননশীল। সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞানে আদর্শজগতের নানা পরিকল্পনায় সে তার মননের বিচিত্র ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়। আধুনিক সভ্যতায় যা-কিছু ক্ষেমঙ্কর, তা এই মনস্বী মানুষের সৃষ্টি।

আধারশক্তির স্ফুরণের তারতম্য অনুসারে মানুষকে তিন থাকে ভাগ করলেও মনে রাখতে হবে, সব মানুষের মধ্যেই এই বিভিন্ন শক্তির একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক ঝোঁক ঊর্ধ্বপরিণামের দিকে। সুতরাং দেহের মূঢ়তা এবং প্রাণের উদ্দামতার উপর প'ড়ে মনের আলো তাদের ঊর্ধ্বায়িত করবার চেষ্টা করছে, সভ্যতার প্রগতির হল এই ধারা। ব্যাপারটা অবশ্য সহজে হচ্ছে না—কেননা আধারের নিম্নশক্তিগুলিরও একটা স্বকীয়তার দাবি আছে, যা তারা সহজে ছাড়তে চায় না। বিচিত্র শক্তির সংঘর্ষ তাই প্রাকৃত জীবনের মূল সুর।

অবশ্য অসাড়তার চাইতে সংঘর্ষ ভাল। কিন্তু তার চাইতে ভাল সৌষম্য এবং উদ্দীপনা। মানুষ জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে একটা ছন্দ আনবার চেষ্টা করছে মননের সহায়ে। এ-যুগে মনের ঐশ্বর্য অসম্ভব বেড়েছে। কিন্তু তবুও আমরা যে সব-পেয়েছির দেশে পৌঁছে গেছি, একথা বলতে পারছি না।

কেন, তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। চেতনার গতি যে শুধু প্রবৃত্তির দিকে তা নয়, নিবৃত্তির দিকেও তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। প্রাকৃত চেতনাতেই আমরা তার পরিচয় পাই। কর্মের পাশে বিশ্রাম, জাগ্রতের পাশে সুপ্তি, উপভোগের পাশেই উপশম—এগুলি জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। যে শিল্পী, সে জানে কি করে এ-দুটিকে মিলিয়ে নিতে হয়। প্রবৃত্তির রাস টানতেই হয়, নইলে মানুষ বৃহৎ হতে পারে না।

এই থেকে শুরু হয় অন্তরাবৃত্তির সাধনা। শুধু জগৎকে জানব, শাসন করব, সম্ভোগ করব—তাতেই জীবনের সার্থকতা নয়। নিজের মধ্যে গুটিয়ে এসে নিজেকে জানব, স্বরাট হব, আত্মারাম হব—সার্থকতার এই আরেকটা

দিকও আছে। কেউ তার দাবি এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রাকৃত জীবনে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ একটা মস্ত সম্পদ, সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্যও তা-ই। কিন্তু অন্তর্মুখীনতা, আত্মসচেতনতা, আত্মত্যাগ, কারুণ্য—এগুলির অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সম্ভব হয় না। এও একটা যোগ। যোগীই সত্যকার জীবনশিল্পী। দেহ প্রাণ মনের সুস্থ ও সুসমঞ্জস বৃত্তির 'পরে যোগের আলো প'ড়ে যদি তাদের অনুবিদ্ধ এবং উদ্দীপ্ত করে, তাহলেই জীবন আনন্দে এবং ঐশ্বর্যে দল মেলে। ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ হবে শুধু মনস্বীর সমাজ নয়, স্বরাট্ এবং সর্বগত যোগীর সমাজ।

জীবনে এমন-একটা সময় আসে, যখন ব্যাবহারিক সত্যৈষণা হয় পারমার্থিক, প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে নিবৃত্তি। বিশ্বজিজ্ঞাসার চাইতে আত্ম-জিজ্ঞাসা তখন প্রবল হয়। সবারই যে হয়, তা নয়। যার হয়, তাকেই বলি দ্বিজ। দ্বিজের সংখ্যা সব যুগেই কম, কিন্তু তার দায় সবার চাইতে বেশী। দ্বিজই রূপান্তরের সাধক। মনের ওপার থেকে বিজ্ঞানের আলো এসে পড়েছে তার চেতনায়, তার মনোময় সত্তার গভীর হতে জেগে উঠেছে স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আরেকটা সত্তা—যাকে আমরা নাম দিয়েছি চৈত্যসত্তা।

এই চৈত্যসত্তার বিস্তৃত আলোচনা আগেই করেছি। এককথায় তাকে বলতে পারি আমাদের সত্যকার আমি। সবার মধ্যেই একটা আদর্শের প্রেরণা আছে, একটা ইষ্টার্থের (value) বোধ আছে। এই বোধ আমাদের মন-প্রাণকে শাসন করে, ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ-বোধ যখন স্পষ্ট হয়ে জাগে, তখন প্রাকৃত আমির উর্ধ্বে একটা মহত্তর আমির সন্ধান পাই। তাকেই বলতে পারি চৈত্য-পুরুষ। উপনিষৎ তাকে বর্ণনা করেছেন 'ভূত-ভব্যের ঈশান অধূমক জ্যোতি' বলে, 'মধ্বদ' বা 'পিপ্পলাদ' বলে। এই পুরুষের অনুভবকে চেতনায় প্রোজ্জ্বল এবং সক্রিয় করে তোলাই হল রূপান্তরসাধনার প্রথম পর্ব।

এ-সাধনার প্রাথমিক বাধা হচ্ছে ব্যামিশ্রতা এবং মন্থরতা। ভিতরে আলো আছে, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ প্রথমটায় স্বচ্ছ হয়ে ফোটে না, ফোটে দেহ-প্রাণ-মনের নানা স্থূল ও সঙ্কীর্ণ সংস্কার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে। এই আবিলতা দূর করতে অনেক সময়ও লাগে। বুদ্ধি দিয়ে আদর্শের একটা ধারণা করতে পারলেও তাকে বাস্তবে আনা কঠিন। দেহের জড়ত্ব আর প্রাণের প্রক্ষোভ এ-দুটিই হল আলো ফোটবার পক্ষে মস্ত বাধা। অথচ আলো যে-

পর্যন্ত দেহ আর প্রাণকেও উদ্দীপ্ত করে না তুলছে, সেপর্যন্ত সাধনায় সম্যক্‌সিদ্ধি হয়নি বুঝতে হবে। দেহ আর প্রাণের গণ্ডি হতে জোর করে ছিটকে বেরিয়ে পড়া যায় এবং চিত্তকে দুয়ের ঊর্ধ্বে ধরে রাখাও যায়। কিন্তু বেশীক্ষণ তা পারা যায় না, সমাধি থেকে ব্যুত্থানের ভূমিতে আবার ফিরে আসতেই হয়। উপরের আলো নীচে এসে ফিকা হয়ে যায়, তাই মন চায় আবার উপরে চলে যেতে। আধারের জড়ত্ব এবং প্রক্ষোভকে এমনি করে এড়িয়ে গিয়ে আলোর জগতের নিত্যবাসিন্দা হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। কিন্তু অপরিহার্য হলেও এ হল সাধনার আধখানা মাত্র। আঁধার পেরিয়ে আলোতে গেলেই চলবে না, সেই আলোকে আবার আঁধারের বুকে নামিয়ে এনে তাকেও আলো করে তুলতে হবে। চৈত্য-পুরুষের বোধকে জাগিয়ে তুলে এইটি করা সহজ হয়, কেননা চৈত্য-পুরুষ রয়েছেন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে প্রাকৃত পুরুষের ঠিক পিছনটিতে। শাস্ত্রে বলে, লোকোত্তরের অনুভবে সাধক জড় উন্মত্ত পিশাচ বা বালক হয়ে যায়। এর মধ্যে তিনটি অবস্থা যে অসুস্থ এবং অপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য। চতুর্থ অবস্থাটি ইঙ্গিত করে ব্যাবহারিক জীবনেও চৈত্য অনুভাবের স্ফুরণের ফলে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ আধ্যাত্মিকতার। প্রৌঢ় বুদ্ধির সঙ্গে শৈশবের স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে গোড়া থেকেই সব অবস্থায় বজায় রাখতে পারলে সাধনা সর্বাঙ্গীণ এবং সহজ হয়। চৈত্য রূপান্তরের এটিকে ভিত্তি বলা যেতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীরা অধ্যাত্মচেতনাকে কৈশোরচেতনার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এটা খুবই সঙ্গত। উপনিষদে দেখি, শ্রদ্ধার আবেশে কিশোর নচিকেতাই মৃত্যুর বুক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনল—প্রৌঢ় বাজশ্রবস নয়। এই ইঙ্গিতটি গুরুত্বপূর্ণ। যা-কিছু সত্য শিব ও সুন্দর, যা-কিছু সূক্ষ্ম শুচি ও মহৎ, তার ডাকে সাড়া দেওয়া, হৃদয়ের সচেতন আকূতি দিয়ে তাকে বরণ করা—এই হল সত্যকাম কৈশোরের সহজ ধর্ম। এতে পাই চৈত্য-পুরুষেরই অনুভাবের (expression) একটা সুস্পষ্ট পরিচয়। কৈশোর সবারই জীবনে আসে, কিন্তু তার ব্যঞ্জনাকে গভীর এবং উজ্জ্বল করবার শিক্ষা ও সুযোগ আমরা পাই না। এতে অধ্যাত্মশক্তির অনেক অপচয় হয়। জীবন প্রথম হতেই যদি বৃহতের আলোতে সুন্দর হয়ে ফুটতে পারত, তাহলে অধ্যাত্মসাধনায় প্রৌঢ়জনসুলভ এত দ্বন্দ্ব দেখা দিত না—ইতিতে আর নেতিতে, লোকে আর লোকোত্তরে একটা সহজ সৌষম্যের ছন্দ আবিষ্কৃত হত।

কৈশোর-ভাবনা হল চৈত্য রূপান্তরের বনিয়াদ। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে অগ্র্যা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে বীর্যকে, স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে অন্তরাবৃত্তিকে, সহজের সঙ্গে শক্তিকে। কৈশোরচেতনায় ফোটে জগতের একটা আলোঝলমল রূপ—নচিকেতার শ্রদ্ধা তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে লোকোত্তর হিরণ্যজ্যোতির একটা আভাস। কিন্তু এই আলোর কমল ফুটেছে যে-বৃন্তে, অস্তিত্বের গভীরে ডুবে তার মূলকে আবিষ্কার করতে হবে, তবেই সহজের উল্লাস স্থায়ী হবে। আমরা কালগত অবিদ্যার কথা আগে বলেছি। তার বাঁধন খসে পড়লে বৃত্তির ক্ষণভঙ্গের গভীরে আবিষ্কৃত হয় অস্তিত্বের একটা শাশ্বত প্রত্যয়। কিন্তু শুধু নির্বর্ণ অস্তিত্বের নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুধা-বর্ণবিচ্ছুরণের যে নিগূঢ় প্রবৃত্তি, চাই তারও অনুভব। ভিতরের দিকে চোখ না ফেরালে এটি সম্ভব হয় না। প্রাণ-মনের অঙ্গনে বৃত্তির যে কী উদ্দামতা, তখনই তা আমাদের নজরে পড়ে। চিত্তে তখন অস্বস্তি জাগে, সে চায় নিরোধের দ্বারা এই উদ্দামতাকে থামিয়ে দিতে। নিরোধ একটা সাময়িক সাধন হতে পারে, কিন্তু তা-ই কখনও শেষ লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হল এই বিক্ষোভের মূলে শক্তির নিগূঢ় ছন্দকে আবিষ্কার করা। প্রকৃতির সর্বত্র দেখি, শক্তির বিক্ষোভ হল তার ঋতচ্ছন্দোময় আত্মপ্রকাশের ভূমিকা মাত্র—ছোট ছেলে লেখবার চেষ্টায় যেমন প্রথমটায় হিজিবিজি আঁচড় কাটে তেমনি। তাই বিক্ষোভকে জোর করে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা না করে অন্তর্মুখ হয়ে তার রাস টেনে ধরতে হবে, দেখতে হবে চিৎশক্তির কোন্ গূঢ় অভিপ্রায় তার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হতে চাইছে। এই রাস টানাতে শক্তির মুক্তি ঘটে, একটু উজিয়ে গিয়ে ছন্দোময় বিকিরণে আপনাকে সে স্ফূর্ত করে। কিন্তু এই স্ফূর্তির সঙ্গে সাধকের জড়িয়ে যেতে নাই। একটা অন্তর্মুখ সঙ্কর্ষণের দ্বারা কেবলই তাকে আরও উজিয়ে যেতে হয়—শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিচ্ছুরণের ছন্দোভঙ্গ না করে। তখন প্রবৃত্তির ঝোঁকের মত নিবৃত্তিরও একটা ঝোঁক দেখা দেয় ভিতরে। উজান বাওয়াটা তখন আর আয়াসের ব্যাপার না হয়ে হয় ভোরের আকাশে আলো ফোটার মত স্বভাবের সহজ প্রকাশ। আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রশান্তি আর আত্মপ্রকৃতির উল্লাসে তখন একটা সৌষম্য আর সাম-রস্যের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃত ভূমিতেও শিল্পীর রসসৃষ্টি হয় এই রীতিতে।

জগতের প্রতি একটা কিশোরসুলভ প্রসন্ন উদার কবিদৃষ্টি, আবার নিজের গভীরে শাশ্বত আত্মসত্তার একটি নিরবচ্ছিন্ন অম্লান প্রত্যয় এবং প্রত্যাহারদ্বারা

প্রতিমুহূর্তে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির উল্লাসে রূপান্তরিত করা—এই তিনটি সাধন হল চৈত্য রূপান্তরের প্রথম সোপান। এর মূল নীতিটি আমরা পাই সাংখ্যের বিবেকসাধনায়। প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে না গিয়ে নিজেকে তাথেকে আলাদা রাখা—এই হল বিবেকসাধনার গোড়ার কথা। সাংখ্যবাদী সাধারণত বিবেককে ব্যবহার করেন নিরোধের উপায়রূপে। চিত্তের লয় হল তাঁর লক্ষ্য, জাগ্রৎ থেকে তিনি চলেন সুষুপ্তির দিকে। কিন্তু পূর্ণযোগীর লক্ষ্য হল সুষুপ্তির উপশমকেই জাগ্রতের উচ্ছ্বাসে নামিয়ে এনে তাকে ছন্দোময় করা। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠ থেকে প্রকৃতির দিকে তিনি তাকান রসের দৃষ্টি নিয়ে, উপেক্ষায় তার দিকে চোখ বুজে থাকেন না। অপরা প্রকৃতির মূঢ়তা ও বিক্ষেপ হতে তিনি মুক্ত, কেননা তিনি তাদের ঊর্ধ্বে। এই হল তাঁর বিবেকের নেতির দিক। কিন্তু ইতির দিক দিয়ে এই বিবেকখ্যাতি হয় তাঁর ঐশ্বর্যের প্রবর্তক। আবারও মনে করিয়ে দিই, কৈবল্য হতেই নির্ঝরিত হয় বিভূতি ; কিন্তু তাকে উপসর্গ (by-product) মনে না করে বিসর্গ (creativity) মনে করাই ভাল।

প্রবর্তসাধকের পক্ষে এটি সহজ হয় ঈশ্বরের কাছে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণে। আত্মসমর্পণের মূলে হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা স্বরূপত আস্তিক্যবুদ্ধি—আমার অন্তর যা চায়, তার অবাধিত অস্তিত্বসম্পর্কে নিঃসংশয় বোধ। এটি বোধির বৃত্তি, সুতরাং চিত্তের একটা বিশিষ্ট পরিণাম না হওয়া পর্যন্ত সত্যকার শ্রদ্ধা জাগে না। তার জন্যও একটা কালের অপেক্ষা আছে। শ্রদ্ধা অরুণোদয়ের মত, এর পর সূর্য উঠবেই। এই নিঃসংশয় আবির্ভাবের আশ্বাস নিয়েই সবিতার কাছে নিজেকে মেলে ধরা, আলোর নিরন্তর অভিষেকে আধারের অণু-পরমাণু আলোকময় হ'ক এই ভাবনায় অতন্দ্র থাকা—এই হল আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয় নিত্য-সমনস্কতাতে। এটা বরাত দেওয়ার ব্যাপার নয়। নিজেকে যে রিক্ত করে দিলাম তাঁর কাছে—এই সর্বশূন্যতার বোধটি অজপার ছন্দে সত্তার তন্ত্রে-তন্ত্রে গুঞ্জরিত হওয়া চাই। সাধকের তরফ থেকে এইটুকু করণীয় এবং তা খুব সহজও নয়। তবে সহজ এইদিক দিয়ে যে, সমস্ত সিদ্ধির মূলে যে-উপশম, তাতে পৌছবার এটি একটি সরল উপায়—কেননা এদিকে আমাদের প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের, অংশীর সঙ্গে অংশের, মায়ের সঙ্গে সন্তানের স্বাভাবিক যোগের ভিত্তিই হল আত্মসমর্পণ। বলা যেতে পারে, উন্মুখ চিত্তের পক্ষে এটি যেন নাড়ীর টান।

প্রবর্তসাধকের পক্ষে আরেকটি অপরিহার্য সাধন হল সদ্গুরুর শরণ নেওয়া। দু-চারজন উচ্চকোটির সাধক ছাড়া এটি সবারই দরকার হয়। যোগী বলেন, ঈশ্বরই সবার গুরু। এমনও বলা চলে, শুদ্ধ মনই গুরু। এ হল ভাবের কথা এবং অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু ভাবও রূপ ধরে। রূপের জগতে রূপের সার্থকতা আছে বই কি। ভাব আর রূপে সন্ধি করে সোজা কথায় বলতে পারি, গুরু মনের মানুষ। এই মনের মানুষটি কিশোরচিত্তের চাইই।

এইগুলি হল চৈত্য রূপান্তরের ভূমিকা। তারপর আসা যাক আসল সাধনার কথায়। সাধনার মুখ্য সাধন হল মন। মনকে আশ্রয় করেই সিদ্ধিকে ক্রমে সঞ্চারিত করতে হবে প্রাণে এবং দেহে। মনোবিদেরা মোটামুটি মনের তিনটি বৃত্তির কথা বলেন—ভাবনা বেদনা (feeling) এবং সঙ্কল্প। এই তিনটি বৃত্তিকেই দিব্যভাবনায় ভাবিত করতে হবে, এই হল সাধনার লক্ষ্য।

মন স্থির না করতে পারলে কিছুই হবে না, একথা আমরা শুনে এসেছি। তার জন্য সবাই ধরে বৃত্তিনিরোধের পথ। কিন্তু বাইরের মনটাকে জোর করে চেপে ধরলে বৃত্তিনিরোধ খুব সহজ হয় না, নিগ্রহের নানা কুফলও দেখা দেয়। নিরোধ বা উপশম হল শেষের কথা ; তার আগে আছে একটা শুদ্ধ-সত্ত্বের ভূমি। সেখানকার তত্ত্ব হল শূন্যতা নয়, সৌষম্য। এইটিকে আগে আয়ত্ত করতে পারলে উপশম সহজ এবং কল্যাণকর হয়। মননের বৃত্তিগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে দিতে হবে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ। জীবনে ছন্দ আনতে হবে। একটা ভাবের ভূমিকা না থাকলে এই ছন্দ ফোটে না। ভাবের মূল হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আনে আত্মসমর্পণের আকূতি। তিনি আছেন, তাঁর হয়ে আমি আছি, এ-জীবন তাঁরই লীলাকমল, প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন তাঁরই ছন্দে ছন্দিত—অহরহ এই বোধে ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পের সমাহার ঘটে। এই সৌষম্যের বোধের মূলে একটা ধ্রুব অচঞ্চল সত্তার প্রৈষা (urge) আছে। চিত্তের অন্তরাবৃত্তির দ্বারা এই সত্তার বোধকে জাগিয়ে রাখতে হবে। আমারই গভীরে আছে একটা নির্বর্ণ সত্তা—সুষুপ্তির মত, মৃত্যুর মত, নির্মেঘ আকাশের মত। নিজের নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কখনও-কখনও তার সাক্ষাৎ পাই। এই কূটস্থ সত্তাই আমার জীবনের প্রচোদক, আমার ভাবনা-বেদনা-সঙ্কল্প

সমস্তই উৎসারিত হচ্ছে ওই ধ্রুববিন্দু হতে—জীবনসম্পর্কে এই অবরোহ-(deductive) দৃষ্টি আনতে হবে।

প্রাচীন সাধকেরা সম্যক্-দৃষ্টির উপর খুব জোর দিতেন। বাস্তবিক দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সাধনা অনেক সহজ হয়ে যায়। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা বুদ্ধি খাটাই, একটা জিনিষ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অনেকসময় চলি দিনকানার মত, নির্বোধের মত। এরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, একথা ভুলে যাই। তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিকের চিত্ত না হলে সাধনায় অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে, এটা জানা থাকা ভাল।

অবরোহ-দৃষ্টিতে জগৎকে অস্বীকার করবার কোনও প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বোত্তরের সেখানে কোনও বিরোধ নাই, কেননা বিশ্বকে সেখানে দেখছি বিশ্বোত্তরের বিসৃষ্টিরূপে। তাই এ-দৃষ্টি পূর্ণযোগের অনুকূল। এর মধ্যে গোড়া থেকেই জোর দেওয়া হয় বোধির উপর। যেন প্রথমেই আমরা দেখি পৃথিবীকে নয়—সবিতাকে, আকাশকে। সেই আলোতে দেখি পৃথিবীকে। এখানকার ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিৎ সব-কিছুর উপর ঢালতে থাকি ওখানকার আলো। আমারও আধারের গহনে নিরন্ত নির্ঝরে সেই আলো ঝরে পড়ছে এবং তার বীর্যে প্রতিমুহূর্তে অকল্যাণকেও রূপান্তরিত করে চলেছে কল্যাণে। সাধনায় এমনিতর ইতি-ভাবনার শক্তি অমোঘ। এ তো লাঠি মেরে অন্ধকার তাড়ানোর দুশ্চেষ্টা নয়, এ হল আলোর ছোঁয়ায় তাকে আলো করে ফুটিয়ে তোলা। বিশ্ববিসৃষ্টির মর্মে রয়েছে এই জ্যোতির্ময় রূপান্তরের প্রেরণা, আমাদের জীবনসাধনাকেও সেই দিব্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আঁধারের সহস্র ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আলোকেই জানব এবং মানব সত্য বলে—এই শ্রদ্ধা এবং বীর্যই হল এ-সাধনার পাথেয়। আমাদের মন দেখে আলো-আঁধারির মায়া, কিন্তু চৈত্যসত্তা সব-কিছুর মধ্যে আলো ছাড়া আর কিছু দেখে না। অবরোহ-দৃষ্টি তাই চৈত্যসত্ত্বের জীবনদর্শন।

আলোর ওপারে আছে নির্বর্ণ আকাশ। আলোর নিরন্ত ভাবনায় যে অন্তর্মুখ সংবেগের সৃষ্টি হয়, তা সাধককে কখনও-কখনও ওই আকাশের গভীর গহনে ডুবিয়ে দিতে পারে। এইখানেই ঘটে বৃত্তির নিরোধ এবং প্রপঞ্চেরও উপশম। ভাবনাকে অবলম্বন ক'রে মনের যে-যোগ, এই তার চরম কোটি। অনেক সাধক একেই মনে করেন সাধ্যের অবধি। কিন্তু পূর্ণযোগীর কাছে এ-সিদ্ধিও সাধন মাত্র। এই প্রলয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্তার যে-বীর্য, তাকে নামিয়ে

আনতে হবে সৃষ্টির বুকে। সুষুপ্তির স্তব্ধতা থাকবে স্ফুরন্ত জাগ্রতের গভীরে। সমাধি হবে সহজ। তবেই আত্মপ্রকৃতির সম্যক্‌-রূপান্তর সিদ্ধ হবে। পূর্ণ-যোগীর তা-ই লক্ষ্য।

ভাবনার সাধনার পাশেই রয়েছে বেদনার বা ভাবের সাধনা। আত্মসত্তা দ্বিদল, পুরুষ আর প্রকৃতি তার মধ্যে যুগনদ্ধ হয়ে আছে। ভাবনার সাধনা পুরুষের, আর ভাবের সাধনা প্রকৃতির। ভাবের সাধনা হল হৃদয়ের সাধনা, ভক্তি ও প্রেমের সাধনা। আলোর নির্ঝর নিরন্তর ঝরে পড়ছে এই আধারে, তাতেই হৃদয়ের কমল উন্মুখ আনন্দে দল মেলছে তার দিকে। এই আলোর দেবতা আর কমলিনীর দিব্যসম্প্রয়োগে সত্তার গভীরে উপচে ওঠে ভাবোল্লাসের অফুরন্ত মাধুরী, পুরুষোত্তমের কাছে নিঃশেষ আত্মনিবেদনের আনন্দে হৃদয়ের সকল আকুতির হয় পর্যবসান।

ভাবনা আর ভাবের সাধনা, দুইই সাধককে নিয়ে যায় লোকোত্তর ভূমিতে। প্রবুদ্ধ চেতনার নির্বর্ণ আকাশে ফোটে সাবিত্রী দীপ্তির ছটা, আকাশে-আলোতে এক অবিচ্ছেদ মিলনরভসের রসোল্লাস। জীবসত্ত্ব তাতে আবিষ্ট অভিষিক্ত ও জারিত হয়। কিন্তু এই অমৃতকে ব্যাবহারিক জীবনে সঞ্চারিত করতে না পারলে সাধনা অপূর্ণ থেকে গেল। তাই ভাবনা আর ভাবকে, জ্ঞান আর ভক্তিকে যুক্ত করতে হয় দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে। এই হল সঙ্কল্পের সাধনা। ক্ষুদ্র অহন্তার কামসঙ্কল্পকে নির্জিত করে প্রবৃত্তির গভীরে জাগাতে হবে অন্তর্যামীর সত্যসঙ্কল্পের প্রবর্তনা। এখানেও সেই অবরোহ-দৃষ্টি। দেখতে হবে, আমাকে আশ্রয় করে কর্ম হচ্ছে তাঁরই অমোঘ প্রেরণায়, আমার কামনার প্ররোচনায় নয়। আমার কূটস্থপুরুষের তটস্থ জ্ঞানবৃত্তি যেমন আমাকে অকর্তার আসনে করবে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি আমার আত্মপ্রকৃতির পারার্থ্য স্ফুরিত হবে নিমিত্ত-কর্তার ছন্দোময় কর্মে। সত্তার গভীরে আমি নিস্পন্দ অকর্তা বলেই আমার শক্তি স্পন্দিত হবে দিব্যকর্মের ছন্দে।

এমনি করে ভাবনার সাধনা, ভাবের সাধনা আর সঙ্কল্পের সাধনা— সহজজীবনে এ-তিনের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটলে আধারের চৈত্য রূপান্তর সিদ্ধ হয়। তার ফল হল আধারের গভীরে নিগূহিত চৈত্য-পুরুষের বহিরুন্মেষ। যিনি ছিলেন যবনিকার আড়ালে, তিনি এবার এসে সামনে দাঁড়ান। তাঁর জ্যোতির্ময় আবেশে অপরা প্রকৃতির মূঢ়তা আর বৈকল্য দূর হয়ে যায়, জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সাধক চলে দেবযানের পথে, চলে আলোয় আনন্দে

এবং বীর্যে। সে-চলায় সংশয়ের আচ্ছন্নতা নাই, হৃদয়ের আবিলতা নাই, শক্তির দৈন্য নাই। জীব তখন সত্য ও নিত্য জীব, তার জীবন যুগনদ্ধ শিব-শক্তির সামরস্যের উল্লাসে এক অপরূপ কুমারসম্ভবের মহাকাব্য।

এমনি করে অন্তরের সিদ্ধিকে বাইরেও রূপ দিতে হবে। ধ্যানে সত্তার গভীরে যে প্রশান্ত ও প্রসন্ন জ্যোতির অনুভব পাই, তার শক্তিকে সঞ্চারিত করতে হবে কর্মেও। বস্তুত ধ্যানে আর কর্মে কোনও বিরোধ থাকবে না। কর্ম হবে যোগস্থের কর্ম, তাঁর ধ্যানচিত্তেরই জ্যোতিঃস্পন্দ।

এ-সাধনা চলেছে সহজের পথে, কিন্তু তার চালটি আয়ত্ত করা প্রথম-প্রথম মোটেই সহজ হয় না। চলার পথে আসে তিনটি বাধা। প্রথম বাধা হল অভ্যাসের জড়ত্ব এবং সংস্কারের দাসত্ব। পরিবেশের প্রতিকূলতাসত্ত্বেও কৈশোর পর্যন্ত জীবন অনেকটা সহজ আনন্দেই ফুটে ওঠে, যদিও তার আড়ালে মূঢ়তারও আপাত-নিষ্ক্রিয় একটা সঞ্চয় থাকে। এই মূঢ়তার শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রৌঢ়চিত্তের সংস্পর্শে এসে। সংসারের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে কৈশোরের স্বর্গ হতে মানুষের পতন ঘটে। পরিবেশ তাকে অভ্যস্ত করে অবিদ্যা-প্রকৃতির নানা বিকৃত সংস্কারে। গোড়ায় যে ছিল সহজ, সে কুটিল হয়ে ওঠে। তার বুদ্ধি মার্জিত হয়, কিন্তু হৃদয় স্বাচ্ছন্দ্য হারায়। মোটের উপর এই হল আমাদের সামাজিক শিক্ষার পরিণাম। অবশ্য ক্ষেত্রের দোষ ছাড়া বীজের দোষও আছে। অবচেতনার স্বকীয় মূঢ়তাও পথের বাধা কিছু কম সৃষ্টি করে না। কিন্তু ব্যক্তির অবচেতনায় সঞ্চিত হয় জাতিরই অতীতের সংস্কার। সুতরাং ব্যক্তির সংস্কারান্ধতার জন্য জাতিই অনেক পরিমাণে দায়ী।

অপরা প্রকৃতির মূঢ়তাকে ব্যক্তিগত জীবনে কাটিয়ে উঠলেও অধিচেতনার ভূমি হতে তার আক্রমণ হতে পারে, এই হল পথের দ্বিতীয় বাধা। এ-বাধা দূর করতে হলে চাই চেতনার বিশ্বব্যাপ্ত প্রসার, যা চিন্ময় রূপান্তরের সাধনার অপেক্ষা রাখে।

তৃতীয় বাধা হল সাধকের নিজের হঠকারিতা। গোড়াতেই সম্যক্-দৃষ্টির কথা বলেছি, যাতে সাধনরাজ্যের সমস্তটা মানচিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি না হলে সাধনশক্তির বিভিন্ন প্রবৃত্তির (function) মাঝে সামঞ্জস্য ঘটানো কঠিন হয়। অন্তরের তীব্রসংবেগের প্ররোচনায় সাধক তখন ধরে বলাৎকারের পথ, নিম্নপ্রকৃতির শোধন না করেই বাঁধ ভেঙে উপরের শক্তির প্লাবন নামিয়ে আনতে চায় আধারে। তার ফলে আধারের ভারসাম্য

নষ্ট হয়ে অধ্যাত্মজীবনে দেখা দেয় নানা বিকার এবং বিপর্যয়। দৃষ্টান্ত খুঁজতে বেশী দূর যেতে হবে না। অধ্যাত্মসিদ্ধির একটা সুস্থ সুন্দর এবং সমগ্র প্রকাশ যে এদেশেও কত দুর্লভ, দুঃখের সঙ্গে তা স্মরণ করতে হয় এবং সেইসঙ্গে স্মরণ করতে হয় শাস্ত্রোক্ত 'জড়োন্মত্তপিশাচবৎ' সিদ্ধদেরও কথা।

মোটামুটি এই হল চৈত্য রূপান্তরের সাধনা। এ হচ্ছে জীবনে শুদ্ধ জীবত্বের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদের ভাষায় এটি 'আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধির' অবস্থা। কিন্তু তারও পরে আছে শিবত্বের প্রতিষ্ঠা, উপনিষদের মনোবিদ্যা যাকে বলে 'ধ্রুবা স্মৃতি'। তার সাধনা হল চিন্ময় রূপান্তরের সাধনা। রূপান্তরের সমস্ত সাধনাই পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে আছে, তবুও বোঝবার সুবিধার জন্য আমরা তাকে পর্বে-পর্বে ভাগ করে নিচ্ছি।

চৈত্য রূপান্তর হল চিন্ময় রূপান্তরের ভূমিকা, যার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বিশ্বচেতনার স্ফুরণে। বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটি বৈদিক ঋষি বুঝিয়েছেন একটি সুন্দর উপমা দিয়ে। আকাশে জলছেন সবিতা, তাঁর একটি রশ্মি জীবের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে হৃদয়ে নেমে এসে ফুটছে আলোর কমল হয়ে। এই আলোর কমলটি জীবের জীবত্ব। এই উপমার জের টেনে বলা যেতে পারে, প্রাকৃত জীবের মধ্যে কমলের কলি যেন অধোমুখ হয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু কমলের নালে আছে এক ঊর্ধ্বমুখী আকৃতির নিগূঢ় বিদ্যুৎস্রোত। সবিতার আলোর ছোঁয়ায় তার মন্থর বেগ প্রখর হয়, ঘুম ভেঙে আলোর কমল মুখ তুলে চায় সবিতার দিকে। আলো নেমে এসে এইখানে আলো ফোটায়—দলে-দলে শিরায়-শিরায় কেশরে-পরাগে বৃন্তের তন্তুতে-তন্তুতে আলো ঝিকিয়ে ওঠে, এলিয়ে পড়ে, ছড়িয়ে যায়। এই কমল-জীবন হল চৈত্য রূপান্তরের সিদ্ধি, জীবের জীবত্বের পূর্ণপ্রকাশ। কিন্তু অভীপ্সার তো এইখানেই শেষ নয়। কমল যে চায় আকাশে উড়তে, সবিতার মধ্যে নিজেকে পেতে, যে-আলো হাজার কমলের ঘুম ভাঙাল তার গভীরে ডুবতে। ঊর্ধ্বলোকে চেতনার এই উত্তরণ এবং প্রতিষ্ঠাই হল চিন্ময় রূপান্তরের মর্মকথা।

চিন্ময় রূপান্তরের সাধারণ লক্ষণ হল চেতনার তুঙ্গতা এবং বিশ্বব্যাপ্ত বিস্ফোরণ—যোগীর ভাষায় 'শিরসি সহস্রারে' চৈতন্যের স্থিতি এবং বিলাস। মনে রাখতে হবে, এও জাগ্রৎ-সমাধির অবস্থা। ঊর্ধ্বজ্যোতির অজস্র বিভূতি

তখন সহজের স্রোতে আধারে নেমে আসে বন্যার মত। যেমন কূটস্থ সত্তার প্রশান্তি ফোটে আকাশের উত্তুঙ্গ উদার ব্যাপ্তিতে, তেমনি তার বুকে ঢেউ খেলে যায় যুগনদ্ধ শিবশক্তির সামরস্যের আনন্দ, জীবঘন বিশ্বতনুর অণুতে-অণুতে কাঁটা দিয়ে ওঠে মধুচ্ছন্দা চিদ্‌বিলাসের বিদ্যুৎ। বিশ্বাত্মক ভাবনা জমাট বাঁধে ব্যষ্টির আধারে—চিত্তে ফোটে বিজ্ঞানের দীপ্তি, হৃদয়ে হ্লাদিনীর জ্যোৎস্না, ইন্দ্রিয়ে ও দেহে লোকোত্তর অনুভাবের পুণ্যচ্ছটা, অতন্দ্র কর্মে চিৎ-শক্তির ক্ষেমঙ্কর উল্লাস।

চৈত্য রূপান্তরের সিদ্ধিতে সহজের যে-বীর্য আবির্ভূত হয় জীবনে, তা-ই হয় চিন্ময় রূপান্তরেরও প্রয়োজক। সহজের শক্তি সম্যক-দৃষ্টির শক্তি, শুদ্ধ-বোধের শক্তি। জ্ঞান যখন আর মানসী ক্রিয়া নয়—কিন্তু বোধির ব্যাপার বা শুদ্ধসত্ত্বের স্বচ্ছন্দ বিকিরণ মাত্র, তখন তার মধ্যে ফুল ফোটার মত একটা উন্মেষের লীলা দেখা দেয়। উত্তর-সত্যকে তখন আর চেষ্টা করে জানতে হয় না, খোলা চোখে আলোর মত তা আপনি এসে নিজেকে জানিয়ে দেয়। প্রথম সে আসে বিদ্যুতের ঝলকে-ঝলকে—এই আসে এই মিলিয়ে যায়, আবার ঘন-ঘন আসতে থাকে। ক্রমে চঞ্চল বিদ্যুৎ স্থির হয়, উপরের আকাশ নীচে নামে। অবশেষে ওই আকাশ আর এই আকাশ দুয়ে একাকার হয়ে যায়, সমাধি আর ব্যুত্থানে কোনও ভেদ থাকে না। উপনিষদের ভাষায় জীবন হয় বিশ্বপ্রাণ মহাভূতের নিঃশ্বসিতের ছন্দ।

আধার জুড়ে এই-যে স্থিরবিদ্যুতের দীপ্তি, এই-যে উন্মেষের ছন্দ, তার মধ্যে একটা শক্তির খেলাও আছে। শক্তি কাজ করে দুদিক দিয়েই—চেতনাকে সে যেমন ঊর্ধ্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি উত্তরজ্যোতির বীর্যকে অবর-ভূমিতে নামিয়েও আনে। এই নামিয়ে আনাকে মরমীয়াদের ভাষায় বলে শক্তিপাত। শক্তিপাত যে-কোনও রূপান্তরের পক্ষে অপরিহার্য। শক্তিপাত যেমন ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, তেমনি জাগ্রত চেতনাকে লোকোত্তরের ঐশ্বর্যে মণ্ডিতও করে। আধারকে সে গড়ে তোলে নতুন ছাঁদে। চৈত্য-রূপান্তর যদি পূর্বেই সিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে এই শক্তিপাতের ক্রিয়া বিপুল এবং দুর্বার হলেও তার মধ্যে থাকে সহজ প্রকাশের সৌষম্য। আকাশের বৈপুল্যে আলোর অনিবাধ বিস্তারের মত চেতনা তখন সবসময় জারিত থাকে একটা আনন্ত্যের বোধে। বিজ্ঞানের এই আনন্ত্যে ওঠে চিদ্‌বিলাসের নানা ঢেউ—কখনও লোকোত্তরের অগম নৈঃশব্দ্যে, কখনও উত্তরজ্যোতির বিচিত্র

ঐশ্বর্যে, কখনও প্রাতিভসংবিতের বিদ্যুদ্‌দীপ্তিতে, কখনও-বা ইন্দ্রিয়সংবিতের চিন্ময় তীক্ষ্ণতায়। ঈশ্বরকে তখন ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, আস্বাদন করা যায়। আত্মভাবের সান্দ্রতা তখন ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অণুতে-অণুতে : অনুভব হয়, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম'—সবই আত্মা, সবই চিন্ময়।

এই হল চিন্ময় রূপান্তরের স্বরূপ। ধারণার সুবিধার জন্য আমরা এখানে তার একটা ছক বেঁধে দিয়েছি, কিন্তু বস্তুত তার ক্রিয়া সবসময় ক্রম মেনে চলে না। কোনও অধ্যাত্মসাধনাই তা করে না, কেননা একটি শিববিন্দুতে বিধৃত থেকে শক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং সাবলীলতাই হল অধ্যাত্মসিদ্ধির রহস্য। শক্তির এই সাবলীলতাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নিতে পারলে সাধক অনেক সংশয় ও অস্বস্তির হাত হতে বেঁচে যায়।

ক্রম মেনে এবং না মেনে শক্তির ক্রিয়া হতে পারে বলেই অনেকসময় চৈত্য এবং চিন্ময় রূপান্তরের সাধনা পাশাপাশি চলে। হৃদয়ের কমল পুরা-পুরি ফোটবার আগেই সাধকের তীব্র আকূতিতে আধারে শক্তিপাত ঘটতে পারে। বলা বাহুল্য, অকালে শক্তিপাতের ফলে লোকোত্তর অনুভব অনেকসময় দেখা দেয় ব্যামিশ্র হয়ে। তার জন্য মনের অভ্যস্ত সংস্কার প্রায়ই দায়ী। এদেশের সাধকদের মধ্যে নিরোধের দিকে একটা মাত্রাছাড়া ঝোঁক থাকায় মনের পুরাপুরি উন্মীলন না ঘটিয়েই উত্তর-শক্তিকে তাড়াতাড়ি তারা আধারে নামিয়ে আনতে চায়। উপরের আলো তখন নামে ঘুমন্ত মনের 'পরে। তাতে সমাধির সময়টা বেশ কাটে, কিন্তু গোলমাল লাগে ব্যুত্থানদশায়। স্বাভা-বিক নিয়মে সমাধিপ্রত্যয়ের বীর্য ব্যুত্থানের মধ্যে খানিকটা সংক্রামিত হলেও পুরাপুরি তা হয় না, সুতরাং অবরপ্রকৃতির রূপান্তরও ঘটে না। সিদ্ধ-ব্যবহারের মধ্যেও তাইতে আমরা অনেকসময়ে নানারকম বৈষম্য দেখতে পাই। তাছাড়া অমার্জিত আধারে শক্তিপাতের ফলে অনেকসময় অবচেতনায় লুকানো অবিদ্যাশক্তিও এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে তাদের বাগ মানাতে সাধকের প্রাণ বেরিয়ে যায়। সময়ের পূর্বে শক্তিপাত ঘটাবার এমনিতর নানা বিপদ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বোধ হয় অশুদ্ধ অহন্তার স্ফীতি—যা সাধকের নিজেকে যেমন ঠকায়, তেমনি ঠকায় পরকেও। প্রকৃতির ধরনধারন তো বস্তুত সহজ নয়—তার চলনে আছে নানা বাঁক, নানা বৈচিত্র্য। এই-জন্যই সাধকের পক্ষে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ঔদার্য এবং স্বচ্ছতার এত প্রয়োজন। সাধনাকে গোড়া হতেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সহজ সৌষম্যের ছন্দে। আধারের

প্রত্যেকটি অংশকে তার স্বভাব ও স্বধর্ম অনুসারে সংস্কৃত করতে হবে সবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। একদেশদর্শিতা, হঠকারিতা, অধৈর্য এগুলিকে বিষের মত বর্জন করতে হবে। প্রকৃতিপরিণামের গতি অত্যন্ত মন্থর, বিশেষত সামাজিক পরিবেশ যেখানে আজও চিদুন্মেষের অনুকূল নয়। একথা জেনেও তাড়াহুড়া বা জবরদস্তি করলে কোনও লাভ হয় না। ইষ্টসিদ্ধির পথে সাধককে এগিয়ে যেতে হবে অটুট শ্রদ্ধা, উদার দৃষ্টি, কঠিন সঙ্কল্প এবং অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে। বাস্তবকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে চলবে না, ভাবের সুষম শক্তিতে তাকে গড়তে হবে নতুন করে—যেমন নিজের ভিতরে, তেমনি বাইরেও।

প্রকৃতি-পরিণামের মন্থরতাকে আমরা ক্ষিপ্র করতে পারি—নীচে থেকে আকুলিবিকুলি করে নয়, আকাশের মত প্রশান্ত থেকে উপরের শক্তিকে নীচে নামিয়ে এনে। এইজন্য প্রত্যেক রূপান্তরের সাধনায় একটা ঊর্ধ্বতর শক্তির প্রসাদের অপেক্ষা আছে। চৈত্য রূপান্তর সহজ হয়, যদি চিন্ময়-ভাবনার তুঙ্গতা এবং ব্যাপ্তি হয় তার পটভূমিকা। আকাশভরা আলোর আশ্বাসে এবং প্রসাদেই হৃদয়ের কমল দল মেলে। তেমনি চিন্ময় রূপান্তরও পূর্ণসিদ্ধ হয় অতিমানস শক্তির অবতরণে। বস্তুত অতিমানস রূপান্তরই আমাদের পরমপুরুষার্থ। চৈত্য এবং চিন্ময় রূপান্তরের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি-পরিণাম অগ্রসর হচ্ছে অতিমানস রূপান্তরেরই দিকে।

এইবার তার কথায় আসা যাক।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

অতিমানসের দিকে

অতিমানস রূপান্তর হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। অতিমানসের কথা আমরা আগেই বলেছি, যদিও মনের ভূমি থেকে তার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা কোনরকমেই সম্ভব নয়। তবুও অতিমানসই যখন সৃষ্টির প্রবর্তক এবং মন যখন তার বিভূতি, তখন তার আভাস যে একেবারে মনের অগোচর তা নয়। উপনিষদে আছে বিজ্ঞানভূমির কথা, যা মনের ওপারে অথচ মানুষের সকল মননের আশ্রয়। এই বিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে অতিমানসের বৃত্তি। উপনিষদের সংজ্ঞা ব্যবহার করে বলতে পারি, অন্ন (matter)-প্রাণ-মন যেমন উজিয়ে চলেছে, তেমনি সৎ-চিৎ-আনন্দও নেমে আসছে বিজ্ঞানের দিকে। ব্যক্তির দিক থেকে সিদ্ধচেতনায় যা বিজ্ঞান, বিশ্বের দিক থেকে ব্রহ্মচেতনায় তা-ই অতিমানস। তাই মানসোত্তর বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে তবে অতিমানসের বৈভবের ধারণা সম্ভব হয়, যদিও একেও বলব অতিমানস সিদ্ধির ভূমিকা মাত্র।

মানুষের মননের দুটি আশ্রয়—ইন্দ্রিয়জ বিশেষজ্ঞান, আর তাকে ভিত্তি করে বুদ্ধিজ সামান্যজ্ঞান। সামান্যজ্ঞান হল বিজ্ঞানের মুখ্যবৃত্তি। সামান্য-জ্ঞানকে ধরে মানুষ অমূর্তের দিকে অগ্রসর হয় যার পর্যবসান ঘটে দার্শনিক ভাবনায়। দর্শন সামান্যাশ্রয়ী বলে তার মধ্যে ভাবনার ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের তীক্ষ্ণতা নাই। সামান্যপ্রত্যয়ের মধ্যে যদি বিশেষপ্রত্যয়ের তীক্ষ্ণতা সঞ্চারিত হয়, তাহলেই আমরা পাই শুদ্ধবিজ্ঞানের বৃত্তি। বলা বাহুল্য, অনুভব তখন প্রাকৃত বা লৌকিকের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু লৌকিকের আশ্রয়রূপে অলৌকিক তার অতিরেক মাত্র, একথা আগে বলেছি। সুতরাং বিজ্ঞান স্বরূপত মনের অতীত হলেও কার্যত তার আধার। বিজ্ঞানের বৃত্তি দিয়ে যদি মনের বৃত্তিকে জারিত করা যায়, তাহলে মন অবিদ্যার ব্যাপার হতে উত্তীর্ণ হবে বিদ্যার ব্যাপারে। এমনিতর বিজ্ঞানের জারণা হল পূর্ণ-যোগের এবং অতিমানস রূপান্তরের মুখ্য সাধন।

সমস্ত সাধনাকেই আমরা দেখি উজান বওয়ার ব্যাপাররূপে। প্রবর্ত-সাধকের পক্ষে এ-দৃষ্টি অপরিহার্য। উজান বওয়ার পর আবার ভাটিয়ে আসা—

একে আমরা জানি সিদ্ধের বিলাস বলে। কিন্তু সাধক উজান-ভাটার যুগল ধারাকে যদি একই সঙ্গে আধারে কাজ করতে দেয়, তাহলে তার সাধনা হবে পূর্ণযোগের অনুকূল। একটি বৈদিক রূপক ব্যবহার করে বলা চলে, এ যেন আধারে আগুনের শিখা আকাশের দিকে জ্বলে উঠছে, আর সেইসঙ্গে সোমের ধারা সেখান থেকে নিরন্ত নির্ঝরে ঝরে পড়ছে। জীবের অভীপ্সা আর শিবের প্রসাদ—দুয়েরই সম্মিলিত বীর্যে ঘটছে আধারের রূপান্তর।

আগে চৈত্য রূপান্তর, তারপর চিন্ময় রূপান্তর, সবার শেষে অতিমানস রূপান্তর—এমনতর একটা পরম্পরার কল্পনা আমরা করেছি। কিন্তু অতিমানস রূপান্তরই যদি সব সাধনার লক্ষ্য এবং আশ্রয় হয়, তাহলে চৈত্য এবং চিন্ময় রূপান্তরের সাধনাতেও অতিমানস রূপান্তরের ভাবনা অনুস্যূত হয়ে থাকবে। সুতরাং সাধনার মধ্যে পর্বভেদ থাকলেও গোড়া থেকেই তাকে চরম লক্ষ্যের অনুকূলে পরিচালনা করা অসম্ভব নয়। এইজন্য অতিমানস রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে আবার আমাদের শুরু করতে হবে একেবারে সাধনার আদিপর্ব হতে।

অতিমানস রূপান্তরকে চরম লক্ষ্য রেখে তারই আলোকে সাধনার গোড়ার কথাগুলি একবার আলোচনা করা যাক।

চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তর সিদ্ধপ্রায় না হলে অতিমানস রূপান্তরের অপরোক্ষ ক্রিয়া দেখা দেয় না। সুতরাং আমাদের শুরু করতে হবে চৈত্য রূপান্তরের সাধনা দিয়ে, যদিও তার মধ্যে থাকবে অতিমানস ভাবনার আবেশ। এ-আবেশ চেতনায় সবসময় জাগিয়ে রাখবে ভূমার সহজ এবং অবাধিত একটা প্রত্যয়—প্রসন্নোজ্জ্বল আকাশের আনন্ত্যের মত। এ কোনও মনগড়া প্রত্যয় নয়, যা আছে তারই অত্যন্ত সহজ অনুভব। চোখ মেলে আলো দেখার মত এ হল চৈত্যবোধের দৃষ্টিতে অনন্তকে দেখা। আকাশের আনন্দ আলো হয়ে প্রতিদিন পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরছে, পৃথিবীর পুষ্পে-পল্লবে জেগে উঠছে প্রাণের শিহরন। এমনি করে প্রতিমুহূর্তে আমাদেরও মন প্রাণ দেহ এমন-কি অবচেতনা ও অচেতনার গহন পর্যন্ত শিউরে উঠবে অসীমের ছোঁয়ায়। গর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের সত্তায় ভাবে প্রাণাবেশে জারিত হয়ে থাকে, তেমনি করে আমাদের সত্তা অতি-সহজেই জারিত হয়ে থাকবে সৎ-চিৎ-আনন্দের ধারাসারে—শিশুর মত অজ্ঞানে

নয়, সম্যক্-সম্বন্ধের পূর্ণজ্ঞানে। ফুল ফোটার মত আলোর দিকে চিত্তের এই-যে সহজ উদ্গতি, এই হল অতিমানস রূপান্তরের অনুকূল পরিবেশ।

মনে হবে, এ যেন শেষের কথাটাই গোড়ায় বলছি। কিন্তু উপায় নাই। বহু আয়াসে হলেও এই সহজের বোধটুকু যেপর্যন্ত চেতনায় স্ফুরিত না হচ্ছে, সেপর্যন্ত অতিমানসের সার্থক ধারণা আমরা করতে পারব না। এইজন্য শুরুতেই অধিকারিভেদের কথা ওঠে। প্রাচীন সাধনশাস্ত্রে তিনরকম অধিকারীর কথা আছে। উত্তম অধিকারীর কানে শ্রুতির মন্ত্র ঢুকতেই ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তখনই তার সব-কিছু হয়ে যায়। মধ্যম অধিকারী মন্ত্র শুনে মনন করে, তর্ক দিয়ে মনের সংশয় কাটায়, তবে তার মধ্যে আলো ফোটে। অধম অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে নানা কসরত করে দেহ-মনের আড় ভেঙে আলোর দেখা পায়। বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের অধিকারী উত্তম অধিকারী। অধমকেও উত্তমের পর্যায়ে আসতে হবে, তবে তার সত্যকার সাধনা শুরু হবে।

একটা সঙ্কেত দেওয়া যেতে পারে। এ-সাধনা চেষ্টা-চরিত্র করে একটা-কিছু গড়ে তোলবার সাধনা নয়—প্রকৃতিতে যা হচ্ছে, নির্বাধে তা হতে দেওয়াই এখানে সাধনা। অবশ্যই এক্ষেত্রে প্রকৃতি বলতে অপরা প্রকৃতির কথা বলছি না, বলছি পরা এবং পরমা প্রকৃতির কথা। অপরা প্রকৃতির অধিকারে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ 'করতে'ই হবে। কিন্তু করার পাট চুকিয়ে যখন থেকে 'হওয়া'র পাট শুরু হবে, তখন থেকে অতিমানস রূপান্তরেরও শুরু। অপরা প্রকৃতির ভূমিতে থেকে বলতে পারি, এই ক'টি অভ্যুপগম (postulate) এ-সাধনার গোড়ায় রয়েছে : আনন্ত্যের একটা অপরোক্ষ এবং সহজ বোধ, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অবরোহ-দৃষ্টি, প্রসাদ ও শক্তিপাতের স্বচ্ছন্দ অনুভব, আধারের অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ। চেতনা একেবারে শরতের নির্মেঘ আকাশের মত প্রশান্ত প্রসন্ন উজ্জ্বল এবং উদার হওয়া চাই। ভাবনা ছাড়লেই অভাব দূর হয়, ভাব আপনি ফোটে—অধ্যাত্মপ্রকৃতির এই নিগূঢ় রীতিতে বিশ্বাস থাকা চাই।

তাছাড়া কালের একটা অপেক্ষা তো আছেই। সময় না হলে সহজে কিছু হয় না। অসময়ে অনেক সাধ্য-সাধনায় একটা ফল ফলানো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু সময়ের ফল ফলে বিনা আয়াসে, প্রকৃতির প্রাণের উচ্ছ্বাসে। অধ্যাত্মসিদ্ধি আজও আমাদের তপস্যার ফল, জন্মের ফল নয়। তপোগত সিদ্ধিকে জন্মগত করতে হবে, এই হল পূর্ণযোগীর দায়। জন্মগত সিদ্ধিই সহজ এবং সর্বগত সিদ্ধি। অতিমানস সিদ্ধির গূঢ়বীর্য সমষ্টিপ্রকৃতির বন্ধ্যাত্ব

ঘোচাবে, দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের অধিকারকে করবে সর্বজনীন—এই হল দূরের লক্ষ্য। দূরকে নিকট করতে হবে, কালকে জয় করতে হবে। ভাবনার দ্বারা তা সম্ভব। কিন্তু সে-ভাবনা মননের কৃচ্ছ্রতা নয়, বিরাটের সহজ বোধ।

আরও কথা আছে। পূর্ণাদ্বৈতবাদ জগৎকে মিথ্যা তো বলেই না, তাকে লীলা বলেও তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সমস্ত দায় চুকিয়ে দেয় না। তার কাছে বিশ্বব্যাপারের একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। সে-অর্থকে জীবনে রূপ দিতে হবে, তবেই সাধকের সিদ্ধি। বিশ্বমূল চিন্ময় অর্থের ভাবনা এবং বোধ তাই অতি-মানস রূপান্তরের অপরিহার্য উপক্রমণিকা। অপরা প্রকৃতির সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা ভাঙতে হবে, আধারে ফোটাতে হবে পরা প্রকৃতির সহজ ও উদার ছন্দ। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের ভূমিকায় থেকে পরমপুরুষের নিমিত্তরূপে সাধক তুলে নেবে অভিনব সৃষ্টির দায়, তার প্রত্যেকটি চিন্তা এবং কর্ম হবে সাবিত্রী-শক্তির বিচ্ছুরণ। বিশ্বের জীবনকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, তটস্থ থেকে তাকে শুধু মেনে নেওয়াও নয়, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিন্ময় ভাবনা এবং কর্মের বীর্যে তাকে উদ্দীপ্ত করা—এই দিব্যসঙ্কল্পকে সিদ্ধ করাই হবে পূর্ণযোগীর জীবনব্রত।

নিজের জীবনে এইজন্য অভঙ্গ-সমাহরণের (integration) কৌশল প্রয়োগ করতে শেখা চাই। দেহ-প্রাণ-মনের আড়ষ্টতা হতে মুক্ত হবার জন্য মানসোত্তর চেতনায় আসন পাততে হবে সত্য, কিন্তু সেখান থেকে এদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। বিজ্ঞানের সৌষম্য দিয়ে মনের ভাবনাকে জারিত করতে হবে, প্রাণের চাঞ্চল্যকে করতে হবে ছন্দোময়, জড়ত্বের মূঢ়তাকে রূপান্তরিত করতে হবে স্থৈর্যের প্রত্যয়ে। কর্মচেষ্টা, আহার-বিহার নিদ্রা-জাগরণ সমস্তই তুরীয়ের আলোকে উদ্ভাসিত এবং তার বীর্যে উদ্‌বোধিত হবে। সমাধি হবে সহজ, লোক এবং লোকোত্তরের ভেদ সে ঘুচিয়ে দেবে। এই জাগ্রতের মধ্যেই নেমে আসবে আনন্দঘন সুষুপ্তির নিথরতা এবং বিজ্ঞানঘন স্বপ্নের ভাবোল্লাস। প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন ভুল করে হলেও এই অপ্রাকৃত অনুভবই চায়। লোকোত্তরের আবেশে তাদের ভুল ভাঙবে, তাদের চলনের অনৃত রূপান্তরিত হবে ঋতচ্ছন্দে। শুধু যে আর তাদের বেতালে পা পড়বে না তা-ই নয়, তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে থাকবে একটা সঙ্কল্পশক্তির প্রবর্তনা এবং তার ফলে পরিবেশও ছন্দোময় হয়ে উঠবে। আত্মাই বিশ্বের কেন্দ্র। শক্তি আত্মাতে সংহত এবং প্রতিষ্ঠিত হলেই তা দুর্ধর্ষ বেগে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মোটামুটি এইগুলি হল অতিমানস রূপান্তরের সূত্র। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনটি রূপান্তরের সাধনাই অন্যোন্যনির্ভর। তাই আর-কিছু বলবার আগে রূপান্তরের সাধারণ শর্তগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

রূপান্তরের প্রথম শর্তই হল চৈত্য-জাগরণ, মরমীয়াদের ভাষায় যাকে বলে দ্বিজত্বলাভ। এখন বাইরে ছড়িয়ে আছি, সেখান থেকে ঢুকতে হবে ভিতরে। সেইখানে জেগে থেকে অনিমেষ দৃষ্টির শাসনে বাইরের প্রকৃতির চলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পের উদ্দামতা তখন শান্ত হবে, তার মধ্যে গভীরতর একটা অর্থের আবিষ্কারে জীবনের সাধনা হবে স্বভাবের অনুগত।

কিন্তু স্বভাবের বিকার সহজে কাটে ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে। আমার সান্ত ভাবনা ও কর্মের চারদিকে একটা অনন্ত জ্যোতিঃশক্তির পরিমণ্ডল রয়েছে, যা সৌররশ্মির মত আমার প্রতি লোমকূপে যেন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে—এই শ্রদ্ধার বীর্যে অবিদ্যাচেতনার ঘোর কেটে যায়, আমি কে এবং আমার কাজ কি তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের ব্রতকে এমনি করে খুঁজে পেলে পরমা শক্তির কাছে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিতে আর বাধে না। আমি তখন চলি আমার ইচ্ছায় নয়, সেই বিশ্বভাবন শক্তির প্রচোদনায়। তাঁর যে নিগূঢ় আকূতি সহস্রদল কমলের মত বিশ্বকে ফুটিয়ে তুলছে, সে হয় আমারও জীবনস্পন্দ।

বৃহতের সঙ্গে এই নিত্যযোগে মন স্বচ্ছ হলে ফোটে বোধির আলো। সে তখন আর তর্কবুদ্ধির ঘোরালো পথে চলে না, অন্ধবাসনার প্ররোচনায় বার-বার বিঘোরে পা বাড়ায় না—যা জানবার তা সে সহজে জানে, যা করবার তা স্বচ্ছন্দে করে। দুর্ভাবনা আর অচরিতার্থতার ভার হতে মুক্ত হয়ে মনের শক্তি তখন হয় আলোর শক্তি, সঙ্কল্পসিদ্ধি হয় অনায়াস—কেননা মন তখন আর ভুয়া 'স্বাধীন-ইচ্ছার' ইশারায় চলে না, চলে বিশ্বান্তর্যামীর প্রশাসনে। প্রত্যেকটি ভাবনা এবং প্রত্যেকটি কর্মের সঙ্গে তখন থাকে বিশ্বভাবন শক্তির প্রজ্ঞা এবং সঙ্কল্পের যোগ, তাই জীবন হয়ে ওঠে দেবতার ব্রত।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে। রূপান্তরের বেলায় শুধু পুরুষের সায় ও সহায়তা থাকলেই চলে না, সেইসঙ্গে চাই প্রকৃতিরও সায় ও আনুকূল্য।

শুধু মন দিয়ে রূপান্তর চাইলেই হবে না, চাইতে হবে প্রাণ দিয়ে, দেহ দিয়ে—আধারের সবখানি দিয়ে। এইজন্য নিজেকে চেনা চাই, দেহ-প্রাণ-মনের প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন সমস্ত বাসনার খবর খুঁটিয়ে জানা চাই। আধারের ভাল-মন্দ যা-কিছু সবারই পরিচয় নিতে হবে সত্যের সুস্পষ্ট দিবালোকে। আত্মাদরে ঘা পড়বে বলে নিজের কাছে নিজেকে আড়াল করে রাখলে চলবে না, বা আদর্শবাদের মোহে তাড়াতাড়ি নিজের দুর্গুণগুলির পাশ কাটিয়ে গেলেও হবে না। নিজের মধ্যে পুরুষকে যেমন জানতে হবে, তেমনি প্রকৃতিকেও জানতে হবে—এবং জানতে হবে খুঁটিয়ে। এইটিই কঠিন। ভাবের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া বরং সহজ। কিন্তু অ-ভাবের শিকড়গুলি পাতাল খুঁড়ে বের করে তাকে ভাবে রূপান্তরিত করা অসীম অধ্যবসায়ের কাজ। অথচ এইটি না হলে আত্মসমর্পণও কখনও সম্পূর্ণ এবং সার্থক হবে না—ভাবের ঘরে চুরি থেকেই যাবে। ভালবাসার আলোর কাছে নারীচিত্তের বিবশ আত্মসমর্পণের মত প্রযত্নশৈথিল্যের (relaxation) একটা লঘু এবং প্রদীপ্ত বোধকে আধারের সবটুকু দিয়ে অনুভব করা চাই, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত আড় ভেঙে নিজেকে একেবারে বাষ্পতরল করে মেলে দেওয়া চাই সত্যের সবিতার কাছে। তবেই প্রকৃতির পুরুষকে চাওয়া সত্য এবং সার্থক হবে।

মোটামুটি এই হল রূপান্তরের শর্ত। এবার সাধনার কথায় আসা যাক।

সাধনার প্রথম পর্বে চাই তীব্র এষণা (seeking) এবং নিষ্ঠাপূত প্রয়াস (effort), আর সেইসঙ্গে পরা শক্তির কাছে নিজেকে লুটিয়ে দেওয়া। সমর্পণ সাধনার গোড়ার কথা। কিন্তু সেটা শুধু মুখের কথা নয়। সমর্পণ-বুদ্ধি প্রথম থাকে একটা শুভেচ্ছা বা সঙ্কল্পের আকারে, দীর্ঘদিনের অতন্দ্র সাধনায় তা সিদ্ধরূপ ধরে। যে-অহং সমর্পণের বাধা, তাকে নিয়েই প্রথম সাধনার শুরু। মলিন অহং শুদ্ধ হবে, তাঁর যন্ত্র হবে—এবং হবে তাঁরই শক্তিতে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে এ-কাজটি শুরু করতে হবে তাকেই। এইজন্য চাই আত্মসচেতনতা, চাই অতন্দ্র বিবেক, চাই নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ, চাই বিরুদ্ধ শক্তির হানাকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা। সাধনার গোড়াতেই এই-যে অধৃষ্য বীর্যের পরিচয়, জানতে হবে এ তাঁরই বীর্য। এই বোধ যখন সুস্পষ্ট

হবে, তখন সাধনার দ্বিতীয় পর্বের শুরু। তখন আর সাধনা আমি করছি না, আমার মধ্যে থেকে সাধনা করছেন তিনিই। তিনিই আমাকে তাঁর মত করে গড়ে তুলছেন, আমার কর্মে রূপ ধরছে তাঁরই সঙ্কল্প। এ-অবস্থাকে গোত্রান্তরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবনের তখন মোড় ফিরে যায়। অভীপ্সার আগুন এর আগে শিখা মেলেছিল উপরপানে, এবার তার উপর নেমে আসে প্রসাদের সৌম্যধারা। উত্তরশক্তির 'পরে নির্ভরতা তখন পূর্ণ হয়, কিন্তু তাতে আত্মসচেতনতা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাধকের অন্তর্দৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণ, সন্ধানী-আলোর মত আধারের সর্বত্র তা বিসর্পিত হয়। নিজের মর্মভেদী দৃষ্টির কাছে নিজের কোন-কিছুই আর আড়াল থাকে না—মন-প্রাণ-দেহের চেতনা, অবচেতনার সংস্কার, অচেতনার মূঢ়তা, সব-কিছু বোধির আলোকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এইহতে সত্যকার আত্মসমর্পণে শুরু হয় সাধনার তৃতীয় পর্ব। এ-আত্মসমর্পণ আর ভাসা-ভাসা একটা মানস-প্রত্যয় নয়, আধারের অণু-পরমাণুকে শিউরে তুলে আলোর দিকে তার একটা উদগ্র আকূতি। নিজেকে জানা তখন পূর্ণ হয়—শুধু আত্মসত্তার কূটস্থ স্তব্ধতাকে জানাতে নয়, আত্মপ্রকৃতির সকল সম্ভাবনাকেও খুঁটিয়ে জানাতে।

বলা বাহুল্য, এই-যে আকূতি আত্মসমর্পণ আর আত্মজ্ঞান, এর কোনটাই মনোভূমির ব্যাপার নয়। এরা সবই বোধিজ প্রত্যয়। ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে আলোর মত এরা সাধকের চিত্তে ফুটে ওঠে। 'আমার সব-কিছুতেই আর আমি নয়, আছ তুমি'—এই নিবিড় অন্তরঙ্গ বোধ হতেই এদের উদ্ভব। এই বোধ যতই উজ্জ্বল হতে থাকে, আধারে চিৎশক্তির প্রদীপ্ত স্পর্শ ততই যেন একটা সঞ্জীবন প্রলয়ের আগুন ছড়িয়ে দেয়। সে-আগুনে সব পুড়ে গিয়ে লোকোত্তরে সত্তার পরিনির্বাণও ঘটতে পারে। প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য দেহপাতের প্রতীক্ষায় থাকার কথা এইখানেই ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতির রূপান্তর যদি হয় অন্তর্যামীর অভিপ্রায়, তাহলে তীব্রতম শক্তিপাতের ফলে আধারে সঞ্জীবনী সৌম্যশক্তির আবেশ হয় মুখ্য। ব্যাপারটা নির্ভর করে কতকটা সংস্কারের 'পরে, কতকটা প্রাক্তন অভ্যাসের 'পরে। নিরোধের সংস্কার যার মধ্যে প্রবল, সে প্রলয়ঙ্কর হীনযানের পথে চলতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনবোধ যার মধ্যে প্রবল, সে ধরে মহাযানের পথ। সে প্রলয়ের বুকে দেখে সৃষ্টির আলো। তার শূন্যতা জাগ্রৎকে সুপ্তির মধ্যে তলিয়ে দেওয়া নয়, সুপ্তির স্তব্ধতাকেই জাগ্রতের মধ্যে সঞ্চারিত করা। এই মহাযানই পরমা

প্রকৃতির অভিপ্রেত, অতএব লোকাতত সহজ পথ। ভারতবর্ষের সাধনাও এক নিগূঢ় প্রেরণার বশে এই পথেই চলেছে।

সহজ প্রত্যক্ষের মধ্যে অর্থের বোধ গভীর হলে যে তত্ত্বদর্শন হতে পারে এবং সে-দর্শনই যে সম্যক্-দর্শন—একথা আগে বলেছি। উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্রের তাৎপর্য সত্য হয়ে ওঠে এই বোধের গভীরতা হতে। ধ্যান তখন চোখ বুজেই হয় না, চোখ মেলেও হয়। চিত্তে প্রবৃত্তির ধারা তখন উল্টে যায়। আমি আর তখন তাঁকে পেতে চাই না, অনুভব করি তিনি আমায় পেয়ে রয়েছেন। করার প্রয়াস তখন পর্যবসিত হয় হওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যে। এটি হয় স্ব-ভাবের স্ফুরণে, বোধির উদ্দীপনে। মন-বুদ্ধির বিশ্লেষণশক্তি তখনও থাকে, কিন্তু তারা হয় বোধির আজ্ঞাবহ। তেশিরা কাচের ভিতর দিয়ে আলো যেমন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে, বোধির ভিতর দিয়ে তেমনি তখন দেখা যায় মন-বুদ্ধির বিচ্ছুরণ—বহুর জগতে ব্যবহারকে সিদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু তার মধ্যে সর্বব্যাপ্ত একের বিজ্ঞান আন্তর-প্রত্যক্ষে প্রজ্বল হয়েই থাকে। ব্যাবহারিক চিত্ত তখন একাগ্রভূমিক ধ্যানচিত্ত—তার উজানে সত্তার নিস্পন্দতা আর ভাটাতে কল্যাণভাবনার ঐশ্বর্য। শুদ্ধসত্ত্বের অগ্নিদীপ্তিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তখন জারিত। তাই রাজসিক চাঞ্চল্য তখন ধরে অকুণ্ঠ লীলায়নের রূপ, তামসিক মূঢ়তা হয় অটল স্থৈর্যের আধার। অথচ সমস্ত ছাপিয়ে থাকে সত্তার অণুতে-অণুতে এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির আবেশ, নির্মেঘ আভাস্বর বিরাট আকাশের স্তব্ধতার সঙ্গেই যার উপমা চলে।

সাধ্যসাধনায় এটি হয় না, হয় আবেশে। এ তো বদ্ধ-দুয়ার ঠেলেঠুলে আলোর দিকে খুলে দেওয়া নয়, এ যে মুক্ত আকাশের বুকে উষার আলোয় জেগে ওঠা। এমনি করে আলোর প্রসাদ সব সাধকের জীবনেই একবার আসে, নইলে সত্যকার সাধনা শুরু হতেই পারে না। কিন্তু সত্যদীক্ষার এই মাহেন্দ্রক্ষণের স্মৃতিকে ধরে রাখার ক্ষমতা সবার সমান নয়। তখনই কাল আর অধিকারের কথা ওঠে। বিদ্যুৎচমকের মত যা এসে মিলিয়ে গেল, তাকে আবার ফিরে পাওয়ার জন্যই চলে দীর্ঘকালের অতন্দ্র সাধনা। কিন্তু সে-সাধনার ভিত্তি যদি হয় একটা গভীর সুনিশ্চিত আশ্বাসের বোধ, এবং একটা আবেশের সুস্পষ্ট চেতনায় 'কি হবে' তা না ভেবে দৃষ্টির মোড় যদি ঘুরে যায় 'কি হচ্ছে' তারই দিকে, আলোর অভিষেকে গাছের মত সমস্ত সত্তা যদি অসীমের অভিষেকে নিরন্তর আপ্লুত হতে থাকে, তাহলেই সাধনা হয় পূর্ণ-

যোগের অনুকূল। এই সহজের অভিষেকই হল অতিমানস রূপান্তরের প্রবর্তক।

কিন্তু কথা হল, 'সহজ সহজ সবাই কহয়ে, সহজ জান্যাছে কে।' সহজ হওয়াটাই যে সবচাইতে কঠিন। তবে একটা আশ্বাস মেলে এই জেনে যে, প্রকৃতিপরিণামের ধারা চলেছে কিন্তু এই সহজের অকুণ্ঠ প্রকাশের দিকে। গীতার ভাবায় বলা যেতে পারে, অনেক 'শ্রোতব্য' আর 'শ্রুতের' ঝামেলায় পড়ে বুদ্ধিকে যদি ঘুলিয়ে না ফেলে থাকি, তাহলে এই সহজকে পাওয়া খুব কঠিন নাও হতে পারে। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ ও সমর্থ দিশারী, আর সবার উপরে চাই নিজের মনের আর্জব এবং স্বচ্ছতা। কিছু-না-কিছু বাধা সবাইকে ঠেলতে হয়। কিন্তু দৃষ্টির ঔদার্য এবং অনাবিলতা থাকলে খুব বেশী মেহনতও করতে হয় না। চৈত্য এবং চিন্ময় রূপান্তরের কাজ চলে যতক্ষণ, তত-ক্ষণ ওঠা-নামার একটা ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু অতিমানস রূপান্তরের কাজ শুরু হলে আর অকালে শক্তিপাতের ফলে বিভ্রাট ঘটবার কোনও ভয় থাকে না, কেননা আধারের প্রস্তুতি নিখুঁত না হলে অতিমানসের শক্তি কখনও নেমে আসে না। সে যখন আসে, তখন আর সাধক আঁধার ঠেলে আলোর দিকে এগোয় না, আলোর তীর্থ হতে আলোর তীর্থে ভেসে চলে।

প্রাকৃত ভূমির দিকে দৃষ্টি রেখে বলি বটে, অতিমানস রূপান্তর অনেক দূরের কথা, কিন্তু পূর্ণযোগের প্রবর্তসাধককে প্রথমেই কালিক ব্যবধানের এই সংস্কারটা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। তাকে থাকতে হবে সদাজাগ্রত নিত্যবর্তমানের ভূমিতে। 'হবে' এই প্রত্যাশা নয়, 'হয়ে আছি—তিনিই হয়ে আছেন'—তীব্র শ্রদ্ধার আবেশে এই ভাবনা রণিত হয়ে উঠবে সমস্ত সত্তায়, তবেই সাধনা সহজ হবে। চেতনা তখন আর প্রাকৃত মন-বুদ্ধির পর্যাকুল ক্ষেত্রে বিচরণ করবে না, ডুবে যাবে চৈত্যসত্তার গভীরে। সেইখান থেকে জাগ্রতের সমস্ত প্রবৃত্তি উৎসারিত হবে—বীজ থেকে বৃক্ষের বিস্তারের মত। প্রবৃত্তির মধ্যে তখন প্রাকৃতমনের কোনও প্ররোচনা থাকবে না, কিছু ঘটিয়ে তোলবার আগ্রহও থাকবে না। অথচ সুগভীর আত্মবোধ অতিসহজেই আত্মশক্তিকে বিচ্ছুরিত করবে বিচিত্র দিব্যভাবনায়। সেই ভাবনার প্রতিক্রিয়াতে শুরু হবে আধারের প্রাকৃত বৃত্তির চিন্ময় রূপান্তর—যা বিকৃত তা স্বচ্ছ হবে, যা সঙ্কুচিত তা বিস্ফারিত হবে, যা বিষম তা সুষম হবে, যা আড়ালে তা প্রকাশিত হবে। চেতনার এই সহস্রদল উন্মেষণ হবে যেন বিশ্বভাবনার প্রতিভূস্থানীয়।

বহির্বিশ্বে কালের মন্থর পরিণামে যা দূর ভবিষ্যতে ঘটবে, তার সিদ্ধরূপ স্ফুরিত হবে আমারই কূটস্থ চেতনায় নিত্যবর্তমানের ধ্রুববিন্দুতে। এ যেন বিশ্বের বীজকে আত্মসত্তার গভীরে সংহৃত আকারে পাওয়া। তার স্ফুরত্তাকে প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি দেওয়া মহেশ্বরের দায়। সেই মহেশ্বরের সাযুজ্যলাভই অতিমানস রূপান্তরের লক্ষ্য।

এইবার অতিমানস রূপান্তরের মূল সাধনার কথায় আসা যাক। চিন্ময় পরিণাম ঘটে পর্বে-পর্বে—এই তার সাধারণ রীতি। অতিমানসের দিকে চেতনার উদয়নের পথে চারটি ভূমি আছে—তাদের নাম দেওয়া যেতে পারে উত্তর-মানস (Higher Mind), প্রভাস-মানস (Illumined Mind), বোধি-মানস (Intuition Mind) এবং অধিমানস (Overmind)। বলা বাহুল্য, এটা বুদ্ধির কল্পিত ছক। উত্তরায়ণের পথে একটি পর্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে তবে আরেকটি পর্বসিদ্ধির নিশ্চিত অধিকার মেলে—এ হল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এর যে ব্যতিক্রম নাই, তাও নয়। ব্যক্তিপরিণামের ধারা কখনও বাঁধা-ধরা ক্রম মেনে চলে না। সাধনা যেমন 'ক্রমে' হতে পারে, তেমনি 'অক্রমে'ও হতে পারে। এখানে হওয়াটাই মুখ্য এবং তা বুদ্ধির শাসনের অপেক্ষা রাখে না। ঊর্ধ্বলোকের শক্তিগুলি বিশেষ করে ওতপ্রোত, তারা পরস্পরকে অনুবিদ্ধ এবং আপূরিত করে কাজ করে। একবার যখন তাদের কাজ শুরু হয়ে যায়, তখন শক্তির কাছে নিজেকে শিথিল করে ছেড়ে দেওয়াই হল প্রবর্তসাধকের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয়। নিজেকে যত ছাড়া যাবে, পাওয়া ততই নিবিড় এবং সত্য হবে—সহজসাধনার এই মূল নীতিটি মনে রাখা দরকার।

আরেকটি কথা। উপরে যে চারটি ভূমির কথা বলা হল, তাদের প্রত্যেকটি মানসোত্তর বিজ্ঞানের ভূমি। সুতরাং অদ্বৈতবোধ তাদের সহজধর্ম। অবশ্য সে-অদ্বৈত ব্যতিরেকমুখী (exclusive) নয়, অন্বয়মুখী (inclusive)। আধারের সুস্থ এবং স্বাভাবিক সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়েই এখানে চেতনার উল্লাস। সব-কিছু নিয়ে একটা নিটোল 'হওয়ার' ব্যাপার চলছে এখানে, এবং সে-হওয়া আগাগোড়াই আলোর হওয়া। নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের দিক থেকে বলা চলে, এখানে মহাশূন্যের বুকে চিদ্‌বৃত্তির যে-উন্মেষ, তা অলীক

মনোমায়া নয়, পারমার্থিক যোগমায়া। ব্রহ্মের স্বরূপানন্দের নির্ঝরণ এখানে সত্তার সত্য। ধারা এখানে নেমে আসছে এবং আধার উন্মুখ হয়ে তাকে ধারণ করছে ; আর সে-ধারা অখণ্ডের একটা অকুণ্ঠ প্লাবন।

এইথেকে বোঝা যায়, মনের চাওয়া কখনও এসব ভূমির নাগাল পেতে পারে না। অথচ গোড়ায় একটা চাওয়া থাকে এবং সে-চাওয়া চেতনাকে অনেকদূর উজিয়েও নিয়ে যায়। চাওয়ার ফলে পাওয়া আছে। কিন্তু পাওয়ার আসল রূপটি হল 'হওয়া'। এই হওয়ার ব্যাপারটা যখন চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন কিন্তু সাধনার ধারা একেবারে উলটে যায়। মনের চাওয়া আর তখন থাকে না, তা রূপান্তরিত হয় মানসোত্তর বিজ্ঞানের 'হওয়া'য়। 'ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি।' কথাটাকে আমরা সাধারণত তর্জমা করি নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির দিক থেকে। কিন্তু সে হল হওয়ার আধখানা, বাকী আধখানা হল শক্তির চিন্ময় উল্লাস। দুটিতে মিলে সত্যকার হওয়া পূর্ণ হয়। কিন্তু তার রহস্য তো মন দিয়ে বোঝা যায় না। চাওয়া-পাওয়ার যেখানে শেষ, সেইখানেই হওয়ার শুরু।

যতক্ষণ মনের চাওয়া নিয়ে সাধনা চলে, ততক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়ের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে থাকি। প্রথম-প্রথম সেটা দরকারও হয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্বভাবতই একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার অনেকখানিই অভ্যাসগত বা সংস্কারগত। তাতে আমার নিজের অর্থ এবং বস্তুর অর্থ দুইই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সংসারে আমরা দেখছি-শুনছি, চলছি-ফিরছি, পরস্পরের সঙ্গে কারবার করছি। কিন্তু তার প্রায় সবটুকুই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার। এই যন্ত্রমূঢ়তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই ইন্দ্রিয়নিরোধের তাগিদ আসে যোগীর মনে। মনের যোগে আমরা ইন্দ্রিয়ের রাস টেনে ধরি, অন্তর্মুখ হয়ে পৌঁছই অতীন্দ্রিয় সত্তার গহনে। আমার পরিচয় তখন আমার কাছে স্পষ্ট এবং নিবিড় হয়। জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার পক্ষে এটি অপরিহার্য। কিন্তু আমাকে পেতে গিয়ে যদি তোমাকে হারাই, তার মধ্যে একটা ন্যূনতা আছে—যেমন আছে তোমাকে পেতে গিয়ে আমাকে হারানোতে। আমার গভীরের আলোয় যদি তুমি আলোকিত হয়ে ওঠ, তাহলে তোমাকে পাওয়া আমার সত্য হল। ইন্দ্রিয় তখন ফিরে আসে ; জড় হয়ে নয়, চিন্ময় হয়ে—অবিদ্যার সাধন হয়ে নয়, বিদ্যার সাধন হয়ে। চিন্ময় ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষ তখন হয় জ্ঞানের চরম। আর সেই জ্ঞানের বীর্য স্ফুরিত হয় দিব্যসঙ্কল্পে, চিন্ময় ক্রিয়ার জাগে চিন্ময়

প্রতিক্রিয়া। দৃষ্টিতে তখন সৃষ্টি, স্পর্শে বিদ্যুৎ। মানসোত্তর ভাবনার এই পরিণাম।

এইবার একে-একে মানসোত্তর ভূমিগুলির সাধারণ পরিচয় নেওয়া যাক।

অতিমানসের পথে চলতে গিয়ে আমরা মনের ওপারে প্রথমে পাই উত্তর-মানসের ভূমি। মানসোত্তর আর মনের মাঝে এটি সেতু, সুতরাং মনের ধর্মের সঙ্গে তফাত করে এর একটা পরিচয় খাড়া করা চলে।

একদিকে মন যেমন ইন্দ্রিয়নির্ভর, তেমনি আবার ইন্দ্রিয়ের বিশেষ-বিশেষ প্রত্যক্ষকে একটি ভাবসামান্যে সংহত করাও তার কাজ। এই সামান্যভাবনা যার মুখ্যবৃত্তি, তাকে বলি বুদ্ধি। মন বিশেষ আর সামান্যের মাঝে আনাগোনা করে, আর বুদ্ধি সামান্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাকে পরিচালনা করে। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়ে বহুর ভাবনা এমনি করে চলেছে একের দিকে। বুদ্ধি মনুষ্যচেতনার একটি বিশিষ্ট বৃত্তি, যা ইতরপ্রাণী থেকে তাকে পৃথক করেছে। আচ্ছিন্ন (abstract) সামান্যভাবনাকে আশ্রয় করে বুদ্ধি যে অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের কত উঁচুতে উঠতে পারে, তার পরিচয় আমরা পাই বিজ্ঞানে এবং দর্শনে।

কিন্তু তবুও বুদ্ধি দিয়ে ভাবের বাস্তব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষ যেমন প্রাকৃত ভাবনার একটি মেরু, বুদ্ধিজ প্রত্যক্ষও তেমনি আরেকটি মেরু। প্রত্যয়ের ঘনতা দুটি মেরুতে সমান নয়। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয় যেমন গাঢ়, বুদ্ধির প্রত্যয় তেমনি ফিকা। একটা মানুষ আমার কাছে যতখানি স্পষ্ট, 'মনুষ্যত্বে'র প্রত্যয় ততখানি স্পষ্ট নয়। সংজ্ঞা-শব্দ (term) দিয়ে তাকে আমরা মনের কাছে স্পষ্ট করি। তারপর এমনিতর কতগুলি সংজ্ঞা-শব্দ জুটিয়ে তর্কবুদ্ধির সাহায্যে তাদের দিয়ে একটা ভাবের জগৎ গড়ে তুলি। পতঞ্জলি বলেন, এ-জগৎ 'বস্তুশূন্য' বা অবাস্তব, চিত্তের বিকল্পবৃত্তি দিয়ে গড়া। অবাস্তব হলেও তার যে একটা অর্থক্রিয়াকারিতা আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তর্কবুদ্ধির 'ব্রহ্ম' বস্তুশূন্য বিকল্প হলেও মনের কাছে একটা-কিছুর আভাস সে আনে এবং তা তার ব্যবহারকে ক্ষীণভাবে হলেও নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের বিদগ্ধচিত্ত এমনিতর অগুনতি ভাববাসিত (indeational) বিকল্পে ভরা। এই অস্পষ্ট ভাবকে সুস্পষ্ট বস্তুতে রূপান্তরিত করা চিদ্বৃত্তির একটা সমস্যা।

প্রাকৃত চিত্তের একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। আমাদের জাগ্রতে বস্তু আর ভাবের প্রত্যয় পাশাপাশি চলে। চোখে যা দেখছি, তার একটা ছবি মনের পরদাতে পড়ছে, স্মৃতি এবং কল্পনার দৌলতে আরও ছবি এসে জুটছে তার সঙ্গে। কিন্তু ছবিগুলি অস্পষ্ট। চোখ বুজে যদি ছবিগুলি স্পষ্ট করতে চাই, পারি না। অথচ জাগ্রৎ থেকে স্বপ্নে যখন যাই, তখন চোখ বুজেও ছবিগুলিকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখতে পারি। এই দেখার উপর আত্মচেতনার কোনও সংযম থাকে না বলে আমরা ভাল-মন্দ হিজিবিজি অনেক-কিছুই স্বপ্নে দেখি। তাছাড়া চোখ মেলে যা দেখছিলাম, চোখ বুজে আবার তা-ই দেখাতে চেতনার উৎকর্ষের দিক দিয়ে আমার কিছু লাভ হয় না। কিন্তু এথেকে একটা সত্য প্রমাণিত হয়, জাগ্রৎকে নিরুদ্ধ করলে অথবা চিত্তকে অন্তরাবৃত্ত করলে ভাব বস্তুর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। চিদ্‌বৃত্তির এই সূত্র ধরে যোগী ধ্যানচিত্ত বা বিজ্ঞানভূমির আবিষ্কার করলেন।

প্রাকৃত স্বপ্নের কারবার চলে বিশেষের প্রত্যয় নিয়ে। জেগে যে বিশেষের মেলা আমরা দেখছিলাম, স্বপ্নেও তা-ই দেখি। কিন্তু জাগ্রতচিত্তে ভাবসামান্যের প্রত্যয়ও তো আছে। জাগ্রতের অস্পষ্ট ভাবপ্রত্যয় যদি স্বপ্নে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে ভাবসামান্যের প্রত্যয়কেও তেমনি করে স্পষ্ট করা যায় না কি? প্রাকৃত স্বপ্নে তা হয় না জানি। কিন্তু স্বপ্নচেতনার স্বাভাবিক অন্তরাবৃত্তিকে যদি জাগ্রতে সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে ভাবসামান্যও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এই কৌশলকেই যোগী ধ্যানযোগে প্রয়োগ করেন। সাধারণত তা করতে গিয়ে স্বপ্নের অনুকরণে জাগ্রৎকে নিরুদ্ধ করা হয়। কিন্তু তা না করেও ধ্যানচিত্ততা আনা সম্ভব। তাতেই ধ্যানযোগের পূর্ণসিদ্ধি।

এতক্ষণ ব্যাপারটার আমরা আলোচনা করেছি বিষয়ের (object) স্পষ্টতার দিক থেকে। কিন্তু তাকে বিষয়ীর (subject) স্পষ্টতার দিক থেকেও দেখা দরকার। এই স্পষ্টতার দুটি রূপ আছে। তার একটি ফোটে অনুভূতির তীব্রতায়, আরেকটি আত্মসচেতনতায়। আত্মসচেতনতা মানুষের বিশিষ্ট ধর্ম, একথা আমরা জানি। আত্মসচেতনতারও দুটি রূপ—একটি অবিবিক্ত, আরেকটি বিবিক্ত। অবিবিক্ত আত্মসচেতনতা দেখা দেয় প্রাকৃত অনুভবের মধ্যে, যেখানে চেতনা বাইরের দিকে ঝুঁকে আছে। চেতনা যখন ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসে, তখন আমরা পেতে পারি বিবিক্ত আত্মসচেতনতা—যা অধ্যাত্মসাধনার বনিয়াদ।

অন্তরাবৃত্তির ফলে বিবিক্ত আত্মসচেতনতা ক্রমে স্পষ্ট হয়—আমার গভীরে আমি আবিষ্কার করি একটা নতুন আমি। এই আবিষ্কার যে চৈত্য রূপান্তরের ভূমিকা, একথা আগেই বলেছি। আরও গভীরের টানে চৈত্যসত্তারও পিছনে আবিষ্কার করতে পারি কূটস্থসত্তার নিস্পন্দতা। আমার আমিকে এইখানে পাই সবচাইতে স্পষ্ট করে। প্রকৃতির সঙ্গে বিবেক বা বিচ্ছেদও এখানে সম্পূর্ণ হয়। নিরোধের সংস্কার প্রবল থাকলে এখানে এসে ধরতে পারি অনাবৃত্তির পথ, প্রকৃতির স্পন্দলীলায় তখন আর আমি যোগ দিতে চাই না। কিন্তু সংস্কারমুক্ত প্রশান্ত ভাবনায় এখানে নিস্পন্দ চিৎসত্তার গভীরেও স্বচ্ছন্দ চিদ্‌বৃত্তির স্পন্দন অনুভব করা যেতে পারে। এ-স্পন্দন নিস্পন্দেরই স্বভাব বা স্ফুরত্তা। কথাটা তর্কের দিক থেকে স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু অনুভবের দিক থেকে নয়। একটু ভিতরে গুটিয়ে এলে পর প্রাকৃত-অনুভবেও আমরা এর আভাস পাই।

কূটস্থসত্তার এই চিদ্‌বৃত্তিগুলিই বিশুদ্ধ ভাব, বুদ্ধিকল্পিত ভাবসামান্যে আমরা যার প্রতিফলন দেখি। বিষয়টা বোঝবার জন্য এইখানে স্বপ্নের উপমানকে (analogy) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং উপনিষদে তা করাও হয়েছে। কূটস্থ সত্তায় রয়েছে সুষুপ্তির নিথরতা এবং তারই বুকে জাগছে স্বপ্নের স্পন্দন। সেই স্পন্দনই ধরছে জাগ্রতের স্পষ্ট রূপ। প্রাকৃত মনোবিজ্ঞানীর মত এখানে আমরা স্বপ্নবৃত্তিকে প্রাকৃত জাগ্রতের দিক থেকে বোঝবার চেষ্টা করছি না—ঘুমের মধ্যে জেগে থেকে সুষুপ্তি হতে কি করে স্বপ্ন জাগে, সেই প্রক্রিয়ার অনুধাবন করছি। অবরোহ-দৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়াটি ধরতে পারলে মানসোত্তর চেতনার মূলতত্ত্বটি বুঝতে পারব এবং উত্তর-মানসের আভাস পাব।

এখানে জাগ্রতের ভূমিতে থেকেই সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ তিনটি ভূমিকে দেখা হচ্ছে অবরোহক্রমে। যাঁরা নিজেরাই নিজেদের মনোবিকলনে (psycho-analysis) অভ্যস্ত, তাঁরা আভাসে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু মনোবিকলকের কারবার অবরপ্রকৃতিকে নিয়ে, তাঁর স্বপ্নলোক হল অবচেতনা এবং সুষুপ্তিলোক হল অচেতনা। আর যোগীর কারবার পুরুষের শুদ্ধপ্রকৃতিকে নিয়ে—ভাবচেতনা যার স্বপ্নলোক, আর অতিচেতনা যার সুষুপ্তিলোক। এখানে দ্রষ্টা শুদ্ধ পুরুষ, প্রাকৃত পুরুষ নন—গোড়াতেই এই তফাত। তবে একথা বলে রাখা ভাল, শুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি অবরপ্রকৃতির গহন

পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এবং পূর্ণযোগেরও তা-ই লক্ষ্য, কেননা 'গুহাগ্রন্থির বিকিরণে চিত্ত আশয়-নির্মুক্ত' না হলে চেতনার ঐশ্বর্য পুরাপুরি ফুটতে পারে না কখনও।

আগেই বলেছি, মানসোত্তর সব ভূমিরই উপাদান হল বিজ্ঞান—প্রাকৃত বুদ্ধি যার পরিচয় পায় ভাবসামান্যে। মানসোত্তরের দিকে উজিয়ে যেতে হলে প্রবর্তসাধককে এই ভাবসামান্যের অনুশীলন করতে হবে, যাতে মননের ধারা ক্রমে বিজ্ঞানাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। এখন বস্তুর প্রতি বিশেষের প্রতি যে-ঝোঁক, তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে ভাবের প্রতি সামান্যের প্রতি। শ্রীমতী যখন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তখন তাঁর 'যাহাঁ যাহাঁ দৃষ্টি পড়ে তাহাঁ তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে'। এখানে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উপর এসে পড়েছে ভাব বা বিজ্ঞানের আলো এবং তাতে বস্তুর নিগূঢ় অর্থ—যা ভাববাসিত চেতনার প্রতিক্ষেপ (projection)—তা-ই স্ফুরিত হয়েছে। ব্যাপারটা মনের কল্পনা নয়, ভাবের বিচ্ছুরণ। চিদ্‌বৃত্তির ক্রিয়া হচ্ছে এখানে অবরোহক্রমে, যেমন হয় কবির কাব্যসৃষ্টিতে। সেখানে ভিতরের ভাবই বাইরে রূপ নেয়। আবার ভিতরের ভাবও স্ফুরিত হয় গভীরের শূন্যতা থেকে স্তব্ধতা থেকে। উপনিষদের ভাষায় তাহলে সেই ধারা আবার ফিরে পাচ্ছি—সুষুপ্তি হতে স্বপ্নসৃষ্টি এবং জাগ্রতে সেই স্বপ্নের ঘনীভাব। অথচ সবটাই ঘটছে এক লোকোত্তর জাগ্রতের দৃষ্টির সামনে। এই জাগ্রৎ বেদান্তের ভাষায় তুরীয়—কিন্তু উজানের শেষে নয়, ভাটার মুখে।

গোড়াতেই এই তুরীয়ভাবকে আশ্রয় করতে হবে—মনঃকল্পনার দ্বারা নয়, বোধির দ্বারা। চেতনায় এই বোধিকে প্রবর্তিত করবার প্রধান সাধন হল শ্রদ্ধা সমনস্কতা এবং প্রযত্নশৈথিল্য। আকাশের মত এক অনন্ত ভাস্বর সর্বাবগাহী চিন্ময় সত্তা ওতপ্রোত হয়ে আমার সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে, এই সুস্পষ্ট নিঃসংশয় বোধকে অজপার ছন্দে অহরহ জাগ্রত চেতনায় বহন করতে হবে। দেহ প্রাণ মনের কোনও প্রবৃত্তিতে নিজের ইচ্ছা বা প্রযত্ন বলে কিছু থাকবে না, অথচ সমস্ত প্রবৃত্তির উৎসের প্রতি একটা অন্তরাবৃত্ত সজাগ দৃষ্টি থাকবে। এই অতন্দ্রতার প্রথম ফল হবে বিবেক : পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির মাঝে, আমার আদর্শ আমি আর বাস্তব আমির মাঝে ভেদটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বস্তুত পরা প্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির সমস্ত প্রবৃত্তির উৎস, বাস্তবের নানা বাঁকের ভিতর দিয়ে আদর্শই চাইছে রূপ পেতে। আবার কারণের জ্ঞান দিয়েই কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব—এই হল ক্রিয়াযোগের

মূল সূত্র। সুতরাং পরা প্রকৃতির জ্ঞান যতই উজ্জ্বল হবে, অপরা প্রকৃতি ততই সহজে তার ছন্দ মেনে চলবে। এমনি করে নিগ্রহ বা কৃচ্ছ্রতা না হয়ে প্রকৃতির সংযম স্বচ্ছন্দ হবে।

পরা প্রকৃতির স্বভাবধর্ম হচ্ছে পারার্থ্য বা লোকোত্তরের ছন্দোনুবর্তন। সাধনার ভাষায় তাকেই বলি আত্মসমর্পণ। অপরা প্রকৃতি আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করতে পারে, কিন্তু সে-সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় পরা প্রকৃতির উন্মেষে। চৈত্যসত্তার সমর্পণই সত্যকার সমর্পণ। এই সমর্পণ হতেই শুরু হল সাধন-জীবনে দ্বিজত্বের অধ্যায়। চেতনা তখন অপরা প্রকৃতির দুরাগ্রহ হতে মুক্ত, উন্মুখ পরা প্রকৃতি উপরের আলোর দিকে দল মেলছে। পদ্মের নিস্পন্দ কর্ণিকায় তখন আলোর ধারা লঘুচ্ছন্দে নিঃশব্দে নেমে আসে। শিশুর মতন ভয়হীন ভাবনাহীন চিত্তে প্রথম জেগে ওঠে এক প্রসন্ন শূন্যতা। সাধকের প্রশান্ত নিঃশঙ্ক নিস্তরঙ্গ অভিনিবেশের ফলে শূন্যতাই ক্রমে আলোর উপচয়ে কানায়-কানায় ভরে ওঠে, তার বুকে ফোটে ভাবের কমল। বলা বাহুল্য, সে-ভাব মনের কল্পনা নয়, বুদ্ধির ভাবসামান্যও নয়; কল্পনা ও ভাবসামান্যের মধ্যেও গুহাশায়ী অর্থের যে ক্ষীণ ব্যঞ্জনা, সে তারই চিন্ময় সিদ্ধরূপ। চেতনার আদিম উষায় মানুষের চিদাকাশে দেবতার যে বিচিত্র আবির্ভাবের ইতিহাস আমরা এখনও শুনতে পাই, এই ভাবের আবির্ভাব তারই সগোত্র। এই ভাব-লোকই উত্তর-মানসের ভূমি।

উত্তর-মানসের বৃত্তি ভাবময় চিদ্‌বৃত্তি, অথচ তাতে আছে প্রাকৃত বাস্তব প্রত্যয়ের একান্ত স্পষ্টতা। মনের ঠিক উজানেই উত্তর-মানসের ভূমি বলে মনন তার সহজ ধর্ম। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ-মনন প্রাকৃত তর্ক-বুদ্ধির মনন নয়, মৌল সত্যের অপরোক্ষদর্শন-জনিত দিব্য মনন। দার্শনিকের অন্তর্মুখ চেতনায় কখনও-কখনও এই মননের অনুরূপ একটা-কিছুর ঝলক দেখা দিতে পারে। কেননা, প্রাকৃত মননকে ভাবসামান্যের তুঙ্গভূমিতে নিয়ে যাবার একান্ত প্রয়াস কেবল তাঁরই, তিনিই চান এক তত্ত্বের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটাতে। তবুও উত্তর-মানসের আলো সাক্ষাৎভাবে তাঁর মনেও পড়ে না, কেননা যে-তাদাত্ম্যবোধ বিজ্ঞানবৃত্তির মৌল ধর্ম, তা তাঁর মননে নাই। তিনি একের মধ্যে বহুকে দেখতে চান, কিন্তু হয়ে দেখেন না। এই

হওয়ার দিকে ঝোঁক রয়েছে অধ্যাত্মসাধকের—দার্শনিকের নাই বৈজ্ঞানিকেরও নাই, যদিও প্রাকৃত জগতে ভাবসামান্যের শ্রেষ্ঠ কারবারী তাঁরাই। অধ্যাত্ম-সাধক সত্যের মনন করেন সাযুজ্যলাভের জন্য। গোড়া থেকেই তাঁর সত্যের বোধে একটা প্রবণতা থাকে লোকোত্তরের দিকে, তাই তাঁর মনন হয় বিজ্ঞান-বাসিত। এইখানে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর তফাত। আধারের সবখানি দিয়ে একটা বৃহৎ বস্তুকে তিনি পেয়েই রয়েছেন এবং তার আবেশে চলছে তাঁর মননের ক্রিয়া। সুতরাং সে-মননে প্রকাশ পাচ্ছে একটা অখণ্ড সত্যানুভূতির বিচিত্র সত্যবিভূতি। ন্যায়ের অবরোহ-প্রত্যয়ে (deduction) যেমন কোনও ভুল থাকতে পারে না, তেমনি তাঁর মননও কখনও অসত্য সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হতে পারে না। কেননা, যে-ব্যাপ্তিবোধ (intuition of the universal) তাঁর অবরোহ-প্রত্যয়ের ভিত্তি, তা ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যয়ের সমাহার নয়, কিন্তু বিশ্বের কোনও মৌল সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন।

প্রাকৃত মননে কিন্তু এমনতর নৈশ্চিত্যের আশ্বাস নাই। দার্শনিক বলেন, যে-সামান্যজ্ঞানকে ভিত্তি করে আমাদের প্রাকৃত মনন চলে, তা একটা গড়-পড়তা সিদ্ধান্ত মাত্র। সুতরাং তার আশ্রিত সিদ্ধান্তও যে ধ্রুবসত্য হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। ব্যাবহারিক জগতে এই গড়পড়তা সত্যকে নিয়েই কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে আমাদের কাজ চলছে। একটা ঘটনার পরিণাম কি দাঁড়াবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি মাত্র। কিন্তু ঠিক কি ঘটবে, তা জোর করে বলতে পারি না। সমষ্টির বেলাতে যদিও-বা একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া গেল তো ব্যক্তির বেলায় দেখা গেল তার মধ্যে একশ'টা ব্যতিক্রম। প্রাকৃত ভূমিতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন তাই নানা অনিশ্চয়তার একটা জগাখিচুড়ি। মন অনবরত ভেবে চলেছে, কিন্তু ভেবে কোনও কূল পাচ্ছে না। সংসারে তাই অসোয়াস্তিরও সীমা নাই।

অথচ প্রাকৃত মনও সত্য জানবার চেষ্টাই করছে। কিন্তু তার জানবার মুখ্য সাধন হল ইন্দ্রিয়—যার দৃষ্টি বস্তুর গভীরে পৌছতে পারে না, বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বাইরে থেকে বস্তুকে সে যতটুকু জানে, তা সত্যের একটা ভগ্নাংশ বা বিকৃত রূপ মাত্র। এই ভাঙা-চোরার বেসাতি নিয়েই বহির্মুখ মনের কারবার।

অন্তর্মুখ মনের ধারা স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়কে সেও ব্যবহার করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পিছনে-পিছনে সে ছোটে না। ইন্দ্রিয়ের আহরিত জ্ঞান তার মধ্যে তখন-

তখনই প্রবৃত্তির সংবেগ জাগায় না। বাইরে থেকে যা আসে, তা প্রথম তার গভীরে তলিয়ে যায়। বিষয়কে এমনি করে গ্রাস করে অন্তরের গভীরে তলিয়ে দেবার সাধনই হল উত্তর-মানসের ভূমিতে পৌঁছবার উপায়। বিষয়ের সংস্পর্শে সত্তার মর্মমূলে যে-সাড়া জাগে, তাতে বোধির আলো জ্বলে ওঠে এবং সেই আলোতে বিষয়ের সত্য রূপটি আত্মীয় হয়ে বিষয়ীর কাছে ধরা পড়ে। চলতি কথায় একে বলে 'প্রাণ স্পর্শ করা'। সুতরাং এ-অভিজ্ঞতা প্রাকৃত ভূমিতেও বিরল নয়। কিন্তু সাধারণত এ-ব্যাপারেও আমরা বাইরের উপর নির্ভর করি বলে কদাচিৎ কোনও-কিছু আমাদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। অন্তর্মুখ চিত্তের স্তব্ধতায় ব্যাপারটা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। প্রাণকে তখন আর জাগিয়ে দিতে হয় না, নিত্যজাগ্রত থেকে বাইরের যা-কিছু সবই সে গ্রাস ক'রে নিজের আগুনে আগুন করে তোলে। সমস্ত জগৎটাই তখন প্রাণাগ্নির ইন্ধন। ইন্দ্রিয়-মনের বৃত্তি, সুখ-দুঃখের দোলা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংবেগ সব-কিছুরই তখন আবিষ্কৃত হয় একটা চিন্ময় তাৎপর্য। এমনি করে প্রাণের পুষ্টিতে যে-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় অন্তরে, উত্তর-মানসের বৃত্তি তার সহজ ধর্ম। আমার মধ্যে আমাকে আমি নিশ্চিতরূপে পেয়েছি বলে তখন আমার জ্ঞানও হয় নৈশ্চিত্যের বাহন। আমার জানায় তখন আর সংশয়ের দ্বিধা বা অর্ধসত্যের ভেজাল থাকে না। সঙ্গে-সঙ্গে অজানার দিগন্তও প্রসারিত হতে থাকে। সে আর তখন আচ্ছন্ন মনের কাছে কল্পনার মুখোস পরে হাজির হয় না, স্বানুভবের বিভূতিরূপে যোগীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তার নিরাবরণ রূপ।

উত্তর-মানসের এই হল জ্ঞানের দিক। কিন্তু এছাড়া তার একটা সঙ্কল্পের দিকও আছে। বস্তুত জ্ঞান ও সঙ্কল্প একই চিৎশক্তির দুটি সহচরিত (concomitant) বৃত্তি। ব্যাবহারিক জগতে এই সহচারের ভাবটি সবসময় স্পষ্ট নয়। বাইরের জগতে আমরা জানতে পারি অনেক-কিছু, কিন্তু আমাদের শক্তি কুণ্ঠিত বলে করবার তত-কিছু থাকে না। তাইতে জ্ঞানের অনেকখানি জমি আপাতদৃষ্টিতে অনাবাদী পড়ে থাকে। কিন্তু অন্তরের গভীরে জানা যেখানে হওয়ার সঙ্গে এক হয়ে আছে, সেখানে জ্ঞানের সবটুকুই সক্রিয়। জ্ঞান সেখানে সৃষ্টিধর্মী। বীজরূপে অনুভূত সত্যকে বনস্পতিতে বিস্ফারিত করা তার কাজ। আমি স্বরূপত আমাকে যা বলে জেনেছি, আমার আত্মপ্রকৃতিতেও তাকে রূপায়িত করে তুলতে হবে—এই তখন আমার অনতিবর্তনীয় দায়। এইখানেই উত্তর-মানসের সঙ্কল্পশক্তি ভাবনার বীর্যকে আশ্রয় করে সাধকের

জীবনে শুরু করে দেয় রূপান্তরের কাজ। ভাল হওয়া যে কি তা জানি এবং মনেও করছি ভাল হব, কিন্তু তবুও ভাল হতে পারছি না—প্রাকৃতমনের এই নির্বীর্যতা উত্তর-মানসের ধর্ম নয়। সত্যের আদর্শকে সে তো বাইরে দেখে না, তাকে সে অনুভব করে আত্মসত্তার গভীরে। তাই তার প্রত্যেক জানা এক ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে হওয়ায় রূপান্তরিত হয়। দেহ-প্রাণ-মন সব-কিছুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এক দিব্যভাবনার মহাবীর্য, প্রত্যেকটি মনন হয় সৃষ্টির মন্ত্র এবং এক অবন্ধ্য সঙ্কল্পের প্রবেগে আধারকে সবরকমে তা নতুন করে গড়ে তোলে।

জানার সঙ্গে হওয়ার সম্পর্ক এইখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি যখন যা জানছি, তখনই তা হতে পারছি—এই হল উত্তর-মানসের সঙ্কল্পের সহজ ধর্ম। যা ভাবলাম, তা-ই হলাম—এমনটা প্রাকৃতমনের বেলাতেও ঘটে। কিন্তু তখন হওয়ার গতি থাকে নীচের দিকে। মন্দ ভেবে মন্দ হওয়াটা প্রাকৃত মানুষের পক্ষে খুব সহজ—কেননা তার অপরা প্রকৃতির মধ্যে গড়িয়ে চলার দিকে একটা প্রবণতা আছে, যাকে কোনও-কোনও ধর্মে মানুষের স্বভাবে নিরূঢ় 'আদিম পাপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেহের অনেক ব্যাধির মূলে রয়েছে মনের মূঢ় ভাবনা—আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই আবিষ্কারেও বলতে গেলে ওই আদিম পাপপ্রবণতারই পরিচয়। ভাবই যে বস্তুতে রূপ নেয়, এই সত্যের এগুলি হল জলজ্যান্ত উদাহরণ। কিন্তু এ হল অপরা প্রকৃতির খেলা। পরা প্রকৃতিতেও এই সত্য কাজ করছে, অর্থাৎ সেখানেও ঊর্ধ্ব-শক্তির আবেশে ভাবই বস্তুতে রূপ নিচ্ছে—একথা স্বীকার করতে কোনও বাধা নাই। 'আমি ব্রহ্ম' বলতে-বলতে মানুষ ব্রহ্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনি আবার 'আমি পাপী' বলতে-বলতে পাপী হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়, বরং অপরা প্রকৃতির পিছটান আছে বলে এইটাই আমাদের পক্ষে সহজ। বলে, 'যেমন ভাব, তেমন লাভ।' আমাকে আমার ভাবনা দিয়েই আমি প্রতিনিয়ত গড়ে তুলছি। প্রকৃতির এই সহজ সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে অহরহ দিব্যভাবনার আবেশ দিয়ে আত্মপ্রত্যয়কে চেতিয়ে রাখা, মননকে বলিষ্ঠ করা—এইগুলি হল উত্তর-মানসের সাধনাঙ্গ। সোজা কথায় তাকে বলতে পারি, বৃহতের ভাবনায় বৃহৎ হওয়া।

অনেকে মনে করবে, এ তো কেবল কল্পনা।...কিন্তু আমাদের জীবনে কল্পনার প্রভাব কি কিছু কম? বস্তুর কল্পনা সবসময় সত্য নাও হতে পারে,

কিন্তু আমার ভাব বা কল্পনা যে সত্য-সত্যই আমার চেতনায় বিকার ঘটাচ্ছে, এ কি অস্বীকার করতে পারি? অতীত দুঃখের স্মৃতিতে মুহ্যমান হয়ে পড়ছি, অনাগত দুঃখের ভাবনায় আঁৎকে উঠছি—এগুলি কি কল্পনার বাস্তব পরিণাম নয়? প্রশংসায় ফেঁপে উঠছি, আবার নিন্দায় চুপসে যাচ্ছি—যদিও বেশ জানি দুটাই আমার সম্বন্ধে অপরের কল্পনা মাত্র। এমনি করে পরের কল্পনার প্রভাবকে জীবনে মেনে নিয়ে মিথ্যার কারবার করতে আমাদের বাধে না, অথচ আত্মস্বরূপের সত্য ভাবনাতেই যত দোষ?

সমর্থ (effective) ভাবনার সাধনা শুরু করবে এই প্রাকৃতমনই। যদি তার মধ্যে শ্রদ্ধা এবং সঙ্কল্পশক্তির জোর না থাকে, তাহলে প্রথম-প্রথম ভাবনার ফলে চেতনায় আশানুরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হবে না। এই সময়টায় নেতি-ভাবনায় সাধকের খুব উপকার হয়। নেতি-ভাবনার আরেক নাম প্রত্যাখ্যান (rejection)। দেহ-প্রাণ-মনের প্রাকৃত বৃত্তিগুলি এসে সাধককে ছেঁকে ধরছে, আর সে সবলে তাদের প্রত্যাখ্যান করে বলছে, 'না, দেহ-প্রাণ-মনের এই অন্ধ বিকার আমি নই, আমি শিবস্বরূপ, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' —এই হল নেতি-ভাবনার স্বরূপ। এর জন্য চাই অতন্দ্র আত্মসচেতনতা। আমার আত্মসচেতনতাকে অহরহ অনুভব করছি প্রসন্ন উজ্জ্বল উদার আকাশের মত। সর্বদা সতর্ক থেকে দেখছি তাতে যেন কোনও মেঘ না জমে। মেঘের ছায়া পড়তেই তাকে যেমন প্রত্যাখ্যান করছি, তেমনি তার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে তার 'পরে আমার প্রসন্ন মহিমার আলোও ঢালছি। সে-আলোর ধারাসারে হয় মেঘ গলে যাবে, নয়তো জ্যোতির্বাষ্পময় হয়ে জ্বলতে থাকবে। বলা বাহুল্য, এ-আলো বৃহতের আলো, তাঁরই দীপ্তচেতনার স্পর্শে আমার আত্ম-দীপের মুখটির জ্বলে ওঠা। প্রত্যাখ্যানের বীর্যের সঙ্গে প্রসাদের ভাবনাকে এমনি করে যুক্ত করলে তার শক্তি হয় দুর্বার, কেননা উৎসের সঙ্গে যোগ থাকাতে তখন শক্তির যোগান অফুরন্ত হয়।

এমনি করে প্রবর্তসাধক যদি 'সমনস্কঃ সদাশুচিঃ' হয়ে সাধনা করে চলে, তাহলে ক্রমে প্রাকৃতমনের নেতি-ভাবনা রূপান্তরিত হয় উত্তর-মানসের ইতি-ভাবনাতে। উপর হতে যে-আলো অনবরত আধারের উপর ঝরে পড়ছে, তার অনুভব তখন সহজ হয়। অবশ্য তাতেই সাধনার পথের সব বাধা যে কেটে যায়, তা নয়। প্রাকৃতমনের ক্রিয়া তখন হয়তো ছন্দোময় হয়, একটা ঊর্ধ্ব-শক্তির অনুকূল সাধনরূপে সে হয়তো কাজ করে যায়, কিন্তু অবচেতনা বা

অচেতনার গভীর হতে নানা অতর্কিত উৎপাত এসে তখনও তার চলনে ছন্দোভঙ্গ ঘটাতে পারে। প্রাচীন যোগশাস্ত্রে এগুলিকে বলা হত 'আশয়'। আশয়ের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে না। আশয়ের মূল রয়েছে চেতনার গভীরে, সুতরাং তাদের উৎখাত করতে হলে সাধককেও সেই গভীরে ডুবতে হবে। এই গভীরে ডোবার সাধনা হল প্রশমের (quiescence) সাধনা—ইচ্ছামাত্র দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়কে অনুদ্বিগ্ন প্রশান্ত এবং নিষ্ক্রিয় করবার সাধনা। অবশ্য প্রশমের সাধনাকেও পূর্ণযোগের সমগ্র সাধনার অনুকূল করে নিতে হবে, তাকে একান্ত করে তুললে চলবে না—কেননা তাতে প্রকৃতির ক্রিয়া নিরুদ্ধ হলেও তার রূপান্তর না ঘটতেও পারে।

প্রশমের সাধনা সহজ হতে পারে শূন্য-ভাবনার দ্বারা। এই শূন্য কিন্তু কোনও নেতিবাচক প্রত্যয় নয়, এ হল নির্বর্ণ নিস্পন্দ বিরাট আকাশের মত এক সর্বাবগাহী অথচ সর্বাতিশায়ী অস্তিত্বের নিথর বোধ। অমনিতেও আমাদের মন কখনও-কখনও ফাঁকা হয়ে যায়। ওই ফাঁকাকে যদি বোধির আলোকে প্রদীপ্ত এবং প্রসারিত করতে পারি, তাহলে সহজেই আমাদের মধ্যে এই গভীর শূন্যতার বোধ আসতে পারে—এমন-কি তাকে আমাদের নিত্যসহচর করে রাখাও অসম্ভব হয় না। চিত্তে তার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায় এক প্রসন্ন উদার নিরাসক্তিতে। চিত্তগত এই শূন্যতার বোধকে অভ্যাসের দ্বারা দেহগত করতে হবে এবং ক্রমে তাকে তলিয়ে দিতে হবে মেরুতন্তুর গভীরে। শূন্যতার বোধ ওইখানে জাগলে তবে তা আমাদের আশয়ের মর্মে আঘাত করে তাদের গ্রন্থিগুলিকে বিদীর্ণ করে দিতে পারে। আশয়ের মূল রয়েছে জড়প্রকৃতির আড়ষ্টতায়। তাই শূন্য-ভাবনাকে দেহগত না করা পর্যন্ত তার ঘোর কাটিয়ে ওঠা যায় না।

এগুলি হল ব্যষ্টি-আধারের বাধা। কিন্তু তার বাইরে থেকেও বাধা আসতে পারে। ব্যষ্টিপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং বিশ্বের ভাল-মন্দ সব-কিছুর প্রভাব আমার উপরেও পড়ে। নিজেকে রক্ষাকবচে ঘিরে বিশ্বের অভিঘাত হতে বাঁচাতে গিয়েও সবসময় তা পারি না। তাই বৈকল্যের হেতু আমার মধ্যে না থাকলেও তার ঝাপটা কখনও বাইরে থেকে আমার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। এগুলির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলে গভীরতা ব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা তিন দিক দিয়েই চেতনার আরও প্রসার ঘটাতে হয়। বস্তুত এই প্রসারের কোনও সীমা আঁকা চলে না। অবিদ্যার

যে-শক্তি জড়ের মর্মমূলে, তার সঙ্গে মোকাবিলা না করতে পারলে রূপান্তর, সম্যক সিদ্ধ হতে পারে না। মূলা অবিদ্যাকে (original ignorance) অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে—বিদেহমুক্তির সাধক তা-ই করেন। তিনি বলেন, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার হাত হতে আমাদের নিস্তার নাই। সুতরাং জীবন্মুক্তি সত্যকার মুক্তি হতে পারে না। জীবন অবিদ্যাগ্রস্ত, সত্য মুক্তি তাকে পেরিয়ে গিয়ে। পূর্ণযোগী অবশ্য এ-মত স্বীকার করেন না। তাঁর মুক্তি এইখানে, জীবনের এপারে। আবার এই জীবন্মুক্তিও তিনি চান একার জন্য নয়—সবার জন্য। তাই তাঁর সিদ্ধির আদর্শ শুধু তুলা-অবিদ্যার (individual ignorance) নিরসন নয়, মূলা-অবিদ্যার সর্ববিদ্যায় রূপান্তর। এইজন্যই উত্তর-মানসের বীর্যকে সিদ্ধির পক্ষে তিনি পর্যাপ্ত মনে করতে পারেন না।

উত্তর-মানস অতিমানসের পথে চেতনার প্রাথমিক ভূমি মাত্র। চেতনাকে তা ইন্দ্রিয়বশ্যতা হতে মুক্ত করে, বস্তুর দিক হতে মনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সে করে ভাবনির্ভর। তার কাছে ভাবই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, বস্তু তার বিভূতি মাত্র। সুতরাং তার মননের ধারা হয় অবরোহী, নিত্যসিদ্ধ ভাবকে আশ্রয় করে সে বস্তুর বিচার করে। এমনি করে ভাবমুখে থাকা সিদ্ধচিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু চেতনায় ভাবমুখীনতার প্রতিষ্ঠা শুধু উত্তর-মানসের দৌলতে হয় না, সাধককে তার জন্য যেতে হয় আরও উজানে। সাধনার সর্বত্র এই রীতি। উত্তরশক্তির আবেশেই অবরশক্তির ক্রিয়া সুষম এবং সুপ্রতিষ্ঠ হয়। যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তির সৌষম্য ঘটায় মন, মনোবৃত্তির সৌষম্য ঘটায় বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তির সৌষম্য ঘটায় বোধি। উত্তর-মানস হতেই শুরু হল বোধির ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি বস্তুর বন্ধন হতে মুক্ত হল, হল ভাবের বাহন। কিন্তু এই ভাবসিদ্ধি উত্তর-মানসের স্বাভাবিক ধর্ম হলেও ভাবশক্তির যোগান আসছে তারও উজানে প্রভাস-মানস থেকে। অতিমানসের পথে এই হল অদ্বৈতচেতনার দ্বিতীয় ভূমি। এখন তারই কথা বলব।

প্রভাস-মানসের স্বরূপ বুঝতে পারব প্রাকৃত মানসের সঙ্গে বিপরীতক্রমে তার তুলনা করে। প্রাকৃতমন যখন অন্তর্মুখ হয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হতে মানস-প্রত্যক্ষের দিকে যখন তার মোড় ফেরে, তখন আমরা তার উৎকর্ষের পরিচয়

পাই। বস্তু হতে ভাব বড়, এই স্বীকৃতির 'পরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের প্রগতির বনিয়াদ। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে যে-ঘনত্ব আছে, মানসপ্রত্যক্ষে তা নাই। এইখানে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের জিত। তাই মানসপ্রত্যক্ষকেও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মত চিদ্‌ঘন করে তুলতে হবে, এই হল সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার আদত কথা। তার এ-দাবি মেটানো যে অসম্ভব নয়, তার নিশানা আমরা পাই প্রাকৃত অনুভবের মধ্যেই। ভাব প্রবল হয়ে চেতনায় যে-আলোড়ন তোলে, নিছক বস্তুসত্তার চাইতে আমাদের কাছে তারই দাম বেশী। বস্তু তখন ভাবকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্য না থাকলে ক্ষীণবীর্য চেতনায় ভাবের সাড়া মিইয়ে যায়, তাই আমরা বস্তুকে আঁকড়ে থাকি। একবারের দেখা যদি অন্তরে চিরন্তন হয় (যেমন গভীর ভালবাসায় হতে পারে), তাহলে উপলক্ষ্যকে আঁকড়ে থাকবার আর তত প্রয়োজন হয় না। তখন বস্তুনিরপেক্ষ চেতনায় একটা নতুন পরিণাম (development) শুরু হয়: ভাব গাঢ় হয়ে অন্তরেই বস্তুর চিন্ময় রূপ গড়ে তুলতে থাকে। পরিণামের এই ক্রিয়া প্রাকৃত স্বপ্নচেতনার মূলেও কাজ করছে। ধ্যানচিত্তে ইষ্টের সঙ্গে সম্প্রয়োগও (communion) ঘটে এই রীতিতে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, মনকে যখন উজানধারায় বইয়ে দিই, তখন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েও ভাবের গাঢ়তায় আমরা অমনিতর একটা বাস্তব প্রত্যক্ষে আবার ফিরে আসতে পারি। অবশ্য এটা নির্ভর করে সাধকের রুচি এবং সংস্কারের 'পরে। তিনি যদি নির্বিশেষের সাধক হন, তাহলে ফিকা ভাবকে শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য হবে, তাকে জমাট বাঁধতে তিনি দেবেন না ইচ্ছা করেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মেই ভাব জমাট বাঁধে। পুঁথির পাতায় তার বিবরণ না থাকলেও মরমীয়ার অন্তর তার উল্লাসকে অত্যন্ত সহজে স্বীকার করে নিয়েছে।

ভাব ঘনীভূত হয়ে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষের সাধন (means) হয়, তাহলে আর মনের ক্রিয়া থাকে না, কিংবা থাকলেও তা ভাববাসিত হয়েই দেখা দেয়। সব অনুভবের পর্যবসান ঘটে প্রত্যক্ষে। প্রত্যক্ষের পথে বাধা থাকলেই মন ভাবনায় মুখর হয়ে ওঠে। অবশ্য মনের এই মুখরতারও একটা সার্থকতা আছে: এমনি করেই সে প্রত্যক্ষের নতুন প্রকার বা নতুন ভূমির সন্ধান পায়। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করে যে-ভাব জাগে, তা বস্তুর মধ্যে একটা নতুন অর্থের আবিষ্কার করে। মন আবার সে-অর্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করবার চেষ্টা

করে। এমনি করে ইন্দ্রিয়-মনের পারস্পরিক ক্রিয়ায় আমাদের অনুভবের প্রসার ঘটে।

এই যদি চেতনার পরিণামের সাধারণ রীতি হয়, তাহলে প্রাকৃত-মানস উত্তর-মানস আর প্রভাস-মানসের কি সম্পর্ক, তা বুঝতে কষ্ট হবে না। প্রাকৃত মানস ইন্দ্রিয়নির্ভর আর উত্তর-মানস ভাবনির্ভর, একথা আগেই বলেছি। প্রাকৃত মানস থেকে উত্তর-মানসে যেতে হলে আমরা ইন্দ্রিয় হতে ভাবে, বিশেষ-দর্শন হতে সামান্যভাবনার দিকে উজিয়ে যাই। এই সামান্যভাবনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবকে যদি চিন্ময় প্রত্যক্ষে ঘনীভূত করতে পারি, তাহলেই পাই প্রভাস-মানসের ভূমি।

উত্তর-মানসের পরিপাকে প্রভাস-মানস স্বভাবের নিয়মেই জাগে। সুতরাং চিন্ময় প্রত্যক্ষ সামান্যভাবনার স্বাভাবিক পরিণাম—ঠিক যেমন প্রাকৃত ভূমিতেও ভাব গাঢ় হয়ে ভাবময় প্রত্যক্ষের একটা আভাস দেখা দিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃত ভাবময় প্রত্যক্ষ হল অবিদ্যার বৃত্তি, সুতরাং তার বাস্তবতার ভিত্তি দুর্বল—যেমন স্বপ্নে, কল্পনায়, বিভ্রমে (illusion) বা কুহকে (hallucination)। আর প্রভাস-মানসের চিন্ময় প্রত্যক্ষ হল বিদ্যার বৃত্তি। তার ফলে বস্তুর স্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে। গভীর ভালবাসায় এই স্বরূপানুভবের একটা আভাস ফোটে। আমার যে মনের মানুষ, সে চিন্ময়। আমি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যে তাকে রচনা করেছি তা নয়, আমার প্রাতিভসংবিৎ দিয়ে তাকে আমি আবিষ্কার করেছি। সে আরোপ-মানুষ নয়, স্বরূপ-মানুষ। তার স্বরূপ আর সত্যের স্বরূপ একাকার—সে-সত্য যেমন তাতে আছে, তেমনি আমাতেও আছে। সুতরাং তাকে জানার অর্থ আমাকেই জানা, দুয়ে মিলে সেই এককেই জানা—'অনাদিকালের উৎস হতে' প্রবাহিত একটি যুগল স্রোতকে জানা।

অবশ্য এও প্রভাস-মানসের বৃত্তির একটা উদাহরণ মাত্র। স্বরূপত প্রভাস-মানস এক বিশাল অদ্বৈতচেতনার ভূমি। তার মধ্যে আছে নির্মেঘ আকাশের আলোঝলমল এক অসীম বৈপুল্য। হৃদয়ের প্রদ্যোত সেখানে কূল ছাপিয়ে গেছে, বিশ্বের সব-কিছুকে জড়িয়ে ধরছে এক জ্যোতিরুচ্ছল আলিঙ্গনে। আবার এ-ভূমি অবাঙ্‌মানসগোচর এই অর্থে যে, চিন্ময় সংবেদনের জন্য সেখানে মন বা ভাষার কোনও প্রয়োজন হয় না। অথচ দিব্য মনন ও বাণীর সে প্রবর্তক হতে পারে। যে-অপরোক্ষদৃষ্টি দিয়ে অখণ্ড স্বরূপসত্যকে

প্রত্যক্ষ করছি, তারই সংবেগ স্ফুরিত হচ্ছে চিন্ময় মননে, চিদ্বীর্যময় বাণীতে। অর্থাৎ এখানেও এক উর্ধ্বভূমির প্রতিষ্ঠা হতে অবরোহক্রমেই চেতনার পরিণাম ঘটছে।

তাইতে প্রভাস-মানস একটা সহজস্থিতির ভূমি হতে পারে। দিব্য-জীবনের সমস্ত সাধনার যে এই রীতি, একথা কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে। যে-জাগ্রৎকে আমরা নিশ্চিত প্রত্যয়ের ভূমি বলে মানি, তাকে বিলুপ্ত না করেই তার মধ্যে লোকোত্তরের আলো আর শক্তিকে নামিয়ে আনতে হবে—এই হল সাধনার লক্ষ্য। যেমন এই প্রাকৃত-মানস চিদ্বাসিত (spiritualised) এবং শুদ্ধ সামান্যভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে উত্তর-মানসকে আবিষ্কার করে তার উৎসরূপে, তেমনি উত্তর-মানসও প্রাকৃত মানসকে অবিলুপ্ত রেখেই তার উজানে আবিষ্কার করে প্রভাস-মানসের সংবেগকে। জ্যোতির্ময় ভাবনা বিদ্যাশক্তির স্বাভাবিক পরিপাকে খুঁজে পায় তার জ্যোতিরুৎসকে এবং ভগীরথের মত তাকে নামিয়ে আনে এই পার্থিব জীবনের বুকে। তার ফলে এক বাঁধভাঙা আলোর প্লাবনে মন ইন্দ্রিয় প্রাণ এমন-কি দেহের মর্মকোষ পর্যন্ত বিদ্যুদ্বীর্যে প্রজ্বল হয়ে ওঠে। বাইরের আলো আর ভিতরের আলো তখন একাকার হয়ে যায়, চিদাকাশে এক নিত্যসূর্যের অন্তহীন উদয়নে আর্ষপ্রতিভার দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—বহু বেদমন্ত্রে আমরা পাই যার সমৃদ্ধ বাণীরূপ।

প্রভাস-মানসের উজানে হল বোধি-মানস। উত্তর-মানসের দিব্যমনন আর প্রভাস-মানসের দিব্যদর্শন—দুয়েরই সে উৎস। চেতনায় স্বাভাবিক রীতিতেই তার স্ফুরণ হয় ভাবের গাঢ়তায়। যদি কোন প্রাকৃত ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করে তার স্বরূপ বুঝতে হয়, তাহলে বলা চলে বোধি-মানসের সংবিৎ যেন স্পর্শের সংবিৎ। আবার সেই ভালবেসে জানার কথাই তুলি। চোখের দেখায় বাইরে যাকে পেয়েছিলাম, ভাবের উল্লাসে তাকে পেলাম অন্তরে। তারপর আমারই বুকের আলোয় গড়ে উঠতে দেখলাম তার ভাবঘন প্রতিমা। এই দেখা আরও নিবিড় হয় স্পর্শে—যখন হৃদয়ের আলো দিয়ে ওই আলোর মানুষটিকে জড়িয়ে ধরি। এই স্পর্শযোগে শুরু হয় চেতনার নতুন বিলাস। রূপ হতে জেগেছিল স্পর্শের আকৃতি; এবার সেই স্পর্শই যেন রূপের সায়রে তোলে নতুন ঢেউ, আর সেই রূপোল্লাস অকল্প্য ভাবনার বিদ্যুতে বারবার

ঝিকিয়ে ওঠে। আরোহক্রমে যা ছিল আকূতি, এবার অবরোহক্রমে তা-ই হয় বিসৃষ্টি। ভাব চেয়েছিল রূপকে, রূপ স্পর্শকে; এবার স্পর্শের মাধুরীই ফোটে রূপ হয়ে, আর সেই রূপ উৎসারিত করে ভাবকে। যাঁরা রসের সাধক, চিৎপরিণামের এ-রীতি তাঁদের অজানা নয়। আলঙ্কারিকের ভাষায় স্পর্শ এখানে 'বিগলিতবেদ্যান্তর'—অন্তরঙ্গ অনুভবের নিবিড়তায় আর-সব জানাকে গলিয়ে সে পর্যবসিত করেছে একরস প্রত্যয়ে। এমনি করে জানা হল একেবারে আপন করে পাওয়া। বোধি তাই তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের সহজ বৃত্তি।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মধ্যেও বোধির আবেশ আছে বলে তাকে আমাদের এত নিশ্চিত মনে হয়। যা চোখে দেখেছি বা হাতে ছুঁয়েছি, তার প্রামাণ্যের উপর আর কথা চলে না। কিন্তু তবুও প্রত্যক্ষের বিষয় সেখানে বিষয়ীর বাইরে পড়ে থাকে। তাইতে দেখে বা ছুঁয়েও যে বিষয়কে আমরা পুরাপুরি জানতে পেরেছি, একথা বলা চলে না। জানার এই ন্যূনতা পূরণ করে ভাব। ভাবের মধ্যে বোধির যে-আবেশ, তা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের চাইতেও অন্তরঙ্গ। তাইতে বাইরে পাওয়ার চাইতে অন্তরের পাওয়া যে আরও নিবিড় আরও সার্থক হয়, একথা আগেই বলেছি। ভাবের পাওয়াতে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ ঘুচে যায়, বিষয়কে বিষয়ী জানে তারই আত্মস্বরূপের বিভূতি বলে। এই জানাকেই আমরা আগে বলেছি 'হয়ে জানা'। প্রাকৃত জগতেও এই 'হয়ে জানার' দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমবেদনা তার একটা সর্বজনীন এবং সুপরিচিত রূপ। সমবেদনা যে শুধু সমানে-সমানেই হয়, তা নয়। কবির হৃদয় নিষ্প্রাণের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে এই সমবেদনা দিয়েই। বৈজ্ঞানিকের মনীষা বহিরঙ্গ বিশ্লেষণের (analysis) পথ ধরে বলে এই অন্তরঙ্গ সংশ্লেষণের (synthesis) পথকে উপেক্ষা করতে পারে বটে। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণ দুয়ে মিলে তবে জানার পূর্ণতা। বুদ্ধির জিজ্ঞাসাকে পঙ্গু না করে হৃদয় যদি তার সঙ্গে যোগ দেয়, তাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং সার্থকতা বাড়ে বই কমে না। বুদ্ধিও জানে অন্তরাবৃত্তি এবং তন্ময়তার দ্বারা। বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্তের তন্ময়তার গভীরে 'দপ্ করে' জ্ঞানের আলো জলে ওঠে, এ-তথ্য বৈজ্ঞানিকেরও অগোচর নয়। অর্থাৎ বিশ্লেষণের পন্থাতেও জ্ঞানের প্রসার ঘটে বোধিবৃত্তির সহায়ে। প্রাচীন যোগীরা এই তথ্য জানতেন বলেই ধারণা-ধ্যান-সমাধিযুক্ত 'সংযমকে' অলৌকিক বিষয়জ্ঞানের দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের

একটা স্থূল উপায়ই আমাদের জানা আছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষের সীমানাকে যে প্রসারিত করা চলে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবিৎ যে একেবারে অসম্ভব নয়, একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানও স্বীকার না করে পারছে না।

তবে কিনা প্রাকৃতমনে বোধির আলো স্বচ্ছ হয়ে ফোটে না সবসময়। তার কারণ হল প্রাকৃতমনের ইন্দ্রিয়নির্ভরতা এবং বাসনার মালিন্য। অন্তর্মুখ স্বচ্ছ এবং প্রশান্ত চিত্তে বিষয়ের অর্থের জ্ঞান যে ভিতর হতে আপনি উৎসারিত হয়, এ-অনুভব তো বিরল নয়। অন্তরাবৃত্তির অনুশীলনে চিত্ত যোগভূমিক হলে বিষয়ের ধর্মের (properties) জ্ঞানও যে অসম্ভব নয়, একথার ইঙ্গিত আগেও করেছি। শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও বোধির তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। যোগীর বাক্‌সিদ্ধি বা প্রাকাম্যকে (irresistibility of will) বোধির স্ফুরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করাও চলে। রাগদ্বেষহীন প্রশান্ত চিত্তে অবাস্তব কল্পনার উদয় হয় না, বস্তুত যা ঘটবে তারই ছবি ফুটে ওঠে। বলা বাহুল্য, চিত্তে তখন মনন বা অনুমানের কোনও ক্রিয়া থাকে না। ঘটনায় শক্তির যে-ব্যাপ্রিয়া থাকে, যোগী যদি তার নিমিত্ত হন, তাহলে তাঁর সিদ্ধিতে ফোটে বোধির ক্রিয়ারূপ। অবশ্য জ্ঞান আর ক্রিয়া সেখানে অবিনাভূত। যা ঘটছে তা বস্তুস্থিতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবেগেই ঘটছে, যোগীর বোধি আত্মসত্তায় সে-প্রবেগকে অনুভব করছে মাত্র।

আমাদের সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির মূলে রয়েছে তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের প্রেরণা। সব জানা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় বিষয়কে নিজের মত করে জানাতে, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়াতে। এই তাদাত্ম্যবোধ হল বোধির বিশিষ্ট লক্ষণ। আত্মানুভবকে জাগ্রত রেখে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর যে-একাত্মতা, তাইতে তাদাত্ম্যবোধের চরম সার্থকতা। তন্ময় হয়ে বিষয়কে জানছি, কিন্তু নিজেকে হারিয়ে নয়। আমার জানাতে আত্মবোধ এবং বিষয়বোধ দুইই উজ্জ্বল থাকছে। এ ঠিক নিরোধযোগ নয়—যদিও চেতনার অন্তরাবৃত্তি আছে বলে নিরোধের সংস্কার যে এখানে একেবারে নাই, তাও নয়। একে জাগ্রৎ-সমাধির অবস্থা বলা যেতে পারে।

বোধের দুটি প্রান্তকে এমনি করে যুগপৎ জাগিয়ে রাখতে হলে তৃতীয় একটি সত্তার আবেশ দরকার হয়। এই সত্তা হল 'ভূমা'—আকাশবৎ এক মহাবৈপুল্যের বোধে আমরা যার পরিচয় পাই। জাগ্রৎচেতনায় আনন্ত্যের বোধকে নিরন্তর বহন করা যে পূর্ণযোগের প্রথম সাধন, একথা আগেও বলেছি।

এও বলেছি, এই ভূমা বা আনন্ত্যের বোধকে পেতে হবে সহজ হয়ে, কোনও কসরত করে নয়। ফুল যেমন আলো-বাতাস-আকাশকে পায়, পাপড়ি খুলতেই অসীমের ছোঁয়ায় সুরভি হয়ে ওঠে, ভূমাকে পেতে হবে তেমনি করে। আলো ঝরে পড়ছে আর হৃদয়ের কমল নিত্যকাল ধরে নিজেকে মেলেই রেখেছে তার দিকে : এ-ব্যাপারটি ঘটে চলেছে সত্তার গভীরে। কমল দল মেলছে। ভূমার আবেশে তার সবটুকু ফুটছে আলো হয়ে। ঘটছে শুদ্ধসত্ত্বের সহজ পরিণাম— যেমন ঘটে থাকে চৈত্য-রূপান্তরে। যা আভাস ছিল, তা-ই হল প্রভাস। আত্মসত্তার সুগভীর প্রত্যয় ফুটল দৃষ্টির উল্লাস হয়ে, ফুটল ঝলকে-ঝলকে দিব্যভাবনার বিচ্ছুরণ হয়ে। স্বানুভবই হল দৃষ্টি, আবার সেই দৃষ্টি হল সৃষ্টি— যেমন হয় কবিহৃদয়ের কাব্যে রূপায়ণে। অলখের ছোঁয়ায় সত্তার গভীর হতে এমনি করে আত্মবিভূতির উৎসারণ হল বোধি-মানসের ব্যাপ্রিয়ার (functioning) রীতি।

এই ব্যাপ্রিয়ার চারটি বিভাব আছে, তাদের বোধির স্বাভাবিক বৃত্তি বলতে পারি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংজ্ঞা অনুসারে তাদের নাম দিতে পারি— শ্রবণ স্পর্শন দর্শন ও মনন। প্রাকৃত ভূমিতে ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারেই যে বোধির পরিচয় সবচাইতে স্পষ্ট, একথা আগেই বলেছি। যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মত সুস্পষ্ট এবং অবাধিত অথচ যার নিদান বাইরের বস্তুতে নয় কিন্তু গভীর আত্ম-প্রত্যয়ে, তা-ই হল বোধির স্বাভাবিক বৃত্তি।

অনুভবের সূক্ষ্মতা অনুসারে বৃত্তিগুলিকে পর-পর সাজানো যেতে পারে। তখন বোধি-মানসের সবচাইতে সূক্ষ্ম বৃত্তি হবে সত্যশ্রুতি। এই বৃত্তির গ্রাহ্য বিষয় হল 'বাক্'—যার কথা সবদেশের মরমীয়ারা নানাভঙ্গিতে বলে গেছেন। এদেশের বৈদিক-মীমাংসায় এবং তন্ত্রে বাকের রহস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। তার মূল কথা হল, বাক্ আকাশের স্পন্দ। শূন্যের মধ্যে উন্মিষন্ত সত্তার যে আত্মস্পন্দ, তা-ই বাক্। বোধির যে অন্তর্মুখ বৃত্তি তার গ্রাহক, তা-ই হল শ্রুতি।…অরূপ বাকের গভীরে রূপায়ণের যে-আকূতি, সিসৃক্ষার যে-সংবেগ—উপনিষদের ঋষি যাকে বলেছেন প্রাণ— তার গ্রাহক হল বোধির স্পর্শবৃত্তি। এই স্পর্শ হল প্রাণ দিয়ে প্রাণকে ছোঁয়া, যে-প্রাণের মধ্যে রূপায়ণের সামর্থ্য টলমল করছে। এই সামর্থ্যকে স্পর্শ করা হল যে-কোনও বস্তুর মর্মসত্যকে স্পর্শ করা এবং তার অবরুদ্ধ সম্ভাবনাকে মুক্তি দেওয়া। মাতৃহৃদয়ের স্পর্শ যেমন সন্তানের নিগূঢ় সত্তাকে উদ্‌বেল করে

তার স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলে, এও তেমনি।...তারপর প্রাণের আকৃতি নীরূপ ভাবকে দেয় রূপ, আকাশের আত্মপ্রতিবিম্ব ফোটে জ্যোতিতে, স্পর্শের রোমাঞ্চ যেন অনন্তবিথার আলোর নীহারিকায় ঝলমলিয়ে ওঠে। বোধির দর্শনবৃত্তি হল এই জ্যোতির গ্রাহক। বলা বাহুল্য, এ-দর্শন প্রাকৃত দর্শনের মত বাইরের বস্তুর সংঘাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উত্তেজন এবং তার ফলে নিজের বাইরে বস্তুকে দেখা নয়। উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে এ হল 'আবৃত্তচক্ষু হয়ে নিজেকেই সামনাসামনি দেখা' এবং সেই আত্মদর্শনের উল্লাসকে রূপান্তরিত করা বস্তুর বিসৃষ্টিতে এবং দর্শনে। মরমীয়া বলেন, যিনি আত্মারাম, তিনি নিজের মাধুরীকে আস্বাদন করবার ইচ্ছাতে তাকে প্রতিক্ষিপ্ত (projected) করে 'ঈক্ষণ' করলেন অর্থাৎ দেখলেন। বোধির দর্শন এমনিতর ঈক্ষণ—কবি যেমন তাঁর ভাবময় আত্মসত্তাকে প্রতিক্ষিপ্ত করে ঈক্ষণ করেন, তেমনি।

বোধির এই তিনটি বৃত্তির আমরা নাম দিয়েছি প্রাকৃত বহিরিন্দ্রিয়-বৃত্তির নাম অনুসারে। কিন্তু স্পষ্টই দেখছি, দুয়ের মাঝে মিল শুধু বিষয়ের অপরোক্ষ-তায়, নইলে বোধির বৃত্তি আর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ধারা একেবারে পরস্পরের বিপরীত। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষে আমরা বাইরের বস্তুকে ভিতরে আকর্ষণ করি; আমাদের অনুভব যে সত্য, তার নৈশ্চিত্য থাকে বস্তুতে। আর বোধির প্রত্যক্ষে আমরা ভিতরের ভাবকে বাইরে প্রতিক্ষিপ্ত করি; অনুভবের সত্যতা সেখানে নির্ভর করে আত্মপ্রত্যয়ের উপরে।

এই-যে বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগৎ, এ-দুয়ের সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মনের জগৎ। মনন ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের উজানে, চোখের দেখার ওপারে হল মনের দেখা। আবার মনন বোধিজ প্রত্যক্ষের ভাটিতে, ভাবের দেখাই রূপ নেয় মননে—ভাবকে হয় নিজের কাছে কিংবা পরের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর করবার জন্য। ভাব আত্মানুভবের সঙ্গে জড়িয়ে একাকার হয়ে ছিল, আত্মবিচ্ছুরণের প্রবেগে তা বাইরের দিকে ঠিকরে পড়ল। তখন আমিই যেন আমাকে দু'ভাগে ভাগ করলাম—আমার একভাগ হল বিষয়ী, আরেক ভাগ হল বিষয়। অখণ্ড অনুভবকে এমনি বিভাজিত করে চেতনার যে-বৃত্তি, তাকে বলে 'বিবেক' (discrimination)।

বোধির এই আত্মবিবেক হতে জাগে দিব্য মনন, যা বোধির স্বাভাবিক বৃত্তির মধ্যে চতুর্থ। সত্যের শ্রবণ স্পর্শন আর দর্শন হতে তখন জাগে সত্যের মনন—ঠিক যেমন প্রাকৃত ভূমিতে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ হতে প্রাকৃত মনন জাগে।

কিন্তু প্রাকৃত মননের ধারা হল আরোহী, আর বোধিজ মননের ধারা অবরোহী। বোধি মনকে তখন ব্যবহার করে যন্ত্ররূপে। সাংখ্যের ভাষায় বলতে গেলে এক 'মহৎ তত্ত্ব' হতে তখন মনের উৎপত্তি হয়। সে-মন শুদ্ধ, ছন্দোময়, ক্ষিপ্র-চারী। প্রাকৃতমন জাগে ইন্দ্রিয়ব্যাপার হতে, ইন্দ্রিয় জাগে ভূতের ব্যাপার হতে; সে-মনের ক্রিয়া মন্থর, চঞ্চল, অবিশুদ্ধ। মানসভূমিতে এই শুদ্ধ মন আর অবিশুদ্ধ মন পাশাপাশি থাকে। তাইতে ওপার হতে আলোর ঝলক আসে, কিন্তু এপারের ধোঁয়ায় তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অনুভবের ধারাকে যদি আমরা উলটে দিতে পারি, অর্থাৎ বাইরের চাপে না দেখে ভিতরের প্রেরণায় দেখতে শিখি, জীবনকে বস্তুনির্ভর না করে মুখ্যত ভাবনির্ভর করি, তাহলে বোধিজ মননের ক্রিয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

বোধি-মানসের ভূমিতে উত্তীর্ণ হলে পর প্রভাস-মানস আর উত্তর-মানসের ক্রিয়া যে অনায়াস হবে, একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুত উত্তর-মানসে আমরা স্বরূপত পাই বোধিজ মননেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। আর প্রভাস-মানসে তত্ত্বত কাজ করে বোধিজ প্রত্যক্ষের বৃত্তি। উত্তর-মানস প্রাকৃত-মানসের কাছা-কাছি, তাই মননবৃত্তিই তার মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই মনন প্রভাস-মানসের মধ্যে খোঁজে একটা দিব্য প্রত্যক্ষের আশ্রয়। তখন চেতনার ধাতুরও (stuff) একটা রূপান্তর ঘটে। উপনিষদের ঋষি এই রূপান্তরকে বলেন 'প্রসাদ' (transparency)। প্রাকৃতমনের রাজ্যে যে আবছা আলো, উত্তর-মানসে তা ফোটে জ্যোছনা হয়ে এবং প্রভাস-মানসে সৌরদীপ্তি হয়ে। চিত্তের উপাদান তখন 'তেজস্বী' হয়। এই তেজেরও ঊর্ধ্বে যে প্রাণ আর আকাশের একটি মিথুন আছে, তার মধ্যে হল বোধি-মানসের প্রতিষ্ঠা। বোধি-মানসের মধ্যে বলতে গেলে দিব্যধাতুর প্রসাদ চরমে ওঠে এবং তা প্রাণে ইন্দ্রিয়ে ও দেহচেতনাতেও উত্তরজ্যোতির বীর্য আর দীপ্তিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা যেতে পারে ব্যক্তিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠার চরম ভূমি।

বোধি-মানসের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং মর্মভেদী। মন এবং প্রাণের মধ্যে অবিদ্যার যেসব গ্রন্থি থাকে, বিদ্যুতের অভিঘাতে খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেগুলিকে সে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু তবুও তার শক্তি সীমাবদ্ধ, অচিতির গভীরে আঘাত হানতে গিয়ে সেও কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে আসে। তাই আধারের সম্যক রূপান্তর সিদ্ধ করবার জন্য যেতে হয় বোধি-মানসেরও উজানে —অধিমানসের ভূমিতে। এইবার তার কথা তুলছি।

অধিমানসের পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি, এখানে শুধু সংক্ষেপে তার কথা কিছু বলব। সত্যকে খণ্ড-খণ্ড করে দেখা মনের ধর্ম, আর অতিমানসের ধর্ম হল অখণ্ডদর্শন। অতিমানসের একধাপ নীচে যেখানে খণ্ডদর্শনের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, সে-ই হল অধিমানস মায়ার ভূমি। খণ্ডদর্শনের এইখানে শুরু; তবুও তার ভিত্তি রয়েছে অখণ্ডদর্শনের মধ্যে। অধিমানস যেমন ভাঁটার দিকে অতিমানসের প্রথম প্রতিভূ, তেমনি মনের উজানে সে হল মানস ক্রিয়ার চরম উৎকর্ষ। মন খণ্ড-খণ্ড করে দেখলেও বুদ্ধির সামান্যদর্শন তার ভূমিকা, সামান্যের আশ্রয় না নিয়ে মানুষের বিশেষজ্ঞান এক পাও এগোতে পারে না—একথা আমরা জানি। এও দেখেছি, মনের উজানে চলতে গিয়ে ওই সামান্যজ্ঞানই ক্রমে চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে, বিশেষজ্ঞান দেখা দেয় তারই অবরোহ-পরিণামরূপে। মনের মৌল ধর্ম বজায় রেখে সামান্য-জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ যেখানে, সেইখানে অধিমানসের অধিকার।

অধিমানস যে অদ্বৈতজ্ঞানের ভূমি, একথা আগেও বলেছি। একটা ফুলের মধ্যে যেমন অনেকগুলি পাপড়ি থরে-থরে সাজানো থাকে, তেমনি অধিমানসের বর্তুল পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকে বহু সামান্যজ্ঞানের সমাহার। ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট সত্তা আছে, কিন্তু তাবলে পাপড়িতে-পাপড়িতে কোনও বিরোধ নাই। অধিমানস ভূমিতেও তেমনি সত্যের সমূহের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে ঐকান্তিক এবং চরম মর্যাদা দিয়েও তাদের মধ্যে কোনও বিরোধের সৃষ্টি করা হয় না। এইখানেই মনের সঙ্গে তার তফাত। মন যখন একটা-কিছুকে একান্ত করে তোলে, তখন আর-সব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, চাই কি তাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকিও বাধিয়ে দেয়। কিন্তু অধিমানস এককে একান্ত করে 'সর্বেষামবিরোধেন'। একটা উপমা দিলে হয়ত কথাটা স্পষ্ট হতে পারে। সতীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেম যখন তার হৃদয়কে পূর্ণ করে, তখন নিষ্ঠা তাকে সঙ্কীর্ণচেতা করে না, তার ভালবাসার ঔদার্য অপর মেয়ের ভালবাসাকেও মর্যাদা দিতে শেখায়। তেমনি অধিমানস ভূমিতে বিশেষের জ্ঞান অবশ্য চরমে ওঠে, কিন্তু সে-চরমতায় বিশেষের অন্তর্গূঢ় পরম-সত্যের প্রকাশ ঘটে বলে তার আলোকে একের সঙ্গে সবার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হয়। তাই সেখানে বিশেষে-বিশেষে কোনও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না।

অধ্যাত্মসাধনার চরমে এই দ্বন্দ্বহীন বৈশিষ্ট্যের রূপ অনায়াসেই ফুটে উঠতে পারে। যেমন মনের ভূমিতে দেখি—জ্ঞান ভক্তি এবং কর্মের অধিকার আলাদা, সাধনা আলাদা। সাধক প্রথমত আপন অধিকার অনুযায়ী সাধনার একটি বিশেষ ধারাকে—ধরা যাক জ্ঞানের ধারাকে—হয়তো নিষ্ঠাভরে আঁকড়ে ধরল। তার চিত্ত যদি নির্মোহ উদার এবং সাবলীল থাকে, তাহলে একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তার জ্ঞান যখন অধিমানস ভূমিতে উত্তীর্ণ হবে, তখন সে দেখবে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বা কর্মের কোনও বিরোধ নাই—একটি তার রসরূপ, আরেকটি তার শক্তিরূপ। অথচ নিরূঢ় সংস্কারের বশে জ্ঞানবৃত্তির মাধ্যমেই সে ভক্তি ও কর্মের ভাবনাকে প্রকাশ করবে। বৈশিষ্ট্যের ওই সূক্ষ্ম সংস্কারটুকু যদি না থাকত, অখণ্ড ব্রহ্মসংবিতের সর্বাবগাহী একরসপ্রত্যয়ে যদি চেতনা আপ্লুত হত, তাহলে অধিমানসকে ছাপিয়ে ফুটত অতিমানসের দিব্যজ্যোতি।

অধিমানসের বিশিষ্ট লক্ষণ হল চেতনার তুঙ্গতার সঙ্গে-সঙ্গে তার নির্বাধ পরিব্যাপ্তি। দুপুরের সূর্য মাথার উপরে এসে সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করে পৃথিবীর উপর যেমন ছড়িয়ে পড়ে, এও যেন তেমনি। তবে অধিমানসকে ঠিক-ঠিক বুঝতে হলে উপমাটির জের টানতে হবে। সূর্যের অবর্ণ জ্যোতি শুধু যে দ্যুলোক-ভূলোককে প্রকাশ করে তা নয়, তাদের বর্ণবৈচিত্র্যও ওই অবর্ণের বিচ্ছুরণ। অধিমানসের দর্শনও তেমনি এক সর্বাবগাহী বিপুল দর্শন, যোগি-মানসের আর-সব দর্শন তার বিভূতি। বোধিমানস পর্যন্ত থাকে চিদ্‌বৃত্তির একটা একাগ্রতা, যা ঊর্ধ্বমুখ তীরের ফলার মত বিষয়ের আবরণকে ভেদ করে তার মর্মসত্যকে আবিষ্কার করে চলে। এই আবিষ্ক্রিয়ায় প্রাকৃত বিষয় দেখা দেয় অপ্রাকৃত হয়ে, বস্তুর মূলে যথাক্রমে উন্মেষিত হয় চিন্ময় ভাব, রূপ আর স্পর্শের সংবিৎ—উত্তর-মানস, প্রভাস-মানস আর বোধি-মানস যাদের ধারক। এদের কথা আগেই বলেছি। একটা সংহত আত্মসংবিৎ হল এইসব চিদ্‌বৃত্তির উৎস। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'জ্ঞান-আত্মা', মনের অন্তর্মুখ নিয়মনে আমরা যার সাক্ষাৎ পাই। মনের চেতনা গুটিয়ে গিয়ে আত্ম-সত্তার চিদ্‌ঘন দীপ্তিতে সংহত হয়, তারই বিচ্ছুরণ ঘটে ওইসব দিব্যসংবিতে। এই আত্মসংহত ভাবনা যখন সুপ্রতিষ্ঠ হয়, তখন সহজস্থিতির স্বাভাবিক নিয়মে আভ্যন্তর প্রযত্ন শিথিল হয়ে জাগে একটা ব্যাপ্তির বোধ, উপনিষদের ভাষায় 'জ্ঞান-আত্মা' রূপান্তরিত হয় 'মহান্ আত্মাতে'। এই মহান্ আত্মাই অধিমানসের স্বরূপ। আত্মসংহত চেতনা তখন বিশ্বব্যাপ্ত, তাই এক বিরাট আমির মহা-

সমুদ্রে দুলে ওঠে চিদ্‌বৃত্তির বীচিভঙ্গ। আমি তখন থেকেও নাই, অথবা আছি সবাইকে জড়িয়ে এক বিপুল আমি হয়ে—যে-আমি বিশ্বে প্রতিবিম্বিত বহুবিচিত্র আমির সৌরবিম্ব। আমার একটা আমি তখনও বিশ্বসমুদ্রের বুকে আলোর ঝিকিমিকি হয়ে দুলতে থাকে; কিন্তু তার বোধে সংক্রামিত হয় বিশ্বাত্মার সম্বোধি (spiritual intuition)। তাই নিজেকে অনুভব হয় বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু বলে। 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'—উপনিষদের এই উদাত্ত ব্রহ্মঘোষ তখন এই আমির আত্মপরিচয়ের মন্ত্র।

কয়েকটি অধ্যাত্ম-অনুভবের বিবৃতি থেকে অধিমানসের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হতে পারে। আমিত্ব আমাদের জীবনের কেন্দ্র। আবার এই আমিত্বের বিস্ফারণও জীবনের উন্মেষের একটা স্বাভাবিক নিয়ম। আমরা যত বড় হই, ততই অপরের মধ্যেও নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারি। আত্মবিস্ফারণের এই সামাজিক বৃত্তির সাধারণ সংজ্ঞা 'সহানুভূতি'। সহানুভূতি গভীর স্বচ্ছ এবং উদার হলে তা হয় ভালবাসা। ভালবাসায় বিষয় আর বিষয়ীর তাদাত্ম্য ঘটে—এই হল তার চরম পরিণাম। যদি বিষয়ীর বা আমার দিক থেকে দেখি, তাহলে এই তাদাত্ম্যসঙ্গমে আমার সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে। আমি তখন শূন্যবৎ, আকাশবৎ—এক বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রভাস ছাড়া আমার মধ্যে আর-কিছুই নাই। সেই প্রভাসে এবং সমাহিতচিত্তজাত বোধির তীক্ষ্ণতায় তোমার স্বরূপ আমার চেতনায় অনাবৃত হয়ে পড়ে। অকূল গভীর সমুদ্রের বুকে বীচিভঙ্গের মত আমার চেতনায় তখন তোমার সত্তার উল্লাস। তখন আমাতেই তুমি বা আমিই তুমি। অন্তর্মুখ আত্মলীন প্রাকৃত মায়ের চিত্তেও সন্তান সম্পর্কে এই অনুভবের একটা আভাস ফুটতে পারে। অধিমানস চেতনা তারই অনন্তগুণিত নিঃসঙ্কোচ বিস্তার। 'আমাতেই বিশ্ব বা আমিই বিশ্ব'—এই তার অনুভূতির স্বরূপ। এ-আমি অবশ্যই প্রাকৃত জীবের কাঁচা আমি নয়, যে অদ্বিতীয় বৈশ্বানর আমি হতে বিশ্বময় সকল আমি স্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরে পড়ছে, এ সেই আমি। এ-আমির মধ্যে আমার জীবসত্ত্বও (iudividual being) অন্যান্য জীবসত্ত্বেরই সগোত্র একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এই স্ফুলিঙ্গ একদিন আমার বিশ্বের কেন্দ্র ছিল, আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে অনন্ত বিশ্বের পরিধিতে। এক আমিই যেমন বিশ্বসত্তার (universal existence) বিপুল পরিধি, তেমনি বিশ্বসত্ত্বের (universal being) অনন্ত স্ফুলিঙ্গ। বহু আমি এবং বিচিত্র আমি মৌল আমিত্বের বিভঙ্গ

বা চিৎপরিণামের ক্রমিক স্তর শুধু। মৌল আমিতে আছে সামান্যদর্শন-জনিত প্রজ্ঞা, বিশেষদর্শন তারই বিক্ষেপ মাত্র। তাই আমার সার সত্যকে আমি জানি বলে সবার সত্যকেই জানি। প্রাকৃত সহানুভূতিতেও এই নিয়ম খাটে। সেখানে আমার বেদনা দিয়ে আমি তোমার বেদনাকে বুঝি। কিন্তু প্রাকৃত অনুভবে থাকে বিশেষ ঘটনার জ্ঞান এবং তাকে আশ্রয় করে সামান্যের একটা আভাস কেবল। আর মানসোত্তর অনুভবে সামান্যজ্ঞানই হল বিশেষ-জ্ঞানের ভিত্তি। সুতরাং অধিমানস চেতনায় বিশ্বের অনুভব আত্মানুভবের পরিস্পন্দ মাত্র—আমার সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী আমিত্বের গভীর অনুভবের প্রতিফলন এই বিশ্ব। তাই আমার চেতনা একাকার হয়ে যায় সবার সঙ্গে, সবার বেদন-মনন-হর্ষ-শোকের সঙ্গে—সবার জীবনের অনুভব সত্য হয়ে ওঠে আমারই আত্মসত্তার অনুভবে।

এই হল অধিমানস চেতনার জ্ঞানের দিক। কিন্তু জ্ঞান চেতনার একটা তটস্থ বৃত্তি নয় শুধু, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৃষ্টির শক্তিও। সাধনার প্রবর্তদশায় তিতিক্ষার ফলে যখন আমাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, তখন তার তটস্থ স্বভাবটাই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। আঘাতে আমরা মুষড়ে না পড়ে যদি অচল অটল হয়ে জেগে থাকি, তাতে ফোটে জ্ঞানের নেতিরূপ। তার চরমে রয়েছে স্বরূপস্থিতির কৈবল্য—এক নির্বিকার সাক্ষিচৈতন্যে জগৎ তখন ভাসছে শুধু। তার গভীরে শক্তির যে-লীলা, তার সম্বন্ধে সজাগ থাকলেও আমি তার প্রতি উদাসীন। আমি তখন শক্তির উপদ্রষ্টা, বড় জোর অনুমন্তা মাত্র—তার ভর্তা বা ভোক্তা মহেশ্বর নই। কিন্তু সংস্কারমুক্ত সহজ চেতনায় অনুভবের গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে বহিরঙ্গ শক্তি রূপান্তরিত হয় অন্তরঙ্গ আত্মশক্তিতে, সিদ্ধ-চেতনা তখন অপরা প্রকৃতির গভীরে পরা প্রকৃতিকে অনুভব করে আত্ম-প্রকৃতির রূপে। প্রকৃতির লীলা তখন আর নিরর্থক নয়, আমারই আত্ম-বিভাবনার (self-expression) উল্লাসে তা একান্তভাবে সার্থক। আমি তখন শুধু তটস্থ দ্রষ্টা নই, অবন্ধন ভোক্তা এবং কর্তাও। এই দিব্য ভোগ এবং ঐশ্বর্য জ্ঞানের শক্তিরূপ। অধিমানস চেতনায় এই শক্তিরূপও ফোটে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে একীভূত সত্তায় বিশ্বশক্তির সুদূরভাবী চিন্ময়-পরিণামের সংবেগ সঞ্চারিত হয় স্বভাবের রীতিতে। হিরণ্যগর্ভের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় তখন সিদ্ধচেতনার একটা দায়। পুরুষের চেতনায় এবং কর্মে তখন রূপায়িত হয় বিরাটের মুক্তচ্ছন্দ—যার মধ্যে মানস কল্পনার দ্বিধা সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা

থাকে না, প্রজ্ঞার স্বত-উৎসারণ সিদ্ধসঙ্কল্পের বীর্যে অনিরুদ্ধ ধারায় ঝরে পড়ে বিশ্বের উপর। সিদ্ধচিত্ত তখন বস্তুতই 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরৎ'—লোকোত্তরের আদিত্যদ্যুতিকে বসন্তের সঞ্জীবন আনন্দে সবার গভীরে ছড়িয়ে দেওয়া তার কাজ।

অতিমানসের দিকে চেতনার উত্তরণের শেষ ধাপ হল অধিমানস। কিন্তু উত্তরণের ফলে উত্তরভূমি ও অবরভূমির বিচ্ছেদ ঘটে না, বরং উত্তরভূমিতে প্রতিষ্ঠা অবরভূমির চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করে। অধিমানসের আবেশে তাই বোধি-মানস প্রভাস-মানস এবং উত্তর-মানসেরও সত্ত্বের (essence) ও সামর্থ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। অধিমানস চেতনায় ব্যক্তিভাবনার যে অনন্ত প্রসার দেখা দেয়, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যক্তিসত্ত্বের চিদ্‌বৃত্তিরূপে ফোটে আর তিনটি উত্তর-মানসের ক্রিয়া। প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করে হয়তো কথাটা বোঝানো যেতে পারে।

প্রাকৃত ব্যক্তির মধ্যে বিশেষের ভাবনা মুখ্য হলেও সামান্যভাবনা তার পটভূমিকা। আমার স্বকীয়ত্ব বিশ্বসত্তা হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই আমি যেমন আমাতে আছি, তেমনি আবার বিশ্বেও আছি। আমার বিশ্বগত আমিত্বের ভূমিকায় চলছে আমার ব্যক্তিগত আমিত্বের ব্যাপ্রিয়া। আমার বিশ্বগত ভূমিকা সম্পর্কে আমি যত সচেতন হই, ততই আমার ব্যক্তিসত্ত্বের পুষ্টি ঘটে, আমাকে যেন আমি আরও সত্য করে পাই। মানসোত্তর ভূমিতেও ঠিক তা-ই ঘটে। অনন্তে সমাপন্ন অধিমানসচেতনার ভূমিকায় এক চিন্ময় ব্যক্তিসত্ত্বের বিশিষ্ট বৃত্তিরূপে ফোটে বোধি-মানস প্রভাস-মানস আর উত্তর-মানসের ক্রিয়া। প্রাকৃত ব্যক্তির মতই আমি তখন বিষয়কে ছুঁই দেখি এবং ভাবি—কিন্তু এই স্পর্শন দর্শন ও মননের মূলে থাকে বিরাটের বা মহান্ আত্মার তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের বীর্য। আমি বিরাট হয়ে আমাকেই ছুঁই দেখি এবং ভাবি। মননের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংবিতের সম্পর্ক এখানে যে প্রাকৃত ভূমির একেবারে বিপরীত, একথা আগেই বলেছি। বিষয়ের মর্মমূলে যে অখণ্ড চিন্ময় সত্তা, তার অপরোক্ষ স্পর্শন এবং দর্শন হতে এখানে জাগে তার বিচিত্র বিভূতির উল্লসিত অনুভব এবং এই অনুভব সিদ্ধভাবের জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে উত্তর-মানসের আকাশে। মরমীয়া যখন ঘটে-ঘটে 'তাঁকেই' দেখেন, তখনই তাঁর মধ্যে এমনিতর মানসোত্তর চিদ্‌বৃত্তির উল্লাস জাগে। এ-দেখা একের বহু হওয়ার আনন্দকে দেখা—অবরোহক্রমে। তাই বহুর সঙ্গে একের

এখানে বিরোধ বা বিবিক্ত-সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু প্রাকৃত দেখা ঠিক এর বিপরীত। সেখানে ইন্দ্রিয়সংবেদনের দৌলতে বিরোধ বা বিবিক্ততার দর্শন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, আর মন তার মধ্যে সামান্যভাবনার একটা সূত্র আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। এই সামান্যভাবনার ঘনীভাবে কি করে মানসোত্তর চিদ্‌বৃত্তির উন্মেষ হয়, সেকথা আমরা জানি।

অধিমানস তাহলে একটা সংবর্তুল চেতনার ভূমি। মানসপ্রত্যয়ের সে হল চরম এবং পরম প্রতিষ্ঠা। প্রাকৃতমনের মধ্যে একটা বিভাজনী বৃত্তি আছে, তার ফলে অখণ্ড সত্যকে সে খণ্ড-খণ্ড করে দেখে এবং একটি খণ্ড-ভাবনাকে অন্যনিরপেক্ষ হয়ে চরম উৎকর্ষের দিকে ঠেলে নিতে চায়। মনের এই বিচিত্র বিভূতি অধিমানসে এসে সমাহৃত হয় একটি সহস্রদল পদ্মের মত। তার ভূমিকায় থাকে এক অখণ্ডৈকরস অদ্বৈতভাবনার চিদাকাশ, আর তার বুকে প্রজ্ঞানের আদিত্যবিম্ব হতে দিব্যভাবনার সহস্ররশ্মি দিকে-দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তির ভাবনা আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সেখানে বিশ্বমানসে মুক্তি পায়। তাই চেতনার এই অধিমানস রূপান্তর ঘটতে পারে একমাত্র চিন্ময় রূপান্তরের শেষ পর্বে।

অধিমানস অধ্যাত্মচেতনার উত্তুঙ্গ ভূমি হলেও, এইখানেই তার প্রগতির শেষ নয়। সত্তার পরার্ধে আছে সৎ চিৎ আনন্দ আর অতিমানস; অপরার্ধে আছে জড় প্রাণ চৈত্যসত্ত্ব আর মন। অধিমানস এই অপরার্ধেরই শ্রেষ্ঠ বিভূতি, পরার্ধের সে প্রতিভূ। তাই অপরার্ধের তত্ত্বসমূহের যে মৌলিক ন্যূনতা, অধি-মানস তাহতে মুক্ত নয়, যদিও চিৎপ্রকাশের অকল্পনীয় ভাস্বরতা তার মধ্যে সম্ভব। প্রাকৃতমনের একটা প্রধান ন্যূনতা হল, সে জানতে পারে এবং বুঝতে পারে অনেক-কিছুই কিন্তু করতে পারে তার তুলনায় অনেক কম— বিশেষত যেখানে আন্তর চেতনা নিয়ে তার কারবার। 'তবলার বোল তার মুখে আসে, কিন্তু হাতে আসে না।' প্রজ্ঞানের সীমাহীন ঔদার্যের মধ্যে থেকেও শক্তির এমনতর কুণ্ঠা অধিমানসের মধ্যেও আছে। আছে বলেই অধ্যাত্ম-জগতে আমরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাই। বোধের উত্তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করেও অনেকসময় সাধকের আধারের সম্যক রূপান্তর সিদ্ধ হয় না, আলো ফুটেও যেন সব আলো করে তুলতে পারে না। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই সম্ভবত বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী বলেছেন, নিরঞ্জনের সঙ্গে পরমসাম্যের ফলে ভোগসাম্যই ঘটে, কিন্তু শক্তিসাম্য ঘটে না অর্থাৎ জ্ঞান আর শক্তির মাঝে একটা

অনুপাতবৈষম্য থেকেই যায়। অবশ্য তান্ত্রিক ব্রহ্মবাদী একথা পুরাপুরি মেনে নিতে পারেননি, তাঁর ভাবনায় শক্তিসাম্যের সম্ভাবনার প্রতি অনেক ইঙ্গিতই আছে। যোগীও কৈবল্যের সঙ্গে বিভূতির কোনও বিরোধ দেখতে পাননি, যদিও বিবেকখ্যাতি বা প্রাতিভজ্ঞান হতে সব বিভূতিকে সম্ভাবিত বলেও বিভূতি-সিদ্ধির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন নন। মোটের উপর বলা চলে, জ্ঞানের সঙ্গে শক্তির অনুপাতবৈষম্য থাকলে তাকে অধ্যাত্মসিদ্ধির চরম বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। ব্রহ্মে যদি এই অনুপাতবৈষম্য না থাকে, তাহলে ব্রহ্মীভূত জীবসত্ত্বেও তা থাকবার কথা নয়—এটা সহজ-বুদ্ধির রায়। যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে পরমা প্রকৃতির কোন-একটা রহস্য এখনও আমাদের অনধিগত রয়ে গেছে, যার ফলে পরমসাম্যের সম্যক্-সিদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না। এই নিগূঢ়তম রহস্যই হল অতিমানস—যা সচ্চিদানন্দের রূপান্তরকৃৎ স্বরূপবীর্য।

অতিমানস সবার মূলে, তাকে ছেড়ে বিশ্বের কোন ব্যাপারই চলে না। তবু তার শক্তি পার্থিবলোকে এখনও পূর্ণ প্রকট হয়নি। যদি হত, তাহলে জ্ঞান আর শক্তির ওই অনুপাতবৈষম্য থাকত না। সূর্যের রং নিয়ে মাটির বুকে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটছে; তবু তো তারা আলোর ফুল নয়। মাটির বুকে আলোর ফুল ফোটানই হল অতিমানসের তপস্যা।

সাধনার দিক দিয়ে বলা চলে, অতিমানস আর অধিমানস যেন মুখামুখি হয়ে আছে। জড় উঠে যাচ্ছে চেতনার দিকে; তার উত্তরণের চরম বিন্দুতে যে সূচীমুখ বিদ্যুতের বিস্ফোরণ, তা-ই অধিমানস। পার্থিব শক্তি অথবা জীবসত্ত্বের অভীপ্সা এখন পর্যন্ত নিজের জোরে এতদূরই উঠতে পারে, এর বেশী নয়। অথচ এ-জোরও সে পেয়েছে উপর হতে চিৎশক্তির সম্পাত তার মর্মে অনুবিদ্ধ হয়েছিল বলেই। মাটির তলায় জলের স্রোত থাকে, তার স্বাভাবিক গতি নীচের দিকে। কিন্তু উপরের চাপে কখনও-কখনও সে-জল ঊর্ধ্বমুখী ফোয়ারা হয়ে ফুটে বের'য়। তেমনি অতিমানসের চাপে জড় ঠেলে উঠল অধিমানস পর্যন্ত। এও অতিমানসের বিভূতি, কিন্তু একান্ত সহজ বিভূতি তো নয়। এ সহজ হতে পারে, যদি প্রকৃতির মর্মে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু সে-রূপান্তর ঘটানো মানস প্রকৃতির সাধ্য নয়, তার সাধ্যের সীমা ওই অধিমানসের উন্মীলন পর্যন্ত। অধিমানসে এসে মন পুরাপুরি সাবালক হল। সে জানল, তার পরে কি আছে। এখন তাকে অসীমের

কাছে নিজেকে মেলে দিয়ে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে সহজের প্রকাশের জন্য। প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার জন্য অধিমানসের সংবর্তুল চেতনায় সমাপন্ন হওয়ার একটা অপেক্ষা আছে। মনে রাখতে হবে, চিদ্‌বৃত্তির একদেশিতা এখানে অচল। তাহলেই অধিমানস মায়া এসে হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে সত্যের মুখ ঢেকে দেবে।

যে-যে সোপান বেয়ে অতিমানসের দিকে উঠে যেতে হবে, তাদের মোটামুটি একটা বিবরণ এইখানে শেষ হল। এই প্রসঙ্গে সাধককে কয়েকটি কথা স্মরণে রাখতে হবে। প্রাকৃতমনের মধ্যেই যে সামান্যভাবনার বৃত্তি রয়েছে, তা-ই হবে সাধনার মুখ্য অবলম্বন। অর্থাৎ প্রথম থেকেই সাধককে বস্তুনির্ভর না হয়ে ভাবনির্ভর হতে শিখতে হবে। তার জন্য অন্তরাবৃত্তি বা চিত্তের প্রত্যাহার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ-প্রত্যাহার যে বিরোধে পর্যবসিত হবে, তার কোনও কথা নাই। সাধকের প্রধান চেষ্টা হবে, জাগ্রতভূমিতেই উত্তরশক্তির প্রপাতকে নামিয়ে আনা, বস্তুর মূলে ভাবের আবিষ্করণ দ্বারা সাধারণ প্রত্যক্ষকে চিন্ময় প্রত্যক্ষে রূপান্তরিত করা। তাই সাধকের যোগজীবন হবে উদার সহজ জীবন, তার মধ্যে কোনও উৎকেন্দ্রিকতার স্থান থাকবে না। শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য নিরোধ কখনও প্রয়োজন হলেও তার সাধনা হবে সাময়িক, চরম লক্ষ্য নয়। নির্বিশেষে সমস্ত অনুভবের স্বচ্ছতা গভীরতা পরিব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা হবে সাধনার অগ্রগতির মাপকাঠি। সাধকের মধ্যে নিত্য-সমনস্কতা থাকবে, কিন্তু কোনও হঠকারিতা থাকবে না। প্রযত্নশৈথিল্য দ্বারা অহংএর গ্রন্থিকে এলিয়ে দিয়ে নিজেকে উপর হতে নির্ঝরিত শান্তি জ্যোতি আনন্দ ও শক্তির কাছে মেলে ধরতে হবে, যাতে মর্ত্য আধার রূপান্তরিত হয় দেবতার সোমপাত্রে। বুদ্ধির চাইতে সাধকের বেশী নির্ভর থাকবে বোধির উপর। ভাবমুখে থাকতে-থাকতে বোধির আলো চেতনায় স্বচ্ছ হয়ে ফুটবে।

এইগুলি হল সাধকের পক্ষে সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম ধরে চললে মানসোত্তরের প্রত্যেক ভূমিতে চেতনার যে-বৈশিষ্ট্য ফোটে, তার কথা আগেই বলা হয়েছে। চরম ভূমি হল অধিমানস। এইখানে এসে চিন্ময় রূপান্তর সিদ্ধ হয়। তারও পরে থাকে অতিমানস রূপান্তরের সাধনা। কিন্তু সে-সাধনা আর সাধক করে না, প্রত্যক্ষভাবে করেন তার দেবতা।

বোঝবার সুবিধার জন্য অধিমানস ভূমি পর্যন্ত সাধনার একটা ছক আমরা বেঁধে দিয়েছি। কিন্তু এইধরনের যুক্তিমাফিক ছক বেঁধে কাজ করা পরিণাম-শক্তির দস্তুর নয়। উত্তরশক্তিগুলিকে আমরা আলাদা-আলাদা সংজ্ঞায় চিহ্নিত করলেও বাস্তবিক তারা এক অখণ্ড মৌল শক্তিরই বিভূতি ; সুতরাং তাদের ক্রিয়া আলাদা-আলাদা হয় না, হয় পরস্পর মিলে-মিশে। উপনিষদে উপর হতে শক্তিপাতকে বিদ্যুতের বিদ্যোতনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উপমাটি খুব সুন্দর। আগেও বলেছি, অধ্যাত্মপ্রগতির গোড়ায় অনেক দূরের সিদ্ধিরও একটা ঝলক হঠাৎ সমস্ত চেতনাকে উদ্ভাসিত করে আবার মিলিয়ে যায়, এটা অধ্যাত্মরাজ্যের একটা আইন। অব্যক্ত এমনি করে ঝলকে-ঝলকে আধারে সুব্যক্ত হতে থাকে, তাই শক্তিপাতের লীলায়নে দেখা দেয় বিপুল বৈচিত্র্যের জটিলতা। সুতরাং ব্যক্তিপরিণামের ধারা একটা বাঁধা-ধরা ক্রম অনুসরণ করে চলে না।

এমনিতর জটিলতা আছে বলে সাধনার পথে কতকগুলি বাধারও সৃষ্টি হয়, সাধকের তাদের সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

বাধার মূল কারণ হল শক্তির ক্রিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য ও সামঞ্জস্যের অভাব। এর জন্য প্রাকৃতমনের সংস্কার অনেকপরিমাণে দায়ী। পশু সহজাত-সংস্কারের বশে চলে, সুতরাং স্বভাবের পূর্ণতায় পৌছতে তাকে বেগ পেতে হয় না। একটা কুকুরের ষোল-আনা কুকুর হয়ে ওঠা কঠিন নয়, কিন্তু একটা মানুষের ষোল-আনা মানুষ হওয়া যেন অসম্ভবের শামিল। মানুষের মধ্যে মন জেগেছে এবং তাইতে চেতনার স্বাতন্ত্র্যের অধিকারও অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। মনোধর্মের এইটুকু লাভ। কিন্তু এই মনোধর্ম আবার আধারের অন্যান্য সুব্যবস্থিত ধর্মের মধ্যে বিপর্যয় ঘটায়, এই হল বিপদ। পশু খেয়ে মরে না, কিন্তু মানুষ খেয়ে মরে—সে ওই মনোধর্মের দৌলতে ; কেননা মন খাওয়া হতে শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তিই চায় না, চায় আস্বাদনের বৈচিত্র্য। কিন্তু সম্যক্-দর্শনের অভাবে রসাস্বাদের সঙ্গে প্রাণধর্মের সে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে না। তাই পশুর চাইতে মানুষ রোগে ভোগে বেশী—তার মন আছে বলেই।

মনের এই অসম্যক্-দর্শিতার ঝামেলা অধ্যাত্মজীবনেও সাধককে পোয়াতে হয়। এক্ষেত্রে তিন রকমের ঝামেলা দেখা দিতে পারে—মনের দুরাগ্রহ-বশত উত্তরশক্তির অকালবোধন, উত্তরশক্তি ও অবরশক্তির সম্পর্কে একটা ব্যামিশ্রতা, আর রূপান্তরের বেলায় অবরশক্তির মন্থরতা পঙ্গুতা বা বিদ্রোহ।

প্রথম বিপদ ঘটায় মনের দুরাগ্রহ। অভীপ্সা তীব্র না হলে সিদ্ধি সহজ হয় না, একথা সত্য। কিন্তু এই তীব্রতা যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তার ফলে লাভ না হয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কথাটা স্ববিরুদ্ধ শোনালেও বলতে হয়, অধ্যাত্মসাধনায় 'প্রশান্ত ব্যাকুলতা'ই মুখ্য সাধন। সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি, ব্যাকুলতা প্রকৃতির ধর্ম, আর প্রশান্তি পুরুষের ধর্ম। প্রকৃতি-পুরুষের সামরস্যের ফলেই সাধনার পথ সুগম হতে পারে। অনেকসময় ব্যাকুলতা অজ্ঞতার একটা ছটফটানি মাত্র। সাধকের প্রবর্তদশায় এধরনের ছটফটানি আসা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু চিত্তের এই ক্ষিপ্ততাকে সংহত এবং একাগ্র না করলে চিৎশক্তির সত্য সামর্থ্য জাগে না; শক্তির অপচয়ে চেতনায় কেবল ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। ব্যাকুলতাকে রূপান্তরিত করতে হবে সঙ্কল্পে এবং বীর্যে, তবেই শক্তি সমর্থ (efficient) হবে। তাই সাধনার গোড়াতে চাই সম্যক্-দর্শনের ঔদার্য এবং অবিচল ধৈর্য। যে-রাজ্য জয় করতে হবে, তার পরিচয় আগে খুঁটিয়ে এবং স্পষ্ট করে জানা চাই। তার সম্বন্ধে একটা আবছা ধারণা নিয়ে শুধু মনের আবেগে আধারশক্তির উপর চাপ দিলে ঊর্ধ্বশক্তি নেমে আসতে পারে বটে। কিন্তু আধারে ধারণাশক্তির অভাবে তা নানা বিপর্যয় ঘটাতে পারে এবং ঘটায়ও—যার ফলে সাধকের মস্তিষ্কবিকার পর্যন্ত দেখা দেয়। আকাশজোড়া আলোর ছোঁয়ায় ফুল যেমন দল মেলে, বৃহতের ছোঁয়ায় জীবনও তেমনি সহজের ছন্দে দল মেলবে। অধ্যাত্মসাধকের অতন্দ্র এবং অকুণ্ঠ বীর্য থাকবে, কিন্তু হঠকারিতা মত্ততা বা উৎকেন্দ্রিকতা থাকবে না। অতর্কিতে শক্তির জোয়ার যদি নেমেও আসে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে আধারের সর্বত্র সুসমঞ্জসে ছড়িয়ে দিতে শিখতে হবে। এটি সুসাধ্য হতে পারে, সাধনার গোড়া থেকে যদি বৃহতের কাছে অনিঃশেষ আত্মসমর্পণে আমরা অভ্যস্ত হই। ক্ষুদ্র অহংএর প্ররোচনায় আমরা যা ঘটিয়ে তুলি, তা একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। আর তিনি তো ঘটিয়ে তোলেন না, ফুটিয়ে তোলেন। বৃহতের আবেশে শক্তি জাগে। কিন্তু সে তো শক্তির ঝড় নয়, শক্তির অধ্রুব্য বিকিরণ—গৌরপ্রভাসের মত।

আধারশক্তির শোধন ও প্রস্তুতির অভাবে আরেকটা বাধা দেখা দেয় ব্যামিশ্রতার আকারে। এও ওই অকালবোধনের পরিণাম। সাধকের আগ্রহে উত্তরশক্তি নেমে আসে, আধারের খানিকটা রূপান্তরও ঘটায়, কিন্তু সম্যক্-দর্শনের অভাবে সে-রূপান্তর সর্বাঙ্গীণ হয় না। সাধকের চেতনায়

তখন দেখা দেয় একটা দ্বৈধভাব। উত্তরশক্তির দখল কাঁচা থাকে বলে আধারের কাজ চলে খানিকটা নতুন ধারায়, খানিকটা প্রাচীনকালের মামুলী ধারায়, আর খানিকটা হয়তো দুটি ধারার মিশ্রণে। সাধক তাতে বিশেষ-কোনও অসুবিধা অনুভব করে না, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সাধনার লক্ষ্য থাকে প্রাকৃত জীবন হতে অপ্রাকৃত জীবনে ছিটকে পড়া। এটি যদি তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়, যখন খুশি তখন সে যদি ভাবের গভীরে নিজেকে তলিয়ে দিতে পারে, তাহলে আধারের নীচের পর্বগুলি প্রাকৃত জীবনের রীতি অনুসরণ করে চললেও তার কোনও ক্ষোভ হয় না। অধ্যাত্মজীবনের গোড়াতে ব্যবহারশুদ্ধির খানিকটা প্রয়োজন আছেই, কেননা সংযম ও চিত্তশুদ্ধি ছাড়া উপরের আলোকে ধারণা করা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু সংযমকে যদি আমরা শুধু চিত্তের ইহবিমুখ একাগ্রতাসিদ্ধির কাজে লাগাই, তাহলে আধারশক্তির আমূল রূপান্তর না ঘটিয়েও ঊর্ধ্বশক্তির সাক্ষাৎকার অসম্ভব হয় না। সাধক যতক্ষণ সব ভুলে আপনভাবে থাকে, ততক্ষণ বেশ থাকে; কিন্তু গোল বাধে যখন ব্যুত্থানদশায় দশের মধ্যে সে ফিরে আসে। অবশ্য সমাধির শক্তি ব্যুত্থানেও খানিকটা সঞ্চারিত হয়, সুতরাং সাধকের ব্যবহার তার প্রজ্ঞার অনুরূপ হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা হয় না। তাই সিদ্ধের ব্যবহারেও অনেকসময় প্রাকৃতজনোচিত বিকার দেখা দেয়, যাকে সাধরণত প্রারব্ধবাদ বা লীলাবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এইখানেই বলা যেতে পারে, মানুষের মুক্ত হওয়া যদি-বা সহজ, সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। মুক্তি হল পুরুষের এলাকায়, আর সিদ্ধি প্রকৃতির এলাকায়। পুরুষের স্বরূপাবস্থান যত সহজে হতে পারে, প্রকৃতির রূপান্তর তত সহজে হয় না—যদিও রূপান্তরের জন্য স্বরূপাবস্থান অপরিহার্য। তাই স্বরূপাবস্থানের পরও সাধকের করণীয় অনেক-কিছুই থাকতে পারে। স্বরূপাবস্থানকে জাগ্রতে সিদ্ধ করতে হবে—এই হল সাধকের একটা বিরাট দায়। তাঁকে শুধু ভাবের স্বপ্নলোকে বা শূন্যতার সুপ্তিলোকেই পেলে চলবে না, পেতে হবে বিচিত্র জীবনের জাগ্রত লোকেও। এই জাগ্রতের মধ্যে নেমে আসবে স্বপ্নের প্রভাস আর সুপ্তির নিথরতা। তবেই আধারের সম্যক রূপান্তর সিদ্ধ হবে। সাধক তখন হবে সহজ মানুষ, আলোর মানুষ। তার সমাধিতে আর ব্যুত্থানে তখন কোনও ভেদ থাকবে না। তার প্রজ্ঞাও যেমন হবে দিব্য, তেমনি কর্মও হবে দিব্য।

তৃতীয় দফা বাধা হল সাধকের বহিঃপ্রকৃতি এবং পরিবেশের বাধা।

বহিঃপ্রকৃতির বাধাটা চলে একেবারে রূপান্তরের শেষ পর্ব পর্যন্ত। সাধনার প্রেরণা ও শক্তি আসে অন্তঃপ্রকৃতি বা পরা প্রকৃতি হতে। কিন্তু সবসময় তাতে বহিঃপ্রকৃতির সায় থাকে না, থাকলেও অনেকসময় তার মধ্যে সঙ্কল্পের তেমন জোর থাকে না। অপরা প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এ-সমস্যার যে সমাধান করা যেতে পারে, সে আমরা জানি। কিন্তু সে তো পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়। অপরা প্রকৃতিকেও পরা প্রকৃতির অনুকূল করে নিতে হবে, ব্যাবহারিক জগতে সে যে স্বচ্ছন্দ সামর্থ্যের পরিচয় দেয়, সে-সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে উত্তরশক্তির বীর্য, যাতে এই মৃন্ময়ী প্রকৃতিই চিন্ময়ী হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে অপরা প্রকৃতিকে অধ্যাত্মপ্রগতির যত প্রতিকূল মনে হ'ক না কেন, আসলে তার স্বরূপশক্তির মধ্যে পরা প্রকৃতির অনুবর্তনের একটা আকূতি নিগূঢ় হয়ে আছে। সে বুঝতে পারে না বলেই বেঁকে দাঁড়ায়, বহিঃশক্তির বিচিত্র অভিঘাতের মধ্যে সৌষম্য আনতে পারে না বলেই এত ছটফট করে। নইলে সব প্রকৃতিই পুরুষের আত্মপ্রকৃতি, সুতরাং অভঙ্গ (integral) পৌরুষেয় চেতনার অনুবর্তন করা তাদের স্বভাব। পুরুষের মধ্যে আছে স্বরূপাবস্থানের ভূমিতে শুদ্ধ-সত্তার প্রশান্তি, সর্বগ্রাহী প্রকাশের দীপ্তি এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির অকুণ্ঠ বীর্য। এগুলি পুরুষের স্বরূপশক্তি, অতএব পরা প্রকৃতির স্বভাবধর্ম। অপরা প্রকৃতিতে এইগুলি ফোটে কুণ্ঠিত এবং বিকৃত হয়ে। প্রশান্তি সেখানে নেয় অসাড়তার রূপ, আর বীর্য পরিণত হয় প্রমত্ততায়—কেননা প্রকাশের দীপ্তি সেখানে সর্বগ্রাহী নয়। সাংখ্যের ভাষায়, অসাড়তা তমোবৃত্তি, তা আশ্রয় করে আমাদের শারীর সত্তাকে ; আর প্রমত্ততা রজোবৃত্তি, তা আশ্রয় করে প্রাণসংবেগকে। সাত্ত্বিক মন তার কুণ্ঠিত প্রকাশবৃত্তি নিয়ে 'প্রাণ-শরীর-নেতা' হতে চায়, কিন্তু পারে না। তাইতে সাধকের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতিতে বিরোধের সৃষ্টি হয়, এবং স্বভাবতই উদ্‌বুদ্ধ মন দেহের জড়তা আর প্রাণের চাঞ্চল্যকে সাধনপথের বাধা মনে ক'রে তাদের নিগৃহীত করবার চেষ্টাই করে। কিন্তু নিগ্রহের ফল কখনও ভাল হয় না। বস্তুত মন চেতনার উত্তরভূমির প্রতিবেশী বলে অধ্যাত্মশক্তি প্রথম মনে আবিষ্ট হয়, উপনিষদের ভাষায় সাধনার যজ্ঞে মনই হয় যজমান। মানসোত্তরের প্রসাদে মন যদি উজ্জ্বল হয়, তাহলে শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণাকে প্রাণ এবং দেহের মধ্যেও সে সঞ্চারিত করতে পারে। অপ্রবুদ্ধ প্রাণবাসনা স্বভাবত ইন্দ্রিয়নির্ভর, তা-ই তার

প্রমত্ততার কারণ। অথচ বস্তুর সম্ভোগ সবক্ষেত্রে ভাবের কিছু-না-কিছু উন্মেষ ঘটায়ই। মন যদি প্রাণের আকূতির মোড় ওই ভাবের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে, তাহলে প্রাণের রসাস্বাদেরও রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়। মাত্রা-স্পর্শ (limited contact) তখন পরিণত হয় ব্রহ্মসংস্পর্শে (vast contact), বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দে। প্রাণবাসনার এই রূপান্তরে নাড়ী-তন্ত্রের (nervous system) ক্রিয়া সূক্ষ্মতর এবং দীপ্ততর হয় বলে সাধকের শারীরসত্তাও প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল হয়। তার অসাড়তা তখন পরিণত হয় চিন্ময় প্রশান্তিতে। এইটিই যোগীর শৌচ এবং স্থিরসুখের সিদ্ধি—যাকে কায়সাধনার ভিত্তি বলতে পারি।

এমনি করে উত্তরশক্তির আবেশে দেহ এবং প্রাণকেও আমরা সাধনার অনুকূল করে নিতে পারি—নিগ্রহের দ্বারা নয় সংযমের দ্বারা, তাদের স্বভাবের চিন্ময় পরিবর্তনের দ্বারা। কিন্তু তারও পরে থাকে পরিবেশের বাধা, পরি-চেতনার (environmental consciousness) মধ্যে বহিঃশক্তির আস্রব (influx)। আমরা সবাই এক অখণ্ড বিশ্বশক্তির কুক্ষিগত, কেউ স্বতন্ত্র নই। তাই নিজের অজ্ঞাতসারেও বহিঃশক্তির শুভাশুভ প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত নই। নির্জনে থেকে বাইরের স্থূল অভিঘাতকে না হয় ঠেকালাম, কিন্তু সূক্ষ্ম অভিঘাতকে ঠেকাব কি করে? তবে কিনা সূক্ষ্ম অভিঘাতগুলিকে নিজের গভীরে না ঢুকলে ধরতে পারা যায় না। মনের দুটি অন্দরমহলের কথা আগেও বলেছি—অবচেতনা আর অচেতনা। তারা যে শুধু বহিশ্চেতনার সুপ্ত এবং লুপ্ত সংস্কারের গর্ভাশয় তা নয়, বহিঃ-শক্তির অনেক নিগূঢ় প্রবর্তনারও গ্রাহক। চেতনার এই পাতালপুরীতেও দ্যুলোকের আলো নামিয়ে আনতে হবে। খনির অন্ধকারে সৌরশক্তি ঘুমিয়ে আছে কয়লার বুকে; আগুনের ছোঁয়ায় তার তাপ আর আলোকে মুক্তি দিতে হবে। এইটি সবচাইতে কঠিন। অতিমানসের শক্তিসম্পাত ছাড়া এ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। যোগীর ঈশ্বর আশয়দ্বারা (matrix of inconscience) অপরামৃষ্ট—এইখানেই তাঁর অতিমানস শক্তির পরিচয়। এই ঈশ্বরের সাযুজ্য- এবং সাধর্ম্য-লাভ সাধনার পরম লক্ষ্য।

অতিমানসের তীব্রসংবেগে আশয়ের নিরুদ্ধ শক্তি যখন মুক্তি পাবে, তখন পরিচেতনার পরিমণ্ডল বিশ্বচেতনার ভাস্বরতায় প্রজ্বল হয়ে উঠবে। আশয়ের শিকড় নেমেছে শুধু তুলাবিদ্যার গভীরে নয়, মূলাবিদ্যারও গহনে। বৈশ্বানর

চিদগ্নিকে সেইখানে সমিদ্ধ করতে হবে। তা-ই পূর্ণযোগের চরম সিদ্ধি। এ শুধু অন্ধতমসার মধ্যে আত্মদীপকে জ্বালিয়ে রাখা নয়, অথবা বারুণী রাত্রির অব্যক্ত জ্যোতিতে দীপনির্বাণও নয়। এ হল অন্ধতমিস্রার ধাতুকে দ্যুলোকদ্যুতির ধাতুতে রূপান্তরিত করবার অবন্ধ্য সঙ্কল্পের এক সিদ্ধ প্রবর্তনা। সমস্ত আধারকে চিদ্‌বীর্যে বিদ্যুন্ময় করে জীবনসাধনায় তাকে স্ফুরিত করা, সমস্ত জগৎকে বুকে নিয়ে মহেশ্বরের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে জগৎপ্রকৃতির 'পরেও স্বরাট হওয়া—এই হল এই মহাসিদ্ধির উত্তর কোটি।

যুগযুগান্তরবাহিত দীর্ঘ পথ। পথের পর্বে-পর্বে অগণিত যাত্রীর মিছিল। একটির পর একটি 'জ্যোতির দুয়ার' পার হয়ে চলেছে তারা। সবই আলোয় আলোময়। তবুও অগম রহস্যের বুক হতে অজানা আলোর হাতছানির বিরাম নাই। কে পৌঁছবে এ-পথের শেষে?

যিনি পৌঁছবেন, তিনি হিরণ্ময় বিজ্ঞানঘন পুরুষ। এবার তাঁর কথা বলব।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞানঘন পুরুষ

আমরা জানি, অতিমানস সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপশক্তি। বিশ্বকে সে-ই ধরে আছে এবং প্রবর্তিতও করছে। আমরা মানুষ বা মনোময় জীব, মন হল আমাদের মুখ্য চিদ্‌বৃত্তি। মনের উৎকর্ষে আমাদের মধ্যে দেখা দেয় বুদ্ধি এবং বোধি। বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় সামান্যজ্ঞানের আশ্রয়, বোধির বৈশিষ্ট্য হল প্রাতিভসংবিৎ। চেতনার যে-ভূমিতে বুদ্ধি বিশুদ্ধ এবং বোধি সহজ, উপনিষদের ভাষায় তাকে বলতে পারি বিজ্ঞানভূমি। আমাদের মধ্যে এই বিজ্ঞান হল অতিমানসের মুখ্য বৃত্তি। যেমন সচ্চিদানন্দের অতিমানস, তেমনি প্রবুদ্ধ জীবচেতনার বিজ্ঞান। একটি উপর থেকে নীচে নেমে আসছে, আরেকটি নীচ থেকে উপরদিকে উঠে যাচ্ছে।

মনের ওপারে বিজ্ঞান। মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহুকে জানে পরোক্ষ-ভাবে। আর বিজ্ঞান সেই বহুর মূলে এককে জানে এবং সে-জানাতে বহুকেও জানে অপরোক্ষভাবে—ইন্দ্রিয়ের কোনও আশ্রয় না নিয়ে। মন জানে বাইরের ধাক্কায়, আর বিজ্ঞান জানে অন্তরের স্বতঃস্ফুরণে—তার জানা তাই 'হয়ে জানা'। প্রাকৃত চেতনা বাইরের উপর অনেকখানি নির্ভর করে বটে, কিন্তু তার মধ্যেও অতীন্দ্রিয় স্বতঃস্ফুরণের একটা বেগ আছে। চেতনা আয়নার মত শুধু যে বাইরের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করছে তা নয়, নিজস্ব ভাবনা দিয়ে তাকে অর্থযুক্তও করছে। স্বতঃস্ফুরণের এই হল প্রথম কাজ। ইন্দ্রিয়ের আহৃত জ্ঞানের মধ্যে যে একটি বিশেষ অর্থের বিধান করে, সে হল আমার 'আমি'। স্বভাবের গরজে আমাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত আমার জগৎকে আমি সৃষ্টি করে চলেছি। বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে এই ভিতরের আমি সম্পর্কে আমার চেতনা উজ্জ্বল হতে থাকে, আমি ক্রমে আত্মসচেতন হই। আত্মসচেতনতা স্বতঃস্ফুরণের আরেকটি বৃত্তি। আত্মসচেতনতার উৎকর্ষ-সাধন হল যোগ, তার চরম পরিণাম স্বারাজ্যসিদ্ধি—আমার বিশুদ্ধ আমিকে পুরাপুরি জানা পাওয়া এবং ব্যবহার করা। তখন বিশ্বব্যাপারকে আর

যন্ত্রাচার বলে অনুভব হয় না। দেখি, আমার মধ্যে যে স্বতঃস্ফুরণের অনিরুদ্ধ সংবেগ, তা বিশ্বেরও মূলে; এক বিশ্বোত্তর আদিত্যদ্যুতির স্বতঃস্ফুরণে বিশ্বের লীলাকমল সহজের ছন্দে দল মেলছে। উপনিষদের ঋষির ভাষায় বলতে পারি, সেই আদিত্যের একটি রশ্মি সন্তত হয়েছে আমার হৃদয়ে। তার ছোঁয়ায় আমারও হৃদয়কমল দল মেলছে। আমার জগৎ এই আত্মো-ন্মীলনের আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমিই আমার জগৎ। এ সেই 'জগত্যাং জগৎ'—এক শাশ্বত সত্তার স্বতঃস্ফুরণ, যেমন বিশ্বে তেমনি জীবে। বিশ্বের স্বতঃস্ফুরণের মূলে অতিমানসের সংবেগ, তেমনি আমার স্বতঃস্ফুরণের মূলে বিজ্ঞানের সংবেগ। বিশ্বলীলায় অতিমানসের যে-সাম্রাজ্যসিদ্ধি, তারই ছন্দের অনুবর্তনে আমার মধ্যে বিজ্ঞানের স্বারাজ্যসিদ্ধি।

অতিমানসকে মন দিয়ে জানা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায়। প্রাকৃতমনেও বিজ্ঞানের একটা আবছা প্রকাশ হয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধি দিয়ে অতি-মানসের স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা কল্পনা করা চলে। তাতে আর-কিছু না হ'ক, লোকোত্তরের একটা আভাস চেতনায় ফুটতে পারে। আভাসকে প্রভাসে রূপান্তরিত করা সাধনার লক্ষ্য। তার গোড়ার কথা হল অন্তরাবৃত্তি আর আত্মসচেতনতা। আভাসে যা ফুটেছে, তা বস্তু নয়—ভাব। ভাব আমার চেতনায়, বস্তুর সে অর্থ। ভাবের মধ্যেই চিত্ত নিবিষ্ট হলে দেখি, বস্তুত বস্তুর অর্থ আমিই। আমি তোমাকে জানতে গিয়ে পেতে গিয়ে আমাকেই জানছি এবং পাচ্ছি। এই একাত্মতা যখন সহজ হয়, তখন বিজ্ঞান ঘনীভূত হয়। বিজ্ঞানঘন পুরুষের চিদ্‌বৃত্তির আধার হল এই তাদাত্ম্যবোধ। কোনও-কিছুকে 'আমার' বলে জানা প্রাকৃত বোধের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা আনে। কিন্তু তবুও আমাতে-তোমাতে একটা ফাঁক থাকে। ফাঁক বোজে, যখন আমি তুমি হয়ে যাই। আমি তখন তুমি হয়ে তোমাকে জানি। তখন আমি ফাঁকা, তাইতে তুমি পূর্ণ। এই ফাঁকা হয়ে যাওয়াই বিজ্ঞানের বনিয়াদ। যোগের ভাষায় একে বলে সমাধি। তাদাত্ম্যবোধ সমাহিতচিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম।

এই তাদাত্ম্যবোধের তিনটি বৃত্তি আছে। উপনিষদ তাদের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে: একটি হল আত্মাতে সর্বভূতের বোধ, দ্বিতীয়টি সর্বভূতে আত্মার বোধ এবং তৃতীয়টি আত্মাই সর্বভূত এই বোধ। বলা বাহুল্য, তিনটিই জাগ্রৎসমাধির চিন্ময় বৃত্তি। আত্মচৈতন্যের নিরঙ্কুশ ব্যাপ্তি এবং আবেশ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে, তাকে সত্তার গভীর হতে বিচ্ছুরিত

করছে, এই হল তাদের ক্রিয়ার স্বরূপ। প্রাকৃতমন প্রশ্ন করবে, কি করে তা হয়? তার ওই এক জবাব: অন্তর্মুখ হয়ে, স্তব্ধ হয়ে, শূন্য হয়ে—অথচ সম্পূর্ণ জেগে থেকে।

এই চিদ্বৃত্তি দিয়ে যে-জানা, তা হল বস্তুস্বরূপকে আত্মস্বরূপে জানা। এটা প্রাকৃতমনের এলাকায় পড়ে না। তার জানা বস্তুকে বাইরে রেখে খণ্ড-খণ্ড করে জানা, তার বিচিত্র ধর্মের আবিষ্কার ও বিন্যাস দ্বারা নতুন-নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। এই জ্ঞান হল বৈজ্ঞানিকের—আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের তা মুখ্য সাধন। এতে উপকরণ স্তূপীকৃত হয়, ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যূনতার পূরণ হয়। বস্তুকে আমরা তখন ভোগ করি, কিন্তু ভালবাসি না। ভোগে আত্মাতে আর বস্তুতে ভেদ দূর হয় না; আমি তোমাকে পাই, কিন্তু আমার অন্তরে পাই না। অথচ সেই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতে এত আয়োজনের সৃষ্টি। আয়োজন ব্যর্থ হয়, অন্তরের শূন্যতা কিছুতেই পোরে না। যদি পূরত, বাইরের পাওয়া তাহলে সার্থক হত। সে-পাওয়া তখন হত আত্মার বিলাস, অন্তরে পাওয়ারই আনন্দময় বিচ্ছুরণ।

মানসে আর অতিমানসে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আর বিজ্ঞানে এই সম্পর্ক। অতিমানসেরই মানস, বিজ্ঞানেরই ইন্দ্রিয়জ্ঞান। মন আর ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানের যন্ত্র মাত্র—ব্যাবহারিক প্রয়োজনের যন্ত্র। এটি বুঝতে হলে প্রাকৃত চেতনার ধারাকে উল্টে দিতে হয়—বাঁচতে শিখতে হয় অন্তরের স্বতঃস্ফুরণের তাগিদে, বাইরের চাপে নয়। অন্তরে ঢুকতে গেলে বাইরকে হারাতে হবে, এ-আশঙ্কা মিথ্যা। যোগস্থ থেকেও কর্ম করা যায়, চোখ মেলেও ধ্যান হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর এমন সহজস্থিতি আসে, একথাও সত্য নয়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের জন্য যতখানি মেহনত দরকার, চিদ্বৃত্তির উন্মেষের জন্য তার বেশী মেহনত দরকার হয় না। অভ্যাস উভয়ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সাধনা শুরু করব কোথা থেকে—উপর থেকে, না নীচ থেকে। অবরোহক্রমে সাধনা হল পূর্ণযোগের পথ। আরোহক্রম তাতে বর্জিত হয় না, কিন্তু তার স্থান হয় গৌণ। কি করে সে সাধনা করতে হয়, আগের অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে।

আজপর্যন্ত মনোময় চেতনা আর শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে পৃথিবীতে। মনশ্চেতনার সাম্প্রতিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে জড়াশ্রয়ী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিকাশে। এ-বুদ্ধির একটা বিরোধ চলছে আজ বোধির সঙ্গে। বোধির অতীন্দ্রিয়

বিজ্ঞানও যে মানুষের একটা ইষ্টার্থ, একথা সে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু এ তার ছেলেমানুষি। ইন্দ্রিয়ের ইশারা অতীন্দ্রিয়ের দিকে, বস্তুর পিছনেই রয়েছে ভাব। সেই ভাবের আবিষ্করণে মানুষের জ্ঞান ও রসবোধের সার্থকতা। একটু তলিয়ে দেখলেই এ-তত্ত্বগুলি বোঝা যায়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যে-জীবনদর্শন রচনা করছে, তারও একটা প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর এখানে-সেখানে আত্মার সৌরদীপ্তি ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু মানুষের মনের রাজ্যে আজও অমানিশার রাজত্ব। মহাপ্রকৃতির প্রেরণাতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এই অমানিশার ঘোর ঘোচাবার ভার নিয়েছে। 'মানুষ শুধু অন্নের কাঙাল নয়', এই আপ্তবাক্য বোঝবার আগে তার সর্বজনীন অন্নাভাব দূর হওয়া দরকার। তাই প্রাকৃত জীবনকে নিরঙ্কুশ এবং সমৃদ্ধ করবার একটা তাগিদ এসেছে মহাপ্রকৃতির মধ্যে। বাইরের অভাব যখন আর থাকবে না, মানুষ স্বভাবত তখন ফিরবে অন্তরের দিকে। এবং ফিরবে সমষ্টিভাবে। বর্তমান যুগ সমষ্টিগত সাধনার যুগ, অদ্বৈতবুদ্ধিকে শুধু আধ্যাত্মিক তুঙ্গতায় সমাসীন না রেখে সমাজচেতনায় ও রাষ্ট্রচেতনায় সঞ্চারিত করবার যুগ। মনঃশক্তির সম্যক্ স্ফুরণে এটি সিদ্ধ হলেই মাটির বুকে এবার প্রতিষ্ঠিত হবে এক বিজ্ঞানঘন চেতনা এবং শক্তি। আমরা বর্তমানে একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছি। এখন অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানশক্তির প্রচোদনায় মনঃশক্তিতে এসেছে এক আলোড়ন। একটা মহান্ আদর্শকে মন আভাসে অনুভব করছে, কিন্তু তাকে রূপ দিতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক দ্বৈতবুদ্ধি এবং আধারের অবিশুদ্ধির বশে নানা ঝামেলার সৃষ্টি করছে। এটা হল আগুন জলবার আগে ধোঁয়ার সৃষ্টির মত। কিন্তু ধোঁয়া থাকবে না। ইন্ধন ক্রমে তেতে উঠছে, এইবার আলো ফুটবেই। পার্থিব সমষ্টিগত রূপান্তরের ফলে এক চিদ্‌বীর্যময় দেবজাতির ক্রমিক অভ্যুদয়—এই হল প্রকৃতিপরিণামের পরের ধাপ। মহাপ্রকৃতিতে চলছে তারই আয়োজন। এই পরিণামের যিনি পুরোধা, তিনিই বিজ্ঞানঘন পুরুষ। এবার তাঁর স্বরূপের আলোচনা করব।

পরমার্থতত্ত্বের চারটি বিভাব—সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তি। সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপশক্তি হল অতিমানস। অতিমানসশক্তিযুক্ত সৎ-চিৎ-আনন্দের ঘনবিগ্রহকে আমরা বলি পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম সর্বান্তর্যামী।

বিজ্ঞানঘন পুরুষ পুরুষোত্তমের প্রকট বিভূতি। তিনিও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ এবং অতিমানসশক্তিযুক্ত। তাঁর আত্মসংবিতে সৎ-চিৎ-আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব—তাঁর চেতনার চক্রে-চক্রে, প্রাণশক্তির প্রতি স্পন্দনে, দেহের প্রতিটি কোষে পুরুষোত্তমের দিব্য আবেশ।

আত্মানুভবের তিনটি প্রকার (mode) : নিজেকে অনুভব করা জীবরূপে, বিশ্বরূপে এবং বিশ্বাতীতরূপে ; অর্থাৎ নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা, সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়া, আবার সবাইকে ছাপিয়ে যাওয়া। অনুভবের এই তিনটি প্রকারই বিজ্ঞানঘন পুরুষের মধ্যে সহজ এবং স্বতঃসিদ্ধ। তিনি আপনাতে আপনি আছেন ; এইখানে তিনি উপনিষদের ভাষায় 'আত্মরতি', তিনি সিদ্ধ জীব। আবার তিনি আছেন বৈশ্বানর হয়ে সবার মধ্যে ; তখন তিনি 'আত্ম-ক্রীড়'—ঘটে-ঘটে রমমাণ হয়ে আপনাকেই অনুভব করছেন চিৎশক্তির বিচিত্র উল্লাসে। আবার তিনি প্রপঞ্চাতীত নিষ্কল শিবস্বরূপ। এমনি করে তাঁর মধ্যে ঘটে জীবশক্তি বিশ্বশক্তি এবং স্বরূপশক্তির সামরস্য। জীবরূপে তিনি জগতে থেকেও এবং জগতের হয়েও তার উর্ধ্বে নিত্য অধিরূঢ় রয়েছেন বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপচেতনায়। অর্থাৎ যুগপৎ তিনি 'অণোরণীয়ান্' এবং 'মহতো মহীয়ান্'—আবার পরম শূন্যতা।

বিজ্ঞানঘন পুরুষ মূর্ত, অর্থাৎ চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির তিনি ঘনবিগ্রহ। এই মূর্তত্বই তাঁর সত্তার 'রহস্যমুত্তমম্'। প্রাকৃত পুরুষও মূর্ত ; সুতরাং তার সঙ্গে প্রতিতুলনায় বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্বরূপ বোঝা হয়তো কতকটা সহজ হবে।

মূর্তত্বের একটা লক্ষণ হল সংহতত্ব অর্থাৎ মূর্তির মধ্যে শক্তি বা ভাব যেন জমাট বেঁধেছে বলে আমরা অনুভব করি। যা সংহত, প্রত্যক্ষের কাছে তা স্পষ্ট—কেননা তার অনুভবের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণতা আছে। অনুভবের তীক্ষ্ণতা আমাদের কাছে মূর্ত অস্তিত্বের মাপকাঠি। একটা-কিছু আছে বলে তখনই মানি, যখন তা আমার চেতনাকে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। আঘাতক বস্তুটি মূর্ত, কিন্তু তার মূর্তত্বের প্রমাণ আমার চেতনার তীব্রতায়। যদি আমার দিক থেকে দেখি, তাহলে বলতে পারি, অনুভবের তীব্রতাই আমার মূর্তত্ব।

আমার চেতনা বাইরের অভিঘাতে একটি কেন্দ্রে সংহত হচ্ছে। সেই কেন্দ্রে আমি মূর্ত। এই মূর্তত্বকে বলি আমার অহং।

অহংএর মূর্তত্বই আমার কাছে মুখ্য। আমার বাইরে একটা জগৎ আছে, আমার চেতনাকে সে আঘাত করে বলে সেও মূর্ত। কিন্তু তার মূর্তত্ব গৌণ,

কেননা আমার চেতনার সংস্পর্শে না এলে আমি তার অস্তিত্ব জানতে পারি না।

আমি যেমন আছি, তেমনি আমার বাইরে অসংখ্য জীবও আছে। আমার মত তাদেরও বাহ্যমূর্তির কেন্দ্রে একটি তীব্র সচেতন অহং আছে। কিন্তু আমার অহংএর সঙ্গে তাদের অহংএর যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। আমি তাদের বাইরের মূর্তিটাই চিনি, ভিতরের মূর্তিটাকে চিনি না।

অথচ চেনবার দরকার হয়, ইচ্ছাও হয়। অবশ্য একেবারে যে চিনি না, তা নয়। আমাকে দিয়েই তাদের চিনি, ধরে নিই তারা আমারই মতন। কিন্তু এমনতর চেনার মধ্যে অনেক ভুল অনেক গোঁজামিল থাকে, পদে-পদে তা ধরাও পড়ে। আমিই যে আমাকে সম্পূর্ণরূপে চিনি না; সুতরাং আমার তুলনায় অপরকেই-বা পুরাপুরি চিনব কি করে?

কিন্তু আমার অহংও তো স্থাণু নয়, সেও বাড়ছে। তার বৃদ্ধিতে অনুভবের যেমন প্রসার ঘটছে, তেমনি ঘটছে সংহতি। এটা হল বৃদ্ধির বাইরের দিক। ভিতরের দিকে ওই সংহতির অনুবৃত্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে নতুন-একটা বৃত্তি—আত্মসচেতনতা। আত্মসচেতনতা প্রথমটায় ফিকা থাকে, কিন্তু প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে তা সংহত ও বিষয়নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমার মূর্ত অহং রূপান্তরিত হয় মূর্ত আত্মাতে। আত্মসত্তার মূর্তত্বই যোগের লক্ষ্য।

বাইরে জগৎ, ভিতরে অহং, তারও গভীরে আত্মা। এই পরম্পরার মধ্যে চিন্ময় মূর্তত্বের একটা ক্রমিক উৎকর্ষ আছে। আত্মা অমূর্ত নয়, চিদ্‌ঘন—এই অনুভবে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাহলে অহংকে অনুভব হয় তার বিচ্ছুরণরূপে। বিচ্ছুরণে বৈচিত্র্য আছে, তা আত্মার বিভূতি। কিন্তু সমস্ত বিভূতি সংহত হয়ে আছে এক ঐশ্বর-যোগে। আত্মা সূর্যের মত, অহং তার রশ্মিজাল। প্রাকৃত অহংএ অনুভূতির যে-তীব্রতা বা চিৎশক্তির বিদ্যুদ্‌বিকাশ, তা ওই সৌরবিশ্বের দিকে প্রাকৃত চেতনার উৎক্রমণ। অজ্ঞানে আমরা তা বুঝতে পারি না, কিন্তু বিজ্ঞানে বোঝা যায়। প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে ঝলকে-ঝলকে চিদগ্নির শিখা লেলিহান হয়ে উঠছে—এই হল বিশ্বলীলার তাৎপর্য। বিজ্ঞানঘন পুরুষ এই লীলার বোদ্ধা ভর্তা এবং ভোক্তা—বিদেহী হয়ে নয়, দেহী হয়ে। এই তাঁর চিন্ময় মূর্তত্ব। তিনি যুগপৎ অমানব, অথচ 'মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ'—প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের তিনি পরম চমৎকার।

বিজ্ঞানঘন পুরুষ যখন আত্মকেন্দ্রে সমাহিত, তখন উপনিষদের একটি পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি, তিনি 'জীবঘন' ; অর্থাৎ জীবলীলার যত বৈচিত্র্য সমস্তই সংহত হয়েছে তাঁর মধ্যে এবং সে-লীলার চরম উৎকর্ষও তিনি। একদিকে বিশ্ব, আরেকদিকে বিশ্বোত্তর—দুয়ের মাঝে তিনি সেতু। বিশ্বজীব তাঁর কায়ব্যূহ, তাঁর চিদ্‌ঘন জীবস্বরূপের বিচিত্র বিভূতি ; আর বিশ্বোত্তর তাঁর অকায়স্বরূপ। বিশ্বোত্তরের প্রতি তাঁর যে-প্রীতি, তা-ই বিশ্বজীবে ছড়িয়ে পড়ে মৈত্রীভাবনার স্বত-উৎসারণে। তাঁর হয়েই তিনি সবার—এই হল তাঁর মধ্যে সম্বন্ধতত্ত্বের পরম চমৎকার। তিনি আপনাতে আপনি আছেন—এই তাঁর প্রাকৃত রূপ। এই রূপে তিনি বিশ্বের একজন। কিন্তু তাবলে তিনি বিশ্ব হতে বিযুক্ত নন। প্রদীপের শিখা যেমন নিজের মধ্যে সংহত থেকেই ছড়িয়ে পড়ে, তিনিও তেমনি আত্মবিচ্ছুরণের আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দেন সবার মধ্যে হৃদয়ের বেদনায়, ইন্দ্রিয়ের সংবেদনে—এমন-কি দৈহচেতনার নিবিড়তাতেও। অথচ এমনি করে বিশ্বভুবনকে আত্মচেতনায় জারিত করেও তিনি বিশ্বোত্তর, অতএব শূন্যস্বরূপ। তিনি একাধারে জীবঘন বিশ্বরূপ এবং অরূপ। তাঁর আনন্ত্যচেতনা যেমন ব্যক্তির বিগ্রহে ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিশ্বাত্মক চেতনার ভাস্বরতায়, আবার নিলীন হয়ে গেছে বিশ্বোত্তীর্ণের পরঃকৃষ্ণ শূন্যতায়। তাই বৈদিক ঋষির দর্শনের অনুসরণ করে তাঁকে বলতে পারি 'বৈশ্বানর' পুরুষ।

এই গেল বিজ্ঞানঘন পুরুষের অন্তশ্চেতনার বা স্বরূপের পরিচয়। কিন্তু এ-স্বরূপ নিঃশক্তিক নয়, স্বভাবতই চিদ্‌বৃত্তিতে তার বীর্যের স্ফুরণ হয়। এখন আমরা তার কথা বলব।

পরমার্থ-সৎ যেমন এক, তেমনি আবার বহুও। একের বহুতে ছড়িয়ে পড়া, আবার বহুর একে গুটিয়ে আসা—এই দুটি ছন্দে চলছে শক্তির লীলা। শক্তির প্রকাশ যেমন প্রজ্ঞায়, তেমনি সঙ্কল্পে। প্রজ্ঞা এবং সঙ্কল্প আত্ম-স্বরূপের দুটি মুখ্য চিদ্‌বৃত্তি। একটি অন্তরে সৌষম্যের প্রতিষ্ঠা করে, আরেকটি তাকে অভিব্যক্ত করে বাইরে। বহুর সঙ্গে একের সম্পর্ক হতে দুয়ের উদ্ভব।

বাইরের জগতের বিচিত্র অভিঘাত থেকে অন্তরে বিচিত্র প্রত্যয়ের আবির্ভাব হচ্ছে। চিত্তের বাসনা এবং সংস্কার অনুসারে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা একটা ছন্দ ও সংহতি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি। প্রাকৃত চেতনা ব্যাপক নয় বলে বিশ্বের সবটুকু সে দেখে না বা বোঝে না। তাই বাইরে থেকে যেসব

উপকরণ তার কাছে এসে হাজির হয়, তার মধ্যে বাছাই-ছাঁটাই করতে হয়। তাথেকে জাগে অনুকূল এবং প্রতিকূল বেদনা বা সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব অস্বাস্থ্যকর, তাহতে সৃষ্টি হয় পীড়ার। প্রাকৃত চেতনা খণ্ডিত এবং দ্বন্দ্বসঙ্কুল, অতএব পীড়িত। প্রজ্ঞা সেখানে আচ্ছন্ন।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের চেতনা অনন্তে সমাপন্ন এবং সর্বগ্রাহী। তাই তার মধ্যে অবিরোধে সব-কিছুর ঠাঁই হতে পারে। চেতনার ব্যাপ্তির সঙ্গে বিক্ষোভের একটা বিষমানুপাত আছে। চেতনা যত ছড়িয়ে পড়ে, ততই তার মধ্যে ক্ষোভের তীব্রতা কমে আসে—এটা আমরা প্রাকৃত অনুভব দিয়েও বুঝতে পারি। একার দুঃখ অসহন হয়, কিন্তু দশের জন্য দুঃখবরণে দুঃখকে ছাপিয়ে জাগে আত্মপ্রসাদ। এখানে দেখছি প্রাকৃত রীতির বিপর্যয়। সঙ্কীর্ণ চেতনা আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করে; তাইতে বেদনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরিব্যাপ্ত চেতনায় আঘাত তলিয়ে যায় সত্তার গভীরে। তাতেও আলোড়ন জাগে—কিন্তু সে-আলোড়ন সমুদ্রের বুকে বীচিভঙ্গের মত, তার মধ্যে অসহন উত্তালতা নাই। এইখানে প্রাকৃত দুঃখকে অপ্রাকৃত প্রসন্নতায় রূপান্তরিত করবার সঙ্কেত খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানঘন পুরুষের চেতনা আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ। বিশ্বপ্রকৃতির তরঙ্গ তাতে উঠে তাতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, সৃষ্টি করছে আনন্দের ছন্দ। এই তাঁর প্রজ্ঞার রূপ।

এই-যে প্রজ্ঞা এবং আনন্দ, এ শুধু শক্তির নিমেষ-রূপ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার উন্মেষ-রূপও। পরমার্থ-সতের গভীরে যে আপনাতে-আপনি-থাকবার আনন্দ, তার উচ্ছলন এই জগৎ। সে-জগতের একটা লক্ষ্য আছে—অন্তহীন প্রপঞ্চের উল্লাসে আবার ওই স্বরূপানন্দে ফিরে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, এ ফিরে-যাওয়া শুধু উপশম নয়—উল্লাস, একের মধ্যে শুধু তলিয়ে যাওয়া নয়—একের অন্তর্গূঢ় মহিমাকে অনন্ত বৈচিত্র্যে স্ফুরিত করা। প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তিতে চলছে এই স্ফুরণের তপস্যা। অন্তরে আলো, বাইরে আঁধার—এই হল সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্ত। সেই আলোই আঁধারকে তরলিত করে বাইরে ফুটছে—এই হল তার পরের পর্বে উদয়নের মহিমা। তা-ই প্রজ্ঞার সঙ্কল্প-রূপ, উপনিষদ্ যাকে বলেছেন ব্রহ্মের 'জ্ঞানময়ং তপঃ'।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের প্রজ্ঞার স্ফুরণ তাঁর সত্য সঙ্কল্পের সিদ্ধবীর্যে। প্রজ্ঞা আর সঙ্কল্পে সেখানে কোনও ভেদ নাই। তাঁর প্রজ্ঞা সৃষ্টিধর্মী। সবিতা শুধু প্রকাশ করে না, তাপও দেয়; সে-তাপে প্রাণের স্ফুরণ হয়, মাটির বুকে

ফুল ফোটে, জলে আলোর রংমশাল। তেমনি বিজ্ঞানঘন পুরুষেরও প্রজ্ঞায় আছে শুধু আত্মানুভবের আনন্দ নয়, সে-আনন্দকে আধারে-আধারে সংক্রামিত করবার বীর্যও। এই তাঁর প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য বা গুরুভাব। তিনি ধী-র প্রচোদক —সবিতার মত। ঊর্ধ্বে মহাশূন্য, অব্যক্তের রহস্যে নিথর; নিম্নে পৃথিবীর বুকে চলছে প্রাণের তপস্যা। বিজ্ঞানঘন পুরুষের সঙ্কল্প দুয়ের মাঝে সাবিত্রী দ্যুতির দীপনী। তাঁর প্রজ্ঞা স্ফুরিত হয় সঙ্কল্পে, তাঁর সঙ্কল্প রূপ নেয় সিদ্ধকর্মে। সে-কর্ম প্রকৃতির তাড়নায় নয়, আত্মস্বভাবের প্রেরণায়। বাইরে একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলবার ক্লিষ্ট প্রচেষ্টা তা নয়, তা অন্তরের শক্তিকে সহজের মুক্তচ্ছন্দে উৎসারিত করা। তাঁর কর্ম বিসৃষ্টি। যে-সঙ্কল্প বিশ্বের মূলে, তাঁর সঙ্কল্পে তারই অভিব্যক্তি। সে-সঙ্কল্পের একটিমাত্র ধারা—জড়ের গহন হতে চেতনার স্ফুরণ, লোকোত্তরের প্রচোদনায় বিশ্বকমলের চিন্ময় উন্মীলন। বিজ্ঞানঘন পুরুষের সঙ্কল্পেরও এই ধারা। আনন্ত্যের চিদ্‌ঘন দ্যুতি হয়ে সবার মধ্যে সব-কিছুর মধ্যে তিনি আলো ফুটিয়ে চলেছেন। তাঁর এই আত্ম-বিকিরণের তপস্যা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ। তা-ই তাঁর দিব্যকর্ম। তাঁর সামান্যতম ব্যাবহারিক কর্মের মূলেও ওই দিব্যভাবনার প্রেরণা।

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিজ্ঞানঘন পুরুষের ব্যবহারে ধর্মাধর্মের স্থান কোথায়? জবাবে বলা চলে, বিজ্ঞানঘন পুরুষ যখন শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁর কর্ম যখন চিদ্‌ঘন ব্যক্তিসত্ত্বের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি, তখন তার মধ্যে ধর্মাধর্মবোধের বা ভাল-মন্দের কোনও দ্বন্দ্ব কি সমস্যার কথা ওঠে না। দ্বন্দ্ব দেখা দেয় অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের মধ্যে, কেননা সেখানে চলছে সঙ্কীর্ণ অহংএর খেলা। অহংএ-অহংএ বিরোধ যেখানে, সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি। কল্যাণের আদর্শ তোমারও আছে, আমারও আছে—কিন্তু আমরা কেউ সমগ্র সত্যের সবটুকু দেখতে পাই না বলে আদর্শে-আদর্শে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাইতে যুগে-যুগে আদর্শ বদলায়ও। অবশ্য এরও মধ্যে প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের তাগিদে চেতনার প্রসার ঘটে বলে আমাদের আদর্শবোধও ক্রমে উজ্জ্বল হতে থাকে। কিন্তু তবু দ্বন্দ্ব একেবারে ঘোচে না। কাঠে আগুন ধরতে গিয়ে প্রথম ধোঁয়া এবং তারপর দেখা দেয় তাপ আর আলো। প্রাকৃত চেতনায় ধর্ম-বোধের অভিব্যক্তি হয় এমনি করে। সেখানে ধর্ম আত্মশক্তিরই বিচ্ছুরণ, কিন্তু আত্মদৃষ্টি স্বচ্ছ এবং উদার নয় বলে ধর্মে আয়াস এবং তার ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সবিতার তেজ স্বত-উৎসারিত; তার মধ্যে

আত্মবিচ্ছুরণের কৃচ্ছ্রতা বা আচ্ছন্নতা নাই। সে-তেজও মেঘ সৃষ্টি করে, জড়ের গহনে নিজেকে সঙ্কুচিত করে। কিন্তু তবু সে আত্মস্বরূপে প্রভাস্বর, আপন সৃষ্টির 'পরে তার ঈশনা অকুণ্ঠ। পৃথিবীতে দিন-রাত ঘটে পর্যায়ক্রমে, সেখানে আলো-আঁধারের একটা দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু সূর্যে কেবল আলো এবং পৃথিবীর আঁধার সে-আলোর একটা তির্যক্ ভঙ্গি।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের চেতনাতেও এই সাবিত্রী দীপ্তি। সুতরাং আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে নাই। অথচ প্রাকৃত চেতনায় আঁধার আছে। সে-আঁধার বিজ্ঞানঘন পুরুষের বিশ্বচেতনার কুক্ষিগত। তিনি তেজস্বী, অতএব তিমিরান্তক ; আঁধারের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক। এই তাঁর সুদক্ষিণ রুদ্ররূপ। আমরা তাকে বলতে পারি, আমাদের অনিষ্ট-দর্শনের দিব্য রূপান্তর। প্রাচীনেরা তা-ই বলতেন। যিনি শিব, তিনিই রুদ্র। রুদ্র তো অশিব নন। আমাদের অবিদ্যাক্লিষ্ট চেতনাতেই তিনি 'ঘোর', স্বরূপত তিনি অঘোর।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের সমস্ত কর্ম এই শৈবী চেতনার উৎসারণ। বাইরে তার যে-রূপই থাক না কেন, বস্তুত তার একমাত্র লক্ষ্য অঙ্গারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। সুতরাং বাইরে থেকে প্রাকৃত চেতনার সীমিত আদর্শবোধ দিয়ে তাকে বিচার করলে চলে না। মহাজনেরা তাই বলেন, 'তাঁর ক্রিয়া-মুদ্রা যত বিজ্ঞে না বুঝয়।' এদেশের বৈদান্তিকও বলেছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যের পথে যিনি বিচরণ করছেন, তাঁর কোথায় বিধি কোথায় নিষেধ ? তাঁর পাপ-পুণ্য কিছুই নাই।' কথাটা শুনতে সাংঘাতিক, কিন্তু তবুও সত্য। বিজ্ঞানঘন পুরুষের পাপ-পুণ্যের দায় নাই ; অথচ তিনি অশিবনাশন, শিবস্বরূপ। লৌকিক পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা মনঃকল্পিত। মন কোন কর্মকেই বিশ্বসত্যের পটভূমিকায় রেখে দেখে না। তবু যখন তার দৃষ্টির প্রসার ঘটে, তখনই পাপ-পুণ্যের মানের বদল হয়। নরহত্যা পাপ—কিন্তু রাজা যখন নরঘাতককে প্রাণদণ্ড দেন, তখন লোকে তাকে পাপ বলে না। কেননা সেখানে বিচার হয় ব্যষ্টির স্বার্থের দিক থেকে নয়, সমষ্টির কল্যাণের দিক থেকে। বৈদিক ঋষি তাই পাপের সংজ্ঞা দিলেন, 'অশনায়া বৈ পাপ্মা'—খাই-খাই করাটাই পাপ ; অথবা বললেন, দ্বৈতবোধই পাপ, যেখানে বৃহৎ প্রাণের বিশুদ্ধ প্রকাশ সেখানে পাপ নাই। অর্থাৎ পাপের উৎপত্তি অবিদ্যাক্লিষ্ট অহং হতে। বিজ্ঞানঘন চেতনা অহং-নির্মুক্ত বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ, সুতরাং তা 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্'। বিজ্ঞানঘন পুরুষে দুষ্কৃত নাই, অথচ তিনি দুষ্কৃতের বিনাশক।

তাঁর এই অশিবনাশন রুদ্র রূপকে আমরা বুঝতে পারি না। মন্দবুদ্ধি ব'লে ঈশ্বরে যেমন বৈষম্য আর নিষ্ঠুরতার আরোপ করি, তেমনি করি তাঁর বেলাতেও। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পক্ষে তা স্বাভাবিক। বস্তুত বিশ্বরূপদর্শনের আগে কুরুক্ষেত্রের তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় না, কার্পণ্যোপহতস্বভাব ধর্মসম্মূঢ়চেতার চিত্তে পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা ঘুলিয়ে যায়।

এইখানে আরেকটা প্রশ্ন উঠতে পারে: বিজ্ঞানঘন পুরুষের চেতনা যদি বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ হয়, তার মধ্যে কি ব্যক্তিসত্তার কোনও প্রকাশ হয় না? কেউ-কেউ বলেন, হয় না। অহন্তার নির্বাণে তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রলয় ঘটে। নুনের পুতুল সমুদ্রে নামলে নোনাজলের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। সত্যদর্শনের পর দেহপাত হওয়াই স্বাভাবিক। তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, মুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে ফিরে আসেন শুধু অবিদ্যা-শাসিত প্রারব্ধের জের টানবার জন্য। বস্তুত তাঁর আত্মসত্তাই আছে, ব্যক্তি-সত্তা নাই, তাঁর লোকব্যবহার মায়িক।...এ-মতের সমালোচনা আমরা অন্য-প্রসঙ্গে আগেই করেছি। বলেছি, এ-শুধু সত্যদর্শনের আধখানা মাত্র। 'ব্রহ্ম সত্যং, জগন্ মিথ্যা'—উত্তারপথের এই-যে মহাবাক্য, এ শুধু তার বিবৃতি। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অনুভবের এই উত্তরার্ধও আছে। এটুকু না জানলে ব্রহ্মজ্ঞান অখণ্ড হয় না, পরম উপলব্ধির মধ্যেও অবিদ্যামনের দ্বৈত-সংস্কার লুকিয়ে থাকে। নেতিবাদ শুধু গুণাতীতকে মানে এবং তার প্রতিযোগিরূপে মানে ব্যামিশ্র গুণক্রিয়াকে। কিন্তু গুণাতীততা আর গুণ-বিক্ষোভের মাঝে আছে শুদ্ধসত্ত্বের বা অতিমানসের ভূমি। সেখানে রজস্তমের মালিন্য তিরোহিত হয়ে প্রশান্ত বীর্যে তাদের রূপান্তর ঘটে। বিজ্ঞানঘন পুরুষের প্রকৃতি এই শুদ্ধসত্ত্বের বিভূতি। তিনি গুণাতীত, অথচ শুদ্ধসত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্‌ঘন-বিগ্রহের সৃষ্টি করে, যার কথা আগেই বলেছি। সুতরাং বিজ্ঞানঘন পুরুষ বিশ্বাত্মক এবং নৈর্ব্যক্তিক হয়েও তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব আত্মপ্রকৃতি হতে গড়ে তোলেন ব্যক্তিসত্ত্বের একটা বিভূতি। অবতারেরও এই রহস্য—অব্যয়াত্মা ভূতমহেশ্বর হয়েই স্বীয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আত্মমায়ার দ্বারা সম্ভূত হওয়া।

বিজ্ঞানঘন-বিগ্রহ অতিমানব এমনিতর চিন্ময় পুরুষ বটে, কিন্তু তবুও তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের একটা নির্দিষ্ট ছক কল্পনা করা যায় না। একটা আড়ষ্ট কাঠামোতে আটকা পড়ে অবিদ্যাচ্ছন্ন অহংচেতনা। কিন্তু যাঁর অহং শুদ্ধ অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক হয়ে তবে জীবভূত, তাঁর ব্যক্তিত্বে থাকে একটা

অবন্ধন সাবলীলতা। তিনি সব হয়ে আবার সবাইকে নিজের সত্তার গভীরে আকর্ষণ করছেন এবং এক মহারাসচক্রে দিব্য আত্মবিভূতিরূপে তাদের আস্বাদন করছেন। সুতরাং একদিকে তিনি যেমন সমস্ত ব্যক্তিত্বের সমাহার, তেমনি আরেকদিকে দেশকালপরিচ্ছিন্ন লীলামানুষবিগ্রহ বলে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা অনন্যতাও আছে। কিন্তু সে-অনন্যতা প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের মত ব্যাবর্তক (exclusive) নয়। এককথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব সমুদ্রবৎ—সমুদ্রের তরঙ্গ নয় শুধু। অমূর্ত দিব্য-পুরুষের তিনি স্বপ্রকাশ মূর্ত-বিগ্রহ।

ব্যক্তিত্ব বস্তুত কতগুলি চিদ্‌বৃত্তির একটা সংহতি। দেহ প্রাণ এবং মনের আশ্রয়ে তাদের প্রকাশ। প্রাকৃত ভূমিতে দেহ-প্রাণ-মনের স্বভাব ও সামর্থ্য কুণ্ঠিত থাকে, যদিও স্বচ্ছন্দে নিজেদের ফুটিয়ে তোলবার একটা গভীর আকূতিকেও তারা বহন করে চলে। এই আকূতি তারা সার্থক করতে চায় বাইরের উপকরণকে আত্মসাৎ করে। তাই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় ভোগের তৃষ্ণা। তাতে দেহ-প্রাণ-মনের স্থূল তর্পণই হয়, কিন্তু আকূতির পরিপূর্ণ সার্থকতা ঘটে না। দেহ-প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বে রয়েছে বিজ্ঞান। ভোগ যদি বিজ্ঞান দ্বারা জারিত হয়, তাহলে স্থূলত্ব ঘুচে গিয়ে তার চিন্ময় রূপান্তর ঘটতে পারে। উপনিষদের ঋষি একে বলেছেন অঙ্গ প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মনের আপ্যায়ন বা ধাতুপ্রসাদ (luminosity of substance)। বিজ্ঞানঘন পুরুষের শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের সহজ বিভূতি হল এই ধাতুপ্রসাদ। তাতে দেহ-প্রাণ-মনের স্বভাব ও সামর্থ্যের নিগ্রহ কি উচ্ছেদ ঘটে না, ঘটে তাদের অন্তর্গূঢ় আকূতির সার্থকতা।

প্রাকৃতমন সব-কিছু জানতে চায়, কিন্তু পুরাপুরি জানতে পারে না। অজানার গভীরে চলে তার জানার কৃচ্ছ্রসাধ্য অভিযান। কিন্তু বিজ্ঞানঘন পুরুষের মন জানে বাইরের অজানাকে আবিষ্কার করে নয়, অন্তরের জানাকেই প্রকট করে। এইটি জানার অবরোহধারা। যোগীর সমাধিজ প্রত্যয়েরও আবির্ভাব হয় এই রীতিতে। অখণ্ড হতে খণ্ডের দিকে নেমে আসা, সত্যের বিভূতিরূপে তথ্যকে জানা—এই হল বোধির কাজ, বিজ্ঞানঘন পুরুষের মনোবৃত্তিতে যার সহজ স্ফুরণ। আবার বোধির দ্বারা সত্যের অনুভবই নয়, অনুভূত সত্যকে ব্যবহারের জগতে মূর্ত করবার দিব্যপ্রতিভাও জাগে তাঁর মধ্যে। বোধির অসঙ্কুচিত উন্মেষে তখন তাঁর মন হয় সত্যকার জীবনশিল্পী।

এমনি করে বিজ্ঞানের জারণায় ঘটে প্রাণেরও রূপান্তর। প্রাণ চায় ভোগ আর ঐশ্বর্য অর্থাৎ বেদনা (feeling) আর সঙ্কল্পের (will) নিরঙ্কুশ তর্পণ। তার জন্যে তার যত বুভুক্ষা বিত্তৈষণা আর উপকরণ-সঞ্চয়ের দুরাগ্রহ। বহির্মুখ প্রাকৃত চিত্তে এই দুরাগ্রহের পরিতৃপ্তি কখনই হয় না, হলেও তা স্থায়ী হয় না। প্রাণবাসনা চৈতন্যের ধর্ম এবং তার সার্থকতা ঘটতে পারে একমাত্র চৈতন্যের উন্মেষে। বাসনার বস্তুকে বাইরে নয়, অন্তরে পেতে হবে, পেতে হবে ভাবরূপে। ভাব যেখানে গভীর, বস্তুর আস্বাদনও সেখানে নিবিড় হয়ে ওঠে—এটা আমরা প্রাকৃত অনুভব হতে বুঝতে পারি। বিজ্ঞানঘন পুরুষের আন্তরবৃত্তির ধারা আরোহী নয়, অবরোহী—একথা বহুবার বলেছি। তাঁর ভোগ আর ঐশ্বর্যের বেলাতেও তা-ই। আনন্দ আর বীর্য তাঁর স্বভাবের ধর্ম—তারা তাঁর বেলায় বস্তুনির্ভর নয়। তিনি স্বত-উৎসারিত দিব্যসম্ভোগ আর দিব্যসঙ্কল্পের মূর্ত বিগ্রহ। সবিতার মত তাঁর আলো আনন্দ আর শক্তি সত্তার গভীর উৎস হতে ভুবনের আকারে বিকীর্ণ হয়। যে-পরমপুরুষের বিসৃষ্টি এই জগৎ, যাঁর প্রজ্ঞা আনন্দ ও কামনার স্ফুরত্তা এই বিশ্বভুবনে, বিজ্ঞানঘন পুরুষ তাঁরই সমধর্মা। তাই তাঁকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে ঘটে মহাপ্রাণ মহাপ্রকৃতির উদ্‌বোধন ও সম্প্রসারণ, তাঁর সকল সৃষ্টি হয় শাশ্বত শক্তি দীপ্তি শ্রী ও তত্ত্বভাবের (reality) সার্থক রূপায়ণ। এমনি করে তাঁর প্রাণের তর্পণ হয় অবন্ধ্য দিব্যসঙ্কল্পের উল্লাসে।

অতিমানস চেতনার এই সিদ্ধি বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্থূল দেহেও সংক্রামিত হয়। তখন তাঁর দেহাত্মবোধ হয় এক লোকোত্তর সিদ্ধচেতনার বাহন। পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে দেহ জড়; কিন্তু প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিতে দেহ প্রাণময় বোধ। প্রাকৃত ভূমিতেও দেখি, চেতনা ঘনীভূত হয় দেহে, দেহাশ্রিত বোধই আমাদের মধ্যে সবচাইতে তীব্র। প্রাকৃত চেতনায় এই তীব্রতা সঙ্কীর্ণ এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর ; তাছাড়া দেহ জীবে-জীবে ব্যবধানেরও একটা হেতু। তাই অধ্যাত্মসাধনার প্রথম প্রয়াস হয় দেহবোধকে ছাপিয়ে ওঠা, 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ে' চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এইথেকে দেহের প্রতি একটা জুগুপ্সার (recoil) ভাবই সাধারণত সাধকদের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুত দেহ তো উপেক্ষণীয় নয়। বিদেহভাবনার সিদ্ধির দ্বারা আমরা যদি তার সঙ্কোচ ঘোচাতে পারি, তাহলে সেই ব্যাপ্ত চেতনার ভাবনাকে ঘনীভূত করে আবার দেহেও তো সংক্রামিত করা চলে। বিজ্ঞানঘন

পুরুষের বেলায় এইটি ঘটে। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় দেহাত্মভাবনার একটা চিন্ময় ভঙ্গি—তাঁর দেহ জড় নয়, চিদ্‌ঘন। জড়প্রকৃতিকে নিরাকৃত না করে তাকে স্বচ্ছন্দে এবং নিঃশেষে অঙ্গীকার করবার সামর্থ্য থেকে তাঁর মধ্যে এক অভিনব কায়সম্পদের (physical perfection) আবির্ভাব হয়। জড়কে চিন্ময় করা অর্থাৎ তার অসাড়তা ঘুচিয়ে চিদৈশ্বর্যের বাহন করা —প্রকৃতির এই তপস্যাই তো চলছে জগৎ জুড়ে। জীবের দেহে প্রাণ আর চেতনার উন্মেষ তার নিদর্শন। উন্মেষ এখনও পূর্ণসিদ্ধ হয়নি, অথচ তার একটা আকৃতি এই দেহকে আশ্রয় করেই চলছে। তাতে দেহকে প্রথমে বাধা বলে মনে হতে পারে—যেমন ভিজা কাঠ আগুন জলবার পক্ষে প্রথম একটা বাধা। কিন্তু কাঠে আগুন আছেই। সে যখন জলে ওঠে, তখন কাঠ আর কাঠ থাকে না—বাইরে-ভিতরে সে আগুন হয়ে যায়। তখন তার জড়ত্বের অর্থ আগুনের জমাট বাঁধা। দেহের সঙ্গে চেতনারও এই সম্পর্ক এবং বিজ্ঞানঘন পুরুষের দেহও এমনি করে চিদ্‌ঘন বিগ্রহ হয়ে ওঠে। তাঁর মূর্তত্ব যে স্বরূপের পরম এবং গুহ্যতম রহস্য, একথার ইঙ্গিত আগেও করেছি।

এই চিদ্‌ঘন বিগ্রহ হতে জড়জগতের সঙ্গে তাঁর একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রাকৃত ভূমিতে দেহাশ্রিত জীবচেতনা পরস্পরের কাছে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু চিদ্‌ঘন বিগ্রহে এই আড়াল ঘুচে যায়। বিজ্ঞানঘন পুরুষ বস্তুত বিশ্ববিগ্রহ। যেমন সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সবিতা, সমস্ত মণ্ডলটি তার জ্যোতিঃশক্তিতে উদ্ভাসিত বিসৃষ্ট এবং সঞ্জীবিত, বিজ্ঞানঘন পুরুষের বিগ্রহও তেমনি সমগ্র পার্থিবচেতনার একটা শক্তিকূট। তিনি জীবঘন, নিখিল জীব তাঁর কোষস্থানীয়। বিশ্বে ব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের তিনি হৃদয় বা মূর্ধা; তাঁর চিদ্‌ঘন বিগ্রহের কেন্দ্র হতে বিশ্বের নাড়ীতে-নাড়ীতে চলছে চিৎশক্তির সংক্রমণ। আমাদের হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে যেমন বিচিত্র ভাব গুটিয়ে আসে আবার ছড়িয়ে পড়ে, বিশ্বভূতের সমস্ত চিৎস্পন্দও তেমনি বিজ্ঞানঘন পুরুষের বিগ্রহে সংহত এবং তাহতে বিকীর্ণ হয়। এই তাঁর কায়সিদ্ধির চরম চমৎকার।

এই গেল বিজ্ঞানঘন পুরুষের আত্মসমাহিত বিন্দুচেতনার পরিচয়। কিন্তু তিনি যেমন বিন্দু, তেমনি আবার সিন্ধুও। যেমন তিনি আছেন বিগ্রহে, তেমনি আছেন বিশ্বে। লোকলোকান্তরের সঙ্গে অধিচেতনার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে, তার সম্যক অনুভব তাঁর চেতনাকে করবে জড়োত্তীর্ণ। বিগ্রহে

থেকেই তাঁর শক্তি সৌরচ্ছটার মত জগতে কাজ করবে চিন্ময় ভাবনার নিগূঢ় বীর্য নিয়ে। সমগ্র বিশ্বের অখণ্ড নিগূঢ় প্রজ্ঞান তাঁর সে-ভাবনার উৎস। তা এক ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার সংবেগে বিশ্বের জড়লোক প্রাণলোক ও মনোলোকের পূর্ণবীর্যকে উন্মোচিত এবং নিয়োজিত করবে এই জড়বিশ্বের চিন্ময় অভ্যুদয়ের সাধনায়। এই তাঁর সাবিত্রী শক্তির অবন্ধ্য প্রচোদনার নিত্যরূপ।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্বরূপ জীবন ও কর্মের মোটামুটি একটা পরিচয় আমরা পেলাম। এতক্ষণ আমরা ব্যক্তির কথা বলেছি, এইবার সমূহের কথায় আসা যাক। ব্যক্তি আর সমূহ পরস্পর সম্বদ্ধ। প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণাম প্রথমত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে ঘটে, তারপর তার বেগ সঞ্চারিত হয় সমূহের মধ্যে। ব্যক্তিই সমূহের পথিকৃৎ। তিনি যুগপুরুষ, ভাবী যুগের প্রোজ্জ্বল সম্ভাবনার অপরোক্ষ অনুভব নিয়ে তিনি সমূহের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং তার অগ্নি-বীর্যকে সঞ্চারিত করেন তাদের আধারে। একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, সর্বত্র প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের ছক একটা পিরামিডের মত—ভিত্তির বিস্তার ক্রমে চূড়ার দিকে সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। জড়ের বিপুল আয়তনের সামান্য অংশই হয় প্রাণের আধার, প্রাণিজগতের সামান্য অংশে ফোটে মনস্বিতা, মনস্বিতার অতিসামান্য ভাগ রূপান্তরিত হয় অধ্যাত্মসিদ্ধিতে। বিজ্ঞানঘন পুরুষকে তাই কল্পনা করতে পারি পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে। তিনি একক, কিন্তু তবুও একা নন। তাঁর অমিত শক্তির যোগে সবার সঙ্গে তিনি যুক্ত, সবার তিনি প্রশাস্তা। এক্ষেত্রে সংখ্যা ও পরিমাণের ন্যূনতার পূরণ হয় গুণের উৎকর্ষে। আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ স্তূপাকার ইন্ধনকে আগুন করে তুলতে পারে—এইখানে পরিমাণের (quantity) উপর গুণের (quality) জিত। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে অপ্রবুদ্ধ সমূহের সম্পর্কও নিরূপিত হয় এই রীতিতে।

সমূহের দুটি রূপ—একটি সংঘ, আরেকটি জাতি। প্রাকৃত জগতে যেমন আছে পরিবার এবং সমাজ। বিজ্ঞানঘন সংঘকে বলতে পারি একটি দিব্য পরিবার। পিরামিডের চূড়া হতে শক্তির ধারা নীচের দিকে নেমে আসছে, চূড়ার কাছাকাছিই তার বেগ বেশী। যতই সে নীচের দিকে নামছে,

ততই তার বেগ মন্দা হয়ে আসছে। শক্তিসংক্রমণ সর্বত্র এই রীতিতেই হয়। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্বকে যারা ঘিরে থাকে, তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গের দুটা থাক স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। অন্তরঙ্গের কাছে যা প্রভাস, বহিরঙ্গের কাছে তা আভাস। অন্তরঙ্গে-বহিরঙ্গে কোনও ভেদ থাকবে না, সব প্রভাস্বর হয়ে উঠবে—এটা ঘটতে দেরি হয়। ভিজা কাঠেও যদি আগুন ধরাতে হয়, তাহলে প্রথমটায় শুরু করতে হয় সহজদাহ্য ইন্ধনে আগুন ধরিয়ে ক্রমে-ক্রমে তার জোর বাড়িয়ে। অধ্যাত্মজগতে এই ব্যাপার দেখা দেয় চক্র মণ্ডলী বা সংঘের সৃষ্টিতে। প্রাচীনেরা বলতেন: বিদ্যাকে কুলবধূর মত গুপ্ত রাখবে, পুত্র বা শিষ্য ছাড়া কাউকে বিদ্যা দেবে না, যে শ্রদ্ধাবান্ তপস্বী এবং অনসূয় নয় তাকে মর্মের কথা বলবে না। এই সতর্কতা অকারণ নয়। যে-সত্য সর্বজনীন, তারও গ্রাহক এবং ধারক মুষ্টিমেয়। পৃথিবীর এখন যে-অবস্থা, তাতে যে-ভাব মনোগোচর তাকে অবাধে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া কিছু কঠিন কাজ নয়। তা-ই কি সবাই গ্রহণ করতে পারে? যা ইন্দ্রিয়ারাম, তার গ্রাহক সবাই হতে পারে। যা মননসাধ্য, তার গ্রাহক তার চাইতে কম। যা বিজ্ঞানগম্য, তার গ্রাহক 'কোটিকে গোটিক'। অথচ এই বিজ্ঞানসিদ্ধি হল প্রকৃতিপরিণামের পরের ধাপ। তাকে রূপ দেওয়ার কাজ আগে শুরু হবে ব্যক্তিতে, তারপর সংঘে। শক্তিকে সার্থক করতে হলে সমধর্মীর সংঘে তাকে সংহত করতেই হবে। সংঘ একটা শক্তিকূট, সুতরাং তার চারদিকে একটা গণ্ডি থাকবেই। কিন্তু গণ্ডি রচার অর্থ বাইরের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করা নয়। আপাতত বাইরের প্রতিকূল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শক্তিকে তেজস্বী করা তার উদ্দেশ্য। প্রদীপের শিখায় আলো আর তাপ সংহত হয় ছড়িয়ে পড়বার জন্যই। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির দায় প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সংঘ গড়া, সেই সংঘের দায় প্রবুদ্ধ সমাজ বা জাতি গড়া।

বিজ্ঞানঘন সংঘের স্বরূপ কি হবে, বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্বরূপকথা হতে তা অনুমান করা যেতে পারে। সংঘের কেন্দ্রে আছেন সংঘ-পুরুষ, তিনি সিদ্ধধর্মের ঘনবিগ্রহ। সংঘের ব্যক্তিরা তাঁর কায়ব্যূহ। তাঁদের সত্তায় ও কর্মে প্রকাশ পাবে একটা চিদ্‌ঘন ব্যূহের নিটোল পূর্ণতা, যন্ত্রচালিত একটা যৌথবৃত্তি নয় শুধু। দেহের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যেমন দেহীর চেতনা আনন্দ এবং শক্তি অবাধে ও সমভাবে সঞ্চারিত হয়ে একটা একঘনত্ব (organic unity) গড়ে তোলে, এও হবে তেমনি। সংঘের ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে

বৈচিত্র্যের অফুরন্ত ঐশ্বর্য থাকবে, কিন্তু তাবলে বিরোধ থাকবে না। বৈচিত্র্য সেখানে হবে একত্বেরই সুষম বিভূতি। একই কেন্দ্র হতে সেখানে সবার বিসৃষ্টি, তাই অন্তরে সবাই এক—কিন্তু অভিব্যক্তিতে তারা বিচিত্র। অতি-মানস একত্ব আর অধিমানস বৈচিত্র্য—এই হবে সংঘচেতনার অন্তরঙ্গ পরিচয়। আর তার বহিরঙ্গ বৃত্তিতে থাকবে বোধি-মানস প্রভাস-মানস আর উত্তর-মানসের লীলায়ন।

ধর্মকায় সম্যক্‌সম্বুদ্ধ বিজ্ঞানঘন পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত এই সংঘ হবে যেন সাবিত্রী দ্যুতির একটা পরিমণ্ডল। আর তার জ্যোতিঃশক্তি ছড়িয়ে পড়বে পার্থিব জীবনের 'পরে, বিদ্ধ হবে তার মর্মমূলে—দিব্য-জীবনের ভাস্বর মহিমায় ঘটাবে তার রূপান্তর।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

দিব্য জীবন

অতিমানস রূপান্তরের ফলে পৃথিবীতে যে-চেতনার প্রতিষ্ঠা হবে, বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্বরূপের বিবৃতি হতে আমরা তার একটা আভাস পেলাম। এ-চেতনার প্রতিষ্ঠা যে হবেই, তাতে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই—কেননা একে আমরা বলতে পারি প্রকৃতিপরিণামের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। জড় হতে প্রাণ এবং প্রাণ হতে মনের আবির্ভাব আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মনঃশক্তি মানুষের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার একটি বৈশিষ্ট্য, চেতনাকে সে ইন্দ্রিয়-নির্ভরতা থেকে অনেকখানি মুক্ত করেছে। মানুষের ভাবনা কল্পনা স্মৃতি অনুমান—এসমস্তই অতীন্দ্রিয় বৃত্তি। অথচ এগুলিকে সে ইন্দ্রিয়বোধের মতই সহজে এবং স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। তার ফলে মানুষের চেতনা পশুর চেতনা হতে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। পশু-মন হতে মানব-মনের বিশেষ তফাত হল বিজ্ঞানে। মনের ওপারে অথচ তাকে জারিত করে রয়েছে এই বিজ্ঞান। তার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলেছি—একটি সামান্যজ্ঞান (conceptual knowledge), আরেকটি আত্মসচেতনতা (self-consciousness)। এই দুটি বৃত্তির সহায়ে মানুষ ইন্দ্রিয়নির্ভরতা হতে মুক্ত হতে পেরেছে। সামান্যজ্ঞান প্রধানত তাকে করেছে বস্তুজগতের ঈশ্বর, আর আত্মসচেতনতা তার সামনে খুলে দিয়েছে অন্তর্জগতের ঐশ্বর্যের দুয়ার। এই দুটি বৃত্তির সহায়ে বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির উপরে পুরুষের ঈশনার (mastery) যে-কৌশল, তার নাম যোগ। যোগ মানসোত্তর বিজ্ঞানের বিদ্যা। এই বিদ্যার সহায়ে কি করে প্রাকৃতমন অতিমানসের দিকে ধাপে-ধাপে এগিয়ে যেতে পারে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিয়েছি। তাহতে মনের পরে বিজ্ঞানঘন চেতনার প্রতিষ্ঠা কেন এবং কি করে সম্ভাবিত, তার একটা আভাস পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানঘন চেতনা লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই যখন লোকাতত হয়ে প্রাকৃত চেতনাকে আপন স্বভাবে রূপান্তরিত করে, তখনই পার্থিব জীবন দিব্য হয়। এই দিব্য-জীবনের সাধনা সিদ্ধি এবং প্রয়োগ সম্পর্কে এখন সমগ্রভাবে একটা আলোচনা করব।

সাধারণত জীবনসাধনার তিনটি লক্ষ্য আমরা দেখতে পাই। একটি হল বহির্জীবনের ব্যক্তিগত পরিপুষ্টি। উপনিষদের ঋষি একে বলতেন 'বিত্তৈষণা'। 'আমার ছাওয়াল যেন থাকে দুধে-ভাতে'—এই প্রাকৃত উক্তিতে তার সহজ প্রকাশ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এর বেশী কিছু চায় না। কিন্তু মানুষ তো একা থাকে না, তাকে থাকতে হয় দশজনকে নিয়ে। পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া একক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলাও সম্ভব নয়। তাই স্বার্থপর মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়েই প্রথম পরার্থপর হয়। তারপর পরার্থ-পরতা তার স্বভাবে দাঁড়ায়। তখন জনহিত হয় তার জীবনের লক্ষ্য। গীতার ভাষায়, তখন সে কর্ম করে 'লোক-সংগ্রহের' জন্য। এই দ্বিতীয় আদর্শই অধুনা-প্রচারিত মানবতাবাদের আদর্শ, যাকে অনেকে অধ্যাত্মসাধনার উপরেও স্থান দিয়ে থাকেন। অধ্যাত্মসাধনা বা অন্তর্জীবনের অভ্যুদয় হল তৃতীয় লক্ষ্য। এটিও ভোগবাদের মতই প্রাচীন। প্রাণের বুভুক্ষা যেমন মানুষকে বহির্মুখ করেছে, তেমনি মনের জিজ্ঞাসাও তাকে করেছে অন্তর্মুখ। পশুত্বের একটু উপরে উঠতেই মানুষ বুঝতে পেরেছে, বহিরিন্দ্রিয়ের তর্পণের চাইতে অন্ত-রিন্দ্রিয়ের তর্পণ বড়। ফলে মানুষের মধ্যে জেগেছে শিল্পবোধ আত্মসংস্কৃতির প্রেরণা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসা। ক্রমে প্রবল অন্তর্মুখীনতা মানুষকে করেছে অধ্যাত্মচেতা।

আপাতদৃষ্টিতে জীবনের এই তিনটি আদর্শ বিভিন্ন মনে হলেও বস্তুত তারা ওতপ্রোত। জীবনের মূলে রয়েছে আত্মতর্পণের তাগিদ। এ-তর্পণ যদি স্থূল হয়, একার হয়—তাহলে বুঝতে হবে মানুষ এখনও পশুর স্তরে আছে। মানুষ তা থাকতে পারে না। তর্পণ স্থূল কিন্তু লোকাতত, ভোগের আয়োজন আমার একার জন্য নয়, সবার জন্য—এ হল পশুবৃত্তির পরের ধাপ। তর্পণ যখন সূক্ষ্ম হয়, তখন আধ্যাত্মিকতার শুরু। একার অধ্যাত্মসিদ্ধি—এ-আদর্শ ভাল হলেও সম্বুদ্ধপুরুষ বলবেন, এটা হীনযানীর পথ, অতএব প্রশস্ত নয়। মহাযানীর অধ্যাত্মসাধনা সবার জন্য, তার সিদ্ধি লোকাতত। খুব বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। পূর্ণযোগী তবুও বললেন, 'এহোত্তম, আগে কহ আর।' আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখীনতা যদি বাইরটাকে নস্যাৎ করে দেয়, তাতে তাঁর আপত্তি আছে। অন্তরের সিদ্ধি বাইরেও রূপায়িত হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্ব-ময়—এই তাঁর লক্ষ্য। আমি আমারই তর্পণ চাই, কিন্তু সে-আমি তো সঙ্কুচিত অহন্তার মধ্যে বন্দী নয়—সে যে ভূতে-ভূতে সন্নিবিষ্ট এক অদ্বয় আত্মস্বরূপ।

তার উল্লাস যেমন পুরুষের স্বরূপাবস্থানে, তেমনি প্রকৃতির রূপান্তরে। বিশ্ব-প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামে চলছে সে-রূপান্তরের তপস্যা জড়ের মধ্যে অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রমুক্তিতে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন মহেশ্বরের সাযুজ্যকাঙ্ক্ষিণী তাপসী পার্বতী, তাঁর সমস্ত জীবনটাই যোগ। পূর্ণযোগীর জীবনও এই যুগনদ্ধ শিব-শক্তির দিব্য বিভূতি। তার মধ্যে জীবনসাধনার তিনটি ধারার সমন্বয় ঘটেছে।

অখণ্ডদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, জীবনের প্রেরণা আসছে অন্তর থেকে। বাইরের পরিবেশ ক্ষেত্র মাত্র। বীজের অঙ্কুরণে তা সাহায্য করে, কিন্তু অঙ্কুরণের শক্তি নিহিত রয়েছে বীজের মধ্যে। স্বভাবে যা আছে, আমাদের মধ্যে তা-ই ফুটতে পারে। এই স্বভাবের সাক্ষাৎকার পশুর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাই তার মধ্যে দেখা দেয় আদর্শবোধ। একটা সর্বসাধারণ আদর্শ হল চেতনার বিস্ফারণ। মানুষ বৃহৎ হতে চাইছে—এই তার জীবনের মর্মকথা। বীজ চাইছে বনস্পতি হতে। বীজটি হল মানুষের অহং। আত্মবিস্ফারণের সে অনুকূলও বটে, প্রতিকূলও বটে। অবিদ্যার ঘোর সম্পূর্ণ না কাটা পর্যন্ত অহন্তা পূর্ণবিস্ফারণের প্রতিকূল। কিন্তু এরই মধ্যে চলে তার বিদ্যার তপস্যা। অন্ধকার ক্রমে আলো হয়ে ওঠে।

ভিতরের প্রেরণায় ফুটে ওঠা জীবনের একমাত্র সাধ্য হয় যদি, তাহলে বলতে হবে, অধ্যাত্মজীবনই মানুষের সত্যকার জীবন। অধ্যাত্মজীবনের যে-কোনও ধারার তাৎপর্য হল সত্তার অন্তর্গূঢ় মহিমাকে প্রস্ফুট করা। তাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে অন্তর্জীবনের মূল্য বেশী। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আমি শুধু অন্তরকে মান্‌ব বাহিরকে নয়, অথবা নিজেকেই মানব পরকে নয়। বীজ যেমন মাটির গভীর থেকে রস টেনে আলো-বাতাসের মধ্যে অঙ্কু-রিত হয়, শাখা-প্রশাখায় আকাশের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, অধ্যাত্মজীবনও হবে তেমনি। অন্তরের গভীর গহনে তার শুরু, আর বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তর বিস্ফারণে তার সারা। আমার মধ্যে আমাকে পেয়ে সবার মধ্যে আমাকে পাওয়া, আবার অতিমুক্তির উল্লাসে সব পাওয়াকে ছাপিয়ে যাওয়া আকাশের মত—এই হল জীবনায়নের তাৎপর্য।

তাই অন্তরে চিন্ময় জীবনের প্রতিষ্ঠা হল দিব্যজীবন-সাধনার প্রথম পর্ব। তারপর তার বীর্যে সমগ্র বহিশ্চর সত্তার রূপান্তর ঘটানো, সমস্ত ভাবনা বেদনা ও কর্মকে পরিণত করা ওই অন্তশ্চেতনার মন্ত্রশক্তিতে—এই হল

সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্ব হল, এই সিদ্ধজীবনের সাবিত্রী দ্যুতিকে বিশ্বে বিকীর্ণ এবং অনুবিদ্ধ করা। কিন্তু সব ছাপিয়ে থাকবে লোকোত্তর মহাশূন্যের বৈপুল্য—যেমন আত্মসত্তার কেন্দ্রে, তেমনি তার পরিধিতে।

জীবনকে সার্থক করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন—অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজেকে জানা, নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া, অহরহ আত্মস্থ হয়ে বাস করা। মানুষের প্রাকৃত চেতনার পক্ষে এটা একটা দুঃসাধ্য সাধনা। কিন্তু এছাড়া আর পথও নাই। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, মানুষের ইন্দ্রিয়ের মোড় বাহিরের দিকে ফেরানো, তাই সে কেবল বাহিরটাকে দেখে, ভিতরের দিকে ফিরে নিজেকে দেখতে পায় না। ভিতরের দিকে তাকাতে গেলে সে দেখে কেবল নীরন্ধ্র অন্ধকার। সেখানে ঢুকতে গেলে হয় সে ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো হিজিবিজি স্বপ্ন দেখে। আধুনিক মনোবিকলন-বিদ্যাও মানুষের অন্তরে গিয়ে এই প্রাকৃত চেতনার আর অবচেতনার নিদ্মহল ছাড়া আর-কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু এই তো অন্তরের পূর্ণ পরিচয় নয়। প্রাকৃত চেতনার কাছে যা অন্ধকার, যোগিচেতনার কাছে তা-ই বিজ্ঞানঘন দীপ্তিতে ভাস্বর। জাগ্রতে যোগস্থ হয়ে বাস করলে অন্তরাবৃত্ত চেতনায় যে সূচীমুখ তীক্ষ্ণতার আবির্ভাব হয়, তাকে স্বপ্ন ও সুপ্তির গহনেও নামিয়ে নেওয়া যায়। প্রাকৃত জড়সমাধি তখন রূপান্তরিত হয় অপ্রাকৃত চেতনসমাধিতে। স্বপ্ন ও সুপ্তির স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা আগেই বলেছি। অন্তরের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে অভিযান চালিয়ে যদি তুরীয়ের নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তাহলে নিজের বীজসত্ত্বকে জেনে নিজেকে জানা আমাদের পূর্ণ হয়। তখন দেখি, অন্তরগহনের ওই নৈঃশব্দ্যই চিদ্‌বীর্য—লোকোত্তর জ্ঞান আনন্দ ও শক্তির উৎস। তার রিক্ততা প্রাকৃত আধারের রিক্ততা, ব্রাহ্মী চেতনার অমৃতরসে তাকে ভরে তোলবার আয়োজন। অতএব তা প্রলয়ে অস্তিত্বের নিমজ্জন নয়, মহত্তর ভূমিতে তার উত্তরণ। এমনি করে অন্তরে ঢুকতে পারলে আমরা পাই অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মর্মসত্যের পরিচয়। এই আত্মস্থ জীবন বীজসত্তায় গুটিয়ে গিয়ে আবার নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারে বিশ্বের জীবনকে। এ না করে বহির্মুখ চিত্ত নিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সর্বোত্তম সাধনাও আমাদের পুরুষার্থসিদ্ধির একটা অক্ষম পঙ্গু প্রচেষ্টা মাত্র। সে শুধু মেকীর কারবার, মনকে শুধু চোখঠারা ছাড়া আর-কিছু নয়।

এমনি করে অন্তরের গভীরে ডুবে গিয়ে নিজের বীজসত্তাকে আবিষ্কার করাকে বলে 'সত্ত্বাপত্তি' (being)। তারপর অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রবেগে বীজের যে-অঙ্কুরণ ও বিস্ফারণ, তাকে বলে 'সম্ভূতি' (becoming)। নিখিল প্রকৃতি জুড়ে চলেছে এই সত্ত্বাপত্তি আর সম্ভূতির তপস্যা—একটা-কিছুর রূপায়ণের আকূতি। সত্ত্বাপত্তি হতে সম্ভূতি, বীজ হতে বিস্তার—এই হল সৃষ্টির ধারা। যতটুকু ভিতরে গুটিয়ে যেতে পারব, ততটুকু বাইরে সার্থক-ভাবে ছাড়া পাব। অধ্যাত্মজীবনের এই আইন। আত্মস্বরূপ হওয়া বা নিজেকে পাওয়া হল আমাদের পরম পুরুষার্থ। একবার নিজেকে পেয়ে অন্তরের ওই চিদ্‌বিন্দু হতে দেহ-প্রাণ-মনরূপী দিব্যকলার রূপায়ণ এবং সেই লোকোত্তর আত্মভাবনার বীর্যে এই মর্ত্যের বুকে গড়ে তোলা দিব্য-জীবনের অমৃত পরিবেশ—এই হল আমাদের সাধ্যের চরম।

পূর্ণ সত্ত্বাপত্তির অর্থ হল নিজের সম্পর্কে পূর্ণচেতন হওয়া। যেমন জানতে হবে নিজের পৌরুষেয় সত্তার অচল প্রতিষ্ঠাকে, তেমনি জানতে হবে আত্ম-প্রকৃতির দিব্যবিভূতিকে। কি আমার স্বরূপ এবং কি আমার শক্তি, দুয়েরই পূর্ণজ্ঞান চাই। এই হল সত্ত্বাপত্তির প্রথম সাধন। আবার চাই আত্মশক্তির পূর্ণ সামর্থ্যকে অধিগত করে তার নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগে সিদ্ধ হওয়া। এই হল সত্ত্বাপত্তির দ্বিতীয় সাধন। সিদ্ধের জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নয়, পূর্ণ-সক্রিয়। তা শুধু আলো ছড়ায় না, ছড়ায় তাপও। সেই তাপ জড় ইন্ধনকেও অগ্নিময় করে তোলে। আবার সৃষ্ট হয় আলো আর তাপ। এই বিসৃষ্টিতে সত্ত্বাপত্তির চরিতার্থতা ঘটে বিশ্বাত্মভাবে। আমি শুধু আমার মধ্যে গুটিয়ে থাকি না, ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বময়। এক আমিই বিকীর্ণ হই বহু আমিতে। ঘটে-ঘটে আত্মস্ফুরণের যে-অভীপ্সা, তা আমারই অনির্বাণ বৈশ্বানর চেতনার ঊর্ধ্বশিখা। সবার সত্তা সবার চেতনা সবার আনন্দ সবার শক্তি আমারই আত্মস্বরূপের লীলায়ন। এই বিশ্বাত্মভাবের অনুভব হল সত্ত্বাপত্তির তৃতীয় সাধন। আবার বিশ্বাত্মভাবের এই সাধনা সার্থক হতে পারে বিশ্বোত্তীর্ণ-ভাবনার সিদ্ধিতে। পূর্ণের ফুল ফোটে শূন্যের বুকে—এই এক রহস্য। কোনও-কিছুকে ঠিক-ঠিক পেতে হলে তাকে ছাপিয়ে যেতে হয়। অহংকে না ছাপিয়ে গেলে আত্মাকে পাওয়া যায় না; তেমনি বিশ্বকে না ছাপিয়ে গেলে তাকেও পাওয়া যায় না। বিশ্বোত্তীর্ণের যে অসঙ্গ রিক্ততা, তা-ই পরম অদ্বৈত হয়ে জড়িয়ে আছে বিশ্বকে। এই বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবনার সিদ্ধি হল সত্ত্বাপত্তির চতুর্থ সাধন।

এমনি করে জ্ঞানে শক্তিতে বৈপুল্যে এবং রিক্ততায় নিজেকে পূর্ণরূপে পেলে সহজের আনন্দ আপনাহতে জীবনে উছলে পড়ে। স্বরূপানন্দের এই পরিপূর্ণ আস্বাদনে সত্ত্বাপত্তির পরম সার্থকতা।

'ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি'—ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন। সত্যকার জানা মানে হওয়া। তা-ই সত্ত্বাপত্তি। এই সত্ত্বাপত্তির সাধনা করতে হবে আধারের সব দিয়ে। দেহ প্রাণ আর মন নিয়ে এই-যে মর্ত্য আধার, তাকে রূপান্তরিত করতে হবে দেবতার সোমপাত্রে। তার জন্য তাদের সীমার সঙ্কোচ ভেঙে মুক্তি দিতে হবে ব্রহ্মসদ্ভাবের অনন্ত বৈপুল্যে। এইখানে সত্ত্বাপত্তির প্রথম ভূমিকারূপে নেতিবাদের সার্থকতা। 'এই সীমিত দেহ সীমিত প্রাণ বা সীমিত মন আমি নই'—অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই মন্ত্র জ'পে-জ'পে মর্ত্য অহন্তার অভ্যস্ত ভাবনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। বিহার করতে হবে ব্রহ্মের আনন্ত্যে। দেহ-প্রাণ-মনকে অনুভব করতে হবে সেই আনন্ত্যের বিভূতিরূপে। তাহলে তারা আর আত্মচৈতন্যের বাধক না হয়ে হবে তার যন্ত্র। তাইতে, চিৎশক্তির যে-সামর্থ্য তাদের মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে, তার মুক্তিতে তাদের রূপান্তর ঘটবে।

দেহ হতে এ-সাধনার শুরু হতে পারে, কেননা প্রাকৃত চেতনার কাছে দেহাত্মভাবনা হল সবার চাইতে ঘনিষ্ঠ। তাই বিদেহ-ভাবনা হল দিব্যজীবন-সাধনার প্রথম পাঠ। দেহকে একটা বস্তুপিণ্ডরূপে পরাক্-দৃষ্টিতে না দেখে তাকে প্রত্যক্-দৃষ্টিতে অনুভব করতে হবে বোধের ক্ষেত্ররূপে। এই বোধ যদি স্বচ্ছ ও প্রশান্ত হয় তাহলে আপনাহতেই তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে পরিব্যাপ্তির ভাবনা। প্রদীপের শিখা চারদিকে আলো ছড়ায়। প্রদীপের পরিপূর্ণ সত্তা ওই আলোর পরিমণ্ডল আর শিখা দুটিকে নিয়েই। দেহকেও তেমনি একটা অনন্ত-বিচ্ছুরিত চিৎশক্তির কেন্দ্র বলে ভাবা যেতে পারে। এই ভাবনা সিদ্ধ হলে বিলোমক্রমে এমনও ভাবা যেতে পারে, চিৎশক্তির আনন্ত্য গুটিয়ে এসেছে এই দেহে। তারপর দুটি ভাবনা ওতপ্রোত হয়ে দৈহসত্তা রূপান্তরিত হবে চিৎকেন্দ্রে, বিজ্ঞানঘন চেতনার শক্তিকূটে। তখন তার মধ্যে আর জড়ত্বের কোন সঙ্কোচ থাকবে না।

এমনি করে অবিদ্যালাঞ্ছিত মনের সঙ্কুচিত চেতনার উর্ধ্বে ওঠা, অমনী-ভাবের ভূমিতে থেকে মনকে ব্যবহার করা যন্ত্রের মত—এই হল দিব্যজীবন-সাধনার দ্বিতীয় পাঠ। বিদেহভাবনা থেকেই অমনীভাবের সাধনা সিদ্ধ

হতে পারে। দেহের স্থৈর্যে সত্তার যে-বোধ, শুধু 'আছি' বলে যে শববৎ বা শিববৎ শূন্যতার প্রশান্তি, তাকে যদি জানি চেতনার সমস্ত বৃত্তির প্রতিষ্ঠারূপে, তাহলেই আমরা মনের শাস্তা হতে পারি। নিঃসঙ্গ নিথর আকাশে যেমন মেঘের খেলা আলোর মেলা তারার ঝিকিমিকি, তেমনি দেখছি নিস্তরঙ্গ চেতনার বুকে মনোবৃত্তির বুদ্‌বুদ্ উঠছে আর ভাঙছে। তটস্থ এই দৃষ্টির স্বচ্ছতায় তখন মনের চাওয়ার মূলে ধরা পড়ে আত্মচৈতন্যের সঙ্কল্পশক্তির উল্লাস। তার সিদ্ধি সহজ অপ্রতিহত এবং চিন্ময়। অন্তরে পাওয়ার পূর্ণতায় তখন বাইরে চাওয়ার দুরাগ্রহ শূন্যতায় গিলিয়ে যায়। মনের আর তখন নিজের গরজের কোনও কাজ থাকে না—শুধু অন্তঃশক্তির নির্দেশে ব্যবহারের মধ্যে যোগাযোগ-সাধন করা ছাড়া।

এমনি করে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাণকে আত্মার বিভূতি ও সাধন রূপে প্রশাসন ও পরিচালন করা হল দিব্যজীবন-সাধনার তৃতীয় পাঠ। ব্যক্তি প্রাণের সীমিত আকাঙ্ক্ষার আন্দোলনকে ছাপিয়ে প্রাণ তখন বিশ্বপ্রাণকে আপন জেনে সমস্ত প্রাণবিভূতির সঙ্গে এক হয়ে যায়। নিখিল জুড়ে ব্যষ্টি প্রাণের আকূতি এবং তর্পণে সে দেখে এক অন্তর্গূঢ় আত্মারাম মহাপ্রাণের রসাস্বাদের বৈচিত্র্য।

এসব সাধনার মূলকথা হল চেতনাকে অবিদ্যার সঙ্কোচ হতে বিদ্যার বৈপুল্যে উত্তীর্ণ করা। সপ্তবিধ অবিদ্যার কথা আমরা আগেই বলেছি, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই যে ইন্দ্রিয়নির্ভর জড়াশ্রয়ী প্রাকৃত চেতনা কেবল বাইরের বস্তুজগৎটাকে তার সর্বস্ব মনে করছে, কেবল জাগ্রতের ভূমি ছাড়া চেতনার আর-কোনও গূঢ়ভূমির সন্ধান রাখছে না, একটা আয়ুষ্কালের সীমার মধ্যে জীবনের তাৎপর্য এবং মহিমাকে সঙ্কুচিত রাখছে, নিজের সীমিত অহংএর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে—প্রতিপক্ষ-ভাবনার দ্বারা তার এই ঘোর ভাঙতে হবে। সাধককে অবিরাম জপতে হবে, 'আমি চিন্ময়, আমি গভীর, আমি শাশ্বত, আমি বিরাট্।' তবেই তার সাংস্থানিক চিত্তগত কালগত আর অহংকৃত অবিদ্যার ঘোর ভেঙে উদ্‌বুদ্ধ চেতনা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়, ছাপিয়ে যাবে বিশ্বকেও এবং সেই বৈপুল্যের আবেশে ব্যাবহারিক জীবনও হবে আনন্ত্যের ঋতচ্ছন্দোবাহী দিব্য-জীবন।

এমনি করে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে আপনাকে অন্তর হতে ষোড়শ-কলায় পূর্ণ করে তোলবার যে-অভীপ্সা, তার চিন্ময় সিদ্ধি হল দিব্যজীবন-

সাধকের প্রথম করণীয়। আগে নিজেকে কোটাতে হবে। তারপর আত্ম-চেতনার প্রমুক্ত ঔদার্য নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের আধ্যাত্মিক এবং ব্যাবহারিক যোগাযোগকে সবদিক দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে হবে—এই হল তার দ্বিতীয় করণীয়। তার এ-তপস্যা সার্থক হবে বিশ্বময় আত্মচেতনার অখণ্ড ব্যাপ্তিতে—সর্বাত্মভাবের সিদ্ধিতে। বিজ্ঞানঘন চেতনা ও প্রকৃতিতে উত্তীর্ণ হবার পথে এ-ভাব স্বভাবতই সাধকের মধ্যে ফুটে উঠবে। কিন্তু তারও পরে বাকী থাকে তৃতীয় একটি করণীয়: চাই এক নতুন জগৎ, চাই বিশ্বমানবের জীবনধারার গোত্রান্তর। অন্তত এই পার্থিব প্রকৃতিতে অভিনব সিদ্ধজীবনের একটা সংঘচেতনা ফুটিয়ে তোলা চাই। বিজ্ঞানঘন জীবনের ব্যক্তিগত আদর্শই হবে এই সংঘজীবনেরও আদর্শ।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের স্বরূপের পরিচয় আগেই দিয়েছি, সংঘের কথাও বলেছি। এখন ব্যাবহারিক দিক থেকে এই নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানঘন পুরুষ শুধু আত্মারাম নন, উপনিষদের ভাষায় তিনি আত্মক্রীড় এবং ক্রিয়াবান্। অর্থাৎ তিনি যে শুধু আপনাতে আপনি আছেন কূটস্থচেতনায় অচল হয়ে, তা নয়। কূটস্থ থেকেই তিনি ছড়িয়ে পড়ছেন সবার মধ্যে, তাঁর জীবনচেতনায় আছে সবারই আত্মভাবের অখণ্ড-নিবিড় চেতনা। নিজের মধ্যে থেকেই তিনি সবার মধ্যে বিলসিত, তাই তিনি আত্মক্রীড়, বিশ্বের নিত্যরাস তাঁর চেতনায়। অথচ তাঁর এই উল্লাস প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে একটা তটস্থ শক্তির লীলা শুধু নয়। যেমন পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে থেকেও সবিতার তেজ তার মর্মে অনুবিদ্ধ হয়ে প্রাণ জাগায় ফুল ফোটায় চেতনার উন্মেষ ঘটায়, তেমনি তাঁর লোকোত্তর স্থিতি ও উল্লাস আবার আত্মসম্পূর্তির চিন্ময় তপস্যায় রূপান্তরিত হয় বিশ্বলোকে। চেতনার প্রসার এবং ঊর্ধ্বায়ন বিশ্বজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগের পথে হ'ক বা যোগের পথেই হ'ক, সবাই চাইছে বৃহৎ হতে, উত্তুঙ্গ হতে। আধারে-আধারে এই-যে আত্মো-ন্মীলনের আকূতি, এ বৈশ্বানর বিজ্ঞানঘন পুরুষের অবন্ধ্য তপের শিখা। বিশ্বময় তিনি দেখছেন এক চিন্ময়ী মহাশক্তির আত্মস্ফুরণের লীলা। এই দেব-

লীলায় তাঁর অন্তর্জ্যোতির সত্যসঙ্কল্প ঋতসংবেগের যে-আবেশ, তা-ই তাঁর কর্ম। সে-কর্মে যেমন বিবিক্ত অহংচেতনার কোনও দায় নাই, তেমনি নাই সামাজিক অহংচেতনারও। তাঁর হৃদয়ে যে-পরমপুরুষ, বিশ্বমানবে যে-পরমপুরুষ, বিশ্বের ভূতে-ভূতে যে-পরমপুরুষ, তাঁর মধ্যে থেকে তাঁর বিশ্বতো-মুখী প্রবৃত্তিতে জীবন ঢেলে দেওয়া—এই তাঁর দিব্যকর্মের ছন্দ। এই অর্থেই তিনি ক্রিয়াবান্।

সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন বলে তাঁর কর্মে ফোটে এক আশ্চর্য ছন্দোময় সাবলীলতা। বিজ্ঞানঘন পুরুষ যে-ভূমিকাতে থাকুন, জীবন-পরিবেশের সঙ্গে কোথাও তাঁর বিরোধ হয় না। তিনি জানেন, তাঁর দিব্যসঙ্কল্পের ছন্দোবাহী এই জগতে কোথায় তাঁর স্থান। তাই, যেমন তিনি শাস্তা বা নায়ক হতে পারেন, তেমনি পারেন অধীন হতে। দুটি ভূমিকাতে তাঁর সমান আনন্দ। তাঁর অন্তরের স্বাতন্ত্র্য শাশ্বত এবং অব্যভিচারী বলে ঈশনার নিরঙ্কুশ স্ফুরণে তার যতখানি উল্লাস, ততখানি উল্লাস স্বেচ্ছাসেবকের অধীনতায়। অথচ প্রাকৃত বুদ্ধির আদর্শবাদ তাঁকে কখনও বাঁধতে পারে না। অহংএর সেবা যেমন তাঁর পুরুষার্থ নয়, তেমনি সমাজসেবা রাষ্ট্রসেবা বা মানবসেবাও তাঁর ঐকান্তিক পুরুষার্থ নয়। কারণ এদের মনঃকল্পিত অর্ধসত্যকে ছাপিয়ে ভাগবত সত্যের দিব্য আবেশে আবিষ্ট তাঁর চেতনা, বিশ্বোত্তীর্ণের পরমজ্যোতি তাঁর জীবনের দিশারী। সুতরাং তাঁর মধ্যে বিশ্বহিতের প্রেরণা আসে বিশ্বো-ত্তীর্ণের দিব্যসঙ্কল্পের মুক্তচ্ছন্দ হতে। তাই প্রাকৃতমনের অনুশাসন মানতে তিনি বাধ্য নন। অথচ তিনি প্রাকৃত জনের সেবক। আবার তাদের অন্তর্যামী ঈশানও।

বিজ্ঞানঘন পুরুষের বাহ্যকর্মের এই ধারা। কিন্তু তাঁর আন্তরকর্মের অধিকার আরও ব্যাপক এবং নিগূঢ়। আমাদের পরিচিত প্রাকৃত চেতনার শক্তি নিয়েই তাঁর কারবার নয়। সত্য বলতে তিনি অধিচেতন শক্তির কারবারী। এইখানে তাঁর কর্মযোগের রহস্যক্রমের শুরু।

রহস্যশক্তি অবশ্যই সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু তাবলে তা অবাস্তব নয়। প্রকৃতির সব শক্তিই যে আমরা জানতে পেরেছি তা নয়, জানার চেষ্টা করছি মাত্র। একটা নিঃসীম রহস্যরাজ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের জানার অভিযান চলছে। রহস্য যেমন বাইরে আছে, তেমনি আছে অন্তরেও। দুটির আবিষ্ক্রিয়ার ধারা এক নয়, যদিও উভয়ক্ষেত্রে আমরা মনঃশক্তিরই প্রয়োগ

করে থাকি। বাইরের রহস্য আয়ত্ত করবার প্রধান সাধন হল ইন্দ্রিয়জ্ঞানাশ্রিত অনুমান এবং কল্পনা। কল্পনা অনুমান হতে স্বতন্ত্র বৃত্তি, তার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় বোধির যোগ আছে। অন্তর্বিজ্ঞানের কারবার কিন্তু এই বোধিকে নিয়ে। বোধির সহায়ে কি করে অন্তরের রহস্যশক্তির আবিষ্কার এবং ব্যবহার সম্ভব, তার আলোচনা যোগ-বিজ্ঞানে আছে। সে-বিজ্ঞান দুঃসাধ্য, কিন্তু অবাস্তব বা অযৌক্তিক নয়। চেতনার উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে নতুন শক্তির আবির্ভাব হবে, এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। চেতনার উৎকর্ষ ঘটে নিবৃত্তিতে, অর্থাৎ তার স্রোতকে অন্তর্মুখ করাতে। চরম নিবৃত্তিকে যোগীরা বলেন 'কৈবল্য' অথবা পুরুষের স্বরূপাবস্থান। কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি একটি মিথুন তত্ত্ব; অর্থাৎ চেতনা থাকলেই মানতে হবে তার শক্তিও আছে। তাই নিরুদ্ধ বা কেবল চেতনাতে স্বভাবের নিয়মেই ফোটে বিভূতি বা অন্তরের রহস্যশক্তি। যোগীরা বলেন, বিভূতির আবির্ভাব হয় বিবেকখ্যাতি হতে অথবা প্রাতিভ-সংবিৎ হতে। দুটিকে মিলিয়ে বলা যায়, তটস্থ নিস্তরঙ্গ চৈতন্য হতে বিভূতির আবির্ভাব হয় যেন বিদ্যুতের ঝলকের মত।

সাধনশাস্ত্রে বিভূতির সম্পর্কে সাধককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কারণ সুস্পষ্ট। শক্তির একটা মোহ আছে। শিব না হয়ে শক্তির সঙ্গে খেলা করতে গেলে শক্তি ঘাড় মট্‌কে দেয়। জীবন হতে সরে দাঁড়াতে চান যাঁরা, তাঁদের কাছে এই প্রত্যাখ্যানের সার্থকতা নিশ্চয় আছে—কেননা ঋদ্ধিকে অঙ্গীকার করলে জীবনের দায় বাড়বে, নির্জলা মুমুক্ষার পথে কাঁটা পড়বে। তাছাড়া ঋদ্ধির অলৌকিকত্ব সহজেই সাধকের কাঁচা-আমিকে অযথা ফাঁপিয়ে তুলে সর্বনাশ ঘটাতে পারে। কৈবল্যের অভীপ্সা যাঁর মধ্যে, বিভূতির প্রলোভন থেকে স্বভাবত তিনি সরে থাকতে চাইবেন—কেননা বিভূতি মানুষকে যেমন তুলতে পারে, তেমনি নামাতেও পারে। ওর অপপ্রয়োগ যত সহজ, এমন আর-কিছুর নয়।

কিন্তু কেবল নিঃশ্রেয়স নয়, অভ্যুদয়ও যদি হয় অধ্যাত্মসাধকের পরম পুরুষার্থ, প্রাণ ও চেতনার প্রসারে আধারে স্বভাবতই যদি অভিনব সামর্থ্যের উৎসারণ ঘটে, তাহলে শক্তিসঞ্চয়সম্পর্কে কোনও নিষেধ খাটতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানঘন চেতনায় উত্তীর্ণ পুরুষের আধারে পরমা প্রকৃতির দিব্য বিভূতির উন্মেষ হবে তাঁর স্বাভাবিক আত্মোন্মেষের পরিণাম। মানুষের চেতনা মননশক্তিকে যেমন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে, বিজ্ঞানঘন পুরুষও বিজ্ঞান-

শক্তিকে তেমনি ব্যবহার করবেন। শক্তির অপপ্রয়োগের ভয় প্রাকৃত মানুষের বেলাতেই আছে, কেননা তার চেতনা অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং অসম্যক্-দর্শী। কিন্তু বিজ্ঞানঘন পুরুষ তা নন বলে অপপ্রয়োগের ভয় তাঁর বেলাতে থাকতে পারে না। তাঁর চেতনায় অধিচেতন ভূমির ঐশ্বর্যের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায় বলে দিব্য আত্মবিভূতির প্রয়োগ হয় তাঁর কর্মযোগের একটা নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য।

পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞানঘন চেতনার সিদ্ধি প্রথমত আসবে একক জীবনে, কেননা প্রকৃতি ব্যক্তিচেতনাকে আশ্রয় করেই সমষ্টিচেতনার রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে। বিজ্ঞানঘন পুরুষ তাই প্রথমত নিঃসঙ্গ, বাইরের সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অন্তরের দিব্যধামে গুহাহিত। তবুও আলোর ধর্ম ছড়িয়ে পড়া। তাই অগোচরে হলেও তাঁর চেতনার দীপ্তি নিঃশব্দে সবার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কেউ-কেউ সাড়া দেয়, অন্তরের আকর্ষণে তাঁর কাছে ছুটে আসে। এমনি করে একজন সিদ্ধপুরুষকে কেন্দ্র করে দেশে চিরকাল নানাধরনের অধ্যাত্ম-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানঘন সংঘও এমনি করে গড়ে উঠবে। কিন্তু প্রাচীন সংঘ হতে তার আদর্শ হবে একটু ভিন্ন। ইহবিমুখীনতা দিব্যজীবন-সাধনার লক্ষ্য নয়। প্রাকৃত জীবনকে ছাপিয়ে উঠতে হবে, নইলে অধ্যাত্ম-সিদ্ধি অসম্ভব—একথা খুবই সত্য। কিন্তু চেতনার উত্তরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার বীর্যকে অবরভূমিতে সঞ্চারিত করে তারও রূপান্তর ঘটাতে হবে, সিদ্ধজীবনের এও একটা দায়। তুরীয়ের ভাবনা জাগ্রৎকেও অনুষিক্ত করবে, ব্যক্তির সাধনা হবে বিশ্বের জন্য, আর সমগ্র আধারের ঘটবে আমূল রূপান্তর—তবেই পৃথিবীর বুকে নবজীবনের আবির্ভাব সম্ভব হবে। বিজ্ঞানঘন সংঘের তা-ই লক্ষ্য।

কিন্তু এই সংঘ যে একদিনেই পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তা নয়। বহুজনের মধ্যে মর্ত্যপ্রকৃতির পূর্ণরূপান্তর কখনও অতর্কিতে সিদ্ধ হতে পারে না। তার জন্য যুগব্যাপী অতন্দ্র সাধনার প্রয়োজন। প্রথমত সংঘের বিবিক্ত জীবনে এমন-একটি শরবৎ-তন্ময়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, যা সবরকমে ব্যক্তিচেতনার দিব্যপরিণামের অনুকূল হবে। এইটি হল শক্তিসংহরণের পর্ব। তারপর ওই মন্ত্রপূত চিন্ময় পরিবেশে অভিনব জীবন-ধারার রূপায়ণ এবং উন্মেষ ঘটাতে হবে। এইটি হল শক্তিবিকিরণের পর্ব। কাজটা যে সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। সাধনার গোড়ায় রূপান্তরের বাধাগুলি আরও জোরালো হয়ে ফুটবে। অধ্যাত্মজীবনের এটা একটা

সাধারণ নিয়ম। কাঠে আগুন ধরাতে গেলে তার ভিতরের রসটা আগে গ্যাঁজলা হয়ে বেরিয়ে আসে। তবে চিত্তের অভীপ্সা যেখানে অতন্দ্র এবং ঐকান্তিক, সেখানে বাধার সঙ্গে লড়বার জন্য শক্তির যোগানও আসে ভিতর থেকে। বাধার সার্থকতা ওইখানে।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানঘন সংঘে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং সমূহের সৌষম্যের মাঝে একটা সমন্বয় ঘটবে। প্রাকৃত ভূমিতে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈষম্যই প্রবল। বৈষম্য ঘুচিয়ে সৌষম্য আনবার জন্য প্রাকৃতমন যখন সংঘ গড়তে যায়, তখন সবাইকে সে ঢালতে চায় এক ছাঁচে। কিন্তু দিব্যসংঘে জীবনের আদর্শ তা নয়। সংঘে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রয়েছে; সে তার স্ব-ভাবের স্বাতন্ত্র্য। আর ভাব সেখানে ঊর্ধ্বমুখী বলে কারও স্বভাবের সঙ্গে অপরের স্বভাবের বিরোধ হতে পারে না। বিরোধ সেখানেই দেখা দেয়, চেতনা যেখানে সঙ্কীর্ণ হয়ে নিজের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। যার অহং নাই, তার পরও নাই—সবাই তার আপন। নিজের গভীরে যে ডুবেছে বা আকাশের মত সব-কিছুকে যে ছাপিয়ে রয়েছে, বিশ্বে সে দেখে একেরই বহুধা রূপায়ণ। বৈচিত্র্য তার কাছে প্রতিভাত হয় একের স্বচ্ছন্দ ঐশ্বর্যের রূপে, তাই কোথাও সে বিরোধ দেখতে পায় না।

সবাই একের বিভূতি, অতএব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত সবাই আপন—এই একত্ব (unity) এবং অন্যোন্যভাবনা (mutuality) সৌষম্যের (harmony) মূলমন্ত্র। সংঘবদ্ধ বিজ্ঞানঘন জীবনের তা অনুত্তরণীয় স্বভাবধর্ম।

সমাজ গড়তে গিয়ে একত্ব অন্যোন্যভাব এবং সৌষম্যের অন্তত আংশিক প্রতিষ্ঠার সাধনা আমরা করে থাকি, কেননা এদের ছেড়ে আমাদের সমাজজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্যক্তির অহং মরে না বলে এত করেও আমরা গড়ে তুলি কৃত্রিম একত্বের একটা কাঠামো মাত্র। একত্ব সেখানে একটা মুখোস বা জোড়াতালির ব্যাপার, ভিতরে-ভিতরে সংঘাতটাই প্রবল। কিন্তু বিজ্ঞানঘন চেতনায় অন্তরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়—জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্কল্পের এবং দৃষ্টির সঙ্গে কর্মের কোনও বিরোধ সেখানে থাকে না। ব্যক্তির চেতনা এমনিতর স্বচ্ছ সাবলীল এবং উদার হলেই সমাজে যথার্থ একত্ব অন্যোন্যভাব এবং সৌষম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিজ্ঞানঘন সংঘের এই দায়। তাকে একটা নতুন সমাজচেতনা গড়ে তুলতে হবে। পশুবৃত্ত মানুষের

সমাজ তো দেখছিই। আজকাল সংস্কৃতির রূপান্তরের কথা যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা দেখছেন মনস্বীর সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। গড়তে হবে যোগীর সমাজ। ন্যায়-বুদ্ধির (logical reason) উর্ধ্বে শুদ্ধবুদ্ধির এবং বোধির সহজ বৃত্তি হবে সে-সমাজের ব্যাবহারিক জীবনের ভিত্তি।

পার্থিব পরিণামের এই যদি হয় চরম নিয়তি, তাহলে একবার দেখা দরকার উত্তরায়ণের পথে আমরা এসে কোথায় দাঁড়িয়েছি এতদিনে। বর্তমানে চলছে একটা পর্বসন্ধির যুগ, এসেছে আমাদের পথ বেছে নেবার তাগিদ। আজ মানুষের মন একটা বৈষম্যের ফেরে পড়েছে। কোনও-কোনও বিষয়ে যেমন তার অসম্ভব উৎকর্ষ ঘটেছে, তেমনি অন্যদিকে সে রয়ে গেছে পথহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত। দেহ-প্রাণ-মনের সকল দাবি সকল ক্ষুধা মেটাতে সমাজে রাষ্ট্রে বৃত্তিতে ও সংস্কৃতিতে সে এনেছে অভাবনীয় বৈচিত্র্য। একটা অতিকায় সভ্যতার সে সৃষ্টি করেছে, অথচ তার প্রমত্ত অহং এবং ক্ষুধিত বাসনা যে কি করে একে সামাল দেবে তা সে ভেবে পাচ্ছে না। জীবনে ঐশ্বর্য অবাঞ্ছনীয় নয়, কেননা তাতে শক্তির প্রকাশ ঘটে। চেতনার উৎকর্ষে শক্তি দেখা দেবেই। কিন্তু সে যদি শিবের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলেই বিপদ। শিবহীন শক্তি-সাধনার পৌরাণিক উদাহরণ হল দক্ষ-যজ্ঞ। আধুনিক সভ্যতা প্রজাপতির সামর্থ্যের অহঙ্কার করতে পারে বটে, কিন্তু সে-সামর্থ্যের পরিচালক হচ্ছে ছাগবুদ্ধি। জৈবকামনার তর্পণটাই আজ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিপদ এইখানে।

তবুও সমাজে যাঁরা মনস্বী, তাঁরা একটা আদর্শবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। কিন্তু সেখানেও সমস্যার অন্ত নাই। সত্যকার প্রগতির জন্য যা প্রয়োজন, তার সঙ্গে প্রগতিবিরোধী উপাদানের জটলা পাকিয়ে জীবনসমস্যার সমাধানের একটা বিকল চেষ্টাই চলছে আজকাল। এমনি করে খাড়া করানো হয়েছে জীবনাদর্শের তিনটি ছক : ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা, বা সমাজজীবনের পূর্ণতা, বা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে সমাজের আদর্শ-সমন্বয়। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিরূপণ সুষ্ঠু না হলে কোন সমাজই এগিয়ে যেতে পারে না। এদেশের প্রাচীন সমাজে দুয়ের সম্বন্ধের মাঝে সাধ্যমত একটা সমন্বয় ঘটানোতে তার ভিত্তিও

এতটা পোক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের বদল হয়েছে বলে প্রাচীন ধারা আজ সবক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারছে না। জীবনের সমস্যাকে আজ নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ফলে মানুষের চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে একটা দ্বিধার আন্দোলন। ব্যক্তি কি আজ স্ব-তন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে চলবে, না সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ হবে তার জীবনাদর্শ ?

অপক্ষপাতে বিচার করতে গেলে দেখি, ব্যক্তি আর বিশ্ব অন্যোন্যনির্ভর। বিশ্বকে আশ্রয় করে যেমন ব্যক্তির প্রকাশ, তেমনি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিশ্বের স্ফূর্তি। কিন্তু তাহলেও জীবব্যক্তিই হল প্রকৃতিপরিণামের মূলসূত্র, কেননা আত্মোপলব্ধি বা নতুন সত্যের উপলব্ধি হয় জীবব্যক্তির মধ্যেই সবার আগে। ক্রমে তার বেগ সঞ্চারিত হয় সমষ্টির মধ্যে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে সংখ্যা ও আয়তনকে আমরা বড় করে তুলি বলে প্রায়ই আমাদের বিচারে ভুল হয়। আগেই বলেছি, প্রকৃতিপরিণামের মধ্যে গুণগত উৎকর্ষ পিরামিডের চূড়ার মত সর্বত্র আয়তনে স্বল্প। মানুষের সমাজে কতকগুলি জৈববৃত্তির দিক দিয়ে আমরা একটা সর্বগত সাম্য আনতে পারি, কিন্তু মনোবৃত্তির দিক দিয়ে পারি না। সমাজের সবাইকে সমানভাবে সুস্থ ও সবল হয়তো করা যেতে পারে, কিন্তু সবাইকে সমান বুদ্ধিমান করা যায় না। যদি-বা কোনদিন সবাইকে বৌদ্ধিক উৎকর্ষের একটা সাধারণ ভূমিতে নিয়ে আসতে পারি, তবুও উৎকর্ষের প্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্য ওরই মধ্যে নতুন-নতুন প্রতিভার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হবে, যারা সর্বসাধারণ উৎকর্ষের মানকে ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং সমষ্টির প্রগতির জন্যই ব্যক্তির অসাধারণ উৎকর্ষের দাবিকে স্বীকার করে নিতেই হবে—মৌমাছি বা উইপোকার জীবনায়নের সাম্যকে আদর্শ ভাবলে চলবে না।

আধুনিক সমূহবাদের সৃষ্টি হয়েছে প্রতীচ্যে—অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। ভোগের উপকরণ সঞ্চিত হল ব্যক্তির হাতে, সমূহ হল বঞ্চিত। তাই সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ব্যাপারটা ঘটেছে ব্যক্তির ধর্মবুদ্ধির অভাবে। অধ্যাত্মচেতনা না জাগলে সত্যকার ধর্মবুদ্ধিও জাগে না। সে-চেতনার লক্ষণ হল বিশ্বাত্মভাবনা। অহংচেতনা যখন রূপান্তরিত হবে সুগভীর এবং সর্বগত আত্মচেতনাতে, ঐশ্বর্য তখন হাতের মুঠায় এলেও তাতে আসক্তি থাকবে না। সুতরাং লোলুপতা ও কার্পণ্যও থাকবে না, ভোগের উপকরণ নিয়ে হানাহানির

প্রয়োজনও হবে না। এই সর্বাত্মভাব এবং অনাসক্তির বীজ মানুষের স্বভাবে রয়েছে, সুতরাং তার অনুশীলন তো কৃচ্ছ্রসাধনা নয়। প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতার এই ভাব এই মমতা রয়েছে সন্তানের প্রতি, নইলে সন্তান বাঁচত না, বড় হতে পারত না। পরিবারে যা সম্ভব, সমাজেও তা সম্ভব হবে না কেন? তা সম্ভব করবার জন্য পরিবেশের যেমন বদল চাই, তেমনি ধর্মবুদ্ধিরও উন্মেষ চাই। নতুন সমাজ গড়বার জন্য বিপ্লবই যথেষ্ট নয়—চাই আত্মবোধের জাগরণ, অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ। যিনি আত্মস্থ, তিনিই সার্থক বিপ্লব ঘটাতে পারেন। তিনিই ধর্ম দিয়ে অধর্মকে বিনাশ করতে পারেন। নইলে অধর্ম দিয়ে অধর্মকে বিনাশ করতে গেলে অধর্মের অধিকারই বেড়ে চলে। বর্তমান জগতে হচ্ছেও তাই। অধর্মচারীর প্রতি যে-বঞ্চিতের আক্রোশ, সে যদি স্বয়ং ধর্মবুদ্ধি না হয়, তাহলে তার সূক্ষ্ম পাপবুদ্ধিই তার অভ্যুদয়কে ধুলায় লুটিয়ে দেবে। তার দ্বারা ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনকালেই হবে না।

প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাব আজ সমস্ত জগৎ জুড়ে। তাকে এড়াবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই—কেননা সেও প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের একটা পর্বে এসে দেখা দিয়েছে ভিতরের তাগিদেই। তার মূলে আছে যুক্তিবাদ, যাকে বলা চলে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিযোগ। তাতে জীবনের সকল সমস্যার যাচাই হয় যুক্তিশাণিত ব্যাবহারিক বুদ্ধির বিচার দিয়ে। তার ফলে বাস্তবের প্রেরণায় জীবনকে গড়ে তোলবার সাধনা চলে। লৌকিক স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁত ব্যবস্থাই হল তার লক্ষ্য। প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শকে ভাঙিয়ে সে সৃষ্টি করল 'মানবতাবাদ' (Humanism)—যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোনও বালাই রইল না, মানুষের মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ-সাধনাই হল যার ব্রত। সমূহবাদ (Collectivism) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism) এই মানবতা-বাদের রকমফের। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ মূঢ় প্রবঞ্চিত শোষিত, ধর্মের সান্ত্বনা তাদের ইহলোকে নয়—পরলোকে। এদের জাগাতে হলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিযোগেরই প্রয়োজন। কিন্তু তাবলে মানবতাবাদ এবং বৃত্তিসৌকর্যকে (economic welfare) যদি মানুষের চরম পুরুষার্থ মনে করি, তাহলে ভুল করব। কারণ আগেই বলেছি, সত্যকার ধর্মবুদ্ধির উন্মেষ না হলে সমষ্টিজীবনেরও সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু বুদ্ধির কসরত দিয়ে জাতির প্রগতিকে জিইয়ে রাখা যায় না বেশীদিন, কেননা দেহ-প্রাণ-মনের চাইতে বড় একটা তত্ত্বের দিকে বুদ্ধির মোড় ফেরানো থাকলেই তার দীপ্তি সতেজ

থাকে। মানুষের স্বভাব বদলাবে না অথচ জীবনের ধারা বদলে যাবে, এ শুধু জড়বাদীর অযৌক্তিক আশা।

বাইরের মোহে ভিতরটাকে উপেক্ষা করলে প্রগতির সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তার সূচনাও দেখা দিয়েছে জগৎ জুড়ে, মানুষের অন্তর্জীবনের অশান্তি এবং অনৈশ্চিত্যের পীড়নে। ভোগোপকরণের প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে থেকেও তার চিত্তে অস্বস্তি আশঙ্কা আর হাহাকার। এ-দুর্দৈবের প্রতীকার তো বাইরে নাই, আছে ভিতরে। শক্তির উর্ধ্বে না উঠলে শক্তির প্রশাসন বা সম্ভোগ সম্ভব নয়, একথা আগেও বলেছি। তাই লোকোত্তরকেই লোকজীবনের বনিয়াদ করতে হবে, পূর্ণতার ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শূন্যতার বুকে। কর্মের প্রতিষ্ঠা হবে নৈষ্কর্ম্যে, ভোগের প্রতিষ্ঠা ত্যাগে। চিত্তের আকাশবৎ ব্যাপ্তি এবং রিক্ততা হতেই আলোর নির্ঝর ঝরে পড়বে। আধ্যাত্মিকতার এই আদর্শ যে বাস্তব এবং লোকাতত হতে পারে, তার পরীক্ষা এদেশে বার-বার হয়ে গেছে—যদিও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে তা স্থায়ী হতে পারেনি। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে-ইহবিমুখীনতা জীবনকে বাইরে ঊষর করে তুলেছে চিরকাল, আজ শুধু তাকেই বর্জন করতে হবে—আধ্যাত্মিকতাকে নয়। বরং তাকেই করতে হবে জীবনের সমস্ত প্রেরণার উৎস। তার জন্য তার প্রাচীন ধারার অনেকখানি পরিবর্তন করে নিতে হবে, অতীতের যে-সিদ্ধি কল্যাণকর তাকে প্রত্যাখ্যান না করেও তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনাকে ব্যাবহারিক জীবনে ফলপ্রসূ করতে হবে।

'অধ্যাত্মজীবন তপঃকৃচ্ছ্রতা এবং অপরিগ্রহের জীবন', বলতে গেলে এ-ধারণা আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু দৃষ্টির প্রসার ঘটলে মনে হবে, এও তো অবিদ্যাশাসিত মনের আদর্শবাদের জল্পনা। বস্তুত চরিত্রের অকলঙ্ক শুচিতা ও অখণ্ড আত্মসংযম নিষ্কাম পুরুষের সহজ স্বভাব। ঐশ্বর্য কিংবা দারিদ্র্যে তার কোনও বিপর্যয় ঘটে না। দারিদ্র্য যাকে ক্ষুব্ধ করে কিংবা ঐশ্বর্য যার বিকার আনে, বুঝতে হবে তার অকামতা অখণ্ড কি সত্য নয়। বিজ্ঞানঘন পুরুষের একমাত্র পরিচয়—তাঁর জীবন দিব্য-পুরুষেই সত্যসঙ্কল্পের লীলা। সে-লীলা ফুটতে পারে যেমন অতিসারল্যে তেমনি অতিজটিলতায়, যেমন রিক্ততায় তেমনি ঐশ্বর্যে, অথবা উভয়ের স্বাভাবিক সমত্বে।

সমত্বই যোগজীবনের উত্তম রহস্য। তা ভোগের প্রমত্ততাও নয়, অথবা বৈরাগ্যের ঊষরতাও নয়। তা স্বরাট আত্মস্থ পুরুষের চিদৈশ্বর্যের স্বচ্ছন্দ

বিকিরণ। তা-ই জীবনের বিজ্ঞানঘন লীলায়ন, যা অবিদ্যার সিসৃক্ষার চাইতে আরও পূর্ণ আরও সার্থক আরও রসোচ্ছল। তার পূর্ণ সার্থকতা জীবনের অপঘাতে নয়—এই জীবনের মধ্যে তার স্বরূপশক্তির চিন্ময় পূর্ণতায়।

সমাপ্ত

শব্দকোষ

[সঙ্কেত : জৈ—জৈনদর্শন। ন্যা—ন্যায়-বৈশেষিক। বে—বেদান্ত। বৈ—বৈষ্ণবদর্শন। বৌ—বৌদ্ধদর্শন। মী—মীমাংসাদর্শন। শা—শাক্তদর্শন। শৈ—শৈবদর্শন। শ্রু—শ্রুতি (সংহিতা ও উপনিষদ)। সা—সাংখ্য-যোগদর্শন। স্মৃ—স্মৃতিপ্রস্থান (ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি)।

অগ্র্যা বুদ্ধি—তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে পারে এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি (শ্রু)।

অতিচিতি—চেতনার বিশ্বাতীত চরম ভূমি super-conscience।

অতিভাবী—যে ছাড়িয়ে যায়।

অতিশায়ী—যা ছাপিয়ে চলে।

অতি-ষ্ঠা—সব-কিছুকে অতিক্রম করে স্থিতি যার, বিশ্বাতীত transcendent (শ্রু)।

অনক্ষরা—'অক্ষর' বা ওঙ্কারকেও ছাপিয়ে আছে যে পরমা বাক্।

অনাবৃত্তি—জগতে আর ফিরে না আসা, মোক্ষ (বে)।

অনিবাধ—চেতনার এমন বিশাল ভূমি যেখানে বাইরে-ভিতরে কোথাও ছড়িয়ে পড়ার কোনও বাধা নাই (শ্রু)।

অনুকূলবেদনীয়—যার অনুভব জীবন-বোধের অনুকূল ; সুখ (সা)।

অনুত্তর—চরম ও পরম তত্ত্ব যার পরে আর-কিছুই নাই (শৈ)।

অনুপাখ্য—সবরকম প্রমাণের অগোচর, অনির্বচনীয় (বে)।

অনুভব—বোধ বা জ্ঞানের অর্জন ও ধারণ, অভিজ্ঞতা experience (বে)।

অনুভাব—আকারে-ইঙ্গিতে মনোভাবের বাইরে অভিব্যক্তি।

অনুসিদ্ধান্ত—মূল সিদ্ধান্ত হতে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে এমন-একটি সিদ্ধান্ত corollary।

অন্তঃসংজ্ঞা—ভিতরে-ভিতরে বোধ যার বাইরে প্রকাশ নাই—যেমন গাছপালার (স্মৃ)।

অন্তরাবৃত্ত—ভিতরের দিকে মোড় ফেরানো যার inwardised।

অন্তরাভব—মৃত্যু আর জন্মের মাঝখানটায় যার স্থিতি internatal (স্মৃ)।

অন্নময়—'অন্ন' বা প্রাণের খাদ্যরূপ জড় যার উপাদান material (শ্রু)।

অন্নাদ—'অন্নের' ভোক্তা, প্রাণী ; জীব a living being (শ্রু)।

অন্যথাপরিণাম—অন্যরকম হয়ে যাওয়া transformation।

অন্যোন্যভাবনা—একের মধ্যে অপরের ভাব বা সত্তার অনুপ্রবেশ mutuality।

অন্যোন্যসংক্রমণ—পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়া, মেশামিশি।

অন্যোন্যসম্ভাবন—পরস্পরের আপ্যায়ন (স্মৃ)।

অন্বয়—যুক্ত থাকা; অনুবৃত্তি; মিল agreement (ন্যা)।

অপরা—নিচেকার—যেমন অপরা প্রকৃতি (স্থ)।

অপরামৃষ্ট—সম্পর্কশূন্য, ছোঁয়াচের বাইরে (সা)।

অপরিগ্রহ—একান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া আর কোনও ভোগ্যবস্তু গ্রহণ না করা (সা)।

অপ্রকেত—অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন, আবছা (শ্রু)।

অপ্রবর্তী—যার মধ্যে কোনও প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া নাই—যেমন আকাশ (শ্রু)।

অপ্রমেয়—যা পরিমাপের বাইরে immeasurable ; যা সাধারণ জ্ঞানের বাইরে incomprehensible।

অবর—অধস্তন lower।

অবরার্ধ—গোলকের নিচেকার অর্ধেক lower hemisphere।

অবরোহ—নীচে নামা। -ন্যায়—সামান্য হতে বিশেষের অনুমান deduction।

অবিনাভাব—একটিকে ছেড়ে আরেকটির না থাকা, নিত্যযোগ।

অবিবেক—একাত্মতার ভাবনা বা আরোপ ; একাকারবোধ identification (সা)।

অব্যভিচারী—ব্যতিক্রমশূন্য, নিত্যযুক্ত।

অব্যাকৃত—বিশিষ্ট আকারে বা রূপে যা রূপায়িত নয় amorphous (শ্রু)।

অভিনিবেশ—একাগ্র অভিমুখীনতা exclusive concentration ; আত্মহারা তন্ময়তা absorption। চিত্তের মূঢ়তা dullness, stupidity (সা)।

অভীপ্সা—বড় একটা-কিছুকে পাবার জন্য চিত্তের সংবেগ aspiration (শ্রু)।

অভ্যুদয়—জীবনসাধনায় লৌকিক সিদ্ধি (ন্যা)।

অভ্যুপগম—একটা-কিছুকে আগে থেকেই ধরে নেওয়া বা মেনে নেওয়া assumption, postulate (ন্যা)।

অমনীভাব—চেতনার যে-ভূমিতে প্রাকৃতমনের ক্রিয়া স্তব্ধ plane of no-mind (বে)।

অরতি—ভাল না লাগা (স্থ)।

অরূপাবচর—যোগচেতনার যে-ভূমিতে রূপের বোধ থাকে না (বৌ)।

অর্থক্রিয়াকারিতা—কোনও প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে কাজ করবার স্বভাব বা সামর্থ্য (বৌ) ; ব্যাবহারিক জগতের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিমূলক ব্যাপার pragmatism।

অসদ্‌ব্রহ্ম—যে-ব্রহ্মে কোনও-কিছুর সত্তা অনুভূত হয় না, শূন্যব্রহ্ম (শ্রু)।

অসমোর্ধ্ব—যার সমান বা যার উপরে কিছু নাই, যা সব ছাপিয়ে transcendent (বৈ)।

অসম্ভূতি—কোনও ভাবের স্পন্দ নাই যেখানে, 'নেতি নেতি'র চরম অবস্থা ; সৃষ্টির প্রাক্তন ভূমি non-Becoming (শ্রু)।

অস্মিতা—শুধু 'আমি আছি' এইধরনের নির্বিশেষ বোধ ; অবিদ্যাতে অহং-ভাবনার প্রথম স্ফুরণ (সা)।

আচ্ছিন্ন—(বাস্তব হতে) আলাদা করে নেওয়া abstract।

আতাপ—অন্তঃশক্তির বিকিরণ ও ক্রিয়াপরতা spiritual energising (বৌ)।

আত্তীকরণ—জীর্ণ ক'রে অঙ্গীভূত করা assimilation।

আত্মভাব—সত্তার আত্মরূপে স্ফুরণ ; আত্মসত্তার বোধ এবং সেই বোধের ধারাবাহিকতা (বৌদ্ধমতে তা অবাস্তব)।

আত্মসম্পূর্তি—নিজেকে ভরে তোলা।

আত্যন্তিক—নির্বিশেষ, পরম absolute।

আধিকারিক—[পুরুষ] বিদেহী হওয়ার পরও যিনি জগতের কাজ করে যান একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (বে)।

আপ্যায়ন—চিদ্‌বৃত্তির পোষণ ও সংবর্ধন (শ্রু)।

আপ্তকাম—যা চাওয়ার তা নিজের মধ্যেই যিনি খুঁজে পেয়েছেন (শ্রু)।

আ-ভাস—তাত্ত্বিক বিচ্ছুরণ—যেমন দীপশিখা হতে আলোর (শা)।

আভাস—অতাত্ত্বিক প্রতিভাস (বে)।

আয়তন—আধার, আশ্রয়, বাহন vehicle (শ্রু)। বিস্তার, পরিসর extension।

আরম্ভবাদ—'অদৃষ্টবশে পরমাণুর পুঞ্জভাব হতে বিশ্বের সৃষ্টি' এই মতবাদ (ন্যা)।

আরোহ—উপরপানে ওঠা। -ন্যায়—বিশেষ হতে সামান্যের অনুমান induction।

আর্জব—স্বভাবের ঋজুতা, সোজাপথে চলবার স্বভাব, সরলতা (স্মৃ)।

আলম্বন—প্রত্যয় বা বোধের কারণ (সা).; বিষয়। ভাবের উদ্বোধক।

আস্রব—বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকা influx (জৈ)।

E.-S. P.—অতীন্দ্রিয় অনুভব extra-sensorial perception।

ইন্দ্রিয়সংবিৎ—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত প্রাথমিক বোধ sensation।

ইষ্টার্থ—অভিলষিত বিষয় যাকে আমরা দাম দিই values।

ঈশনা—(ঈশ্বরীয়) অকুণ্ঠ সামর্থ্য (শৈ)। আধিপত্য mastery।

উচ্চাবচ—উঁচুনিচু।

উৎক্রম, -ক্রান্তি—(চেতনার) ধাপে-ধাপে উপরপানে ওঠা (শ্রু)।

উত্তর—আরও উপরে আছে যা higher (শ্রু)।

উত্তরায়ণ—চেতনার ঊর্ধ্বমুখী ক্রমিক অভিযান, মকরক্রান্তিবিন্দু হতে সূর্যের উত্তরদিকে সরে যাওয়ার মত যার ফলে ক্রমেই দিনের আলো বাড়তে থাকে (শ্রু)।

উন্মেষ—শক্তির বিশ্বাকারে স্ফুরণ (শা)।

উপসৃষ্ট—আনুষঙ্গিকরূপে উৎপন্ন by-product

উপাধি—স্বরূপের সঙ্কোচ ঘটিয়ে অথচ বস্তুর কোনও-একটা দিক ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যা determining property। আগন্তুক ধর্ম accidents (বে)।

ঋত—(বিশ্বের মূলে) সত্য ও সুশৃঙ্খল শাশ্বত-বিধান (cosmic) order and rhythm; সত্যের ছন্দ (শ্রু)।

ঋতম্ভরা—ঋতকে ধারণ বা পোষণ করছে যা (সা)।

একদেশী—একপেশে।

একরস—যার অনুভব আগাগোড়া একধরনের (বে)।

একান্তবাদ—বিশেষ কোনও-একটা মতকেই আঁকড়ে থাকা exclusive view, dogmatism।

ঐকান্তিক—সব ছেড়ে শুধু একটাকে আঁকড়ে থাকা যার স্বভাব বা ধরন। আর-কিছুর ঠাঁই নাই যার মধ্যে exclusive।

ঐশ্বরযোগ—ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তির স্ব-তন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ বিলাস divine mastery over things (স্মৃ)।

ঐশ্বর্য—অকুণ্ঠ আধিপত্য mastery (সা)।

কঞ্চুক—স্বরূপের আবরণ (শৈ)।

কবি-ক্রতু—দিব্যদর্শনের সঙ্গে যুক্ত সৃষ্টি-সামর্থ্য বা সঙ্কল্পশক্তি যা কখনও ব্যর্থ হয় না seer-will (শ্রু)।

করণ—ক্রিয়াসিদ্ধির প্রধান সহায় [যেমন দর্শন-ক্রিয়ার 'করণ' চোখ] instrument।

কলা—কৃতিশক্তির বিশিষ্ট স্ফুরণ (শৈ)। অংশ – যেমন চন্দ্রকলা।

কায়-বূ্যহ—বিচিত্র কায় বা বিগ্রহের রচনা এবং স্থাপনা (ন্যা)। বহু বিচিত্র আকারের এককালীন বিন্যাস (স্মৃ)। -সম্পৎ— শরীরের রূপ লাবণ্য বল এবং বজ্র-দৃঢ়তা ইত্যাদি যোগবিভূতি (সা)।

কূটস্থ—ঘাতপ্রতিঘাতে নির্বিকার; প্রকৃতির উর্ধ্বে স্থিত অক্ষুব্ধ পুরুষ (সা)।

কেন্দ্রাপসারী—কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে যা ছড়িয়ে পড়ছে centrifugal।-ভিসারী —তার বিপরীত centripetal।

কেবল—অসঙ্গ পুরুষ (শ্রু)।

কৈবল্য—আত্মার অসঙ্গ স্বরূপে অবস্থান (সা)।

কোটি—চরম, অবধি, প্রান্ত extreme।

ক্ষণভঙ্গ—কালকে ক্ষণে-ক্ষণে ভাগ করে দেখা। ক্ষণে-ক্ষণে স্পন্দিত কালের চলন। বস্তুর উৎপত্তির পরেই তার বিনাশ-হেতু ক্ষণস্থায়িত্বের পরম্পরা (বৌ)।

ক্ষেত্র—দেহ প্রাণ মন ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত আধার। -জ্ঞ—তার অন্তর্যামী পুরুষ (স্মৃ)।

খণ্ডন-মণ্ডন—অপরের মত কেটে নিজেরটা প্রতিষ্ঠা করা (ন্যা)।

গ্রন্থিবিকিরণ—গাঁট খুলে দেওয়া; অবিদ্যার আড়ষ্টতাকে জ্ঞানের নির্মুক্ততায় রূপান্তরিত করা (শ্রু)।

গ্রাহ্য—অনুভবযোগ্য; ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয় (সা)।

চতুষ্পাৎ—চার পো, পরিপূর্ণ—যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় নিয়ে অখণ্ড ব্রহ্ম (শ্রু)।

চিৎপ্রকর্ষ—চৈতন্যের ক্রমে-ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠা।

চৈত্যবোধ—হৃদয়ের গভীর হতে উদ্গত চিন্ময় অনুভব psychic experience।

জন্য—অপর কিছু হতে উৎপন্ন derivative (ন্যা)।

জিজীবিষা—বেঁচে থাকবার ইচ্ছা will to live (শ্রু)।

জীবঘন—বিশ্বপ্রাণের ঘনীভূত রূপ যা অনন্ত জীবব্যক্তিতে প্রকাশমান (শ্রু)।

জুগুপ্সা—সঙ্কোচে গুটিয়ে আসা (শ্রু)।

তটস্থ—নিরপেক্ষ indifferent (সা)।

তত্ত্বভাব—স্বরূপের সত্য এবং তার অনুভব (শ্রু)।

তদাত্মক—একটা-কিছুর সঙ্গে এক হয়ে গেছে যা identical।

তন্ত্র—পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয়সমূহের একত্র সমাহার system।

তাদাত্ম্য—পরস্পরের অভেদভাব identity।

তুর্যাতীত—তুরীয় ভূমির ওপারে পরমশিবের সহজ ভূমি যা সবাইকে ছাপিয়ে থেকেও সবাইকে জড়িয়ে আছে আকাশের মত (শৈ)।

তৈজস রূপান্তর—চিন্ময় তেজঃ বা 'চৈত্য-সত্ত্বে'র রূপান্তর psychic transformation।

ত্রিপুটী—তিনের সমাহার, তিনে এক trinity। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমাহার; জাগতিক বোধ (বে)।

দিব্যকলা—দিব্য ক্রিয়াশক্তি।

দৃষ্টি-সৃষ্টি—অন্তশ্চক্ষে ভাবকে দেখেই তাকে রূপ দেবার শক্তি creative insight (বে)।

দৈহ্য—দেহসম্পর্কিত corporeal (স্মৃ)।

ধর্মকায়—বিশ্বাতীত চেতনার নির্বিশেষ সহজ-স্থিতি (বৌ)।

ধাতু—মৌল উপাদান stuff (শ্রু)। -প্রসাদ— উপাদানের স্বচ্ছতা luminosity of substance (শ্রু)।

ধ্যানচিত্ত—স্বভাবতই যে-চিত্ত একাগ্রভূমিতে তন্ময় থাকে (বৌ)

নাড়ী—নার্ভ (শ্রু)।

নিঃশ্রেয়স—পরমপুরুষার্থ, মোক্ষ (ন্যা)।

নিঃসত্ত্ব—সত্তার স্বাভাবিক ধর্ম যে-অর্থক্রিয়াকারিতা তাও নাই যেখানে; শূন্য nonentity, void (বৌ)।

নিগূহন—ভিতরে গুটিয়ে থাকা।

নিগ্রহ—জোর করে চেপে রাখা repression (স্মৃ)।

নিবর্তন—ভিতরে গুটিয়ে আসা involution (শ্রু)।

নিমিত্তকর্তা—ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে কাজ করে যে (স্মৃ)।

নিমেষ—শুদ্ধ সন্মাত্রে শক্তির লীনভাব (শা)।

নিরোধ—চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থা (শ্রু, সা)।

নির্ঋতি—বিশ্বের ছন্দোময় বিধানের বিপরীত অবস্থা chaos (শ্রু)।

নির্বাণ—বিনাশ [অবশ্য সমগ্র সত্তার নয়, শুধু প্রাকৃত সত্তার] (বৌ)।

নির্বিশেষ—কোনও বৈশিষ্ট্যের ভাবনা চলে না যার মধ্যে Absolute।

পরমার্থ-সৎ—চরমতত্ত্ব যার সত্যতা অখণ্ডনীয় এবং যার উপলব্ধি সাধনার শেষ লক্ষ্য (বে)।

পরা—উপরকার—যেমন 'পরা প্রকৃতি' higher (শ্রু)।

পরাক্—বাইরের দিকে যার মোড় ফেরানো externalised, objective (শ্রু)।

পরাবর্তন—পিছনদিকে ফিরে আসা regression।

পরার্ধ—অখণ্ড সত্তার উপরের ভাগ, সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তি higher hemisphere (শ্রু)।

পরিচ্ছেদ—সীমা টানা, সীমার ঘের limitation।

পরিণাম—মূলপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ক্রমিক স্ফুরণ evolution (সা)।

পরিতোব্যাপ্ত—যা চারদিক ব্যাপে আছে।

পরিভূ—বিচিত্র হয়ে চারদিকে ফুটে উঠছেন যিনি (শ্রু)।

পারার্থ্য—ঊর্ধ্বচেতনার কাছে নিজেকে তুলে ধরে তার জন্যই কাজ করা (সা)।

P.-K. effect—কোনও-কিছুর মাধ্যম ছাড়া শুধু মনের শক্তিতে বাহ্যবস্তুর উপর কাজ করার শক্তি psycho-kinetic effect।

পুরুষবিধ—পুরুষের ধর্ম বা ব্যক্তিত্ব আছে যাঁর Personal (God) (শ্রু)।

পুরুষার্থ—মানুষের জীবনের লক্ষ্য aim of existence (স্মৃ)।

পূর্ব-চিতি—আদি বিজ্ঞান First Idea (শ্রু)।

-পক্ষ—দার্শনিক বিচারের বেলায় প্রশ্ন তোলা বা আপত্তি করা।

পৌরুষেয়—'পুরুষে'র আশ্রিত বা সম্পর্কিত। মানবীয় human।

প্রকার—জ্ঞানের বিশিষ্ট রূপ mode (ন্যা)।

প্রচয়—পুষ্টি development। জোট বাঁধা aggregation (ন্যা)।

প্রচেতনা—চেতনার ক্রমবিপুল অগ্রাভিযান expanding consciousness (শ্রু)।

প্রজ্ঞান—শুদ্ধবুদ্ধির ভূমি হতে বৈচিত্র্যকে বিষয় করে স্ফুরিত জ্ঞান (শ্রু)।

প্রতিকূলবেদনীয়—স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত অনুভবের বিপরীত, যেমন 'দুঃখ' (সা)।

প্রতিক্ষেপ—সামনে ছুঁড়ে দেওয়া projection।

প্রতিপক্ষভাবনা—বিপরীত বৃত্তির মনন—যেমন ক্রোধ দমন করতে ক্ষমার (সা)।

প্রতিযোগী—সংশ্লিষ্ট অথচ বিরোধী (ন্যা)।

প্রত্যক্—ভিতরের দিকে যার মোড় ফেরানো, বিষয়িগত inwardised, subjective (শ্রু)।

প্রত্যয়—বোধ, অনুভব, প্রতীতি।

প্রত্যাসত্তি—কাছাকাছি আসা rapprochement।

প্রত্যাহার—ফিরিয়ে আনা—যেমন বিষয় হতে ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে আনা withdrawal (সা)।

প্রপঞ্চোপশম—শক্তির শিবে গুটিয়ে আসা, যে নিস্তরঙ্গ অনুভবে জগদ্বোধ লুপ্ত (শ্রু)।

প্রপঞ্চোল্লাস—শক্তির জগদ্ব্যাপাররূপে আনন্দে ছড়িয়ে পড়া (শা)।

প্রবৃত্তি—ক্রিয়া function, activity (সা)। ক্রিয়াজনিত অবস্থান্তরের ধারা process। চলন। -বাদ—জীবে শুধু প্রবৃত্তিই আছে, তার মূলে চৈতন্য নাই—এই মতবাদ behaviorism।

প্রযত্নশৈথিল্য—শরীর আলগা করে ছেড়ে দেওয়ার ভাব—যেমন ধ্যানাসনে relaxation (সা)।

প্রয়োজক—গোড়াতে যার প্রেরণায় এবং অধ্যক্ষতায় কাজ চলে initiating and determining agent।

প্রশম—চেতনার নিস্তরঙ্গ অবস্থা quiessence (বে)।

প্রশান্তবাহিতা—বৃত্তিহীন চিত্তের নিস্তরঙ্গ হয়ে বয়ে চলা (সা)।

প্রসাদ—চিন্ময় আবেশহেতু জড়ে আবির্ভূত স্বস্থতা (বৌ, শ্রু)।

প্রস্থান—দার্শনিক চিন্তার বিশিষ্ট ধারা বা 'তন্ত্র' a school or system of thought।

প্রাকাম্য—স্বচ্ছন্দে কামনাপূরণের ক্ষমতা (সা)।

প্রাতিভ—অলৌকিকভাবে অন্তরে স্ফুরিত, অতীন্দ্রিয় (সা)। -সংবিৎ—এই-ধরনের জ্ঞান intuition (সা)।

প্রেতি—সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা দেওয়া urge, impulsion (শ্রু)।

প্রেমসেবোত্তরা গতি—ভগবানকে ভালবেসে সিদ্ধদেহে তাঁর সেবায় অনন্তকাল অতিবাহন (বৈ)।

প্রেষণা—সামনের দিকে ঠেলে নেওয়া (শ্রু)। আদিপ্রবর্তনা urge।

প্রৈষা—দ্র. 'প্রেষণা' (শ্রু)।

বর্গ—সজাতীয় সমূহ class, group।

বর্ণরতিপ্রমোদ—বাইরের চাকচিক্যে আসক্তিহেতু সুখ (শ্রু)।

বলক্রিয়া—শক্তির স্ফুরণ dynamis (শ্রু)।

বহিরাবৃত্ত—বাইরের দিকে যার মোড় ফেরানো extravert।

বহুধাবৃত্ত—নানাধরনের ক্রিয়া যার।

বিকল্প—শুধু ভাষাকে অবলম্বন করে কোনও বিষয়ের অবাস্তব এবং অস্ফুট প্রতীতি unreal mental construction (সা)।

বিকৃতি—প্রকৃতি বা মূলবস্তুর বিভিন্ন রূপ variable forms (মী); বিকার, রূপান্তর mutation; উৎপন্ন ধর্ম derivative phenomenon (সা)।

বিজ্ঞান—মনের ওপারে চেতনার সর্বতোভাস্বর ভূমি (শ্রু)। ভাব idea। চেতনা, চিত্তবৃত্তি, বোধ consciousness and its functions (বৌ)।

বিদেহমুক্তি—দেহ থাকতে মুক্তি সম্ভব নয়—এই মতবাদ (ন্যা, বে)।

বিনাশ—আত্মভাবের প্রলয় (শ্রু, বৌ)।

বিপরিণাম—তত্ত্বের বিশেষ-কোনও বিকার বা অবস্থান্তর mutation, modification (সা)।

বিপাক—কর্মফলের পরিপুষ্টি যাথেকে নতুন জন্মের সূত্রপাত হয় (সা)।

বিবর্ত—তত্ত্ববস্তুর ভাবময় 'পরিণাম' conceptual evolution of an entity। প্রতিভাস—phenomenal becoming (বে)।

বিবিক্ত—নিঃসম্পর্ক, পৃথক (সা)।

বিবেক—আলাদা করে বা চিরে-চিরে দেখা discrimination (সা)। -খ্যাতি —বিবেক থেকে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান (সা)।

বিবৃত্ত—বীজভাব হতে ক্রমান্বয়ে স্ফুরিত evolved (শ্রু)।

বিভজ্য-বাদী—তত্ত্বসন্ধানের বেলায় বিশ্লেষণপন্থী (বৌ)। -বৃত্ত—ভেঙে-ভেঙে দেখা বা চলা যার ধরন।

বিভাব—একই তত্ত্বের নানান দিক aspect।

বিভাবনা—বিচিত্র রূপে রূপায়িত করা deployment।

বিভূতি—বিচিত্র রূপায়ণ ও তার সামর্থ্য (শ্রু)। ঐশ্বর্য, অলৌকিক শক্তি (সা)। -সংবিৎ—চেতনার যে-ভূমিতে দৃক্‌শক্তিরই অধিষ্ঠানে এবং আবেশে দৃশ্যরূপে ফোটে রূপায়ণের বৈচিত্র্য apprehensive movement of the supermind।

বিভ্রম—সমূল অবাস্তব প্রতীতি—যেমন দড়িতে সাপ দেখা illusion [অমূল হলে 'কুহক'—যেমন মরীচিকা hallucination] (বে)।

বিশেষ—যা সর্বসাধারণ নয়, কিন্তু সুনির্দিষ্ট একটা-কিছু particular। ভেদ-সাধক ধর্ম differentia (ন্যা)।

বিশ্বাত্মক—বিশ্বে অনুস্যূত এবং তার সঙ্গে একাকার immanent (শৈ)।

বিশ্বোত্তীর্ণ—বিশ্বকে ছাপিয়ে transcendent (শৈ)।

বিসৃষ্টি—বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে দিকে-দিকে শক্তির ছলকে পড়া বা নির্ঝরণ (শ্রু)।

বীথী চিত্ত—ক্ষণস্থায়ী চিত্তবৃত্তির মিছিল (বৌ)।

বৃত্তি—ক্রিয়া, ব্যাপার function ; চলন ; পরিণাম। চিত্তের ধর্ম বা সামর্থ্য (সা)।

বেদনা—সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্তের প্রক্ষোভময় অবস্থা feeling, emotion (বৌ)।

বৈরাজ্য—বিরাটের ভাব, বিশ্বের উপর আধিপত্য (শ্রু)।

বৈশিষ্ট্যাবগাহী—বৈশিষ্ট্য বা ভেদভাবকে আশ্রয় করে আছে যা particularised (বে)।

ব্যতিরেক—বিযুক্ত হওয়া, ভিন্ন হওয়া, বিপরীত দিকে সরে যাওয়া difference (ন্যা)।

ব্যাকৃতি—বিশেষ আকার দেওয়া বা নেওয়া formulation ; বিশিষ্টরূপ (শ্রু)।

ব্যাবৃত্ত—আলাদা-করে-নেওয়া, নিঃসম্পর্ক exclusive (ন্যা)।

ব্যায়াম—সাধনায় উদ্যম এবং অধ্যবসায় (বৌ)।

ব্রহ্মনাড়ী—মেরুদণ্ডের ভিতরে প্রাণ ও চেতনার সূক্ষ্মতম প্রণালিকা (শা)।

ভব—হওয়া ; হওয়া এবং থাকা, অস্তিভাব existence। হওয়ার বা জন্মাবার আকাঙ্ক্ষা (বৌ)।

ভব্য—যার ঘটবার সম্ভাবনা বা সামর্থ্য আছে possible (শ্রু)।

ভব্যার্থ—'ভব্য' বিষয় possibles, potentialities।

ভাবক—অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধানী ও রসিক, মরমীয়া mystic (বৈ)।

ভাববাসিত—মনোময় ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ideational।

ভূত-গ্রাম—বিশিষ্ট 'সত্ত্বে'র সমূহ class of beings (স্মৃ)। -শুদ্ধি—যোগশক্তির দ্বারা পঞ্চভূতকে চিন্ময় করা (শা, শ্রু)।

ভূমা—সব হওয়া যাঁর স্বভাব, ব্রহ্ম (শ্রু)।

ভোগায়তন—আত্মার ভোগের সাধন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর (ন্যা)।

মহাযান—'সবার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি নাই' এই ভাবনা (বৌ)।

মাত্রাস্পর্শ—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ যাতে বিষয়ের মাত্র আংশিক জ্ঞান হয় (স্মৃ)।

মৈত্রীভাবনা—সমগ্র জগৎকে বন্ধুর মত আপন মনে করা (বৌ)।

যুগনদ্ধ—জোড়া-বাঁধা—যেমন শিব আর শক্তি (বৌ)।

যোগমায়া—ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত প্রজ্ঞার রূপায়ণী শক্তি যার মধ্যে ভাবের সৃষ্টি আর বস্তুর সৃষ্টি একাকার হয়ে আছে (স্মৃ)।

রহস্যক্রম—সাধারণ জ্ঞানের অগোচর ক্রিয়ার ধারা occult process (শা)।

রূপধাতু—রূপের উপাদান substance (বৌ)।

লক্ষ্যাভিসারী—বিশেষ-কোনও লক্ষ্যের অভিমুখে গতি যার teleological।

লোক-সংগ্রহ—যথাযথভাবে সর্বলোকের হিত-সাধন (স্মৃ)। -সংস্থান—বিভিন্ন ভুবনের সুবিন্যস্ত পরম্পরা system of worlds (স্মৃ)।

লোকৈষণা—ইহলোকের ওপারে উর্ধ্বলোকের সন্ধানে ফেরা (শ্রু)।

লোকোত্তর—চেতনার সাধারণ ভূমিকে যা ছাড়িয়ে যায়, অলৌকিক supernormal (স্মৃ); ধ্যানচিত্তের চরম ভূমি, নির্বাণ (বৌ)।

শক্তিপাত—চিৎশক্তির আবেশ যার ফলে চেতনার রূপান্তর ঘটে (শা)।

শক্তিসাম্য—ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তিতে এক হওয়া (বে)।

শাস্তা—যিনি চালিয়ে নেন ; বুদ্ধ (বৌ)।

শুদ্ধসত্ত্ব—যে-সত্ত্বগুণে রজোগুণের চাঞ্চল্য বা তমোগুণের আবরণের সম্ভাবনা নাই (সা, স্মৃ)।

শূন্যবাদ—বিশ্বের মূলতত্ত্বকে কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না—এমন-কি অস্তিত্বেও তার পরিচিতি সম্ভব নয় এই মতবাদ (বৌ)।

শ্রুতি-প্রস্থান—বেদবিদ্যা, বেদ ও ব্রাহ্মণ।

সঙ্কর্ষণ—সবার উর্ধ্বে টেনে নেয় যে-যোগশক্তি (বৈ)।

সংঘাত-রূপ—বিচিত্র উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন আকারবিশেষ (ন্যা)।

সংজ্ঞাশব্দ—বস্তুনির্দেশক নাম term (ন্যা)।

সংজ্ঞান—সমগ্রের সম্যক্ ছন্দোময় জ্ঞান comprehension (শ্রু)।

সংবৃত্ত—বীজাকারে গুটিয়ে-আসা involved (শ্রু)।

সংবেগ—(সাধনপথে) তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য চিত্তের জোর তাগিদ (সা)।

সংবেদন—প্রাথমিক অনুভব, সাড়া sensation (সা)।

সংযম—কোনও বিষয়কে ধরে তাতে ধ্যানশক্তির প্রয়োগে সমাহিত হওয়া (সা)।

সংস্থান—অবয়ব বা উপাদানকে বিশেষধরনে সাজানো organisation। অঙ্গ-সজ্জা; পরিকল্পনা।

সৎ—যা আছে; যার অস্তিত্ব নিত্য (শ্রু)।

সত্ত্ব—স্ব-ভাব, আত্মভাব essential being। মৌল উপাদান—যেমন 'জীব-সত্ত্ব' substance। যে কোনও লোকের অধিবাসী জীব an organised being। প্রকৃতির প্রকাশধর্মযুক্ত গুণ (সা)। -তনু—'শুদ্ধসত্ত্বে'র দ্বারা রূপায়িত বিগ্রহ (স্মৃ)।

সত্তাপত্তি—ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে এক হওয়া, আত্ম-সত্তায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। জ্ঞানের চতুর্থ ভূমি (বে)।

সদৃশপরিণাম—যেখানে পরিণামের পরম্পরা আছে কিন্তু তার দুটি পর্বের মাঝে ভেদ নাই—যেমন ধ্যানতন্ময়তায় (সা)।

সদ্‌ভাব—শুদ্ধসত্তারূপে অবস্থান (বে)।

সন্ধিনীশক্তি—পরমপুরুষের যে-স্বরূপশক্তি শুদ্ধ-সত্তারূপে সবার আধার হয়ে আছে (বৈ)।

সন্নিকর্ষ—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ contact (ন্যা)।

সন্মাত্র—'আত্মসত্তায় পূর্ণ হয়ে আছেন' এইমাত্র বোধ হয় যাঁর সম্পর্কে (শ্রু)।

সমব্যাপ্ত—সমান-সমান হয়ে পরস্পরকে ছেয়ে আছে যারা co-extensive।

সমাপত্তি—ধ্যেয়বিষয়ে একাগ্রচিত্তের তন্ময়তা (সা, বৌ)।

সমাহরণ—বহুর সমাবেশে একটি অখণ্ড সত্তারূপে গড়ে তোলা integration।

সমুচ্চয়—একসঙ্গে নেওয়া; সঙ্কলন (বে)।

সম্প্রয়োগ—বিশেষ যোগ [যেমন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের (মী)]; নিবিড় মিলন (সা, বৈ)।

সম্বন্ধতত্ত্ব—পরমপুরুষের আশ্রয়ে বিশ্বভাব ও বিশ্বভূতের পরস্পর সম্পর্কের সত্যতা relativities viewed as real (বৈ)।

সম্বোধি—সর্ববিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সম্যক বিজ্ঞান comprehensive spiritual intuition (বৌ)।

সম্ভূতি—বিচিত্ররূপের সমাহারে অখণ্ড ও সম্যক রূপায়ণ total becoming (শ্রু)। -সংবিৎ—যে-বিজ্ঞানে 'সম্ভূতি'র বোধ পূর্ণ comprehensive knowledge।

সম্মূঢ়—অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন।

সম্যক্—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাহারহেতু সম্পূর্ণ, অভঙ্গ integral (শ্রু)।

সর্বাত্মভাব—'এই যা-কিছু, সবই আত্মা' এই অনুভব (শ্রু, বে)।

সহ-চার—একসঙ্গে থাকা বা চলা concomitance। -ভাব—একসঙ্গে থাকা।

সাংস্থানিক—আধারের 'সংস্থান' বা উপাদানগত বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে আছে যা constitutional।

সাধন—কার্যসিদ্ধির প্রধান সহায় means (ন্যা)।

সাধর্ম্য—ধর্মগত সাদৃশ্য বা একতা (স্মৃ)।

সামরস্য—পরস্পরের ভাবনায় একই রসের উচ্ছলন এবং তাইতে একাত্মতার বোধ (শা)।

সামান্য—বহু ব্যক্তিতে অনুস্যূত সাধারণ ধর্ম general property। সর্বসাধারণ universal (ন্যা)।

সাম্পরায়—দেহপাতের পর আলোয়-আলোয় চলে যাওয়া (শ্রু)।

সাযুজ্য—অব্যবহিত যোগ, পরমসাম্য, অভেদভাব communion (শ্রু)।

সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করবার ইচ্ছা।

সৌম্য—সোম বা অমৃতচেতনার সঙ্গে যুক্ত (শ্রু)।

স্ফুরত্তা—ধ্রুববিন্দু হতে বিচ্ছুরণের স্বভাব radiation; চৈতন্যের স্বাভাবিক স্পন্দ dynamis (শৈ)।

স্মৃতি-প্রস্থান—'শ্রুতি'র আশ্রিত শাস্ত্রসমূহ—বিশেষত ইতিহাস-পুরাণ।

স্বগতপরিণাম—নিজের মধ্যেই স্বভাবের বশে রূপান্তর।

স্বধা—স্বপ্রতিষ্ঠার ভাব ও ধর্ম, আপনাতে আপনি থেকে শক্তির বিচ্ছুরণ (শ্রু)।

স্বনিষ্ঠ—আত্মকেন্দ্রে সমাহিত।

স্বরূপ-ধাতু—স্বরূপের উপাদান stuff, substance। -শূন্যতা—আত্মহারা ভাব (সা)।

স্বারসিক—স্বাভাবিক, স্বত-উচ্ছল।

স্বোত্তরণ—নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়া self-exceeding।

হীনযান—শুধু নিজের মুক্তি খোঁজা (বৌ)।

হৈতুক—কার্য-কারণভাব আছে যাতে।

হ্লাদিনী—পরমপুরুষের আনন্দরূপিণী স্বরূপশক্তি (বৈ)।

—

সংশোধন

[প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার (স্থূলাক্ষরে), দ্বিতীয় সংখ্যা ছত্রের। সংশোধিত রূপ উদ্ধৃতিচিহ্নের মাঝে।]

৪০।১৭ 'নিমেষিত' বা। ৫৩।১৪ 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়া'। ।২৬ 'তারা' পরস্পরের। ৯৭।২৪ সাগরের 'পূর্ণতা'। ১১৪।২৮ 'ডুবতে-ডুবতে'। ১৬৪।২৬ 'teleological'। ১৭১।২১ 'আরেকটি'। ১৭৯।১২ 'কেউ' যদি। ১৮২।১৯ 'বলে (আর'। ২১৭।১৯ 'আনন্দরূপ' বলে। ২৪৯।২১ প্রাকৃত 'উপায়ে'। ২৫২।২৩ 'মহিমবোধ' জাগে। ২৬৭।৫ 'প্রবাহ' /'। ৩০৬।২৯ 'অন্তর্গূঢ়'। ৩৩০।১১ প্রকৃতি ও 'পরিমাণ'। ৩৪২।১৫ 'মূল' রীতি। ৩৪৪।২০ 'উজানে' চলে। ৩৮৫।২১ 'স্ফূর্ত' করে। ।২২ 'স্ফূর্তির' সঙ্গে। ৪০৬।২৭ 'ideational'। ৪৫৯।১০ 'ঘুমিয়ে' পড়ে। ৪৬৯।৯ 'স্ফূর্তি'। ।১১ 'সম্পর্ক' বিচার।